দেশবিভাগ : ফিরে দেখা

আহমদ রফিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতবিভাগ (১৯৪৭, আগস্ট) এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি হিসাবে বিবেচিত। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে এ ইতিহাস এক বিরল রক্তাক্ত ঘটনা। এ ট্র্যাজেডি ও তার নায়কদের নিয়ে বিচারি-বিশ্লেষণ কম হয়নি ভারত, পাকিস্তান ও পশ্চিমা বিদগ্ধজনের হাতে। সে প্রক্রিয়া এখনো চলছে। তবে বাংলাদেশের গবেষক ও ইতিহাসবিদগণের মধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহ তুলনামূলক ভাবে কম।

দেশভাগ শুধু সম্প্রদায়গত বিভাজনেই নয়, স্বাধীনতা ও মানবিক চেতনা বিভাজনেরও এক অমানবিক ইতিহাস। দেশবিভাগের উত্তরপ্রভাব তেমন পরিচয়ও রেখেছে। তাই সে ইতিহাস জানা ও বোঝা ত্রিধাবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য, জনগণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সে ইতিহাসের অতিসংক্ষেপিত বিবরণসহ বিভাজনের ঠিক-বেঠিক, যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিয়ে মুল্যায়নধর্মী গ্রন্থ দেশবিভাগ : ফিরে দেখা এবং তা মূলত একুশ শতকের চিন্তাভাবনা ও বিবেচনায়। এখানে রয়েছে একটি বড় প্রশ্ন : দেশভাগ কতটা অনিবার্য ছিল? পাঠক এ রচনায় দেশভাগের কিছু ভিন্নমাত্রিক বিচার-ব্যাখ্যা দেখতে পাবেন। সেখানেই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

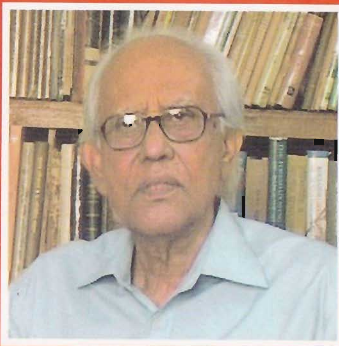

প্রাবন্ধিক, কবি ও কলামিস্ট হিসাবে খ্যাত আহমদ রফিক (জন্ম ১৯২৯) ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতির আকর্ষণে সমভাবে আলোড়িত ছিলেন। তিনি বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক।

প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে তাঁর শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। পেশাগতভাবে শিল্প ব্যবস্থাপনার সঙ্গে একদা যুক্ত থাকা সত্ত্বেও মননের চর্চাতেই তিনি অধিক সমর্পিত। এখন পুরোপুরি সাহিত্যকর্মে সক্রিয়। একাধিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদনা, প্রকাশনা ছাড়াও সক্রিয় রয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মযজ্ঞে। রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র ট্রাস্টের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, বাংলা একাডেমীর ফেলো এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জীবনসদস্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : শিল্প সংস্কৃতি জীবন (১৯৫৮), আরেক কালান্তরে (১৯৭৭), বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি (১৯৮৬), ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য (১৯৯১), রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প (১৯৯৬), জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা (১৯৯৭), রবীন্দ্রভুবনে পতিসর (১৯৯৮), জীবনানন্দ : সময় সমাজ ও প্রেম (১৯৯৯), নির্বাচিত কলাম (২০০০), একাত্তরে পাক বর্বরতার সংবাদভাষ্য (২০০১), কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা (২০০১), রবীন্দ্রনাথ এই বাংলায়, মৃত্যুহীন বিপ্লবী চে-গুয়েভারা (২০১১), বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ (২০12) ইত্যাদি। কবিতাগ্রন্থের মধ্যে নির্বাসিত নায়ক (১৯৬৬), বাউল মাটিতে মন (১৯৭০), রক্তের নিসর্গে স্বদেশ (১৯৭৯), বিপ্লব ফেরারী, তবু (১৯৮৯), পড়ন্ত রোদ্দুরে (১৯৯৪), নির্বাচিত কবিতা (২০০১) ও ইচ্ছামতির ঘরে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯২ সালে অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার, সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯95 সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদক আর কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে পেয়েছেন 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি ও স্বদেশে রবীন্দ্র পুরস্কার (১৪১৮)। এছাড়া অনেক ক'টা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক।

ISBN 978 984 90662 7 9

নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশবিভাগ : ফিরে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭ ৩৭৬৯, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০
বিক্রয়কেন্দ্র
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১৮০৮২৫৪৫
অক্ষর বিন্যাস
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
বানান সমন্বয় : আকতার হোসেন
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭ ৩৭৬৯, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০
মূল্য : ৭৫০.০০ টাকা

DESHBIBHAG: FIRE DEKHA by Ahmad Rafique
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/1ka Hemendra Das Road, Dhaka-1100
Phone : 957 3769, 01711 664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
Second Print : February 2015

Price : Taka 750.00

US $ 40

ISBN 978 984 90662 8 6

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মননশীল শিক্ষাবিদ, অনুসন্ধিৎসু গবেষক
প্রফেসর নজরুল ইসলাম
প্রিয়বরেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

প্রারম্ভকথা	৯
আমজনতারও স্বপ্ন ছিল পাকিস্তান	১৭
রাজনীতির সাম্প্রদায়িক বিভাজন	২৬
সহাবস্থানের ভিত নষ্ট করে স্থানীয় রাজনীতি ও শাসকনীতি	৩১
সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ : লীগ কংগ্রেস প্রজাপার্টি	৩৬
প্রাদেশিক নির্বাচন ও দলীয় সম্পর্কের জের	৪১
রাজনৈতিক টানাপড়েনে বিপর্যস্ত ফজলুল হক	৪৬
লীগের গায়ে জোয়ারি হাওয়া বঙ্গ-পাঞ্জাবের দাক্ষিণ্যে	৫২
লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বে ব্রিটিশ রাজের ভূমিকা	৫৮
বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লীগ-কংগ্রেস ও 'রাজ'	৬৪
কংগ্রেসে নীতিগত অন্তর্বিরোধ : যথারীতি গান্ধি-প্রাধান্য	৭১
কংগ্রেসে ডান-বাম দ্বন্দ্ব ও সুভাষ সমাচার	৭৬
হক-জিন্না দ্বন্দ্বের নেপথ্যে ক্ষমতার চক্রান্ত	৮৩
সিকান্দার হায়াতের পাকিস্তান বনাম পাঞ্জাব-ভাবনা	৮৯
ফ্যাসিস্টশক্তির অগ্রযাত্রায় স্থানিক প্রতিক্রিয়া	৯৫
বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে প্রধান বিশ্বশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০১
ক্রিপস প্রস্তাব নিয়ে নানা টানাপড়েন	১০৭
ক্রিপস-মিশনের ব্যর্থতা ও ব্রিটিশ চাতুর্য	১১৪
স্বশাসন প্রস্তাবের চোরাবালিতে স্থানীয় রাজনীতি	১২০
বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় কমিউনিস্টদের 'জনযুদ্ধ'	১২৭
বিয়াল্লিশের ক্রান্তিকালে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃত্ব	১৩৫
'ভারত ছাড়' আন্দোলন	১৪৩
আগস্ট আন্দোলনের চরিত্রবিচার ও কুশীলবগণ	১৫০
যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দুঃশাসনের কালোছায়া	১৫৬
হক সোহরাওয়ার্দী দ্বন্দ্ব : লীগের অগ্রযাত্রা	১৬৩
পাকিস্তান আন্দোলন : সাহিত্যচর্চায় প্রভাব	১৭০
কংগ্রেস রাজনীতির আপসবাদ	১৭৮
বঙ্গ-ভারতীয় রাজনীতি ও মুসলমান সমাজ	১৮৭
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী	২০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

বঙ্গভঙ্গ রদ থেকে মন্টফোর্ড প্রস্তাব : রাজনীতির নৈরাজ্য	২১১
রাজনীতিতে ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত	২১৯
সাম্প্রদায়িক ঐক্য-অনৈক্য ও রাজকীয় দমননীতি	২২৭
'সারে জাঁহাসে আচ্ছা'র ঐক্যবোধ টেকেনি	২৩৫
লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বের রাজনীতি	২৪৪
জিন্না : 'ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র'	২৫২
জিন্না পাকিস্তান চাননি : প্রশ্নবিদ্ধ মিথ	২৬১
পাকিস্তান অর্জন কতটা ইতিবাচক রাজনীতির প্রতিফলন	২৮০
সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার দায় কার?	২৮৭
অগ্নিগর্ভ ভারত : ছাত্র-জনতা-শ্রমিক ও নৌ-সেনা তৎপরতায়	২৯৪
সাধারণ নির্বাচন ও মুসলিম রাজনীতি	৩০২
কেবিনেট মিশন : সমঝোতার নয়া প্রচেষ্টা	৩০৯
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস : কলকাতায় সাম্প্রদায়িক গণহত্যা	৩১৯
অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে বেজায় টানাপড়েন	৩২৬
ব্রিটিশ সিংহের ভারতত্যাগের ঘোষণা : সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিস্তার	৩৩৩
কোন্ ভাঙনের পথে ভারতবর্ষ	৩৪১
ভাঙনের প্রতিক্রিয়ায় বিপন্ন দেশ	৩৫২
ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধি-জিন্না সমাচার	৩৬৪
দেশভাগের নিয়তি : নেহরু বনাম আজাদ, নেপথ্যে প্যাটেল	৩৭৯
ভারতবিভাগ কি অনিবার্য ছিল	৩৮৯
দেশভাগ বাংলাভাগ : জাতীয়তাবাদ থেকে সাম্প্রদায়িকতায়	৩৯৯
দেশবিভাগের পটভূমিতে বাঙালি জাতিসত্তা	৪১৪
জিন্নার পাকিস্তান : পাকিস্তানের জিন্না	৪২৩
দেশভাগ ও উদ্বাস্তুকথা	৪৩৬
দেশবিভাগ বিচার : একুশ শতকে দাঁড়িয়ে-১	৪৪৫
দেশবিভাগ বিচার : একুশ শতকে দাঁড়িয়ে-২	৪৫৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রারম্ভকথা

দেশবিভাগ (ভারতবিভাগ) দেখতে দেখতে ষাটোর্ধ্ব বয়সে পৌঁছে গেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী-হীরক জয়ন্তী এখন শতবর্ষ উদযাপনের দিকে তাকিয়ে। অপেক্ষা জমজমাট অনুষ্ঠানের। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক বিভাজন দুই রাষ্ট্র থেকে তিন রাষ্ট্রে পৌঁছেও তার 'আদিপাপ' থেকে মুক্তি পায় নি। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার এখনো অবসান ঘটেনি। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? দেশবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর তথা স্বাধীনতার কাছ থেকে মানুষ কী চেয়ে কী পেয়েছে আর কী পায়নি সে হিসাব-নিকাশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত।

দেশবিভাগের সঙ্গতি-অসঙ্গতি, ঠিক-বেঠিক, যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতা নিয়ে লেখক-গবেষকদের মননশীল পর্যালোচনা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। চলছে ভারতে, পাকিস্তানে, অধিকতর মাত্রায় পশ্চিমা দেশে। মতামত ও সিদ্ধান্তের ভিন্নতা সত্ত্বেও এসব পর্যালোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে দেশবিভাগ অনিবার্য না নিবার্য, তা নিয়ে আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। যে-কারণে হোক বাংলাদেশে দেশবিভাগ সংক্রান্ত গবেষণা, আলোচনা খুবই কম।

দেশভাগ নিয়ে নানামাত্রিক রচনায় আগ্রহের মূল কারণ সম্ভবত এর রক্তক্ষয়ী 'মানবিক ট্রাজেডি', কারো মতে 'ঐতিহাসিক ট্রাজেডি'। একথা ঠিক যে বিশ শতকের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রক্তস্নাত ভারতভাগ ও ব্রিটিশ রাজের ভারতত্যাগ তৎকালীন দক্ষিণ এশিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত। রাজনৈতিক ও মানবিক এই উভয় দিক বিচারে এর গুরুত্ব। আমাদের বিশ্বাস, গত ছয় দশক সময়পর্বে এ বিভাজনের পরিণামও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে আলোচনার যোগ্য।

দেশভাগ ও ক্ষমতার হস্তান্তর বিষয়ক রচনার পক্ষে সুযোগ বৃদ্ধি করেছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর তথ্যাদির প্রকাশ, নয়া দলিলপত্র, তৎকালীন শাসনকর্তাদের গোপন চিঠিপত্র, দিনলিপি, তারবার্তা, স্মৃতিকথা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে নব্য সমাজচিন্তার আলোয় বিষয়টি নিয়ে নানামাত্রিক পুনর্বিবেচনাও নতুন করে লেখার কারণ বা প্রেরণা দুই-ই। তাই সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগ ও ক্ষমতার হস্তান্তর সংক্রান্ত ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট কুশীলবদের ভূমিকা নিয়ে ভিন্নমাত্রিক বিচার-ব্যাখ্যাও যেন অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তা পক্ষে-বিপক্ষে। সেক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরপেক্ষ যৌক্তিকতা কতটা প্রকাশ পাচ্ছে তাও বিবেচনার বিষয়। তবু বলতে হয়, যত আলোচনা ততই স্বচ্ছতার দিকে যাত্রা।

দুই

দেশবিভাগ ও ক্ষমতার হস্তান্তর নিয়ে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে (যার মধ্যে অভিসন্দর্ভও অন্তর্ভুক্ত) তাতে এই বিস্তর রচনাবলী 'পার্টিশন সাহিত্য' তথা 'বিভাজন সাহিত্য' হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। এসব আলোচনায় যুক্তিসঙ্গত ভাবে দেশভাগের প্রেক্ষাপট হিসাবে সম্প্রদায়গত সংঘাত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত। তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক সামাজিক বিভেদ রাজনীতিতে তুলে এনে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যবহার। এ অপব্যবহারের দায় রাজনৈতিক নেতাদের, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে।

সুমিত সরকার সঙ্গত কারণেই লিখেছেন : 'উপনিবেশবাদের হাতে লালিত আর প্রায়শই প্রত্যক্ষভাবে পালিত বড় ধরনের খণ্ডচেতনা হলো ধর্মীয় বিভাগ–হিন্দুমুসলিম সাম্প্রদায়িকতা' (আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭, পৃ. ৫৮)। অথচ '১৮৮০-র দশক অবধি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ রকমে বিরল' (সরকার, প্রাগুক্ত)। পরবর্তীকালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মূল কারণ ধর্মসামাজিক সাধারণ বিষয়–যেমন মসজিদের সামনে বাদ্যবাজনা এবং গো-কোরবানি ইত্যাদি। এগুলো নিয়ে সমঝোতা কঠিন ছিল না। কিন্তু সে চেষ্টা কারুর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এ-সমস্যা মিটাতে শান্তিনিকেতন সংলগ্ন এলাকায় শান্তিপূর্ণ উদাহরণ তৈরি করেছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক মানসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে ১৯ শতকী নবজাগরণ-সূত্রে 'হিন্দু সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন'। এ সম্বন্ধে সুমিত সরকারের মন্তব্য: 'পুনরুত্থানবাদকে যে পরিশীলিত ও মননশীলরূপ দেওয়া হয় তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি-১৮৮০-এর দশকের বঙ্কিমচন্দ্র।... আরও অন্ধতার স্তরে পুনরুত্থানবাদের প্রতিনিধি ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।... বিবেকানন্দ নিজে আর্য ঐতিহ্যের গৌরবের আবেগমথিত ভাব উদ্রেকের সঙ্গে মিলিয়ে ছিলেন হিন্দুত্ব' (পৃ : ৭১-৭৩)।

প্রসঙ্গত তিনি 'আর্য সমাজ' ও প্রাচ্যবিদদের হিন্দুমাহাত্ম্য প্রচারের কথা উল্লেখসহ মন্তব্য করেছেন যে এসবে ছিল 'প্রায়শই বেশ প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক ও মুসলমান-বিরোধীচেতনা' (পৃ. ৭৪)। লিখেছেন আনন্দমঠ ও শিবাজী ভজনার প্রতিক্রিয়ার কথা। সেই সঙ্গে ইসলামি জাগরণ ও সংস্কারের পাল্টা অভিঘাতের কথা। তবে লক্ষণীয় যে বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, বন্দেমাতরম, মুসলমান বিদ্বেষ বিষয়ক ঘটনাবলীর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অথচ ঘটনাগুলো বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি অনুপস্থিত শ্রেণীচেতনা ও কৃষক বিদ্রোহগুলোর প্রসঙ্গ যা বিশেষ কারণে শ্রেণীসংঘাতকে সাম্প্রদায়িক চরিত্রে পৌঁছে দিয়ে ছিল। জনগোষ্ঠীর আন্দোলন ও বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানত সুমিত সরকার, সুনীতিকুমার ঘোষ, নিম্নবর্গীয়বাদী তাত্ত্বিক কেউ কেউ। সুমিত সরকার দাক্ষিণাত্যের মোপলা কৃষক বিদ্রোহ থেকে দূর পূর্ববঙ্গের পাবনা, ময়মনসিং-এর জমিদার ও মহাজন-বিরোধী সংঘাতের কথা কিছুটা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। বলাবাহুল্য হিন্দুবুদ্ধিজীবী ও সাময়িকপত্রের বিচার-ব্যাখ্যার কল্যাণে জনসমাজে এর সাম্প্রদায়িক প্রভাব পড়ে বিকৃত ধারায়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষককুল মুসলমান ও জমিদার-মহাজন হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত।

এ অসম শ্রেণীবিন্যাসের দায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর এবং মূলত ব্রিটিশ রাজশাসনের। কিন্তু ইতিহাসের এ ধারাকে ইতিবাচক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার দায়-দায়িত্ব সেকুলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিরই ছিল। যে-রাজনীতির সিংহভাগ নেতৃত্ব অগ্রসর সম্প্রদ্রায়ের হাতে। সাংগঠনিক বিচারে কংগ্রেসের হাতে। কিন্তু কংগ্রেস তাদের ঘোষিত সেকুলার জাতীয়তার চরিত্র পুরোপুরি ধারণ ও প্রয়োগ করতে পারেনি মূলত তাদের ডানপন্থী ও হিন্দুমহাসভাপন্থীদের প্রভাবের কারণে। সে হয়ে ওঠে সেকুলার ও ধর্মবাদী চেতনার মিশ্র সংগঠন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান সংগঠনগুলো ছিল দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন। আর বামরাজনীতি এ দিক থেকে ক্বচিত সঠিক, কখনো বিভ্রান্তিকর নীতি ও সুবিধাবাদের শিকার। তারাও দেশভাগ সম্বন্ধে সঠিক, বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারেন নি। ঘটনার ক্রান্তিকালে বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধ তাদের চেতনা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির মতাদর্শ নিয়ে পথ চলেছে। হিন্দুমহাসভা চলেছে হিন্দুত্ববাদী অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন নিয়ে। ঠিক বিপরীত স্বপ্ন মুসলিম লীগের চল্লিশের দশকে পৌঁছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে সাম্প্রদায়িকতা ধারে ভারে তাই অধিকতর শক্তিমান হয়ে ওঠে। তবে এর মধ্যেও অখণ্ড ভারতের প্রেক্ষাপটে সেকুলার জাতীয়তার রাজনৈতিক সম্ভাবনা একাধিকবার এসেছে। সদ্ব্যবহারের অভাবে বা ক্ষণিক ভ্রান্তির ভারে সে ফিরে গেছে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক চেতনার রাজনৈতিক বিকাশের দায় সবটুকুই স্থানীয় রাজনীতির তথা লীগ কংগ্রেসের ছিল না। ভারতশাসনে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ব্রিটিশ রাজের এ বিষয়ে ছিল সিংহভাগ দায়—'ভাগ কর শাসন কর' নীতির সফল প্রয়োগে। এবং তা তাদের শাসনকালের শুরু থেকেই। ভারতীয় ইতিহাসবিদ প্রায় সবাই এ বিষয়ে একমত যদিও হডসন চাণক্যনীতির প্রকাশ ঘটিয়ে সরসভঙ্গিতে লিখেছেন, রাজনীতির খেলায় প্রতিপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ অন্যপক্ষ তার প্রয়োজনে গ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ সম্পর্কে নিজদের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তা সংশোধনের ইঙ্গিত রেখে বলেছেন : 'শনি ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না'। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত এমন হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত যে সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক বিস্তার ঘটানোর জন্য লীগ, কংগ্রেস ও 'রাজ'–এ তিনপক্ষই দায়ী, কম তার বেশি। ঘটনা তাই বলে। তবে ইতিহাস-লেখকগণ যে-যার মতো করে ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ শেষে এর দায় ত্রিভুজের তিন কোণে স্থাপন করেছেন। শীর্ষ বিন্দু তথা 'রাজ'-এর দায় সম্ভবত সবচেয়ে বেশি, বিশেষত তা পরিকল্পিত বিধায়। এ ত্রিভুজই দেশভাগ সম্পন্ন করেছে।

তিন

বেশ কিছু কাল থেকে ভারতভাগ বিষয়ক 'পুনর্বিবেচনাবাদী' লেখক-গবেষকগণ (এদের 'সংশোধনবাদী' তথা 'রিভিশনিস্ট'ও বলা হয়ে থাকে) দেশভাগের দায় ভিন্ন ধারায় নির্ধারণ করতে শুরু করেছেন। তাতে দেশভাগ ও পাকিস্তান দাবির প্রবক্তা মোহাম্মদ আলী জিন্না ও তার সংগঠন মুসলিম লীগকে একপাশে রেখে ভারতীয় রাজনীতির যে নব মূল্যায়ন তার ফলে দেশভাগের দায় কংগ্রেসের ওপরও বর্তাচ্ছে। বিশেষ করে শেষপর্বে এ বিষয়ে অভিযুক্ত জওহরলাল নেহরু ও সরদার বল্লভভাই প্যাটেল। দায় হিন্দুমহাসভা ও তার সহযাত্রীদের কট্টর সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও তৎপরতার।

এক্ষেত্রে পাকিস্তানবাদী ইতিহাস-লেখকদের সঙ্গে সংশোধনবাদীদের সিদ্ধান্তের অনেক মিল লক্ষ্য করার মতো। তবে সম্প্রতি (২০০৯ খ্রি.) প্রকাশিত ভারতীয় জনতা পার্টি ('বিজেপি')র শীর্ষস্থানীয় নেতা যশবন্ত সিং-এর 'জিন্না ও দেশভাগ' বিষয়ক বিশালায়তন গ্রন্থের মূল্যায়নও ভিন্ন নয়। কারো কারো মতে এ মূল্যায়ন ভারতে কংগ্রেস-বিজেপি দ্বন্দ্বে বিজেপির জন্যে রাজনৈতিক সুবিধা তৈরি করতে পারে। ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের দায় বলে কথা! কিন্তু তাই বলে তথ্যের সত্য কি অস্বীকার করা চলে? বিশ্লেষণের সত্য যদিও ভিন্নমাত্রিক হতে পারে।

সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে শতবর্ষেরও অধিক বয়সী কংগ্রেস দীর্ঘ ভারত-শাসন কালেও স্বাধীন ভারতের শিক্ষিতশ্রেণীকে সম্প্রদায়চেতনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারে নি। শিক্ষার আলোয় সমগ্র ভারতবাসীকে আলোকিত করে তুলতে পারে নি। এর অবাঞ্ছিত প্রভাব পড়েছে অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত জনচেতনায়। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কংগ্রেস নিজেই দুই বিপরীত চেতনার ধারক, যেমন বিভাগপূর্ব তেমনি বিভাগোত্তর কালে। বিশদ আলোচনায় তা প্রমাণ করা চলে।

অন্যদিকে মুসলিম লীগের যাত্রা যেমন সম্প্রদায়চেতনা ও বিভাজনচিন্তা-ভিত্তিক, তেমনি পাকিস্তান অর্জনের পরও জিন্না-শাসিত এবং পরবর্তী সময়ের পাকিস্তান পূর্ব ধারা অক্ষুণ্ন রেখে পথ চলেছে। যেজন্য রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্রধর্মে পাকিস্তান হয়ে ওঠে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' (১৯৫৬) যদিও ভারত সেকুলার সংবিধান প্রণয়ন করেছে। সেকুলার জাতীয়তা বা গণতন্ত্র কখনো জিন্নার কাছে গ্রহণযোগ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না, একই ঘটনা দেখা গেছে স্বাধীন পাকিস্তানে। তাই ধর্মীয় নৈরাজ্যের রক্তারক্তি তার সমাজ ও রাজনীতির ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়। তার বর্তমান অবস্থা তো ভয়াবহ।

পাকিস্তানি শাসনে বাঙালি-অবাঙালির বৈষম্যমূলক নীতির অবশেষ পরিণাম ১৯৭১-এ আরোপিত যুদ্ধ বাঙালি বনাম পাকিস্তানি। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে সে যুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের সেকুলার চেতনায় উদ্বুদ্ধ। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ সে চেতনার পথ ধরে চলতে পারে নি। সামরিক শাসনের ঐতিহ্য ও সাম্প্রদায়িক চেতনার পাকিস্তানি উত্তরাধিকার থেকে স্বাধীন বাংলার সমাজ ও রাজনীতি পুরোপুরি মুক্তি পায় নি।

চার

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ ও ক্ষমতার হস্তান্তর তার প্রভাব বিভাজিত ভুবনের কাঁধ থেকে নামে নি। এ পরিণতি হয়তো জিন্না বা নেহরু কারোরই জানা ছিল না, কাম্য হওয়ারও কথা নয়। তবে একথা ঠিক যে তাদের তৎকালীন রাজনীতি বিচক্ষণতা ও মানবিক চেতনার পরিচায়ক ছিল না। সে কথা তাদের কেউ কেউ বুঝেছেন পরে। কিন্তু ক্ষমতার লাগাম হাতে পাবার অস্থির, অসহিষ্ণু আকাঙ্ক্ষা যুযুধান লীগ-কংগ্রেস নেতাদের দৃষ্টি একমুখী করে দিয়েছিল। সুস্থ হিসাব গোলমাল করে দেয়। সমস্যার চারদিক বুঝে দেখার মনোভাব কারোরই ছিল না।

প্রসঙ্গত ১৯৪৭-আগস্টে ক্ষমতা গ্রহণকালে অভিভূত নেহরুর রোমান্টিক ভাষণে 'নিয়তির সঙ্গে অভিসার' কথাটির সঠিক তাৎপর্য বোধ হয় স্বয়ং বক্তারও ভাবনায় ছিল না। বস্তুত সে 'অভিসার' ছিল রক্তঢেউ তোলা বিভাজনের ভয়াবহ পরিণতির সঙ্গে। সে দায় কম বেশি সবার। যেমন ১৯৪৬-আগস্টে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণার পরোক্ষ কারণ নেহরুর বক্তৃতা, অন্যদিকে সে উপলক্ষে নরহত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষ দায় জিন্না-মুসলিম লীগ ও সোহ্‌রাওয়ার্দি মন্ত্রীসভার। পরবর্তী পর্যায়ে সারা ভারতজুড়ে, বিশেষত পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সবাই হত্যা ও নারীনির্যাতনের প্রেতনৃত্যের শরিক। যুক্তিহীন, অমানবিক সে উন্মত্ততার কথা সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবা যায় না। সে উন্মত্ততা বন্ধে লীগ-কংগ্রেস কতটা সার্থক ভূমিকা রেখেছিল? প্রশ্ন উঠতেই পারে।

সবদিক বিচারে কারো কারো ধারণা ক্ষমতার ভাগ নিয়ে ব্রিটিশ ভারতের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের লড়াই যেন মিনি কুরুক্ষেত্রের মহড়া যেখানে যুক্তি ও মানবিক বোধের হার। সে ইতিহাস মূলত ঘটনা-নির্ধারিত যেখানে নাটকের কুশীলবগণ ঘটনার হাতে সমর্পিত। আবার কখনো তারাই ঘটনার নায়ক বা ঘটক। দেশবিভাগের কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে হয় জিন্নার অনুকূলে ছিল, যেমন বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও শাসকবর্গের দাক্ষিণ্য। কংগ্রেস সেখানে ঘটনার চাপে কোণঠাসা।

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রচনায় অন্তত দুটো ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—একটি বঙ্গে, অপরটি পাঞ্জাবে। সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের (১৯২৩) প্রবক্তা চিত্তরঞ্জন দাসের অকালমৃত্যুর (১৯২৫) ফলে 'হিন্দুমুসলিম চুক্তি' বাতিল, এবং অকালমৃত্যু (১৯৪২) পাঞ্জাব রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নায়ক ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা সিকান্দার হায়াত খানের। উত্তরসূরি খিজির হায়াত খান অবশ্য ততটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন না। দুই মুসলমান-প্রধান প্রদেশে পূর্বোক্ত অঘটনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। এই দুই ঘটনায় কারোর হাত ছিল না।

অবশ্য একই সঙ্গে লীগ, কংগ্রেস ও 'রাজ' এই ত্রয়ীর ভূমিকা এবং দেশের সামাজিক পরিস্থিতি ও রাজনীতির চতুর খেলা এবং তাতে ব্যক্তি-বিশেষের তৎপরতা দেশবিভাগের সহায়ক পটভূমি তৈরি করে। আর একথাও সত্য যে 'মাত্র গুটিকয় ব্যক্তির খেয়াল-খুশিতে ভারতের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল'। তাদের মৃত্যু, তাদের নির্যাতনভোগ, তাদের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা ওই কয়েকজনের হাতের তৎপরতার দান।

দেশভাগ নিয়ে এক্ষেত্রে গুরুতর প্রশ্ন : অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা, স্বাধীনতা-সংগ্রামী নেতাগণ কেন শেষপর্যন্ত ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের বিনিময়ে ক্ষমতা হাতে নিতে রাজি হয়েছিলেন? এখানে কি তারা কিছুটা বলিষ্ঠ দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারতেন না যেমনটা উল্লেখ করেছেন হডসন? লেনার্ড মোস্‌লের মতে দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ভারে ক্লান্ত, বয়স্ক কংগ্রেসী নায়কগণ আর লড়াইয়ের ময়দানে নামতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই সহজেই সাম্প্রদায়িকতার কাছে তাদের আত্মসমর্পণ ('দ্য লাস্ট ডে'জ অব দ্য ব্রিটিশ রাজ')। কিন্তু পাথুরে ব্যক্তিত্বের জিন্না কেন তার ভাষায় ' 'পোকায় খাওয়া পাকিস্তান' নিয়ে ময়দান ছেড়ে গেলেন? ক্লান্তিকে ভয় পেয়ে পিছু হটার মতো স্বভাব তো তার নয়? এসব প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া ইতিহাসের দায়। তবে একথাও বোধ হয় ঠিক যে পূর্বোক্ত ত্রিশক্তির মধ্যে সবার সেরা নায়ক শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন।

পাঁচ

ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় জিন্নার জেদ সত্ত্বেও দেশবিভাগ এড়ানো সম্ভব এমন মতামত প্রকাশ করেছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। সে নিরিখে কিছু প্রস্তাবও রাখেন তিনি। তার মতে দেশভাগ এড়ানো যেতো যদি গান্ধি-নেহরু মুসলিম লীগ তথা জিন্নার দাবি দাওয়ার ব্যাপারে আরো কিছুটা উদার হতেন, সংশ্লিষ্ট ভাইসরয়গণ অধিকতর বিচক্ষণতা, নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ ঘটাতেন। সর্বোপরি ত্রিপক্ষীয় সংলাপে জিন্না যদি পাথুরে দৃঢ়তার পরিবর্তে কিছুটা নমনীয় হতেন। এই তিন 'যদি'র কারণে অখণ্ড ভারতের সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয়ে হডসনও কয়েকটি 'যদি' ও 'কিন্তু'র উল্লেখ করে দেশভাগ এড়ানোর কথা বলেছেন। যেমন ব্রিটিশরাজ যদি দু-দশ বছর আগে ভারতীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন তাহলে ঘটনা অন্যরকম হতো, দেশভাগ এড়ানো যেতো। লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব তখন অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পৌঁছায় নি। কিন্তু তেমন মনোভাব তখন ব্রিটিশ রাজ-এর ছিল না।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে ব্রিটিশ রাজ ভারতত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। হডসন আরো লিখেছেন, মন্ত্রীমিশনকে যদি অধিক ক্ষমতা বিশেষ করে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দেওয়া হতো তাহলেও পরিস্থিতি ভিন্ন পথ ধরতে পারতো। এমনি কয়েকটি 'যদি'র কথা উল্লেখ করেছেন হডসন। তার এ বক্তব্যে দেশভাগের দায় প্রধানত ব্রিটিশ শাসনের ওপরই বর্তায়। অন্তত ১৯৪২ সালে ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার কারণ যে মূলত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সে কথা অনেকে বলেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চাপের মুখে চার্চিলের দুর্বুদ্ধি ও ভাইসরয় লিন্‌লিথগো'র আপত্তি ভারত সমস্যাকে জটিল করে তোলে।

দেশভাগের সঙ্গতি ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে দুচার কথা বলা যায় একটি প্রচলিত প্রবাদ সাপেক্ষে–'গাছের পরিচয় তার ফলে' কিংবা 'যার শেষ ভালো তার সব ভালো'। ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে দেশভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরিণাম ভারত, পাকিস্তান্ দুই ভূখণ্ডেই মানুষ হত্যার পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ধারাবাহিকতা এখনো শেষ হয় নি। কয়েক কোটি ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণার্ত জীবন দেশভাগের সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া যুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংঘাত ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য হয়ে ওঠে অনিবার্য বাস্তবতা। অশুভযাত্রার অশুভ ফল এখনো দৃশ্যমান। সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা বিষয়ক জিন্নার 'গ্যারান্টি' ধোপে টেকেনি। এমনকি কাজে আসেনি নেহরু-লিয়াকত চুক্তি। জিন্নার 'মাইনরিটি তত্ত্ব' দেশভাগ সত্ত্বেও অশুভ রাজনৈতিক তত্ত্বরূপে বেঁচে রয়েছে।

দেশভাগের বিষাক্ত পরিণাম এড়ানোর সুষ্ঠু সম্ভাবনা ছিল অখণ্ড ভারতে ভাষা ও জাতিসত্তাভিত্তিক রাজ্য বা প্রদেশ নিয়ে সীমিত শক্তির কেন্দ্রভিত্তিক সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠন। সে প্রস্তাব এক সময় কমিউনিস্ট পার্টির বিবেচনায় এসেছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য কোনো চেষ্টা চালানো হয়নি। মূল আলোচনায় আমরা দেখেছি ১৯১৬ থেকে ১৯২৮ এবং তার পরেও ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর সাম্প্রদায়িক সমঝোতার শুভ সম্ভাবনা কীভাবে নষ্ট হয়েছে। ফলে দেশভাগের সম্ভাবনায় গতি সঞ্চারিত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের শেষ প্রশ্ন : অযুত (মিলিয়ন) অধিক নরনারীর মৃত্যু, কয়েক কোটি ছিন্নমূল মানুষের দুঃসহ জীবন যন্ত্রণার বিনিময়ে দেশভাগ ও স্বাধীনতার ইতিবাচক ও মঙ্গলদায়ক ফল কতটা মানুষের হাতে ধরা দিয়েছিল? প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির বিচারে তাতে নেতির ভাগই বেশি, বিশেষ করে রাজনৈতিক-সামাজিক পরিণাম বিচারে। একুশ শতকে পৌঁছেও আধুনিকতার বড় অবদান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভূত এখনো আমাদের কাঁধে সওয়ার, ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশে। ঘটেছে ধর্মীয় মৌলবাদের সন্ত্রাসী উত্থান।

সত্যিকার অর্থে সেকুলার, গণতন্ত্রী ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন দুর্নীতিহীন শাসনব্যবস্থা উপমহাদেশে কায়েম করা যায় নি। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিরূপতার বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিমেষে সামাজিক-রাজনৈতিক সহিংসতায় পরিণত হয়ে যায়। দেশভাগের বাস্তব পরিণাম হিন্দুজাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ যেখানে হিন্দু-আইডেনটিটি, মুসলিম আইডেনটিটি প্রধান হয়ে ওঠে। তাই গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকৃত সেকুলার জাতিরাষ্ট্র গঠন আমাদের সুবুদ্ধির অপেক্ষায় আছে।

ভারতীয় রাজনীতি ও তার দেশভাগকালীন ঘটনাবলীর বিশদ বিচারে ও দেশভাগের পরিণাম দৃষ্টে সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে ভারতভাগ যেমন যুক্তিসঙ্গত ছিল না তেমনি তা অনিবার্যও ছিল না। লীগ-কংগ্রেস-রাজ এই ত্রিশক্তি মিলে দেশভাগ অনিবার্য ও বাস্তবায়িত করেছে। একাধিক লেখক এ অঘটনের জন্য ওই ত্রিশক্তিকেই দায়ী করেছেন।

পরিশেষে বলা দরকার যে দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্রান্তিকাল ও ঘটনাক্রমের জটিলতায় যেকোনো লেখকের একমুখী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাই এক্ষেত্রে চেষ্টা করেছি ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নির্মোহ ও নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখার। অর্থাৎ না-মুসলমান, না-হিন্দু, না-বাঙালি, না-অবাঙালি এমন নিরক্ষরৈখিক অবস্থান নিশ্চিত রাখা। এক্ষেত্রে সফলতা-ব্যর্থতার একমাত্র নির্ধারক নিরপেক্ষ চেতনার পাঠক। আর একটি কথা, প্রাসঙ্গিক টানে কিছু কিছু তথ্য ও ঘটনার পুনরুক্তি এড়ানো সম্ভব হয়নি। ত্রুটি মার্জনার ভার পাঠকের।

বইটি প্রকাশের জন্য আগ্রহী প্রকাশক আফজাল হোসেনকে অশেষ ধন্যবাদ।

আহমদ রফিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমজনতারও স্বপ্ন ছিল পাকিস্তান

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। পাকিস্তানের জন্মদিন। ঘটনাক্রমে সে সময় আমি গ্রামে, পরীক্ষা শেষে ছুটির অবসরে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত নবীনগর থানার শাহবাজপুর গ্রামে। ঠিক মেঘনাতীরে না হলেও মেঘনার সান্নিধ্যে, অর্থাৎ মেঘনার কোলঘেঁষা নাসিরাবাদের পরই শাহবাজপুর গ্রাম। বাড়ির উত্তর প্রান্তে দাঁড়ালে ফসলের ক্ষেত পার হয়ে দূরে দিগন্তরেখায় দেখা যায় মেঘনার অস্পষ্ট নীলাভ আভাস। আকাশ-নদী মাটি-গাছপালা মিলে গ্রামবাংলার এক রোমান্টিক রূপ। পূর্ববঙ্গের সব গ্রামেরই কমবেশি একই চেহারা– তা রবীন্দ্রনাথের পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহ হোক কিংবা হোক নাগর নদীতীরের পতিসর। শান্তিতে বসবাস একাধিক ধর্মবিশ্বাসী বাঙালির।

কিন্তু রাজনীতি রোমান্টিকতা বোঝে না, বোঝে না কবিতা। বোঝে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা– সেই সঙ্গে বোঝে ও জানে ব্যক্তিক অহমিকা ও দলীয় স্বার্থ, আর যতটা সম্ভব জনগোষ্ঠীর স্বার্থ নিয়ে ফাঁপা কথকতা। তবে সে স্বার্থ যতখানি জনসাধারণের তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শ্রেণীবিশেষের, বিশেষ করে শিক্ষিত ও বিত্তবান শ্রেণীর। সে বহুমাত্রিক স্বার্থের টানে ছয়কে নয় করে ধর্মকে জাতি বানিয়ে তোলা যায়। ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে অশিক্ষিত জনশ্রেণীকে খেপিয়ে তোলা যায়। যায় সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে– যে স্বপ্ন কখনো বাস্তবের মুখ দেখতে পায় না। আর মধ্যবিত্ত শিক্ষিতশ্রেণী কখনো অন্ধ রক্ষণশীলতার টানে, কখনো সচেতন স্বার্থবুদ্ধির প্রভাবে 'নয়-ছয়'-এর অস্বাভাবিকতা সত্য বলে গ্রহণ করে। রাজনীতির এ ট্র্যাডিশন আমাদের দেশে দীর্ঘদিনের।

এমনটাই ছিল ব্রিটিশভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে চল্লিশের দশকে রাজনীতির খেলা, লীগ-কংগ্রেসের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর মোহাম্মদ আলী জিন্নার তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বাহারি পাকিস্তানি বেলুন যা দেখে মুগ্ধ বাঙালি মুসলমান। এ মুগ্ধতার পেছনে আসলে ছিল বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির স্বপ্ন। মুক্তি অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য, সচ্ছলতা না হোক অন্তত পক্ষে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের। তাই বাঙালি মুসলমান শ্রেণী-নির্বিশেষে মুসলিম লীগপ্রধান জিন্নার পেছনে একাট্টা। প্রচারের মহিমায়

অভিভূত বাঙালি মুসলমান জনতা রাজনীতির খেলায় শ্রেণীস্বার্থের ফাঁকিটা বুঝতে পারেনি, পারার কথাও নয়। বিষয়টা আরো সহজ হয়েছিল হিন্দুপ্রধান জমিদার শ্রেণীর প্রজাপীড়নে ও প্রজাশোষণের কারণে। মুসলমান জমিদারও মুসলমান প্রজাপীড়নে-শোষণে যে ভিন্ন নয় তা ধর্মীয় প্রচারের গুণে বড় একটা চোখে পড়েনি মুসলমান প্রজার, কৃষক-জনতার। সামন্ত শোষণের সঙ্গে যুক্ত হয় ভয়ংকর মহাজনি শোষণ। মহাজনদের লাগামহীন অর্থনৈতিক শোষণ চরিত্র বিচারে ছিল হাঙর কুমিরের মতো। ঋণগ্রস্ত কৃষক, কারিগরের জমিজিরেত বা ভিটেমাটি ঋণের দায়ে গ্রাস করতে তাদের বিবেকে বাধে নি। মহাজনদের প্রায় সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় সে ঐতিহাসিক ঘটনাও সাম্প্রদায়িক সমস্যা তৈরি করে। জমিদার-মহাজনের জাঁতাকলে তা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। নাভিশ্বাস ওঠে কৃষক প্রজার। এ ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

দুই

আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে সেজো চাচার বাড়ি। শ্রাবণ পেরিয়ে ভরা ভাদ্র। পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছেন বাইরের আঙিনায় বাঁশঝাড়ের নিচে নিম্নবর্গীয় কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনি– পাকিস্তান নিয়ে কথা, সোনালি আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে সে কথকতায় ফুটে ওঠে ভবিষ্যৎ স্বপ্নের সোনালি আঁকিবুঁকি। এগিয়ে গিয়ে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করি : 'কেমন বোঝেন দেশ ভেঙে এই পাকিস্তান হওয়াটা'?

মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকান মধ্যবয়সী ভূমিহীন দিনমজুর রেয়াজুদ্দিন (গ্রামের প্রচলিত ডাকে 'রেজদ্দি')। পরনে ভেজা গামছা, খালি গা। প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব : 'জিন্না সাব্‌রে আমরা বাশ্‌সা (বাদশাহ) বানাইছি, পাকিস্তান আইছে। আমরার আর কষ্ট থাকব না।' তার মুখে স্বাপ্নিক আলোর আভা। আমার পাল্টা জিজ্ঞাসা : 'ক্যামনে বুঝলেন, আপনাদের আর কষ্ট থাকব না।' 'জিন্না সাবে কইছে। হ্যার লাইগ্যাই তো পাকিস্তান বাক্সে বুট (ভোট) দিছি।' কণ্ঠে গভীর প্রত্যয়ের সুর। নিজদের ক্ষমতা সম্বন্ধেও সচেতন।

এর পর আর কথা চলে না। জিন্না সাহেবের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। শহর থেকে অনেক দূরে মেঘনাপারের প্রত্যন্ত গ্রাম শাহবাজপুরের শ্রমজীবী মানুষ রেয়াজুদ্দিন একেবারে ভূমিহীন নন। দু-তিন কানি (বিঘা) চাষের জমি থাকলেও তাতে পাঁচ-ছ'জনের সংসার চলে না। তাই দিনমজুরিই জীবনযাত্রার প্রধান নির্ভর। তার ছোট ভাই জৈনুদ্দিনেরও একই অবস্থা। এরা সবাই চেনা মানুষ। অবাক হই দেখে যে, জিন্না সাহেবের রাজনৈতিক প্রভাব কত দূর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরা রাজনীতির আদ্যোপান্ত না বুঝলেও জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক দিকটা ঠিকই বোঝে, অর্থাৎ বুঝতে হয়। মুসলিম লীগের ব্যাপক প্রচারের গুণে জিন্না সাহেবকে যে গ্রামের সাধারণ মুসলমান তাদের পরিত্রাতা মনে করেছে এ তথ্যটা শুধু তখনই নয়, বছর দুই আগে (১৯৪৫) মাস খানেকের জন্য গ্রামে এসে বিলক্ষণ বুঝতে পারি। প্রথম গ্রাম ছাড়ার সময়কার (১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি) চেনা গ্রাম প্রায় এক দশকে অনেক পালটে গেছে। মানুষগুলো বিশেষ করে গ্রাম্য যুবকদের কথাবার্তা, রাজনৈতিক আচার-আচরণ একেবারে অচেনা মনে হয়েছে। অবাক হয়েছি দেখে যে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বার্তা এতদূর অজপাড়াগাঁ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সে মুহূর্তে এর গুরুত্ব বুঝতে পারিনি, বুঝেছি বছর কয়েক পর।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে শহুরে ছাত্র যুবকরা তো বটেই, গ্রামের ছাত্র ও অশিক্ষিত যুবকরাও আবেগে-উদ্দীপনায় লীগের বাক্সে ভোট দেয়ার কাজে ব্যাপক সহায়তা করেছে। দল বেঁধে গ্রাম্য ভাষায় রচিত ভোটের গান গেয়েছে। তাতে ছিল রাজনৈতিক চেতনার পরিচয়। অবিশ্বাস্য তৎপরতায় চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ডাক মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দূর গ্রামের মাটির দাওয়ায় পৌঁছে যায়। বাঙালি মুসলমান আমজনতাকেও সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখায় পাকিস্তান।

এর পেছনে ছিল জিন্না সাহেবের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও তার কিছুসংখ্যক বিশ্বাসী অনুসারীর ভূমিকা। আর বাংলায় বিশেষভাবে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, কামরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ রাজনীতিকের সাংগঠনিক তৎপরতা এবং তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের মতো ছাত্র-যুবাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। সত্যি বলতে কি দেশভাগের ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জিত হয় একদিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও চাতুর্যের গুণে, অন্যদিকে বাংলার মুসলমান তরুণ ও যুবকদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক তৎপরতায়। এর প্রতিফলন দেখা গেছে ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বাংলায়। আমার অবাক লেগেছে যে প্রগতিবাদী ছাত্রযুবাদের অধিকাংশ পাকিস্তানি আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি।

এ অবস্থার হুবহু প্রতিরূপ দেখা যায় দুই যুগ পর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যদিও ঠিক বিপরীত রাজনৈতিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়ে। ছেচল্লিশের নির্বাচনে জিন্নার সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব বাঙালি মুসলমান শ্রেণী-নির্বিশেষে যে অন্ধ আবেগে গ্রহণ করেছিল সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে, সত্তরের নির্বাচনে সেই বাঙালি মুসলমানই অনুরূপ শ্রেণী-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্বোক্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে জয়যুক্ত করতে– পরবর্তী সময়ের পরিণতি যেমনই হোক না কেন। ঐ রাজনীতির প্রধান কারিগর আওয়ামী লীগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

সাধারণভাবে মনে করা হয় ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতেই দেশবিভাগের ভিত তৈরি। ইতিহাসে 'লাহোর প্রস্তাব' হিসাবে উল্লিখিত হলেও রাজনৈতিক আলোচনায় তা হয়ে ওঠে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'। হিন্দু ও মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি– জিন্নার এ তত্ত্বের ভিত্তিতেই লাহোর প্রস্তাব (মার্চ, ১৯৪০) দেশবিভাগের তাত্ত্বিক ভিত রচনা করে।

এ প্রস্তাব ঐতিহাসিক হিসাবে চিহ্নিত হলেও এতে ছিল অস্পষ্টতা, গণতান্ত্রিক চেতনার রাষ্ট্রনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব যে জন্য দেশ ও দেশের বাইরে এ রাষ্ট্রধারণা অবাস্তব বিবেচিত হতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও বিদেশি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কারো কারো মতে পাকিস্তান চিহ্নিত হয় এক উদ্ভট রাষ্ট্ররূপে (রুপার্ট এমার্সন)। কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় এমন এক রাষ্ট্ররূপে যার দুই অঞ্চলের মধ্যে কোনো সীমান্তরেখা নেই এবং দুই অংশের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান– মাঝখানে অন্য একটি রাষ্ট্র।

লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্রভূমির প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে 'ভৌগোলিক দিক থেকে সন্নিহিত ইউনিটগুলো নিয়ে এবং তার জন্য প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক রদবদল করে ভারতকে এমন কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করতে হবে যাতে ভারতের উত্তর- পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা– সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো (ইংরেজিতে বলা ছিল স্টেটস) গড়ে উঠবে এবং সেসব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলো হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম।

মূল প্রস্তাবটি উদ্ধৃত করে দেশবিভাগ বিষয়ক গবেষণাধর্মী বিশাল গ্রন্থ 'দ্য গ্রেট ডিভাইড'-এর লেখক এইচ ভি হডসন মন্তব্য করেছেন যে, এ প্রস্তাবের বাক্যরীতি ও ব্যাক্যাংশের তাৎপর্য দুই-ই অস্পষ্ট (অবসকিউর)। কিন্তু প্রস্তাবের মূলনীতি অনুযায়ী এবং অঞ্চলগুলো যাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, কাস্টমস ও অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সব কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে একটি সাংবিধানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

কিন্তু সে কাজ ওয়ার্কিং কমিটি করেনি। এমন এক অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট স্বতন্ত্রভূমির পরিকল্পনা নিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক লাহোর প্রস্তাবের যাত্রা। এ প্রস্তাবের বড় স্ববিরোধিতা হলো যেখানে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবিতে দেশভাগ করা হচ্ছে সেই স্বতন্ত্ররাষ্ট্রে তথা পাক ভূমিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের উপস্থিতি। প্রস্তাবে আরো বলা হয়, এই ইউনিট ও অঞ্চলগুলোতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে এবং সে ব্যবস্থা তাদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে করা হবে। এখানেও স্পষ্ট নীতিগত স্ববিরোধিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বভাবতই যুক্তি, বহুজাতিক বহুভাষিক ভারত ভূখণ্ড থেকে কেটে মুসলমান রাষ্ট্র যদি গঠিত হয় তাহলে সে রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অবস্থান দ্বিজাতিতত্ত্বের স্ববিরোধিতা ও দুর্বলতাই প্রমাণ করে। আর সংখ্যালঘু ভিন্ন সম্প্রদায় যদি থাকেই তাহলে একই যুক্তিতে তারাও এক সময় ওই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কেটে নিজেদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তুলতে পারে। পরবর্তী সময় প্রমাণ করেছে যে জিন্নার পরিকল্পিত পাকিস্তানে সংখ্যালঘুর স্বার্থ দূরে থাক, নিরাপত্তাও নিশ্চিত ছিল না।

এ ছাড়া একাধিক স্ববিরোধিতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে ওই প্রস্তাবে। যেমন মুসলমানপ্রধান উল্লিখিত প্রদেশগুলোর প্রতিটি যদি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তারা কি কোনো ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হবে, নাকি আঞ্চলিক ভিত্তিতে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হবে। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. আম্বেদকরও এ প্রস্তাবের অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতা নিয়ে অনুরূপ মন্তব্য করে ছিলেন। ওই একই সময়ে (১৯৪০) তার 'পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

ড. আম্বেদকর পাকিস্তান প্রস্তাবের ধোঁয়াশার কারণে এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন এই ধারায় যে, প্রস্তাবিত পাকিস্তানে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো কি স্বতন্ত্র থাকবে নাকি ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত হবে? অন্তর্ভুক্ত হলে তো তাদের সার্বভৌমত্ব থাকবে না। এতে রয়েছে দুটো পরস্পরবিরোধী ধারণা। তাহলে কি সামগ্রিক ব্যবস্থাটি একটি কনফেডারেশনে পরিণত হবে? একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞের পক্ষে এ ধরনের বিভিন্ন সম্ভাবনার প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক। শুধু ড. আম্বেদকরই নন, আরো কেউ কেউ একই প্রশ্ন তুলেছেন।

আমাদের বিস্ময় যে, জিন্না নিজে একজন আইন-বিশেষজ্ঞ হয়েও এ ধরনের একটি অস্পষ্ট, স্ববিরোধী প্রস্তাব উপহার দিলেন কী মনে করে। এ প্রশ্নের জবাব মেলা ভার। এমনকি যিনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেই ফজলুল হকও একজন বিশিষ্ট আইনজীবী, সেই সঙ্গে খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ। তিনিইবা কীভাবে এমন একটি ধোঁয়াটে প্রস্তাব তুলে ধরলেন এর সবদিক না দেখে, না বুঝে?

চার

অস্পষ্ট হোক, ঝাপসা হোক কিংবা স্ববিরোধী হোক, লাহোর প্রস্তাবের (এরপর থেকে একে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'-ই বলব) মূল উদ্দেশ্যে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না এবং তাহলো ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি আর তা ভারত ভাগ করে। কারণ? কারণ একটাই। হিন্দু-মুসলমান নানা দিক থেকে এত ভিন্ন যে তারা এক সঙ্গে থাকতে পারে না। কথাটা জিন্নার। তাহলে প্রশ্ন ওঠে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিগত শত শত বছর ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে এলো কীভাবে? মারামারি, কাটাকাটি করে? মধ্যযুগের ইতিহাস বা সুলতানি আমলের সেক্যুলার বাংলা তো তেমন সাক্ষ্য দেয় না। দুই সম্প্রদায়ের কবিরা মিলেই তো তখন 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' বা 'রসুল বিজয়'-এর মতো কাব্যকাহিনী লিখেছেন। তখনকার ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা বড় একটা দেখা যায়না।

স্বতন্ত্র বাসভূমি কি সে ক্ষেত্রে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সমস্যার একমাত্র সমাধান? তাহলে কয়েক কোটি মুসলমানকে ভারতে ফেলে আসা হল কেন? কেন পাকিস্তানে তাদের স্থান হল না? তাতে জিন্নার বিন্দুমাত্র বিকার দেখা গেল না। হতাশ সেই ভারতীয় মুসলমানগণ কি অভিশাপ দিয়ে ছিল তাদের প্রিয় কায়েদে আজমকে। মাওলানা আজাদ তার বইতে এ সম্বন্ধে স্ববিরোধিতার কথা তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা অগ্রিম বলে রাখা ভালো যে, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্রভূমির ধারণা কিন্তু জিন্নার কোনো মৌলিক উদ্ভাবনা নয়। কবি স্যার মোহাম্মদ ইকবাল থেকে রহমত আলী চৌধুরী গ্রুপ তিরিশের দশকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম দেন।

'সারে জাহাসেঁ আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা' পঙ্‌ক্তির স্রষ্টা কবি ইকবাল ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেন, 'পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র দেখতে চাই আমি। স্বশাসিত সে রাষ্ট্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে বা বাইরে যেখানেই হোক।' এখানে অবশ্য কবি স্পষ্ট করে ভারত বিভাগের কথা বলেননি।

পূর্বোক্ত হডসন সাহেব অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে, কবি ইকবালের দীর্ঘ বক্তব্যে স্বশাসিত রাষ্ট্র নিয়ে ফেডারেশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। হডসনের ভাষায় 'এখানে দ্বিজাতিতত্ত্ব বা প্রকৃত পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা বলা হয়নি'। হ্যাঁ, স্যার ইকবাল জিন্নার মতো দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর নির্ভর করে পাকিস্তান চাননি, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি তুলে ধরেছিলেন।' অবশ্য বঙ্গদেশ বাদ দিয়ে।

তবে রহমত আলী গ্রুপ পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলো নিয়ে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিকল্পনাই তুলে ধরে (১৯৩৩)। তারা বিলেতে গোলটেবিল বৈঠকে মুসলমান প্রতিনিধিদের ফেডারেল সংবিধান ভাবনারও বিরোধী ছিলেন। ওই গ্রুপের মতে, স্যার ইকবালের ফেডারেল ধারণাটি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট নয়। এদের কারো দাবিতেই বঙ্গদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

এ সময়ে একাধিক গ্রুপ বা ব্যক্তি এ বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে, কিন্তু কোনোটারই ভিত্তি রাজনৈতিকভাবে খুব মজবুত বা যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না। এদের মধ্যে চমকপ্রদ ছিল পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াত খানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিস্তরীয় পরিকল্পনা– প্রদেশ, অঞ্চল ও কেন্দ্র নিয়ে। প্রাদেশিক স্তরে বাংলা, সিকিম ও আসাম নিয়ে বৃহদ্বঙ্গের ধারণা সেখানে ছিল। ছিল পশ্চিমের প্রদেশগুলো নিয়ে গ্রুপ গঠন। তার এ জটিল ফেডারেল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল যাতে 'এর চেয়ে খারাপ কোনো পরিকল্পনা রাজনৈতিক অঙ্গনে উঠে আসতে না পারে'। খারাপ বলতে তিনি পাকিস্তান পরিকল্পনার কথাই বলতে চেয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হলো মাস কয়েক পর সিভিলিয়ান পেন্ডেরেল মুন প্রসঙ্গক্রমে স্যার সিকান্দারকে বলেন, পাকিস্তান পরিকল্পনাই তো তার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয়। এ কথা শুনে সিকান্দার হায়াত জবাবে বলেন, 'এত দিন পাঞ্জাবে থেকেও এমন ধারণা তোমার কী করে হলো? পাকিস্তান মানে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ (ম্যাসাকার)। এ সুযোগে পাঞ্জাবি মুসলমান হিন্দু বেনিয়াদের গলা কাটতে থাকবে।'

পেন্ডেরেল মুন-এর লেখা বই 'ডিভাইড অ্যান্ড কুইট'-এ রয়েছে এ কাহিনীর সরস বয়ান। অবাক হয়ে ভাবি, সিকান্দার হায়াত কি সম্ভাব্য ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের রক্তাক্ত ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন? যে জন্য ভারত বিভাগের পরিবর্তে ফেডারেল ভারতবর্ষের একটি জটিল পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরেন তার পুস্তিকায় (আউটলাইনস অব এ স্কিম অব ইন্ডিয়ান ফেডারেশন)। এ পুস্তিকা তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন সবার অবগতির জন্য।

বাস্তবিক পাকিস্তান পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পেশোয়ার থেকে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ হয়ে বিহার বাংলায় যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তার তুলনা নেই। ভাগ্যিস ওই ভয়াবহতা দেখতে স্যার সিকান্দার হায়াত ততদিন বেঁচে ছিলেন না। কিন্তু জিন্না এসব নিয়ে ভাবিত ছিলেন না। তিনি যে কোনো মূল্যে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান গঠনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

তাই দেশবিভাগের জন্য মরিয়া জিন্না ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পথ তৈরি করে রক্তস্রোতের বিনিময়ে দেশবিভাগ অনিবার্য করে তোলেন। যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষ ও বৈরিতার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান অর্জনের পথ তৈরি হয় তার ভবিষ্যৎ পরিণাম নিয়ে তিনি ভাবেননি। তাৎক্ষণিক অর্জনই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। শীতল, নির্মোহ, আবেগহীন জিন্নার সঙ্গে সিকান্দারের অনেক তফাৎ।

কিন্তু কেন? এর একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। তার পারিবারিক জীবনে, ব্যক্তিজীবনে ওপরে ওঠার লড়াই ছিল তার প্রচণ্ড অহমবোধের সমান্তরাল। যে বোধ তার মধ্যে একনায়কী বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটিয়েছে। তৈরি করেছে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব। কামরুদ্দিন আহমদ তাকে 'মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত'রূপে চিহ্নিত করেছেন। এমনকি লিখেছেন, পাকিস্তানের জন্য তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো 'অবসেশন' ছিল না। ছিল 'রাজকোটের দেওয়ানের পুত্র এম.কে গান্ধি ও কাশ্মিরি বর্ণশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়া এবং ভারত ভেঙে প্রতিশোধ নেয়া। এমন এক মানসিকতার কারণে তার পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হওয়া'। ঠিক মনে নেই কবে যেন একটা ইংরেজি লেখায় জিন্নার এ জাতীয় 'স্যাডিস্ট' মানসিকতার কথাই পড়েছিলাম। এসব পড়ার আগে সেই স্কুল জীবনে যখন রাজনীতি নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামাতাম তখনো আমার মনে হয়েছে এ স্ববিরোধী চিন্তার মানুষটি বুঝি ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বনাশের দূত। কিন্তু কেন?

বলছি আমার ভাবনার কথা। তার আগে একটা কথা বলে নিই। হডসনও অনেকটা কামরুদ্দিন আহমদের মতো, তবে অনেকটা সহানুভূতির সুরে বলেছেন জিন্নার ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডির কথা, তার 'অশান্ত, নিরানন্দ গার্হস্থ্য জীবনের' কথা। তবে তা দু-এক বাক্যে। কামরুদ্দিন সাহেবের মতো বিস্তারিতভাবে নয়। এ বিষণ্নতার প্রভাব পড়েছে তার রাজনৈতিক জীবনে। সেখানে লক্ষ্য অর্জনে (যা প্রায়ই ব্যক্তিক) নির্মম হতে কিংবা অমানবিক হতে বাধা নেই। বাধেনি মি. জিন্নার।

তাই যে মানুষটি পোশাক-পরিচ্ছদে ও আচরণে বিলেতি কেতায় সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটান, নাম মোহাম্মদ আলী (পিতৃদত্ত নাম) হলেও ধর্মে বা ধর্মাচরণে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই সে মানুষটি কী না ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিলেন যা স্ববিরোধিতারও চরম। আবার যে রাজনীতিক জিন্না এক সময় ভারতে 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অগ্রদূত' (সরোজিনি নাইডু) হিসেবে খ্যাতি কেনেন এবং ১৯২৪ সালেও মুসলিম লীগের একসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'ভারতে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্বের পেছনে রয়েছে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য, হিন্দু-মুসলমান এক হলেই স্বরাজ অর্জন সম্ভব' সেই মানুষটিই এক যুগ পর ভিন্ন সুরে কথা বলেন।

দিল্লিতে ১৯৩৬ সালের মার্চে জিন্না বলেন, 'নিজ সম্প্রদায়ের কথা আমাদের ভাবতে হবে। হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথকভাবে সংগঠিত হতে হবে।' এবার যেন তার চলার পথ ঠিক হয়ে গেছে সম্প্রদায়-চেতনার ভিত্তিতে। দেড় বছর পর লক্ষ্ণৌতে এক বক্তৃতায় তার কণ্ঠে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার সুর বেশ চড়া। তার মতে, মুসলমানের লড়াইটা হিন্দুর সঙ্গে। অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা তার জন্য কোনো অর্থবহ বিষয় নয় বলেই লড়াই বিদেশি রাজশক্তির বিরুদ্ধে নয়। বিস্মিত গান্ধি এ বক্তব্যকে চিহ্নিত করেন 'যুদ্ধ ঘোষণা' হিসেবে। এর পরই ১৯৪০ সালের মার্চে ঐতিহাসিক (!) লাহোর প্রস্তাব। তালাক দিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের তত্ত্বকে, কিন্তু বর্জন করেননি হিন্দু নেতার দেওয়া খেতাব 'কায়েদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজম' । এখন তার মাথায় টুপি, পোশাকের পরিবর্তন । এমএ জিন্না হয়ে ওঠেন 'কায়েদে আজম জিন্না', 'কায়েদে আজম' উপাধিটা অবশ্য যাদের বিরুদ্ধে তার জেহাদ তাদের কাছ থেকেই পাওয়া। এখন এটা হয়ে ওঠে 'দ্য গ্রেট ডিকটেটরে'র প্রতীকী পরিচয়চিহ্ন । কয়েক পাতায় লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক দেশ-বিভাগের মূলকথার পর দেখা দরকার ভারতীয় রাজনীতির বিভাজক চিত্র চরিত্র ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির সাম্প্রদায়িক বিভাজন

হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিরোধ সামনে নিয়ে ভারতীয় রাজনীতির পার্শ্বপরিবর্তন এবং দুই ভিন্ন পথ ধরে চলার দায় কি এককভাবে জিন্নার? এ প্রশ্নটা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মনে আসতে পারে। এসেছে বিশেষ ভাবে কিছু ভিন্ন মতের গ্রন্থ পাঠে। বইগুলো ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস বিষয়ক। লেখকদের অনেকে এ প্রশ্ন তুলেছেন এবং কারো কারো রায় জিন্নার পক্ষে। হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল বিজেপির শীর্ষনেতা যশবন্ত সিংয়ের ঢাউস বইতেও এ ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। অবশ্য এখানে দলীয় রাজনৈতিক চিন্তা অর্থাৎ কংগ্রেস বিরোধিতা কাজ করেছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যখন ঘটনা ঘটছে তখন স্বাধীনতা দেশের তরুণ মাত্রেরই প্রবল আবেগজড়িত আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সম্প্রদায়-চেতনার চেয়ে মানবিক চেতনা শ্রেয় হিসেবে বিবেচ্য।

তারুণ্যের আদর্শবাদিতা সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে চায় না, অবশ্য ব্যতিক্রম বাদে। চল্লিশের দশক এমন এক সময় যার সূচনা ও বিস্তার দেশের রাজনীতিতে দুই বেগবান স্রোতের ধারায়। বাঙালি তরুণের রোমান্টিক চেতনায় বিদ্রোহী কবি নজরুল অনেক কাছের মানুষ, অনুসরণীয় আদর্শের কবি। তেমনি অনুসরণীয় হয়ে ওঠে বিদ্রোহী শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে কিংবা বিপ্লবী শহীদ ভগত সিং এবং তাদের উত্তরসূরি যত বিপ্লবী নায়ক। এক দশক আগেকার (১৯৩০) বাঙালি বিপ্লবী সূর্য সেন, প্রীতিলতা গর্ব ও অহঙ্কারের কেন্দ্রবিন্দু।

কিন্তু মানবিক চেতনার চেয়ে ধর্মের জোর বেশি, সেখানে রাজনৈতিক আদর্শ যত শুদ্ধ হোক প্রায়ই মার খায়। আর প্রচারের জোর থাকলে তো কথাই নেই। কাজেই আদর্শবাদিতার চেয়ে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা শক্তিমান হয়ে ওঠে চল্লিশের দশকের বছর কয়েকের মধ্যেই। এর প্রধান কারণ যেমন ভারতীয় রাজনীতির কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য, এর ধর্মবাদী প্রবণতা তেমনি এর ছোট-বড় নেতাদের ক্ষমতার দড়ি নিয়ে টানাটানি। তবে মূল টানাটানিটা ছিল লীগ-কংগ্রেসে। পেছনে হিন্দুমহাসভা কিংবা আলেম ওলেমাদের সংগঠন বা আঞ্জুমান।

ওই যে প্রচারের কথা বলেছি তা বাস্তবিকই তরুণ সমাজকে স্পর্শ করে, বিশেষত শিক্ষিত তরুণদের। মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের (১৯৪০) সভাপতি জিন্না দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন হিন্দু ও মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি। তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষাসাহিত্য, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, ইতিহাস সবকিছুই আলাদা। আর এ যুক্তিতেই তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি চান যেখানে তারা আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবনযাপন করবে। এক্ষেত্রে তিনি ধর্মের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন সম্ভবত ভেবেচিন্তেই। কারণ মেধাবী আইনজীবী ভালো করেই জানতেন, ধর্মের ঢাক সবচেয়ে জোরে বাজে। বেজেছিলও তাই।

আর সেজন্যই তার লাহোর বক্তৃতার উল্লিখিত অংশটুকুর লাখ লাখ কপি ভারতের প্রতিটি প্রদেশে মুসলমানদের কাছে পাঠানো হয়। এ তথ্যের সূত্র কামরুদ্দিন আহমদ। এর ফল মেলে কিছুটা ধীরে হলেও। বিশেষ করে যুক্ত প্রদেশ ও পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমান সমাজে। এর কয়েক দশক আগে উত্তর ভারতীয় মাওলানা ও তাদের বাঙালি অনুসারীদের ধর্মীয় শুদ্ধিকরণ বিষয়ক বক্তৃতাদির প্রভাব বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সম্প্রদায়-চেতনার জমি তৈরি করে রেখেছিল। এবার তাতে বীজ রোপণ করা হলো।

জিন্নার সম্প্রদায়বাদী ওইসব যুক্তি যে ধোপে টেকে না তা চোখ-কান একটু খোলা রেখে বিচার ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যায়। যেমন প্রস্তাবিত পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ বা ইতিহাস-ঐতিহ্যে বাঙালি মুসলমানের কোনো মিল নেই। এক ধর্মীয় মিল ছাড়া। সে হিসেবে তারা ভিন্ন জাতিভুক্ত। গান্ধি এমন একটা জবাবই দিয়েছিলেন জিন্নার ওই বক্তব্যের বিপরীতে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জিন্না ও তার পরবর্তী শাসকগোষ্ঠী তাদের আচরণে তেমন প্রমাণই রাখেন। যে জন্য শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ধর্মীয় ভিত্তিতে নয়, জাতিসত্তার ভিত্তিতে এবং প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিশ্চিত করে। সে ঘটনা অনেক পরের।

এবার জিন্নার পক্ষে ঐক্যের পথ থেকে সরে যাওয়ার কারণ খুঁজে দেখা যাক। এখানে নানা জনের নানা মত এবং সে ক্ষেত্রে জিন্নার ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলী প্রাধান্য পেলেও রাজনৈতিক কারণও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যা ঘুরেফিরে ব্যক্তিকে, তার অহমবোধকে আঘাত করেছে। সেজন্য তার ব্যক্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। অথবা বলা চলে, দুয়ে মিলে এক গন্তব্যে বিলীন। তবে জিন্নার সমন্বয়বাদী চিন্তা থেকে সরে আসার পেছনে কংগ্রেসেরও দায় কম ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্না আরো অনেকের মতো লক্ষ্য করেন ভারতের মুসলমান উচ্চশ্রেণী ও শিক্ষিত সমাজের সুযোগ-সুবিধায় পিছিয়েপড়া অবস্থা, সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অধোগতি। একে সংখ্যালঘু, অন্যদিকে শাসক ইংরেজের বিরূপ মনোভাব– দুটো কারণই মুসলমানদের অধোগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ওয়াহাবি আন্দোলন ও মাওলানাদের রক্ষণশীল এবং ইংরেজবিরোধী ফতোয়া, যা অন্তত বাঙালি মুসলমানের সামাজিক অধোগতির অন্যতম কারণ। বিশেষ করে শিক্ষায়। এরপর সংঘটিত হয় হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফারায়েজি আন্দোলন, যা কৃষকের উন্নতি বিষয়ক হলেও ধর্মীয় চেতনাভিত্তিক।

দুই

যুক্তি, তথ্য দিয়ে সাজাতে গেলে জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের কোনো বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। জিন্না একজন আধুনিক চিন্তার মানুষ। তিনি ভালোভাবেই জানতেন, আধুনিক জ্ঞানের বিচারে জাতি ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠী এক সংজ্ঞায় পড়ে না। শুধু তাত্ত্বিক বিচারে নয়, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রমাণ বিশ্বজুড়ে ছড়ানো। জাতি ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠী যদি এক হতো বিশ্ব খুব সরলরেখায় ভাগ হয়ে যেত ধর্মকে ভিত্তি করে– খ্রিস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু ইত্যাদি পরিচয় নিয়ে অর্থাৎ ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে। কিন্তু তা হয়নি। শুধু যে হয়নি তা নয়, মুসলমান রাষ্ট্র বনাম মুসলমান রাষ্ট্রে বিরোধ, যুদ্ধ ইত্যাদি বাধত না। 'প্যান ইসলামিজম' যেমন পায়ের নিচে মাটি পায়নি, তেমনি পায়নি মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রিস্টীয় ভুবন। জাতিসত্তা, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে একই ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন জাতিরাষ্ট্র গঠন করে তা প্রমাণ করেছে। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে তেমনি আফ্রিকার আরব দুনিয়ায়– মিশর বা সুদান থেকে আলজিরিয়া।

এরপরও কথা থাকে। জিন্না ভারতীয় মুসলমানদের এক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। বলেছিলেন ধর্মবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস এবং অনুরূপ একাধিক বিষয়ে ভারতীয় মুসলমান এক জাতি। সে কথাও তথ্যনির্ভর ছিল না। একমাত্র ধর্মবিশ্বাস ছাড়া আর কোনো বিষয়ে (যেমন ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ইত্যাদি) বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে কোনো মিল নেই উত্তর ভারতীয় মুসলমানের। নেই পশ্চিম ভারতীয় অর্থাৎ পাঞ্জাবি, বেলুচি, পাঠানদের সঙ্গে এসব দিক থেকে মিল। তেমনি বিহার ও উত্তর ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানের রয়েছে একাধিক বিষয়ে অমিল। যেমন সিন্ধি, বালুচ ও পাখতুনদের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের অমিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ করে ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। অমিল পাঞ্জাবিদের সঙ্গে। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিরূপতা। তাহলে এত অমিল নিয়ে তারা কীভাবে এক জাতি হিসেবে বিবেচিত হয়? না, হয় না। আর দাক্ষিণাত্য তো একেবারে ভিন্ন।

তাই করাচিতে উদ্বাস্তু বিহারি ও স্থানীয় সিন্ধিতে এখনো চলে সংঘাত, কখনো দাঙ্গা। বালুচরা পাঞ্জাবি শাসন মেনে নিতে চাইছে না বলে সেখানে বোমা ফেলতে বাধেনি আইয়ুব শাসনের। এই দ্বন্দ্বে আরো অনেকের মতো জাতীয়তাবাদী বালুচ নেতা নওয়াব আকবর খান বুগতি বছরকয় আগে কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে প্রাণ দিলেন। পাখতুনদের স্বশাসনের জন্য আমৃত্যু লড়ে গেলেন লাল-কুর্তা নেতা আবদুল গাফফার খান, ওয়ালি খান। তবু হুজুগ মেটেনি পাকিস্তানে। আর ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থেই যদি ভারতবিভাগ হয়ে থাকে তাহলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তানে সব ভারতীয় মুসলমানের স্থান হলো না কেন? কেন জিন্না পেছনে ফেলে এলেন অসহায় কয়েক কোটি ভারতীয় মুসলমানকে? পাকিস্তান গঠনের এ অবাস্তবতা নিয়ে দেশবিভাগের আগে ও পরে অনেক কথা বলেছেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। সমস্যা সমাধানের ভুল পথ ধরে পরবর্তী সময়ে অনেক সমস্যার জন্ম দিয়েছেন পাকিস্তানের স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্না।

তিন

আমার দৃঢ়বিশ্বাস এক ধরনের প্রখর চাতুর্য ব্রিটিশ রাজনীতির গভীরে লুকনো ছিল এবং সেটা তাদের রাষ্ট্রনৈতিক তথা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের টানে নানা চেহারায় বেরিয়ে এসেছে। অন্তত ভারতবর্ষের ইতিহাস বা ইতিকথা রচনায় এমন ইংরেজ ইতিহাসবিদ কমই আছেন যিনি নিরপেক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। তাদের যুক্তি তাদের রাষ্ট্রিক স্বার্থের চারদিকে ঘুরপাক খেয়েছে। সাম্রাজ্যের স্বার্থে টডদের মতো লেখকরা রাজস্থানি, মারাঠি ও শিখদের নিয়ে মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে গালগল্প রচনা করে হিন্দু-মুসলমান-মারাঠি-শিখদের চেতনায় মুসলমান বিদ্বেষের বীজ রোপণ করেছেন যা কালক্রমে বিভেদ ও বৈরিতায় পরিণত হয়েছে। তাদের সুবিখ্যাত নীতি 'ভাগ কর শাসন কর' তো সবারই জানা। আর ওই গালগল্পে রবীন্দ্রনাথের মতো মানবতাবাদীও প্রভাবিত হয়েছেন। সে প্রমাণ ধরা আছে তার কোনো কোনো কবিতায়।

ভারত বিভাগ নিয়ে হডসন, ভারত ইতিহাস নিয়ে পার্সিভাল পিয়ার্সের মতো আধুনিকমনারাও পূর্বকথিত সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে সর্বাংশে মুক্ত হতে পারেননি। ব্যতিক্রম সামান্য। ভারত বিভাগের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমানের স্থায়ী বিভেদ-বৈরিতা হডসন অনেকটা আদি পাপের মতো করে দেখিয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যার ফলে ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাতে ইংরেজ শাসকের ভূমিকা গৌণ। ঘটনা কি তেমন কথা বলে? মধ্যযুগীয় ভারত ও সুলতানি আমলের বাংলার ইতিহাস পুরোপুরি তেমন সাক্ষ্য দেয় না। বরং অনেকটা ভিন্ন কথাই বলে।

তবে তিনি ইতিহাসের একটি সত্য ঠিকই বলেছেন যে, শাসক, রাজনীতিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকার চেয়ে ইতিহাসের শক্তি ও ঘটনাবলীর প্রভাব অবশেষ পরিণতির জন্য প্রবলভাবে দায়ী। তাই নাটকের শেষ অঙ্কে পৌঁছে ভাইসরয় লিনলিথগো ও লর্ড ওয়াভেল, মাউন্টব্যাটেন ও ক্রিপস, গান্ধি, জিন্না, সিকান্দার হায়াত খান ও জওহরলাল নেহরু এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সবাই ঘটনার টানে নিছক পুতুল বই কিছু নন। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদের কাজ হলো কোন ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রক তা শনাক্ত করা যা ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং কারা সেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ও কেন নিয়েছেন তা উদঘাটন করা। ঘটক হিসাবে রয়েছে তাদের দায়।

এ কথা ঠিক, ইতিহাসের ওই সব নিয়ন্ত্রক ঘটনা এবং ঘটনার নেপথ্য নায়কদের তৎপরতা ও সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই বেরিয়ে পড়ে আসল কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং সে ক্ষেত্রে দূরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিশ্লেষণও দরকার হয়। যেমন ১৮৫৭ সালে সূচিত সিপাহি-রাজন্যদের মহাবিদ্রোহ, যা ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিছু বিশেষ ঘটনা ও কারণ ইংরেজ শাসকের পক্ষে গেছে বলেই তাদের জয় নিশ্চিত হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়াও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহাবস্থানের ভিত নষ্ট করে স্থানীয় রাজনীতি ও শাসকনীতি

ইতিহাস সঠিক তথ্যই দেয় যে মহাবিদ্রোহে যদিও হিন্দু-মুসলমান সিপাহি সেনাই নয়, কোথাও কোথাও নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষ এবং দুই ধর্মীয় রাজন্যবর্গের অনেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তবু বাহাদুর শাহকে সম্রাট মেনে নেয়া ছাড়াও মুসলমান প্রাধান্য সেখানে ছিল। পাঞ্জাব ও বাংলা ব্যতিক্রম, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষিত বঙ্গীয় এলিট শ্রেণী ও পাঞ্জাবি শিখ। এরা বিদ্রোহের পক্ষে ছিলনা। ফলে উত্তরকালে ইংরেজ শাসকদের মুসলমান-বিরূপতা ও সন্দেহ যথেষ্টই ছিল।

কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সেই সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর স্বাধিকার চেতনা শাসকদের আবার নতুন করে ভাবায় যে এখন সময় এসেছে অন্যদিকে নজর ফিরাবার। বিশেষ করে বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রভাব এবং পাঞ্জাবের একাংশে স্বাধিকার চেতনা ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বাদেশিকতা রুখতে পরবর্তী শাসকদের চোখে দাবার ছকে মুসলমান ঘুঁটিগুলোকে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ঘটনা, নাম মর্লি-মিন্টো সংস্কার (১৯০৯)। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলোতে ধর্মীয় ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন। শেষোক্ত বিষয়টিতে কিছু যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে দুই ভিন্ন পথ ধরে চলতে বাধ্য করা। সেই পুরনো নীতি– 'ভাগ কর এবং শাসন কর'।

এভাবেই বিচ্ছিন্নতার পথে ছক তৈরি হয়ে যায়। যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করার সুযোগ (তা যে সম্প্রদায়েরই হোক) আর থাকেনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে একসঙ্গে চলার ফলে যে সম্প্রদায়গত সৌহার্দ্য তৈরি হতে পারত তার কফিনে পেরেক ঠোকা হলো। ইতিহাসবিদগণের এ জাতীয় সমালোচনা কিছুটা অনিচ্ছায় যেন মেনে নেন হডসন এবং দু'একজন বিদেশি ইতিহাসবিদ।

অবশ্যই গোটা বিষয়টা গভীরভাবে পরিকল্পিত এবং সে কারণেই লেডি মিন্টো ডায়েরিতে তার স্বামীর চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে লিখেছেন যে, মুসলমানদের তুলে ধরতে হবে যাতে তারা 'রাজ-বিরোধীদের' সঙ্গে যোগ না দেয়' (উদ্ধৃতি হডসনেরই)। এতেও বোঝা যায় ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য কী ছিল। তবু লেখক হডসন স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন জুগিয়েছেন নানা যুক্তির অজুহাতে। আসলে অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং কিছু আসন সংরক্ষণই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শাসক সে পথে হাঁটেনি। হেঁটেছে 'রাজ'স্বার্থের পথ ধরে।

কিছু সাম্রাজ্যবাদী ভাবনার লেখক, ইতিহাসবিদ নানা যুক্তি ও অজুহাত তৈরি করেছেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পক্ষে– যেন তারা ধোয়া তুলসীপাতা। তা না হলে হডসন লিখতে পারতেন না যে, 'ব্রিটিশ হিন্দু-মুসলমান প্রতিযোগিতাকে হয়তো নিজ সুবিধায় ব্যবহার করে থাকতে পারে, কিন্তু তারা তো সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের জন্মদাতা নয়। তারা ভারতীয় ইতিহাসের ইতিকথা বা আখ্যায়িকা ('অ্যানালস') তৈরি করেনি, কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করেনি।' কিন্তু ঘটনা অন্য কথাই বলে। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পর ইংরেজ শাসনের পক্ষে তাদের সিভিলিয়ান বা লেখকরা রাজপুত, মারাঠা ও শিখদের নিয়ে নানা কাহিনী রচনার মাধ্যমে ঠিকই মুসলমান-বিরোধী পরোক্ষ প্রচারণা চালিয়েছেন। যা উক্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মুসলমান-বিরোধী মনোভাব বাড়াতে সাহায্য করেছে। আর দাঙ্গা? ধর্ম বা জাতি বা সম্প্রদায়গত বিরোধ নিয়ে দাঙ্গা কি পাশ্চাত্যে হয়নি? জাতিগত যুদ্ধই তো তারা শত শত বছর ধরে চালিয়েছে।

তবে একথাও ঠিক যে, একমাত্র ব্রিটিশরাজ হিন্দু-মুসলমান বিভেদের জন্য পুরোপুরি দায়ী নয়। ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক নানা কারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তাতে দু'পক্ষই দায়ী, কম আর বেশি। শাসক ইংরেজ নানা সূত্রে সে বিভেদের সুযোগ নিয়েছে, কখনো সংঘাত উস্‌কে দিয়েছে বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলা করেছে। এ সত্যটা রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও খুঁজে পাওয়া যায়। তবু কথা থাকে, এত সব সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান শত শত বছর পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করেছে। বিরোধ তো পরিবারেও ঘটে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঘটে– এটাও বাস্তবতা। এই যে রাজনৈতিক বিভাজনের ধারা যা ভারত-শাসক ও ব্রিটিশরাজের প্রণীত, একের পর এক সংস্কারনীতিতে ওই বিভাজনের ধারাই বরাবর বহাল থাকে। যেমন মর্লি-মিন্টোর পর মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার (১৯১৯) ওই একই নীতিতে তৈরি। উদ্দেশ্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন যতটা সম্ভব বাড়িয়ে তোলা। এরপর সাইমন কমিশন আসে সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে (১৯২৯)।

AMARBOI.COM

যেমনটা আগে বলা হয়েছে, বিভাজনের জন্য ব্রিটিশরাজ যেমন দায়ী তেমনি দায়ী কংগ্রেস রাজনীতির ভুলভ্রান্তি, সেই সঙ্গে মুসলিম লীগপ্রধান জিন্নার অহম্‌বোধ ও একাধিপত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও দায়ী। তবে শেষ পর্বে (১৯৪৬) এ বিষয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নার দায়টা অপেক্ষাকৃত বেশি।

১৯০৯ থেকে ১৯১৯ হয়ে ১৯২৯ অবধি সময়– পরিসর বিভাজন-রাজনীতির নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সমঝোতার চেয়ে দ্বন্দ্বই বেশি। সেই বহু কথিত রাজনৈতিক ত্রিভুজ যার শীর্ষ বিন্দুতে আসীন 'রাজ-প্রশাসন' সমতলে দুই কোণে দুই সম্প্রদায়ের অবস্থান। আসলে সম্প্রদায় নয়, লীগ-কংগ্রেস দুই সংগঠন দুই কোণে। হিন্দুপ্রধান কংগ্রেস ভূস্বামী, উচ্চ ও মধ্যবিত্তের স্বার্থভিত্তিক সংগঠন যেখানে মুসলমান নেতার সংখ্যা কম নয়। মাওলানা আজাদ, হাকিম আজমল খান, ডা. আনসারী, ডা. সফিউদ্দিন কিচলু, আসফ আলী প্রমুখ। তবু এরা কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্রবদল ঘটাতে পারেন নি, বিশেষত সম্প্রদায়গত প্রশ্নে।

অন্যদিকে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের সংগঠন মুসলিম লীগ যার দাবি লীগই একমাত্র মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি যা ১৯৪৫-৪৬ সনেও সঠিক ছিল না। যাইহোক সরকার পক্ষে বিভাজননীতির শেষ তাত্ত্বিক পেরেকটি ঠোকা হলো সুস্পষ্ট ভাষায় 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' নামে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে। সে প্রসঙ্গ পরে আসছে। লীগও ছিল মুসলমান ভূস্বামী, উচ্চবিত্ত ও এলিট-প্রধান দল।

যদিও ১৯০৯ থেকে সুস্পষ্টভাবে তাত্ত্বিক বিভাজননীতির প্রয়োগ, এর সূচনা অনেক আগে থেকে অর্থাৎ ১৯ শতক থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ এবং ইংরেজ আনুকূল্যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন যার ফলে তৈরি হয় শিক্ষিত ইংরেজ সমর্থক হিন্দু এলিট শ্রেণী, সেইসঙ্গে ভূস্বামী ও বণিকশ্রেণী। উনিশ শতকের ব্রিটিশনীতির প্রকাশ ঘটে শাসকদের কাজে ও বক্তব্যে। যেমন ১৮৪৩ সালে লর্ড অ্যালেনবরো বলেছিলেন, 'আমাদের নীতি হলো হিন্দুদের সঙ্গে সমঝোতা গড়ে তোলা'।

এর ফলে ১৯ শতকে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যে নবজাগরণ তা হিন্দু সমাজেরও উচ্চবৃত্তেই আবদ্ধ, নিম্নশ্রেণীতে নয়। আর অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়কে তা স্পর্শও করেনি। কথাটা অশোক মিত্র থেকে সুশোভন সরকার প্রমুখ বিদগ্ধজন অনেকে লিখেছেন। ফলে তৈরি হয়েছিল হিন্দুপ্রধান 'বাবু সম্প্রদায়' যাদের নিয়ে কবি সমর সেন থেকে ইতিহাসবিদ বরুণ দে প্রমুখ বিতর্কের ঢেউ তুলেছেন। এ বিষয়ে উল্লেখ্য কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড গ্রুপের পণ্ডিতগণের 'ভদ্রলোক তত্ত্ব'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই নবজাগরণের একদিকে যেমন ইংরেজ সমর্থন-অসমর্থনের উদারনীতি অন্যদিকে হিন্দু পুনর্জাগরণের ধর্মবাদী ভাবনা (বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, বন্দেমাতরম) যা পরবর্তী সময়ে অরবিন্দ প্রমুখের হিন্দু জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব উপহারে ধর্মীয় স্বাদেশিকতার জন্ম দেয়। এ ব্যাপারে বাঙলা ও পাঞ্জাব অগ্রগণ্য। শিবাজী উৎসব, ভবানী মন্দির ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতীকে হিন্দুত্ববাদিতা শুধু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নয়, বিপ্লবী সংগঠনগুলোকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যে জন্য 'বন্দেমাতরম' দেবীবন্দনার প্রতীকে আবদ্ধ থেকে যায়, সর্বজনীন রাজনৈতিক শ্লোগানে উন্নীত হতে পারেনি। মুসলমান তা গ্রহণ করেনি।

কাজেই এমন ধারণা উড়িয়ে দেয়া চলে না যে 'জনজীবনের অন্দরমহলে নবজাগরণী আহ্বান পৌঁছতে পারেনি। দরিদ্র, নিরক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-মুসলমান চাষির সমস্যা ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু 'বাবু' সম্প্রদায়ের আলোচ্যসূচিতে স্থান লাভ করেনি। বলাই বাহুল্য, ওই 'বাবু' সম্প্রদায়ের কায়েমি স্বার্থমহলগুলো নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্বের ধ্বজা ধরে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সীমিত সংখ্যক হিন্দু সুবিধাভোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হয়। সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাচীর তুলে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের শক্তিকে স্থায়ী করে তোলে' (কেশব চৌধুরী-ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ)।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্দরমহলে তাই সাম্প্রদায়িকতার চোরাস্রোত থেকেই গেছে। বিপ্লববাদী আন্দোলনে তা আরো নগ্ন, আরো স্পষ্ট। স্পষ্ট তার হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় চেতনার নানা প্রতীকে, আচারে ও স্লোগানে যেখানে মুসলমান তরুণের প্রবেশ অসম্ভব। কথাটা মাওলানা আজাদ ও কমরেড মুজফফর আহমদ ভিন্ন ভাষায় স্বীকার করেছেন তাদের লেখা বইতে। বাস্তব ঘটনা ও ইতিহাস তা প্রমাণ করে।

অবাক হতে হয় দেখে যে একদিকে ১৮৮৫ সালে ইংরেজ সিভিলিয়ান হিউমের উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ইংরেজ শাসকের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে 'আবেদন-নিবেদনে'র রাজনীতি শুরু করার জন্য। অন্যদিকে দুই দশক পর রাজনীতির ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান উচ্চশ্রেণীকে হাতে রাখার প্রয়োজনে আগা খানের দৌত্যে ও ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর আগ্রহে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় ইংরেজ শাসকের উদ্যোগে গঠিত হয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। লীগের প্রথম প্রস্তাবে 'ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি ও মুসলমানদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের কথা বলা হয়। অবশ্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের কথাও বলা হয়। এখানেও নবাব, নাইট, ভূস্বামী, বণিকদের প্রাধান্য। তাছাড়া দাবি ছিল স্বতন্ত্র নির্বাচনের।

স্বতন্ত্র নির্বাচনের পথ ধরে যে রাজনীতিতে সাংগঠনিকভাবে হিন্দু-মুসলমানের দুই স্বতন্ত্র ধারায় যাত্রা শুরু হবে এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই। রাজনীতির এ ভিতটা মোটেই গণতান্ত্রিক চেতনার নয়। সাংগঠনিকভাবে আপাত বিচারে এই ভিন্ন পথে যাত্রা মুসলিম লীগের হাত ধরে হলেও এর মূল রচয়িতা ইংরেজ শাসন ও তাদের ভেদনীতি যা ইংরেজ ভাইসরয় থেকে ভাইসরয়ের হাত ধরে বিকশিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের রাজনীতি ছিল বিভাজনের মূল কারণ এবং দেশবিভাগের উৎস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ : লীগ কংগ্রেস প্রজাপার্টি

কংগ্রেস ও লীগ দুই পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি হলেও কিংবা গান্ধি-জিন্না দুই বিপরীত চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের রাজনীতিবিদ হলেও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে লীগ (জিন্নার) নেতৃত্বে কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা ও ভারতীয় ফেডারেশনের সম্ভাবনা নিয়ে কিছু দরজা অবশ্যই খোলা ছিল। কিন্তু ওই দুই দল তার সুযোগ নিতে পারেনি, কাজে লাগাতে পারেনি সম্ভাবনাগুলোকে। মনে হয় সম্ভাবনা তারা কাজে লাগাতে চায়নি ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের টানে। বৃহত্তর রাজনৈতিক দল হিসেবে এদিক থেকে কংগ্রেসের দায়িত্ব ছিল কিছুটা বেশি। কিন্তু কংগ্রেসের উচ্চমন্যতা, মুসলিম লীগকে বিশেষ করে জিন্নার প্রাথমিক প্রস্তাবগুলোতে গুরুত্ব না দেয়ার ফলে সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। কংগ্রেস মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা ও জিন্নার অবমূল্যায়ন করেছিলো। এটা কংগ্রেস নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক।

অথচ নওরোজি, গোখলের ভাবশিষ্য জিন্না তার চল্লিশ বছর বয়সে (জন্ম : ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের প্রধান সহযোগিতাকারী (১৯১৬)। এবং জাতীয় কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা জিন্না তখনো ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিতে দ্বিধা করছেন না। ১৯২৪ সালে (মে মাসে) লাহোরে আয়োজিত মুসলিম লীগের এক সভায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ভারতে ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্বের কারণ হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হলেই ভারতে 'ডোমিনিয়ন-ভিত্তিক সরকার' গঠিত হতে পারে (হডসন)।

এমনকি এরপরও সাইমন কমিশনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নার চৌদ্দ দফার মধ্যেও এক সঙ্গে হাঁটার কিছুটা সম্ভাবনা বজায় ছিল। কিন্তু কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে (১৯২৮) জিন্নার দাবি কংগ্রেসে বিবেচিত হয়নি। আমাদের বিশ্বাস লীগের এসব দফা নিয়ে আলোচনার অবকাশ ছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের গোঁড়ামিতে তা হয়নি। হতাশা নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে যান জিন্না। তার যাত্রা শুরু হয় রাজনীতির ভিন্ন পথ ধরে। ক্রমে সে পথে কঠিন থেকে কঠিনতর রাজনৈতিক ভাবনায় তার স্থিত হওয়া যা শেষ পর্যন্ত (১৯৪০-৪৭) সাম্প্রদায়িক চেতনার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

AMARBOI.COM

আর এর মধ্যে ইংরেজ শাসননীতিও পাকাপাকিভাবে সাম্প্রদায়িক তথা হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের সহায়ক হয়ে ওঠে। ভেবেচিন্তেই ব্রিটিশরাজের ১৯৩২ সালে ভারতে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ('কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড') প্রস্তাব যা হয়ে ওঠে ভারতবিভাগ সম্ভাবনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সবকিছু দেখে শুনে জিন্না লন্ডনে তার স্বেচ্ছানির্বাসন পরিকল্পনায় ইতি টেনে দিয়ে স্থায়ীভাবে ভারতে ফেরেন মুসলিম লীগ প্রধান হিসাবে নেতৃত্বের হাল ধরতে (১৯৩৪)। প্রদেশগুলোতেও হিন্দু-মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা তার জন্য নয়া সম্ভাবনার ভিত তৈরি করে। ১৯৩৫-সনে এ প্রস্তাব ভারতশাসন আইনে পরিণত।

তখনো মুসলমান রাজনীতি মুসলিম লীগের বাইরে বিভাজিত। শুধু কংগ্রেস প্রভাবিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নামীয় মঞ্চই নয়, সিন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতা আল্লাবকশ ও পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট নেতা সিকান্দার হায়াত খান প্রমুখ উদারনৈতিক নেতা তখনো জিন্না বা মুসলিম লীগ রাজনীতির বাইরে। তাছাড়া ছিল মোমিন ও আহ্‌রার সমাজের অসাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব এবং সীমান্ত প্রদেশের লালকুর্তা নেতা গাফফার খান। আর বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি।

এদের প্রভাবে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমান আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, বিশেষ করে বাংলা এবং পাঞ্জাবে। সীমান্তে তো লাল কুর্তাদের একচেটিয়া বিজয়। সিন্ধুতে আধাআধি। ট্র্যাজেডি যে কংগ্রেস বিচক্ষণতার সঙ্গে এ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। বরং তাদের কাজে ও বক্তব্যে পরিস্থিতিকে বিপরীত দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার পথ পরিহার করেছে নির্বাচনে ভালো ফলাফলের অপরিণামদর্শী বিবেচনা থেকে।

প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে নেহরু কমিটির (মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে) অদূরদর্শী প্রতিবেদনের কথা যা লীগ কংগ্রেসের মধ্যে অধিকতর ব্যবধান তৈরি করে। তাতে ইন্ধন জোগায় জওহরলাল নেহরুর অপরিণামদর্শী বক্তব্য (মার্চ, ১৯৩৭) যে 'ভারতীয় রাজনীতিতে এখন একমাত্র দুটো পার্টিই রয়েছে, যথা কংগ্রেস ও ব্রিটিশরাজ (আর জে মুর, 'ইন্ডিয়া'স পার্টিশন' সংকলন গ্রন্থ, সম্পাদনা মুশিরুল হাসান)। সঙ্গে সঙ্গে জিন্না উত্তর ছুঁড়ে দেন এই বলে যে মুসলিম লীগ তৃতীয় দল হিসাবে কংগ্রেসের যুক্তিসঙ্গত 'সমান পার্টনার'।

একথা বলার কারণ ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) মাফিক গোটা ভারতের এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত, আরেক তৃতীয়াংশ দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের জন্য। স্বভাবতই বাকি তৃতীয়াংশ কংগ্রেসের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেহরুর এ ধরনের অদূরদর্শী, অরাজনৈতিক মন্তব্য প্রায় এক দশক পরেও দেখা যায় কংগ্রেস সভাপতিরূপে, যে মন্তব্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অকার্যকর হওয়ায় সাহায্য করে, কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ব্যর্থতার প্রভাব ফেলে এবং ভারত-বিভাগ অনিবার্য করে তোলে। এ বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যাবে মাওলানা আজাদের ক্ষুব্ধ মন্তব্য নেহরুকে সমালোচনা করে ('ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম')। এ দুই মন্তব্যের সময় নেহরু কংগ্রেস সভাপতি। নেহরু এ ধরনের অদূরদর্শী মন্তব্য আরো করেছেন। কখনো করেছেন গান্ধিও (১৯৩৮)।

দুই

১৯৩৫ সালের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' যেমন ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতার যাত্রায় মাইলফলক তেমনি ওই আইনের ভিত্তিতে ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচন জিন্না-মুসলিম লীগের জন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বীজতলা। যদিও নির্বাচনে মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগের একাট্টা বিজয় সূচিত হয় নি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কংগ্রেসি নীতি পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জিন্নার চোখ খুলে দেয়। তখন থেকেই নেতৃত্বের প্রশ্নে মুসলিম লীগ বলতে জিন্না এবং জিন্না মুসলিম লীগ একাকার।

তখন জিন্নার একটাই লক্ষ্য, যে কোনো মূল্যে মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বিচ্ছিন্ন মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তা না হলে হিন্দুপ্রধান কংগ্রেস রাজনীতির দিকে চোখে চোখ রেখে কথা বলা যাবে না। এটা বুঝিয়ে দিতে হবে ইংরেজ শাসকদেরও। প্রয়োজনে ধর্মীয় স্লোগানে মুসলমান জনশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে এভাবে কাছে টেনে নেন জিন্না।

প্রদেশগুলোতে তখন জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে অনেক এগিয়ে ছিল, হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলোতে এককভাবে, মুসলমান-প্রধান কয়েকটিতে সম্মিলিতভাবে। বরাবরের সমস্যা পাঞ্জাব জাতীয়তাবাদী ইউনিয়নিস্ট নেতা সিকান্দার হায়াত খানের বদৌলতে সমস্যাহীন। সিন্ধু টানাপড়েনের মধ্যেও শত্রুক্যাম্পে নয়। আসামও তাই। তবে বঙ্গদেশেই সব হিসাব পাল্টে যায়। আর এই বঙ্গদেশই প্রায় এক দশক পর (১৯৪৬) জিন্নার নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা তথা ভারতবিভাগের সিংহদরজাটা খুলে দিতে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তাই ১৯৩৭ সালের নির্বাচন বাস্তবিকই বিভাজন রাজনীতির অনুঘটক। এর পেছনেও রয়েছে কংগ্রেসের অনিশ্চয়তা ও কর্মসূচিগত দ্বিধাদ্বন্দ্ব। বঙ্গদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। মন্ত্রিসভা গঠন করতে চাই অন্য দলের সমর্থন। আসন বিচারে কংগ্রেস ৫২, বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ৩৯, কৃষক প্রজাপার্টি ৩৬, স্বতন্ত্র ৪৩ এবং ত্রিপুরা কৃষক সমিতি ৫। কৃষক প্রজাপার্টির প্রধান এ কে ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেসের ইচ্ছা সত্ত্বেও হাইকমান্ডের পিছুটান এবং কিছু নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে যখন হিসাব-নিকাশের টানাপড়েন চলছিল সে সুযোগে জিন্না হক সাহেবকে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে মনোনীত করার (এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রিত্ব তো বটেই) বিনিময়ে তার রাজনৈতিক সর্বনাশের পথে টেনে নেন।

কারণ জিন্নার ভালোভাবেই জানা ছিল যে বঙ্গীয় মুসলিম রাজনীতিতে ফজলুল হকই লীগের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী, সত্যিকার অর্থে শেরে বঙ্গাল। এমন কি গোটা বঙ্গদেশের রাজনীতিতে লীগ কংগ্রেস বিচারে হকের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খ্যাতি ('ক্যারিশমা'ও বলা চলে)। কাজেই এই শের হত্যা জিন্নার জন্য জরুরি। আর দ্বিতীয় কোনো উপায় না দেখে ফজলুল হকও আত্মঘাতী পথে পা বাড়ালেন।

শুধু ব্যক্তিক রাজনীতি নয় প্রজাপার্টির সর্বনাশ ঘটল একই ধারায়। জিন্নার চাতুরীর সঙ্গে পেরে ওঠেননি ফজলুল হক। এবং সেটা সম্পূর্ণ হয় তার মুসলিম লীগে যোগদানের মাধ্যমে। এ যোগদানে বাংলায় শুধু যে মুসলিম লীগের ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি ঘটে তাই নয়, বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার অপমৃত্যু, লীগের প্রবল বিজয় যা দেশভাগ নিশ্চিত করার দিকে বড় একটা পদক্ষেপ। এক কথায় বাংলাদেশে রাজনীতির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয় (অমলেন্দু দে-'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক')। বঙ্গীয় রাজনীতির বড়সড় এক ভিন্ন মেরুকরণ।

লক্ষণীয় যে ফজলুল হক ও প্রজাপার্টিকে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে সুস্থধারা বিকশিত হচ্ছিল তা কংগ্রেসের চিত্তরঞ্জন-সুভাষপন্থী ধারার সঙ্গে মিলে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ধারার বিকাশ ঘটাতে পারত। আর তা শুধু বঙ্গীয় রাজনীতিরই নয় সর্বভারতীয় রাজনীতির জন্য ভিন্ন পথনির্দেশ করতে পারতো।

বলা যায় চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু ও 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল এবং পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস থেকে সুভাষের বহিষ্কার বঙ্গের সেকুলার গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য যে অশুভ ধারার সৃষ্টি করে (যাতে কংগ্রেস ও লীগ উভয়েরই অবদান রয়েছে) সে অশুভ ধারা পূর্ণতা পেল ফজলুল হকের লীগে যোগদানে ও প্রজাপার্টির অস্তিত্ব বিনাশে। জিন্নার চাতুরীর কাছে ফজলুল হকের হার, বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে গুজরাতি বুদ্ধির কাছে বাংলার পরাজয়। কারণ সময় বুঝে জিন্না ফজলুল হককে ঠিকই লীগ রাজনীতি থেকে ঝেড়ে ফেলে হক-রাজনীতির অবসান ঘটান।

তাই আমরা অবাক হয়ে দেখি যে ভারতীয় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও এ বিষয়ে জিন্নাকে সাহায্য করেছে, পরে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে বাংলার গভর্নর হার্বার্ট সাহেব সরাসরি মাঠে নেমেছেন হকের আসনে (মুখ্যমন্ত্রিত্বে) নাজিমুদ্দিনকে বসাতে। সে প্রসঙ্গ পরে আসছে। আপাতত দেখা যাক কী দুঃখজনকভাবে প্রজাপার্টির বিভক্তি ও পতন ঘটল ত্রিশক্তির কার্যক্রমে— অর্থাৎ লীগ, ব্রিটিশরাজ এবং খোদ প্রজাপার্টি প্রধান হক সাহেবের ভুল পদক্ষেপে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাদেশিক নির্বাচন ও দলীয় সম্পর্কের জের

ভারতবর্ষ নামক এক প্রাচীন সভ্যতার ভূখণ্ডে বহুভাষী ও বহু জাতিসত্তার, এমনকি বহুধর্মে বিশ্বাসী জনতার উপস্থিতিতে সেক্যুলার আদর্শের রাজনীতি যে অসম্ভবের সাধনা ইংরেজ শাসিত 'ব্রিটিশ ভারত' তেমন প্রমাণ ভালোভাবেই রেখেছে। তাই পূর্বে কথিত 'সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষে' অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষবৃক্ষে জল ঢালতে কসুর করেনি যেমন শাসক, তেমনি দুই প্রধান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সংগঠন ও তার কুশীলবগণ। তবে শাসকের দায় ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। কারণ তারা পরিস্থিতি দূষিত করেছেন।

তাই বলা যায় সংঘাত বা বিরূপতা, প্রতিযোগিতা বা একা তখ্‌তে আসীন হওয়া একমাত্র সত্য ছিল না। রাজনৈতিক সহাবস্থানের মানসিকতাও সে ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। তবে সঠিক সময়ে সে আহ্বানে সাড়া দিতে না পারাটা ছিল দুর্ভাগ্যের অর্থাৎ সুফল অর্জনে ব্যর্থতার কারণ এবং তা পালাক্রমে এদিক-ওদিক থেকে। এর মধ্যে যেকোনো পক্ষ থেকে হোক সদিচ্ছার ছিল বড় প্রয়োজন।

শাসক ইংরেজের ভেদনীতির মধ্যেও তেমন সম্ভাবনা একাধিকবার উঁকি দিয়ে গেছে কিন্তু অপরপক্ষ যুক্তি ও বাস্তবতাকে দুহাত তুলে সর্বদা কাছে টেনে নিতে পারেনি। সন্দেহ নেই ১৯৩৫ সালের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ছিল হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক সম্প্রীতির ওপর মস্ত বড় খাঁড়ার আঘাত। তবু ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফল তার বৈচিত্র্য নিয়ে সম্প্রীতি বা সহাবস্থানের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। কিন্তু ঘটনা তা কাজে লাগাতে দেয়নি।

এ সাতকাহনে আপাতত তিন কারিগর হচ্ছেন হক, জিন্না, নেহরু। আছেন গান্ধিও। এদের হাতের টানে রাজনীতির রথ কখনো সামনে এগিয়েছে বা পিছু হটেছে। যে হাতের টান আসলে রাজনৈতিক কূটনীতি ও রাজনৈতিক দাবার চালের চাতুর্য। তাতেই ঠিক হয়ে যায় হার-জিত, অগ্রপশ্চাৎ যাত্রা। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলমানপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ দুই প্রদেশ পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি।

বাংলায় তখনো সাম্প্রদায়িক রাজনীতি স্বতন্ত্র নির্বাচন সত্ত্বেও মাটির গভীরে শিকড় চালাতে পারেনি। জিন্নার আহ্বান বঙ্গীয় মুসলমান-মানসে তখনো মুগ্ধতা

তৈরির মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি। বলতে গেলে সবকিছু মিলে ত্রিশঙ্কু অবস্থা। স্বতন্ত্র আসনে জয়ীর সংখ্যা ছিল এককভাবে সবচেয়ে বেশি। পরে অবশ্য তাদের কেউ লীগে কেউ হক সাহেবের প্রজাপার্টিতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তাতে অবস্থার হেরফের হয়নি।

এ অবস্থায় বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ে অসাম্প্রদায়িক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের একটা বড় সুযোগ তৈরি হয় এবং বঙ্গের সংসদীয় রাজনীতির সম্প্রদায়নির্ভর ধারাবদলের সুযোগ কংগ্রেস দলের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য হাতছাড়া হয়ে যায়। ফজলুল হকের প্রজাপার্টি তৃণমূল স্তরের মুসলমান ও নমঃশূদ্র হিন্দু সমর্থনে একটি অসাম্প্রদায়িক দল। নীতিগত দিক থেকে মুসলিম লীগের চেয়ে কংগ্রেসের কাছাকাছি।

স্বভাবতই ফজলুল হক চেয়েছেন কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করতে। বঙ্গীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন গ্রুপেরও ইচ্ছা ছিল প্রজাপার্টির সঙ্গে মিলে বঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা। কিন্তু কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিশেষ ভাবে কংগ্রেস সভাপতি নেহরুর আপত্তির কারণে তা সম্ভব হয়নি। নেহরু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণে যুক্তফ্রন্ট সম্ভব নয়।

হুমায়ুন কবিরের বক্তব্যও এদিক থেকে ভিন্ন নয়। তার ভাষায় ফজলুল হকের অব্যাহত আহ্বানে কংগ্রেস সাড়া দেয়নি বলে বঙ্গে একটি অসাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভা গঠনের সব সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। ফজলুল হককে ঠেলে দেয়া হয় মুসলিম লীগের দিকে। কংগ্রেস নেতারা জিন্নার নির্বাচনপূর্ব বাংলা অভিযানের কথাটা একবারও ভেবে দেখেননি। তাদের অদূরদর্শী পদক্ষেপ শুধু ফজলুল হককে পথচ্যুত করতে সাহায্য করেনি, বাংলায় সেকুলার রাজনীতির সম্ভাবনা সমূলে নষ্ট করেছে।

চিত্তরঞ্জনের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নস্যাৎ করার পর কংগ্রেসের এই আঘাত বঙ্গে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে, দেশবিভাগের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। রাজনীতিকদের ব্যক্তিস্বার্থ এতই প্রবল যে সেখানে সম্প্রদায় প্রশ্নও স্থান পায় না। যেমন প্রজাপার্টির দিক থেকে কংগ্রেসের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পর নলিনীরঞ্জন সরকারের দৌত্যে মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রজাপার্টির সমঝোতা এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্গে ফজলুল হকের নেতৃত্বে লীগ-প্রজাপার্টির যৌথ মন্ত্রিসভা গঠন। বিস্ময়ের হলেও সত্য যে নলিনীরঞ্জন হলেন ওই মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী যে জন্য তিনি কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কৃত। আর নানাভাবে বিতর্কিত নলিনীরঞ্জন যেমন ফজলুল হকের জন্য, তেমনি পরোক্ষে দেশবিভাগের জন্যেও এক অশুভ নিয়তি। যেমন পরবর্তীসময়ে কেন্দ্রে ভি.পি. মেনন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

ক্ষমতার প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আবুল কাশেম ফজলুল হকের বরাবরই ছিল, যা রাজনীতিক মাত্রেরই থাকে, কম আর বেশি। বিরল সংখ্যক এর ব্যতিক্রম। আর এ ক্ষমতার জন্য তিন দিকে সর্বনাশের সূচনা। যেমন হক সাহেবের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, তেমনি প্রজাপার্টির সর্বনাশ, সর্বোপরি বঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দ্রুত বর্ধন যা দেশবিভাগের সম্ভাবনা তৈরি করে।

ক্ষমতা এমনই বিষয় এবং তার টান এমনই অন্ধতা তৈরি করতে পারে যে প্রজাপার্টির স্থপতি একবারও ভেবে দেখেননি, নবাব-নাইট-খাজা মুৎসুদ্দি ও ভূস্বামীপ্রধান মুসলিম লীগ দলের সাহায্যে ক্ষমতার আসনে বসে প্রজাবন্ধু ফজলুল হক তার ভূমিপুত্রদের জন্য প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারবেন কি না। কংগ্রেসেও ভূস্বামীর উপস্থিতি রয়েছে, তবে সেখানে মতাদর্শনির্ভর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, বিশেষ করে বঙ্গে।

কাজেই কৃষক প্রজাপার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এমনকি তাদের আদর্শগত কর্মসূচি, যেমন বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলোপ, ভূমি সংস্কার, কাঁচা পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি কৃষিবান্ধব কর্মসূচির মৃত্যু ঘটল– এমন কথাই বলতে হয়। এ মন্ত্রিসভার প্রতি তাই দৃঢ়সমর্থন অবাঙালি ইস্পাহানি, আদমজী প্রমুখ পুঁজিপতি ও ভূস্বামীর, এমনকি বেনিয়া বিড়লাদেরও, যাদের সঙ্গে নলিনীরঞ্জনের সম্পর্ক তখনো অটুট, নেপথ্যে কংগ্রেসপ্রধান এম কে গান্ধি। এমনকি এ যুক্তবন্ধনে খুশি ইংরেজ শাসকও। কারণ মুসলিম লীগ তাদের স্বার্থ, স্থানীয় ইউরোপীয় স্বার্থ নিশ্চিত করবে। কিন্তু এসবের ভারবাহী হবেন প্রজাবন্ধু ফজলুল হক।

তবু মানতেই হয় মূলত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি তথা অসাম্প্রদায়িকতার বিবেচনা থেকেই মুসলিম নিম্নবর্গীয়দের স্বার্থরক্ষা মাথায় রেখে ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার চেষ্টা চালান। বিশেষ করে বসু পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে। এক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো যে, হক যেমন বঙ্গীয় রাজনীতিতে অবাঙালি প্রাধান্যের বিরোধী তেমনি ছিল বসু পরিবার, বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র।

এ দ্বন্দ্বই কিন্তু উভয়ের জন্য রাজনীতিক্ষেত্রে কাল হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে ইস্পাহানি, আদমজী বিশেষ করে ইস্পাহানি যার সঙ্গে জিন্নার গভীর ঘনিষ্ঠতা। অন্যদিকে জি. ডি. বিড়লা যারা বঙ্গে বিশেষত রাজধানী কলকাতায় মাড়োয়ারি স্বার্থরক্ষা ও বিস্তারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আবার যার ও যাদের সঙ্গে কংগ্রেসের মূল ব্যক্তি গান্ধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। গান্ধি-রাজনীতির সঙ্গে বিড়লাদের গূঢ় সম্পর্ক ইতিহাসের সত্য হয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এ কথাও সত্য যে, মূলত মাড়োয়ারি অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে সুভাষ বিড়লাবিরোধী আর গান্ধি সুভাষ-বিরোধী যেমন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতায় তেমনি মাড়োয়ারি তথা বিড়লাদের মতো বেনিয়াদের স্বার্থরক্ষার টানে। এ দ্বন্দ্বের অবশেষ পরিণতি কংগ্রেস থেকে সুভাষের বহিষ্কার এবং তার কংগ্রেস-রাজনীতি তথা রাজনৈতিক জীবনের ইতি। ঠিক যেমন লীগ-প্রধান জিন্নার কূটচালে পরবর্তী সময়ে ফজলুল হকের প্রজা-রাজনীতির, এমনকি সাময়িক হলেও সেই চল্লিশের শেষে ক্রান্তিক্ষণের রাজনীতির অবসান। তাই দেশবিভাগের কুটিল-জটিল রাজনীতির অন্ধকার সময়ে ফজলুল হক অপাঙ্‌ক্তেয়, রাজনৈতিক প্রভাববিচ্যুত। দুই বাংলাপন্থী অসাম্প্রদায়িক ভিন্নধারার রাজনীতিকের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল!

আরো আশ্চর্য যে, বাংলার ক্ষেত্রে নেহরুর ভূমিকাও বিস্ময়করভাবে বাংলা-বিরোধী। এবং তা এ অর্থে যে অন্যত্র ভিন্নমতের হলেও জওহরলাল বঙ্গে কংগ্রেস-প্রজাপার্টি কোয়ালিশনের বিরোধী। এ প্রসঙ্গে অন্যতম নকশাল নেতা সুনীতিকুমার ঘোষ তার 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাজ' গ্রন্থে 'গান্ধী-বিড়লা-ব্রিটিশ রাজ'-এর গভীর নৈকট্যের কথা এবং জওহরলাল নেহরুর সুভাষ-বিরোধিতা ও কংগ্রেস-প্রজাপার্টির কোয়ালিশন-বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছেন।

নেহরুর ওই ভূমিকার বিরুদ্ধে সুভাষ স্পষ্ট করেই আপন অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন এই বলে যে, বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে কংগ্রেস-প্রজাপার্টি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন খুবই জরুরি ও দরকারি। ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি তার চিঠিতে নেহরুকে এমন কথাও লেখেন, দেশে পূর্ণ স্বরাজের সংগ্রাম তো এখন বন্ধ। যদি তা শুরু করতে চান এবং দেশের অন্যত্র কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আগ্রহী না হয় তাহলে আমার বলার কিছু নেই। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম শুরু করলে বঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভার কথা আর উঠবে না। এ প্রশ্নের কোনো জবাব মেলেনি নেহরুর কাছ থেকে।

তিন

দেশবিভাগের তাৎক্ষণিক ও সাময়িক উত্তেজনা থিতিয়ে আসার পর বঙ্গীয় রাজনীতি (বেঙ্গল পলিটিক্স) নিয়ে অনেক গবেষণা, অনেক লেখালেখি হয়েছে, যেমন হয়েছে ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ ও বঙ্গবিভাগ নিয়ে। এ ইতিহাস রচনা ও ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ দেখা গেছে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে; পূর্ববঙ্গে এবং বাংলাদেশে তা অপেক্ষাকৃত কম। এর অর্থ বোঝা কঠিন। বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান চাইলেও সাতচল্লিশে বঙ্গবিভাগ চায়নি। উল্লিখিত অনীহা আমাদের ইতিহাস চেতনার পরিচয় দেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস-ঐতিহ্য জাতি হিসেবে নিজেকে বুঝতে-চিনতে ও ভবিষ্যৎ দেখতে সাহায্য করে– তা সে ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভুল-শুদ্ধ, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত, সঠিক-বেঠিক যেমন ঘটনাই থাকুক না কেন। অনেক সময় ইতিহাস-চর্চা ভুল পদক্ষেপ শুদ্ধ করতেও সাহায্য করে থাকে। যাই হোক পূর্বোক্ত লীগ-প্রজাপার্টি সমঝোতা নিয়ে কৃষক প্রজাপার্টি (কে.পি.পি.) নেতা আবুল মনসুর আহমদও আরো কয়েকজন সহযোগীর মতো দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, কংগ্রেস-প্রজাপার্টির সমঝোতা বঙ্গীয় রাজনীতিকে সম্পূর্ণ ভিন্নধারায় নিয়ে যেতে পারত।

আমাদেরও তাই ধারণা। যে কারণে ১৯৩৭-এর নির্বাচন ও রাজনৈতিক সমঝোতা নিয়ে এত কথা বলা। ঘটনার এই বাঁকফেরা বিন্দু থেকে বঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চোরাস্রোত জোরালো হয়ে ওঠে। এবং ইতিহাস পাঠক জানেন, বঙ্গীয় রাজনীতির স্বাতন্ত্র্যবাদিতাই পরে দেশবিভাগের নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে উঠেছিল। এসব ঘটনার পেছনে ছিল অবাঙালি রাজনীতি ও তার কেন্দ্রীয় শক্তির বঙ্গ-বিরোধিতা– যেমন কংগ্রেসে তেমনি মুসলিম লীগে। যেমন হকের বিরুদ্ধে তেমনি চিত্তরঞ্জন ও সুভাষের বিরুদ্ধে। ইতিহাসের কী অমোঘ গতি, কী তার অদ্ভুত চরিত্র!

আশ্চর্য, ইতিহাসের ছোট ছোট ঘটনা বা আপাত গুরুত্বহীন কুশীলবগণের ভূমিকা কী সব অদ্ভুত কার্যকারণ পরম্পরায় ভবিতব্য হয়ে উঠেছিল যা জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব বহন করেছে। এ সময়ের রাজনীতিতে কত যে পরস্পরবিরোধী স্রোত, যা শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগকে অনিবার্য করে তুলেছে। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে ইস্পাহানি, হারুন, আদমজীদের মতো বিড়লা-গোয়েঙ্কারাও দেশবিভাগের পক্ষে। এবং তা উভয় পক্ষের পুঁজিবাদী স্বার্থে। সে ক্ষেত্রে লীগ কংগ্রেস বাইরে যা-ই বলুক না কেন এ কথা সত্য যে, কেন্দ্রীয় লীগ-কংগ্রেস দুই-ই ছিল বঙ্গ-বিরোধী। বহু ঘটনা তার প্রমাণ। বঙ্গে কোয়ালিশন নিষিদ্ধ হলে সিন্ধু ও আসামের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না কেন? এমন সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে তৎকালীন রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ দাবার ঘুঁটি ফজলুল হকের প্রাসঙ্গিক বিশ্বাস ও ভাবনা কেমন ছিল, যে ফজলুল হক শেষ পর্যন্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের সাময়িক শিকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক টানাপড়েনে বিপর্যস্ত ফজলুল হক

তিরিশের দশকের শেষ দিক থেকে বঙ্গীয় রাজনীতিতে, বিশেষ করে বঙ্গীয় মুসলিম রাজনীতিতে আবুল কাসেম ফজলুল হক একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তার হাত ধরে (ডান হাত বাঁ হাত যে হাতই হোক) বঙ্গীয় রাজনীতির পালাবদলের সূচনা। এবং বঙ্গীয় রাজনৈতিক নিয়তির স্ববিরোধী যাত্রা যা পরিণামে নানামাত্রিক ভারতীয় বিভাজনের নেপথ্য শক্তি হয়ে ওঠে। জওহরলাল নেহরুর কাব্যভাষায় সেই ভয়াবহ বিভাজন-সন্ধিক্ষণ যেন 'নিয়তির সঙ্গে অভিসার' (ট্রিস্ট উইথ ডেসটিনি)। সত্যি বলতে কি সে অভিসারের আয়োজনে নেহরুজিও তো 'শতরঞ্জ কা খিলাড়ি'– অবশ্য অন্যতম প্রধান খেলোয়াড় জিন্না এবং গান্ধি, সঙ্গে ব্রিটিশ 'রাজ'।

তবে এদিক থেকে বঙ্গীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সে সময়কার অন্যতম প্রধান চরিত্র এ কে ফজলুল হক তার ভূমিপুত্র ও স্থানীয় সমর্থকদের ভাষায় 'মোগো হক সাব'। তাকে নিয়ে একাধিক সিভিলিয়ান ও ক্রমফিল্ডের মতো রাজনৈতিক লেখক যত মস্করা করুন না কেন ফজলুল হক তৎকালীন রাজনীতিতে এমনই এক ব্যক্তিত্ব যে পরিস্থিতি বাগড়া না দিলে তার হাত ধরেই হয়তো বঙ্গীয় রাজনীতির যাত্রাপথ ভিন্ন হতো, ঘটত ভারতীয় রাজনীতিরও অন্য এক পালাবদল। কিন্তু কংগ্রেস, নেহরু তা হতে দেননি। পরে তা সম্পূর্ণ করেন মুসলিম লীগ অধিনায়ক জিন্না। রাজনীতি থেকে ক্রান্তিকালে ছিটকে পড়েন ফজলুল হক।

ব্যক্তি ফজলুল হক, রাজনীতিবিদ ফজলুল হক প্রকৃত অর্থেই গ্রামবাংলার প্রতিনিধি, যতই হোন না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী, শহরবাসী আইনজীবী। সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে ব্যক্তি ফজলুল হক রাজনীতিবিদ ফজলুল হকের তুলনায় অনেক বেশি বাঙালি, অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনার বাঙালি। রাজনৈতিক স্বার্থে, ব্যক্তি স্বার্থে কখনো কখনো তিনি বিপরীত পথে হেঁটেছেন, কিন্তু নান্দনিক বিচারে তার মনটা ছিল হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত 'রূপসী বাংলা'য়। ছিল মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, তেমনি ছিলেন ভূমিপুত্রদের কাছে কিংবদন্তিতুল্য স্বজন। যে জন্য ১৯৪৬-এর নির্বাচনে প্রবল পাকিস্তানি

জোয়ার একমাত্র তাকেই ভাসিয়ে নিতে পারেনি। অথচ উপড়ে নিতে পেরেছিল টাঙ্গাইলের আবদুল হালিম গজনভি, যশোরের সৈয়দ নওশের আলী, কুমিল্লার আশরাফউদ্দিন চৌধুরী বা ফরিদপুরের হুমায়ূন কবির প্রমুখ অশথ বটগুলোকে। একমাত্র ব্যতিক্রম বরিশালের ফজলুল হক। এ রহস্য দুর্জ্ঞেয় নয়। অথচ এমন এক ফজলুল হক কি না কালো পানিতে নৌকা বাইলেন যা হয়তো ছিল তার চেতনা-বিরোধী কাজ। তবু এমনটাই তার ভবিতব্য হয়ে ওঠে। আর সে ভবিতব্যের পেছনে সক্রিয় তার ব্যক্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিকূল ঘটনাক্রম।

এটাই কি সবার বহু পরিচিত হক সাহেবের প্রকৃত পরিচয়? কিন্তু বেশ কিছু ঘটনা তা বলে না। জন ক্রুমফিল্ড অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের রাজনৈতিক বিচারের ধারায় তাকে কথিত 'হিন্দু ভদ্রলোক' রাজনীতিকের কাতারে 'মুসলিম ভদ্রলোক' রাজনীতিক হিসেবে দাঁড় করালেও তার মধ্যে ছিল দ্বৈত সত্তা—মাটি ও রাজপথের। একদিকে তিনি যেমন তৃণমূল রাজনীতির পথেই গ্রামবাংলার হিন্দু-মুসলমান প্রজাস্বার্থের প্রতিনিধি, তেমনি জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে ক্রুমফিল্ডের মতে 'হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার প্রবক্তা'। সেই সঙ্গে 'কংগ্রেসী ঘরানার মিলে সাধারণ শত্রু ব্রিটিশরাজের বিরোধী'। সম্মিলিত বিরোধিতার পথেই বাঙালি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ নিহিত এমনই ছিল তার বিশ্বাস।

কিন্তু কংগ্রেস রাজনীতি তার জন্য সর্বদা পরিচ্ছন্ন তথা ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না, যে জন্য ফজলুল হককেও কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে মোড় নিতে দেখা গেছে। কখনো কংগ্রেস, কখনো মুসলিম লীগের সঙ্গে লেনদেনে। সেসব পদক্ষেপ ছিল কখনো ঠিক, কখনো বেঠিক। এমন সব টানাপড়েনের মধ্যেও ১৯১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ফজলুল হক বলেন যে 'হিন্দু প্রকৃতিগভাবে মুসলমানের শত্রু— হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে এমন ধারণা নিন্দনীয় ভুল'।

আবার এই ফজলুল হকই বিশ শতকের বিশের দশকে গান্ধিসূচিত অসহযোগ আন্দোলনের ধারায় আইনসভা বয়কটের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। কারণ তার মতে তাতে ইংরেজ শাসকেরই লাভ হবে। প্রসঙ্গত এক পর্যায়ে চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলেরও অনুরূপ ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে। তখনো তিনি অর্থাৎ হক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমর্থক নন এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের (মন্টেগু-চেমসফোর্ড সামপ্রদায়িক আইন) পক্ষপাতী নন। এ জন্য তিনি রক্ষণশীল বা সম্প্রদায়বাদী মুসলিম মহলে সমালোচিত।

প্রকৃতপক্ষে ১৯২৯ সালে তার হাতে গঠিত প্রজাস্বার্থের কৃষক প্রজাপার্টিই ছিল তার জন্য সঠিক সংগঠন যা অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারক, সেই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মুসলমান কৃষক-প্রজার স্বার্থরক্ষার বাহক। এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক রাজনৈতিক পরিচিতি নিয়ে অল্প সময়ে তিনি কলকাতা করপোরেশনের মেয়র এবং ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে লীগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দলেবলে জয়ী। অর্থাৎ মুসলিম লীগের (১৯০৬) তুলনায় মাত্র বছর সাতেক বয়সী প্রজাপার্টির আসন সংখ্যা বৃহত্তর জনশ্রেণীতে তার জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। মুসলিম লীগের মতো সবকটি আসনে প্রার্থী দিতে পারেন নি হক।

নির্বাচনের ফলাফলে লীগের চেয়ে কয়েকটি আসন কম পেলেও কৃষক প্রজাপার্টির পক্ষে মোট ভোটের শতকরা সংখ্যা ছিল মুসলিম লীগের চেয়ে বেশি (৩১ বনাম ২৭)। স্বল্প সময়ের পার্টি হিসাবে সাংগঠনিক অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে ওই নির্বাচনে হক নিরুঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পান নি। স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (৪৩)। অন্যদিকে প্রজাপার্টি ও মুসলিম লীগ যথাক্রমে ৩৬ এবং ৩৯ আসনে জয়ী। সাধারণ আসনে কংগ্রেস ৫২, স্বতন্ত্র ৩৯, হিন্দু জাতীয়তাবাদী ৩, হিন্দু মহাসভা ২ এবং ইউরোপীয় গ্রুপ ২৫। সাধারণ আসনেও স্বতন্ত্র বেশি, তবে নিয়ন্ত্রক শাসকদের পেয়াদা ইউরোপীয় গ্রুপ। তারা একাই একাধিকবার বাংলার হিসাব নিকাশ পাল্‌টে দিয়েছে।

ফজলুল হক ও তার কৃষক প্রজাপার্টি শহুরে আসনে ভালো ফল করতে না পারলেও (এটাই স্বাভাবিক) বঙ্গীয় মুসলিম রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বতন্ত্র নির্বাচন সত্ত্বেও যে অসম্প্রদায়বাদী ধারার জন্ম দিয়েছিল তা সুস্থ রাজনীতির জন্য ছিল যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। কয়েকটি ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে অশিক্ষিত গ্রামীণ মানসে ধর্মীয় প্রচারণা কোনো কাজে আসেনি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব ছিল ধর্মীয় চেতনার ওপরে (অথচ রাজনীতির বিভ্রান্তিকর যাত্রায় ওই চেতনা ঠিক বিপরীত পথ ধরে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে)।

এছাড়াও ওই নির্বাচনে ফজলুল হকের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তারও উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে। বিশেষভাবে তা স্পষ্ট হয় পটুয়াখালী আসনে খাজা নাজিমুদ্দিনকে বিশাল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করার ঘটনায়। কারণ ওই নির্বাচন ছিল ওই দুই ব্যক্তিত্বের মর্যাদার লড়াই। তাত্ত্বিক বিচারে জয়ের পাল্লা নাজিমুদ্দিনের দিকেই ভারী ছিল। প্রথমত পটুয়াখালী ঢাকাই নবাবদের জমিদারির অন্তর্গত। তাছাড়া ফুরফুরার খ্যাতিমান পীরসাহেব শাহ সুফি মাওলানা আবু বকরসহ তার সাগরেদ মোল্লামৌলবী সবাই নাজিমুদ্দিনের পক্ষে প্রচারণায় নামেন। এমনকি ঢাকার গদ্দিনশীন নবাব হাবীবুল্লাহ পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিতে পটুয়াখালীতে আসেন। সবচেয়ে বড় বিস্ময় স্বয়ং বাংলার লাটবাহাদুর নাজিমুদ্দিনের পক্ষে প্রচার চালান, যা ছিল এক অনৈতিক পদক্ষেপ। জয়ের জন্য প্রচার কাজে নেমেছিল পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য স্থান থেকে আগত বহু সংখ্যক মুসলমান ছাত্র। সবাই মিলে ইসলামের ধুয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলে নাজিমুদ্দিনকে জয়ী করতে। অর্থাৎ মুসলিম লীগ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে পটুয়াখালী আসনটি হাতের মুঠোয় নিতে। কিন্তু কৃষক, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষ তাতে ভোলেনি। নির্বাচনের ফলাফল ফজলুল হক ১৩,৭৪২ ভোটে জয়ী, নাজিমুদ্দিনের পক্ষে ভোট মাত্র ৬,৩০৮। অবিশ্বাস্য ওই বিজয়। আমার ধারণা উর্দুভাষী খাজাদের পক্ষে উর্দুভাষী ছাত্র ও স্বয়ং লাটবাহাদুরের প্রচারই সবকিছু গুবলেট করে দেয়। মাটির মানুষ তাদের বহু চেনা মানুষটিকে ভোটে জয়ী করে দেন।

সত্যি বলতে কি ১৯৩৭-এর নির্বাচন তার অনিশ্চিত রাজনীতির প্রকাশ নিয়ে বঙ্গে সুষ্ঠু, সুস্থ রাজনৈতিক বাঁক ফেরার সম্ভাবনা তৈরি করে। কিন্তু সে সম্ভাবনা নষ্ট করার পেছনে দাবার ছকের গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটি অর্থাৎ খেলুড়ে সংগঠন তিনটির কম-বেশি দায় ঠিকই ছিল। যেমন ফজলুল হকের আগ্রহে কংগ্রেস-প্রজাপার্টি মন্ত্রিসভা গঠনের প্রক্রিয়ায় নিম্নতম কর্মসূচি, যেমন একদিকে বন্দিমুক্তি অন্যদিকে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির মতো কৃষক স্বার্থ বিষয়ক এজেন্ডা নিয়ে মতের অমিল হক-কংগ্রেসের আলোচনা অচল করে দেয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে ও দাবিতে অনড়।

এ ক্ষেত্রে যুক্তি, রাজনৈতিক ঔদার্য এবং বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি অগ্রাধিকার বিবেচনা কাজ করেনি। পরিস্থিতির অবনতি ঘটে যখন ফজলুল হক তার স্বভাব-সুলভ কূটনৈতিক চাতুর্য প্রকাশে ব্যর্থ হন, অন্যদিকে 'ফরোয়ার্ড'সহ (২২/২, ১৯৩৭) একাধিক পত্রিকায় অপরপক্ষের ওপর দায় চাপিয়ে কংগ্রেস তরফে বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে ক্ষুব্ধ হন ফজলুল হক। শুরুতেই এমন কাণ্ড! অন্যদিকে প্রজাপার্টির বক্তব্যে যুক্তি ছিল যে প্রথমে প্রতিশ্রুত কৃষকস্বার্থ বিষয়ক কিছু আইন পাসের পর বন্দিমুক্তির বিষয়টি বিল হিসাবে আনা ও পাস করানো হবে, সে ক্ষেত্রে গভর্নর ভেটো দিলে এবং মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হলেও কৃষকদের কাছে জবাবদিহির সুযোগ থাকবে। কিন্তু কংগ্রেস এ যুক্তি মানতে চায়নি যদিও তাদের অজানা ছিল না যে গভর্নর তথা ইংরেজ শাসক কংগ্রেস ও ফজলুল হককে একই মানদণ্ডে অপছন্দ করে। এরপরও সমস্যা ছিল নলিনী-রঞ্জন সরকারকে নিয়ে কংগ্রেস ও প্রজাপার্টির ভিন্নমতের কারণে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো এ দরকাকষিতে উভয় পক্ষই বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থের প্রতি অগ্রাধিকার দিতে ব্যর্থ হয়। সঙ্গত কারণে শীলা সেনের মন্তব্য যে, 'নানা কারণে বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতারাও ফজলুল হককে সমর্থন দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই কংগ্রেস হাইকমান্ডকে সিদ্ধান্তহীনতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না' (বঙ্গে মুসলিম রাজনীতি)। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন মতও রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসু পরিবারের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সদস্য শরৎ বসুর পত্রাবলীতে দেখা যায় যে কংগ্রেস যখন সংগ্রামের পথ ছেড়ে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় তখন যেসব প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যালঘু, যেমন বঙ্গদেশের মতো প্রদেশ, সেসব স্থানে সম্মিলিত (কোয়ালিশন) মন্ত্রিসভা গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শরৎ বসু। কিন্তু তার মতামত কংগ্রেস হাইকমান্ডে গৃহীত হয়নি। তাই তিনি লেখেন, '১৯৩৭ সালে গান্ধি যদি বঙ্গে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনে রাজি হতেন তাহলে জিন্না ও তার সমর্থকরা সন্তুষ্ট হতেন এবং হিন্দু-মুসলমান মতপার্থক্য অনেক কমে যেত।'

শুধু মতপার্থক্য কমা নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রীতির সুবাতাস বইতে শুরু করত এবং তাতে উভয় পক্ষই লাভবান হতো। হয়তো এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবে হিংসার রক্তে ভারতবিভাগের (বাংলাবিভাগেরও) তরবারি রঞ্জিত হতো না। কিন্তু কংগ্রেস যেমন বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও উদারতার পরিচয় দিতে পারেনি, তেমনি পারেনি সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতিতে যুক্তপ্রদেশ (উত্তর প্রদেশ) বা বোম্বাইয়ে অনুরূপ প্রজ্ঞার পরিচয় রাখতে। বিষয়টি পরে আলোচনায় আসবে।

কংগ্রেসের শাসনে ও আচরণে যে কর্তৃত্বপরায়ণতা ও ক্ষমতা-কেন্দ্রিকতার অভিযোগ তুলেছেন সুনীতিকুমার ঘোষ, একই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এইচ ভি হডসন তার 'দ্য গ্রেট ডিভাইড' বইতে। তবে বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে ফজলুল হক দরকষাকষিতে বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থের কথা ভেবে আরো কিছু মাত্রায় নমনীয় হতে পারতেন বলে আমার ধারণা। কিন্তু তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছিল, যে জন্য একটি সুস্থ রাজনৈতিক সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটল।

শুধু তা-ই নয়, তার সম্ভাবনাময় সংগঠন 'কৃষক প্রজা পার্টি'কেও তিনি নিজ হাতেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছেন। তাও তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায়, যে তাড়নায় তিনি চতুর গুজরাতি বুদ্ধির ফাঁদে পা দিলেন। সম্ভবত সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় নেতা হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু জিন্নার মুসলিম লীগে তা সম্ভব ছিল না। কারণ এক আসনে দুই পীরের সহাবস্থান সম্ভব নয়। তাছাড়া বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্বের বিষয়টির গুরুত্ব তার পক্ষে বুঝতে না পারার কথা নয়। কিন্তু বুঝতে পারেননি হক, তাই তিনি স্বখাত সলিলে। সেসব অবশ্য পরবর্তী সময়ের কথা।

নিরুপায় ফজলুল হক যখন বন্ধুপ্রতিম নলিনীরঞ্জন অর্থাৎ বিতর্কিত মি. সরকারের দৌত্যে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের জন্য মুসলিম লীগের দ্বারস্থ হন এবং লীগ তাকে সব দাবিসহ সাদরে বরণ করে নেয়। তখনো তিনি বুঝতে পারেননি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন এক অন্ধকার গহ্বরে তিনি পা রেখেছেন, যেখানে রাজনীতিক ফজলুল হককে কেউ সমর্থন জোগাবে না বিশেষ করে তার কৃষক স্বার্থের কর্মসূচি বাস্তবায়নে। আসলে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার এ জাতীয় আপসবাদিতা পরেও দেখা গেছে। কিন্তু তিনি তো জানতেন মুসলিম লীগ জমিদার নবাব নাইট প্রধান দল।

তার এ দুর্বলতা বরাবরের। যেমন অখণ্ড বঙ্গে তেমনি বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গে, পূর্ব পাকিস্তানে। এ পর্যায়ে তার জন্য বড় ট্র্যাজেডি হলো রাজনৈতিক চিন্তায় অসমমনাদের ওপর নির্ভর করে চলেছে তার রাজনৈতিক জীবন বিশেষ করে যারা তার খুব অপছন্দের– যেমন কট্টর লীগপন্থিরা, তার চেয়েও বেশি অপছন্দের ইউরোপীয় সদস্যগণ, সংখ্যায় তারা কম নয়।

ভুল পদক্ষেপ যেমন ফজলুল হকের, তেমনি কংগ্রেসেরও। তা না হলে স্পিকার নির্বাচনে এমন ভুল কেউ করে? লীগ ও ইউরোপীয় ব্লকের পছন্দসই প্রার্থী খান বাহাদুর আযিজুল হকের বিরুদ্ধে প্রজাপার্টির তমিজুদ্দিন খানকে সমর্থন না করে কংগ্রেস কিনা সেখানে নিজস্ব তৃতীয় প্রার্থী দাঁড় করায়? ফলে লীগ প্রার্থী জিতে যায়। শীলা সেনের বিবেচনায় এটা কংগ্রেসের পক্ষে 'হিমালয়সম গুরুতর ভুল' (হিমালয়ান ব্লান্ডার)।

কংগ্রেসের এ রকম ভূমিকা মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের জন্য সমস্যা ও বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে নিজ দলে বিদ্রোহ। এর দায় অবশ্য চাপেপড়া বাঘ ফজলুল হকেরই। পার্টির সেক্রেটারি শামসুদ্দিন আহমদকে মন্ত্রীপদে মনোনীত করে পরে তা বাতিল করার ঘটনা কেন্দ্র করে উল্লিখিত বিদ্রোহ এবং শেষ পর্যন্ত দলে ভাঙন। একের পর এক সমস্যায় বিপর্যস্ত হক। এর কিছু তার নিজের সৃষ্টি। অথচ রাজনৈতিক বিচারে এ ধরনের দুর্ভোগ তার প্রাপ্য ছিল না।

প্রাপ্য ছিল না অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী রাজনীতিক ফজলুল হকের। দীর্ঘকাল পর দেশবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক গ্রন্থে (Transfer of Power in India) ভিপি মেনন তার সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন, 'বাংলায় ফজলুল হকই একমাত্র মুসলমান নেতা যিনি প্রদেশের পর্যাপ্ত সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন'। অথচ আশ্চর্য, সেই নেতাকেই কি না অব্যাহত দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু কেন? এর জবাব মিলবে হকের ব্যক্তিভাবনা ও বঙ্গীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট বিচারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগের গায়ে জোয়ারি হাওয়া বঙ্গ-পাঞ্জাবের দাক্ষিণ্যে

সত্যি, বঙ্গে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিপর্যয়ের কারণ যেমন ফজলুল হকের কিছু ভুল পদক্ষেপ তেমিন কংগ্রেসের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা আর লীগপ্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নার রাজনৈতিক চাতুর্যের কূটকৌশল। এক্ষেত্রে বুদ্ধির দৌড়ে কংগ্রেসের তথা গান্ধি-নেহরুর হার জিন্নার কাছে। জিন্না খুবই সুকৌশলে উপঢৌকন সামনে রেখে 'শেরে-বঙ্গাল'কে খাঁচায় পুরেছিলেন। রাজনৈতিক টানাপড়েনে ক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত, সর্বোপরি উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'শের' সেটা বুঝতে পারেননি। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে। এভাবে বঙ্গীয় রাজনীতিতে বিপরীত ধারায় ইতিহাস তৈরি হয়।

তাই বলতে হয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সুবিধাবাদ ফজলুল হকের যতটা ক্ষতি করেছে অন্য কিছু ততটা করতে পারেনি। পারেনি অন্য কোনো রাজনৈতিক মহাজনের এতটা ক্ষতি করতে। বরং কেউ কেউ সুবিধাবাদের সিঁড়িতে পা রেখে দ্রুত উপরে উঠে গেছেন। হক সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল মুসলিম লীগে যোগদান এবং তার রাজনৈতিক অস্তিত্বের ভিত কৃষক প্রজাপার্টিকে মুসলিম লীগের সঙ্গে একাকার করে দেয়া।

একই ভুল করেন আরেক মুসলমানপ্রধান প্রদেশ পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী নেতা সিকান্দার হায়াত খান। একইভাবে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে তার পার্টিকে লীগের সঙ্গে একাকার করেন। সিকান্দার হায়াত কিন্তু মুসলিম লীগের চরিত্র জানতেন যা তার কিছু কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়। জানতেন একনায়ক জিন্নাকেও। তবু কিসের টানে চতুর জিন্নার পাতা ফাঁদে পা দিলেন? পাঞ্জাব প্রদেশে তার তো একচেটিয়া বিজয়, হক সাহেবের মতো মন্ত্রিসভা গঠনের সমস্যা তার ছিল না। তবু কেন জেনেশুনে বিষপান? এসব হলো রাজনৈতিক অঙ্গনের বিচিত্র ঘটনাবলীর রহস্য, যে রহস্যের জবাব কখনো মেলে, কখনো মেলে না।

পাঞ্জাবের ঘটনা সত্যি দুর্বোধ্য। কারণ সিকান্দার হায়াতের ইউনিয়নিস্ট পার্টির ছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আর জিন্নার মুসলিম লীগ নির্বাচনে সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো ফল দেখাতে পারেনি। পারেনি ধর্মের জিগির তুলেও। তবু জাতীয়তাবাদী চেতনার অর্জন কেন জিন্না- লীগের ধর্মীয় রক্ষণশীলতার হাতে তুলে দিলেন সিকান্দার? এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইচ ভি হডসন।

তার মতে, সেসময় ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক চেতনার ক্রমবর্ধমান উত্থান এবং পাঞ্জাবে তার অনুসারীদের মধ্যে আলোড়ন লক্ষ্য করে ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের আশঙ্কায় নিজের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও দলের জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্যই সিকান্দার হায়াত দলের সবাইকে মুসলিম লীগে যোগ দিতে আহ্বান জানান। এ ব্যাখ্যা স্যার পেন্ডেরেল মুন নামীয় সিভিলিয়ানের লেখা দেশবিভাগ বিষয়ক 'ডিভাইড অ্যান্ড কুইট' গ্রন্থে মিলবে। এ ব্যাখ্যায় মূল প্রশ্নের জবাব মেলে না।

ভাবতে অবাক লাগে, সিকান্দার হায়াতের মতো একজন বুদ্ধিমান রাজনীতিক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় এভাবে আত্মহত্যার দলিলে বা সর্বনাশের দাসখতে সই করবেন কেন? অবশ্য একথাও ঠিক যে তখন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার একনায়কী আচরণ নিয়ে অভিযোগ উঠতে থাকে এবং জিন্নার ক্রমাগত প্রচারণায় ভারতীয় শিক্ষিত মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু তাই বলে দলের অস্তিত্ব নাশ?

শুধু কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুই নন, গান্ধির বক্তব্যেও ভারতে কংগ্রেসদলীয় একনায়কত্বের আভাস মেলে, যেখানে বলা হয় ভারতে 'ব্রিটিশ রাজ' রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতে পারে তেমন একটি দলই রয়েছে আর তা হলো জাতীয় কংগ্রেস (গান্ধি সেবাসংঘে বক্তৃতা, ২৫ মার্চ, ১৯৩৮)। একই কথা লেখেন 'হরিজন' পত্রিকায়ও। গান্ধির মতো দূরদর্শী রাজনীতিবিদ যে কেন ও কী ভেবে বাস্তবতা অস্বীকার করেন তা বোঝা কঠিন।

সত্যি ভারতীয় রাজনীতির দুর্ভাগ্য যে রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ দুই দুটো সময়পর্বে নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি। এবং সভাপতির একাধিক বক্তব্য ও পদক্ষেপ ভারতবর্ষকে বিভাজনের দিকে ঠেলে দেয়। দ্বিতীয় সময়পর্ব সম্বন্ধে আজাদ তার বইতে স্পষ্টই বলেছেন যে সেসময় সভাপতির পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানো তার পক্ষে ছিল বিরাট ভুল। সেকুলার রাজনীতি সে ভুলের মাশুল গুনেছে। গুনেছে উপমহাদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে, নির্যাতনের শিকার হয়ে। এমন কি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে।

কংগ্রেসের এ জাতীয় কিছু ভুল পদক্ষেপে ভারতীয় রাজনীতির জল ঘোলা হতে থাকে। শুধু বিবৃতিতে নয়, কাজেকর্মেও। যেমন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে 'কোয়ালিশন' সরকার গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস পক্ষ থেকে এমনভাবে নাকচ করা হয় যাতে রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসৌজন্যই প্রকাশ পেয়েছে। প্রস্তাবের জবাবে কংগ্রেস পক্ষ থেকে অনেক শর্তের মধ্যে আরো বলা হয় যে সে ক্ষেত্রে মুসলিম লীগকে তার দলীয় সত্তা বিসর্জন দিয়ে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে হবে। এ কার্যক্রমের সমালোচনা করেছিলেন শরৎ বসু।

ফজলুল হক, সিকান্দার হায়াত যা করতে পারেন জিন্না নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে তা করতে পারেন না। তার ধাতই আলাদা। দরকার হলে সুসময়ের জন্য তিনি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করবেন, কিন্তু কোনো আত্মঘাতী পদক্ষেপ নয়। তবে এটাও ঠিক যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য জিন্নার মুসলিম লীগ যে কোনো ধরনের যুক্তিহীন, অনৈতিক কাজও করতে পারত। পারত নয়, করেছেও, যেমন বিহারে কংগ্রেস শাসনের অভিযোগ সংবলিত 'পীরপুর রিপোর্ট'। এ বিষয়ে নানা মত রয়েছে। তবে কংগ্রেস তো বটেই, মাওলানা আজাদ 'ভারত স্বাধীন হলো' শীর্ষক আত্মজৈবনিক রচনায় এ রিপোর্ট সঠিক নয় বলে মতামত প্রকাশ করেছেন।

আর একথাও ঠিক যে, নির্বাচনী জয়ে উৎফুল্ল কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তার পায়ের নিচে জমি কতটা প্রশস্ত, কতটা শক্ত তা ঠিকঠাক মতো মেপে নিতে পারেনি। পারেনি বলেই যত ভুল পদক্ষেপ, যত অঘটন। সেজন্যই মুসলমান প্রতিক্রিয়া ও মুসলিম লীগের জনসমর্থন, অন্ততপক্ষে জনসমর্থনের সম্ভাবনা পরিমাপে মস্ত ভুল করে বসে কংগ্রেস। ধর্মীয় প্রতীক, ধর্মীয় অনুষঙ্গ মুসলিম লীগের মতোই কংগ্রেসের মতো সেক্যুলার সংগঠনে স্থান করে নেয়। বিশেষ করে 'বন্দেমাতরম' শ্লোগান, উর্দুর স্থলে হিন্দির ভাষিক প্রভাব ইত্যাদিও নানাভাবে প্রভাব ফেলে।

AMARBOI.COM

এ সবের সুযোগ নেন জিন্না। রাজনীতি মন্থনে অমৃতের বদলে যে গরল উঠে আসে তা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চালাতে থাকেন। সত্য-মিথ্যার ব্যাপক প্রচারণা তার কৌশল হয়ে ওঠে। 'পীরপুর রিপোর্টি, 'শরীফ রিপোর্ট' যে অতিরঞ্জিত তার প্রমাণ মেলে কংগ্রেস-বিরোধী ইংরেজ গভর্নরদের এমন মতামতে যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যক্রম মূলত সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। তবে কংগ্রেসের জেলা ও গ্রামপর্যায়ের সদস্যদের মধ্যে কর্তৃত্বপরায়ণতার ঝোঁক ছিল যথেষ্ট (হডসন)।

তা সত্ত্বেও আশ্চর্য যে এ জাতীয় রিপোর্টের ভিত্তিতে উত্তেজিত ফজলুল হক 'কংগ্রেস শাসনে মুসলিম দুর্দশা'র বিবরণ তুলে ধরে বক্তৃতায় সম্প্রদায়বাদী চেতনার আবহ তৈরি করেন (ডিসেম্বর, ১৯৩৯)। অথচ এই কংগ্রেসের সঙ্গে (অবশ্য বঙ্গীয় কংগ্রেসের উদারপন্থীদের সঙ্গে) তার ওঠাবসা, হাঁটা চলা (যে মনোভাব বিভাগোত্তর সময়েও সজীব দেখা গেছে)। হডসনের লেখায়ও উল্লিখিত ঘটনাবলীকে অতিরঞ্জিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বীকার করা কঠিনই হবে যে ভারত বিভাগের পটভূমি বা পরিপ্রেক্ষিত রচনায় জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বিশেষ করে গান্ধি-নেহরু-প্যাটেলের অবদান কম নয়। অন্য ভাষায় বলা যায়, এ পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রাজনীতির দাবা খেলায় একক জিন্নার কাছে গান্ধি-নেহরুর হার এবং সেটা যতটা দেশবিভাগের বাস্তবায়নে তার চেয়ে বেশি সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্নতার কারণ তৈরিতে। সেক্ষেত্রে জিন্নাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ভুল চালের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো দুটো বড়োসড়ো মুসলমান-প্রধান প্রদেশে লীগের প্রভাব বিস্তার। সেক্ষেত্রে যদি খলনায়ক নাও বলি, বলব বিভ্রান্ত দুই নায়ক একে ফজলুল হক ও সিকান্দার হায়াত খান। এ দুই ব্যক্তি ও রাজনীতিকের মধ্যে যথেষ্ট মিল তাদের রাজনৈতিক পদক্ষেপে। তেমনি মিল রাজনৈতিক সাংগঠনিক চরিত্রে।

বলা হয়ে থাকে ভারত বিভাগে এ দুই প্রদেশের ভূমিকা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তবিকই তাই। এ দুই প্রদেশ ভারত বিভাগের দায় বহন করে বিভক্ত হয়েছে। হয়েছে সর্বাধিক রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে। এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিককার রাজনৈতিক বিবেচনায় এ দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য। অথচ ভূ-প্রকৃতি, ভাষা-সংস্কৃতি ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এ দুই প্রদেশ ও অধিবাসীর মধ্যে প্রভেদ সম্ভবত সর্বাধিক।

বঙ্গদেশ যদিও প্রধানত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত, পাঞ্জাবে সে ক্ষেত্রে তিন প্রধান সম্প্রদায় মুসলমান, হিন্দু ও শিখ। সংঘাতে মুসলমান ও শিখ কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। সে প্রমাণ ইতিহাসে ধরা আছে– অতীত ইতিহাস ও আধুনিক ইতিহাস এ দুয়েরই পাতায়। মধ্যিখানে শিক্ষিত ও মূলত বেনিয়া শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়। এতদসত্ত্বেও বিশের দশকে স্যার ফজল-ই-হোসেনের চেষ্টায় এ তিন সম্প্রদায়কে পরস্পরমুখী করার তাগিদে গঠিত হয় সেক্যুলার রাজনৈতিক দল ইউনিয়নিস্ট পার্টি।

বাস্তবিকই ইউনিয়নিস্ট পার্টি এই তিন সম্প্রদায়ের কম-বেশি প্রতিনিধিত্ব করেছে। করেছে প্রধানত গ্রামীণ জনশ্রেণীর বিশেষত কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে। এদিক থেকে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে ফজলুল হক ও তার কৃষক প্রজাপার্টির সঙ্গে। উভয় ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাব রয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রামীণ স্বার্থ ও গ্রামীণ অর্থনীতি উদ্ধার। সর্বশেষ মিল জিন্না-লীগের কাছে আত্মসমর্পণে। তাতে ওই দুই পার্টির সর্বনাশা বিলুপ্তি। তবে সিকান্দারের অকাল মৃত্যুর (ডিসেম্বর, ১৯৪২) পর তার উত্তরসূরি খিজির হায়াত খান তার পাকিস্তান-বিরোধিতা নিয়ে ব্যর্থ লড়াই চালিয়ে গেছেন, সে কাহিনী পরে বিবেচ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কিছু ভুল আচরণ এবং জিন্নার ধর্মীয় চেতনাবাদী (আসলে সম্প্রদায়বাদী) প্রচারে রাজনৈতিক হাওয়ায় উল্টো টান দেখা দিতে থাকে। অথচ ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্লেষক প্রায় সবাই একমত যে ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনের তাত্ত্বিক ফল অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির আলোকরেখা হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। অনেকটা এমন মতামতই লক্ষ করা যায় বিজেপি নেতা যশবন্ত সিং-এর লেখা দেশবিভাগ ও জিন্না বিষয়ক ঢাউস বইটিতে। তিনি অবশ্য ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে চিহ্নিত করেছেন 'গণতান্ত্রিক রাজনীতির সন্ধিক্ষণ' হিসেবে (জিন্না ইন্ডিয়া-পার্টিশন-ইন্ডিপেন্ডেন্স', পেপারব্যাক, পৃ. ২২৩)।

বাস্তবিক সেটা সন্ধিক্ষণই ছিল এবং আমি এক্ষেত্রে 'অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি' কথাটার ওপর গুরুত্ব আরোপ করব এ কারণে যে ভারত বিভাগের বীজমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতা ঘিরে। যদিও পাকিস্তান দাবির পেছনে আর্থ-সামাজিক উন্নতির প্রেক্ষাপট ছিল প্রধান কিন্তু সেখানে দ্বিজাতিতত্ত্ব আমদানি করে, ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে, সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান তুলে ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে ব্যাপক কাটাকুটি ও জিঘাংসার মধ্য দিয়ে ভারত বিভাগসহ বাংলা-পাঞ্জাব বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা হয়। এর দায় প্রধানত মুসলিম লীগ ও জিন্নার।

আর লক্ষণীয় বিষয় যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে হাতিয়ার করে তোলা হলেও বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে এর পেছনে আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-কারিগর শ্রেণী, যারা ছিল সামন্তবাদী শোষণের শিকার। অন্যদিকে উঠতি মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণী প্রতিযোগিতায় পিছু হটে ক্ষুব্ধ। তারাও পদ-মান-মর্যাদার ভাগ চায়।

এদের জন্যই স্বতন্ত্র ভুবন অর্থাৎ পাকিস্তান মুক্তির নিশানা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের একাধিক প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায় থেকে উন্নত। কারণটা প্রধানত ঐতিহাসিক। বর্তমান উত্তরপ্রদেশ (তখনকার ইউপি অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশ), পাঞ্জাব, এমনকি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে নিম্নবর্গীয়দের অবস্থা যেমনই হোক শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত ও সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান শ্রেণীতে মুসলমান সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুব কম ছিল না। এমনকি পেশাজীবীশ্রেণী সম্পর্কেও কম-বেশি একই কথা খাটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেই ছিল বঙ্গীয় মুসলমানদের সঙ্গে অবাঙালি ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ ফারাক, সুস্পষ্টভাবে শিক্ষিত ও বিত্তবান শ্রেণীর (পেশাজীবীসহ) বিবেচনায়। তাই বঙ্গীয় মুসলমানের জন্য ভারত বিভাগ ও স্বতন্ত্র ভুবন প্রতিষ্ঠা হয়ে ওঠে জীবন-মরণ প্রশ্ন। যে জন্য জিন্নার সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক প্রচারে বঙ্গীয় মুসলমান সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হয়। সর্বশেষ নির্বাচনে (১৯৪৬) সে বিভ্রান্তির প্রকাশ ঘটে। অথচ ওই নির্বাচনের ফল অন্যত্র ছিল কিছুটা ভিন্ন। অনেকটা ১৯৩৭-এর নির্বাচনী ধারায়।

প্রায় এক দশকের ব্যবধানে ভেসে যায় গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির চারাগাছ। সেটা যায় মূলত মুসলমানপ্রধান দুই প্রদেশ বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির টানে। তার সঙ্গে যোগ দেয় আসাম– সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লার হাত ধরে। বিভ্রান্ত এ তিন মুখ্যমন্ত্রী ১৯৩৭-এর নির্বাচনপরবর্তী সময়ে একের পর এক ঘোষণা দেন তাদের রাজনৈতিক অনুসারীদের মুসলিম লীগে যোগ দিতে। এভাবে আল্লাহ ও ইমানের টানে অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রী 'ওয়াটারশেড' ভেসে যায়। বিপন্ন মুসলিম লীগ পরিপুষ্ট জিন্না-লীগে পরিণত হয়। পায়ের নিচে শক্ত মাটি পেয়ে, ঘর গোছাতে শুরু করেন জিন্না। বুঝে নেন সাম্প্রদায়িকতার প্রচারই রাজনৈতিক বিজয়ের ধারালো অস্ত্র। এর ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজন।

জিন্না হয়ে ওঠেন মুসলিম লীগের এমন একজন একনায়ক, যার ইঙ্গিত ছাড়া মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক বৃক্ষটির একটি পাতাও নড়বে না। অথচ সেকুলার মুসলিম রাজনীতি, বিশেষ করে বাংলা পাঞ্জাব ১৯৩৭-এর নির্বাচনী ফলের পরিপ্রেক্ষিতে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশ ঘটাতে পারত। আসাম তাদের সঙ্গী হতে পারত। কিন্তু সেই বিকাশ ও বিস্তার কেন ঘটেনি তার কিছুটা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

পূর্বোক্ত দুই প্রধানের দেখানো পথ ধরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগে মুসলিম ঐক্যের যে উদ্দীপনা ও উন্মাদনা দেখা দেয় তার নাভিকেন্দ্র কিন্তু পাঞ্জাবের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ। হডসন লিখেছেন নির্বাচনের ফল ঘোষণা ও মন্ত্রিসভা গঠন এবং লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের (অক্টোবর, ১৯৩৭) তিন মাসের মধ্যেই মুসলিম লীগের ১৭০টি নতুন শাখা গঠিত হয় এবং এদের ৯০টিই উত্তরপ্রদেশে। নতুন সদস্য সংখ্যা ১ লাখ। এই যে ঢেউ উঠল এর জোয়ারি প্রভাব ক্রমে অন্যান্য প্রদেশেও আছড়ে পড়ে। তবে বঙ্গদেশে সবচেয়ে দেরিতে, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। অবশ্য সূচনা চল্লিশের দশক থেকেই যখন হক সাহেবের রাজনৈতিক শক্তি প্রায় নিঃশেষিত। অথচ এই ফজলুল হকই মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে স্বতন্ত্র ভুবনের প্রস্তাব (লাহোর প্রস্তাব / পাকিস্তান প্রস্তাব) উত্থাপন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বে ব্রিটিশ রাজের ভূমিকা

রাজনীতির নানা মত নানা পথের বিভিন্ন দর্পণে ১৯৩৭-এর নির্বাচনী ফল বিচার-বিশ্লেষণ করার পর নানা বিশ্লেষকের মতামত এক বিন্দুতে এসে দাঁড়ায় যে বাস্তবিকই নির্বাচনের ফলাফল ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক উপকরণে (বীজে) উর্বর। দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাবে এর সদ্ব্যবহার করা যায়নি। পরিণাম নেতিবাচক। বীজের অঙ্কুর দেখা দিলেও ফলেনি ফসল। অথবা ফলেছে বিষাক্ত ফসল।

ওই ব্যর্থতা যেমন বঙ্গের ফজলুল হককে কেন্দ্র করে, কংগ্রেস-প্রজাপার্টিকে ঘিরে তেমনি উত্তরপ্রদেশে লীগ-কংগ্রেসকে ঘিরে। বিষয়টা ইতিপূর্বে ইঙ্গিতাকারে বলা হয়েছে। আধুনিক সময়ের ইতিহাস বিশ্লেষকগণ একমত যে অভাবিত জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল কংগ্রেসের উত্তরপ্রদেশে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনে না যাওয়াটা ছিল আত্মঘাতী ভুল। এর দায় যতটা কংগ্রেস হাইকমান্ডের তার চেয়েও বেশি সে সময়কার কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুর। যশবন্ত সিং, সুনীতিকুমার ঘোষ, ভি. পি. মেনন প্রমুখ এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাদের লেখায়।

এ বিষয়ে পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদ (১৯৩৯-১৯৪৬) তার আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে, 'উত্তর প্রদেশে লীগের সহযোগিতা প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হতো তাহলে এক পর্যায়ে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে মিলেমিশে যেত। কিন্তু জওহরলালের ভূমিকা উত্তর প্রদেশে মুসলিম লীগকে নবজীবন দান করে।... এখান থেকে লীগ নতুন করে সংগঠিত হয়। মি. জিন্না পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেন তার ফলেই শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগ নিশ্চিত হয়।'

ভারত বিভাগ বিষয়ক ঘটনাবলীর অনুপুঙ্খ বিচারে দেখা যায়, যেসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দেশবিভাগের চাকা ঘুরতে শুরু করে তার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কংগ্রেসের, বিশেষ করে জওহরলাল নেহরুর অবদান সবার চেয়ে বেশি। যেমন উত্তর প্রদেশে লীগ-কংগ্রেসের কোয়ালিশন, তেমনি এক দশক পরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রসঙ্গে নেহরুর বিবৃতি ইত্যাদি ঘটনা জিন্নাকে ভারত

www.amarboi.com ~

বিভাগের হাতিয়ার জুগিয়ে দেয়। তেমনি একই ঘটনা ১৯৩৭-এ প্রজাপার্টির সঙ্গে সমঝোতায় না যাওয়ার ক্ষেত্রে নেহরুর নেতিবাচক ভূমিকা।

সব দিক বিবেচনায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯– মাত্র দুটো বছরের রাজনৈতিক ঘটনাবলী দেশ-বিভাগের পক্ষে নিশ্চিত পথ তৈরি করে দেয়। অবশ্য সেই সঙ্গে আরো একাধিক অনুঘটক শক্তিও ছিল সক্রিয়, যেমন পাঞ্জাব ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ের লীগকে শক্তিশালী করার ভূমিকা গ্রহণের কথা যা একাধিক বার উল্লিখিত। উত্তরপ্রদেশের লীগনেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সঙ্গে পরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো সুফল মেলেনি। কারণ ততক্ষণে পাশার দান পড়ে গেছে। সব সম্ভাবনা শেষ।

এ সময়ের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হরিপুরা কংগ্রেসে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) সুভাষ বসুর কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার পর জিন্নার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার অশুভ ফল নিয়ে পত্রালাপ। এমনকি সুভাষের এ চেষ্টা পত্রালাপে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সুভাষ-জিন্নার সাক্ষাৎকারও ঘটে। কিন্তু প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে।

জিন্নার দাবি, মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন; আয়েশা জালালের ভাষ্যে 'একমাত্র মুখপাত্র' এবং কংগ্রেস হচ্ছে হিন্দু প্রতিনিধিত্বের যা মেনে নেয়া কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ ঐ সময়পর্বে বহু সংখ্যক জাতীয়স্তরের মুসলমান নেতা কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। তাদের অনুসারীও রয়েছেন। তাছাড়া আছে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নামের প্রতিষ্ঠান যারা কংগ্রেসের সমর্থক। আসলে জিন্নার চোখে সবচেয়ে আপত্তিকর ব্যক্তিটি ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, যিনি একসময়কার কংগ্রেস সভাপতি। ঘটনা প্রমাণ করে তাকে কিছুতে সহ্য করতে নারাজ ছিলেন জিন্না। রাজনীতিতে এ জাতীয় অসহিষ্ণুতা অচল, গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী। কিন্তু এ ব্যাপারে জিন্না অনড়। তার মতে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার একক অধিকার রাখেন, অন্য কেউ নয়।

মূল কথা হলো মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতার সময় জিন্না এগিয়ে এসেছিলেন সমঝোতা প্রস্তাব নিয়ে, যেমন উত্তরপ্রদেশে যৌথ মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান নিয়ে তখন কংগ্রেস সভাপতি নেহরু ইতিবাচক সাড়া দেননি। এরপর যখন বাংলা ও পাঞ্জাবকে হাতে পেয়ে মুসলিম লীগ শক্তি সঞ্চয় করেছে তখন কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিতে জিন্না পাল্টা অনিচ্ছুক। আর সেজন্যই তাকে উপলক্ষ তৈরি করতে হয়। 'মুসলিম প্রতিনিধিত্ব' সেই উপলক্ষমাত্র। এক কথায় 'বোস ফর্মুলা' কার্যকর করা যায়নি। কারণ এ কালখণ্ড এ কাজের জন্য ছিল অসময়। সময়ের এক ফোঁড় এর আগে যথাসময়ে দিতে পারা যায়নি। দেয়নি কংগ্রেস নেতৃত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

ঘটনার দিক থেকে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক না হলেও সময়ের বিচারে প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনার সূত্রে বলতেই হয় যে, ব্রিটিশ কূটনীতিতে বোধহয় সিদ্ধান্ত নেয়াই ছিল যে ব্রিটেনকে যদি ভারত ছাড়তেই হয় সেক্ষেত্রে দেশটাকে দু-ফালা করে কেটে রেখে আসাই ভালো, যাতে দুই ভূখণ্ড-রাষ্ট্রের হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করবে এবং দুই সম্প্রদায়-প্রধান রাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকবে। বাস্তবে তাই ঘটেছে।

এ কথা বলার কারণ ভারত বিভাগ প্রসঙ্গে শুধু শেষ ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেনের কূটনীতির কথাই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে (মার্চে) লন্ডনে চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সঙ্গে ভারত সচিব জেটল্যান্ডের ভারতের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র ভূখণ্ড গড়ার আলোচনা রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। গণতন্ত্রের লেবাসে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের পক্ষে এ জাতীয় কূটকৌশলী চাল ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গণতান্ত্রিক রীতিনীতির স্বভাববিরুদ্ধ।

তবে সব দোষই যে ওই কংগ্রেস নামক কালো ভেড়াটার, বিশেষ করে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের তাও ঠিক নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কার্যকারণ এবং তার প্রতিকারের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মুসলিম লীগ অবস্থার সুযোগ নিয়েছে মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য। সম্মিলিতভাবে দাঙ্গা প্রতিরোধ তারা দায়িত্ব হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে চায়নি (মুশিরুল হাসান)।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মুসলিম লীগের জন্য শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে এলো। পাঞ্জাব ও বাংলা থেকে (সিকান্দার হায়াত ও ফজলুল হক) যুদ্ধে ইংরেজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। মুসলিম লীগের প্রতি ভারত সরকারের তোষামোদের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। ভাইসরয় লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাতে জিন্নার শর্তসাপেক্ষে সরকারকে সমর্থন : কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলোকে বাতিল করতে হবে। ওরা 'রাজ' সমর্থক নয়। এ সাক্ষাতে জিন্না এই প্রথম ভাইসরয়ের কাছে ভারত বিভাগের অর্থাৎ পাকিস্তানের দাবি উল্লেখ করেন।

যুদ্ধ সত্যই মুসলিম লীগের জন্য সুযোগ-সুবিধার পরিবেশ তৈরি করে আর কংগ্রেসের জন্য সঙ্কট। কারণ কংগ্রেস পরাধীন ভারতে ইংরেজের যুদ্ধ-সমর্থক সঙ্গী হতে রাজি নয়। অথচ যুদ্ধ একটি বাস্তবতা এবং মিত্রপক্ষের এ যুদ্ধ বিশ্ব ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নীতির দিক থেকে ফ্যাসিবাদবিরোধী। সঙ্কট এখানেই। কারণ সমর্থন বা বিরোধিতা দুটোর কোনোটাই তাদের হিসাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলেনি। কিন্তু জিন্না-লীগের সে সমস্যা নেই। জিন্নার একটাই দাবি– লীগের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এবং মানতে হবে মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন।

কথাটা ওই সময়ের জন্য সঠিক ছিল না যদিও তবে প্রায় সঠিক হয়ে ওঠে এক দশক পর। যদি সঠিক হতো তাহলে সব মুসলমান আসনে মুসলিম লীগ জয়ী হতো। কিন্তু তা হয়নি। বরং এ বিষয়ে সুভাষ বসুর বক্তব্য নির্ভুল ছিল যে, লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশের প্রতিনিধি। এ ব্যাপারে জিন্নার জেদ ও একগুঁয়েমি ছিল যুক্তিহীন। শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার কারণে অর্থাৎ খুঁটির জোরে জিন্নার ওই যুক্তিহীন জেদ।

ইংরেজ শাসকের পক্ষে জিন্নাকে তোষামোদের কারণ একটাই। মুসলিম লীগ কখনই, কোনো সময়েই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে রাজপথে নামেনি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগের, আত্মদানের প্রমাণ রাখেনি। এর মূল কারণ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বরাবরই নবাব-নাইট ও ভূস্বামী-প্রধান। জিন্না ব্যতিক্রম, আইনজ্ঞ পেশাজীবী হিসেবে। মাহমুদাবাদের নবাব থেকে নবাবজাদা লিয়াকত আলীদের পরিচয় সবার জানা। প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃত্বে ছিলেন হাড়মজ্জায় ইংরেজ তোষক নবাব সলিমুল্লাহ ও আগা খানের মতো লোক যারা দেশকে স্বদেশ জ্ঞান করেননি। জিন্নাও প্রকৃতঅর্থে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না। 'রাজ' বিরোধী সংগ্রামী হিসেবে তিনি কখনো জেলে গেছেন? মনে হয় না।

সেই মুসলিম লীগকে ইংরেজ শাসক তোয়াজ করবে না কেন? অবশ্য কংগ্রেসেও ভূস্বামীদের উপস্থিতি ছিল। তবে সময়ের এ পর্যায়ে তার শীর্ষ নেতৃত্ব ছিল বুদ্ধিজীবী-পেশাজীবীপ্রধান। গান্ধি-নেহরু-আজাদ-প্যাটেল, আনসারি-চিত্তরঞ্জন-সুভাষ প্রমুখ নেতা কেউ জমিদার বা ভূস্বামী ছিলেন না।

কংগ্রেস শুরুতে 'আবেদন-নিবেদনে'র নীতিতে অভ্যস্ত থাকলেও কালক্রমে হয়ে ওঠে সরকারবিরোধী। তার একাংশে বামপন্থা সক্রিয় হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও প্রবল ইংরেজবিরোধী, বিশেষ করে সুভাষ প্রমুখের স্বাধীনতা দাবির উচ্চারণে। তাতে গান্ধি যতই রাশ টেনে ধরুন না কেন। এ বিষয়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা হসরত মোহানীর স্বাধীনতা-প্রস্তাবের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লীগ-কংগ্রেসের তুলনামূলক মূল্যায়নে ইতিহাসের এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন ও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড) নিয়ে হুডসন প্রমুখ ভারত-বিষয়ক লেখকগণ যতই সোচ্চার হোন না কেন এ সংস্কার আইন একদিকে ভারতের সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান নষ্ট করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্ত বড় ভূমিকা নিয়ে ছিল। অন্যদিকে শাসনব্যবস্থা ওদের ভাষায় 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন' রূপে তুলে ধরা হলেও এটা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির স্বায়ত্তশাসন ছিল না। থাকার কথাও নয়।

ছিল সরকারের তথা গভর্নরের অধীনে এক কার্যনির্বাহী পরিষদ, যদিও করদাতা মানুষের ভোটে নির্বাচিত। কারণ এ ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গভর্নর ও গভর্নর-জেনারেলের (ভাইসরয়ের) ছিল বিপুল ক্ষমতা। তারা ইচ্ছা করলে মন্ত্রিসভা বাতিল করতে পারতেন, আইনসভায় গৃহীত কোনো বিল পছন্দ না হলে 'ভেটো' দিয়ে তা খারিজ করতে পারতেন। তবু হডসনের মতো কথিত গণতন্ত্রী ইতিহাস-লেখককের ভাষায় এটা ছিল 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন'।

হডসন লিখেছেন, গভর্নরগণ সাধারণত এ ধরনের 'ভেটো' প্রয়োগ করতেন না। তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রাথমিক পর্যায়ে শাসনকর্তাগণ মাত্র ৫টি ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থবিরোধী বিলে 'ভেটো' দিয়ে তা খারিজ করেছেন। বিহার ও উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পক্ষে কয়েকজন বন্দির মুক্তি-নির্দেশ কি এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে তাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পতন ঘটতো? অথচ ওই দুই প্রদেশের গভর্নর ওই বিলে সই করেননি এবং যথারীতি মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। স্মর্তব্য যে, বন্দিমুক্তি দাবির প্রশ্নে কংগ্রেসের অনড় অবস্থানের কারণেই ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক তাদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কারণ তার জানা ছিল যে এসব দাবি বাংলার গভর্নর মেনে নেবেন না।

আর এর পরিণতি হবে নবগঠিত মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। কারণ ওই সময়ের সরকারি নীতির চরিত্র সবারই জানা যে, কংগ্রেস তখন আর শাসকের চোখে পছন্দসই পার্টি নয়। যদিও এ পার্টি ১৮৮৫ সালে তাদেরই উদ্যোগে গড়া যেমন গড়া নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসেবে। এর পেছনে ছিল তাদের অনুসৃত বহু পুরনো নীতি– 'ভাগ করা ও শাসন করা ('ডিভাইড অ্যান্ড রুল')। আমাদের ভাষায় ওই নীতি হচ্ছে দুই দলকে, দুই সম্প্রদায়কে লড়িয়ে দাও এবং আরামসে ভারত শাসন কর। এসব কারণে হক চেয়েছিলেন বন্দিমুক্তির বিষয়টি ধীরেসুস্থে ফয়সালা করতে। কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজি হয়নি।

যুক্তিসঙ্গতভাবেই এ কথা মানতে হয় যে ভারতীয় মুসলিম লীগ কখনই জোরালোভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বিশেষভাবে 'ব্রিটিশ রাজ'বিরোধী নীতি প্রকাশ্যে গ্রহণ করেনি। দেশের স্বাধীনতার দাবির বদলে মুসলমান অধিকার নিয়েই লীগ এবং জিন্না বরাবর সোচ্চার। কারণ জিন্নার ধারণা ছিল, স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের একাট্টা শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেটা হিন্দুশাসনের নামান্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বা পরে হরিপুরা অধিবেশনে উচ্চারিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে মুসলমান রাজনীতির সহযোগিতার আহ্বান জিন্নার মনে দাগ কাটেনি এবং লীগ বরাবরই ইংরেজ শাসন উৎখাতের আহ্বান উপেক্ষা করেছে। দেশের রাজনৈতিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ না হলে যে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয় এ কথা একজন সাধারণ মানুষও বোঝে, জিন্নার না বোঝার কথা নয়। কিন্তু একসময় বুঝেও পরে তিনি তা বুঝতে চাননি। তার শত্রু জাতীয় কংগ্রেস, ইংরেজ শাসক নয়।

পরিস্থিতির জটিলতা এবং শাসকের পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট বক্তব্যের অভাবে কংগ্রেস একতরফাভাবে শাসক-সহযোগিতা ও যুদ্ধে সহযোগিতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাদের কথা, সমর্থনের আগে স্বাধীনতার ঘোষণা চাই। তাই অক্টোবর, ১৯৩৯-এ বড়লাটের নীতিগত ঘোষণার সমালোচনা করে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত : উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষে সহযোগিতা নয়। সে ক্ষেত্রে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পক্ষে পদত্যাগ বাঞ্ছনীয়। এখন প্রশ্ন : কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্ত কি সঠিক ছিল? বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক যেমন তখন তেমনি পরবর্তীকালে। সংখ্যাগুরু অভিমত, সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লীগ, কংগ্রেস ও 'রাজ'

বিশ্বযুদ্ধ পরোক্ষে হলেও ভারতেরও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ওলটপালট করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হিটলারি দাপটে কোণঠাসা হলেও ভারতে ইংরেজ শাসক 'যুদ্ধংদেহী' অবস্থায়। ভারতীয় সাহায্য তার বড় দরকার। পাঞ্জাব ও বাংলা সরকার এ বিষয়ে দু-পা এগিয়ে। জিন্না একইভাবে এক হাতে দাবিনামা নিয়ে অন্য হাত সহায়তার উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে রেখেছেন। কিন্তু কংগ্রেস উল্টোপথে।

এই অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দেনদরবার শেষে ভাইসরয় লিনলিথগো তাদের রাজকীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে জানালেন। তার স্পষ্ট কথা দেশ এখন যুদ্ধাবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশরাজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সর্বাত্মক সাহায্য কামনা করে। এ উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সর্বদলীয় পরামর্শসভা গঠনে আগ্রহী। তারা যুদ্ধশেষে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'এর মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মতামত ও স্বার্থ বিবেচনা করে ১৯৩৫ সালের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' পরিমার্জনায়ও আগ্রহী।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ আহ্বান প্রধানত কংগ্রেস দলের উদ্দেশে। কারণ দ্বিতীয় প্রধান দল লীগ তো সরকারের পক্ষেই দাঁড়ানো। কংগ্রেস অবশ্য এ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাদের মূল দাবি স্বাধীনতার কথাই উল্লেখ করে। স্বভাবতই ভারত সরকার ও কংগ্রেস দল এ অবস্থায় পরস্পরবিরোধী মুখোমুখি অবস্থানে। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ পৃথক সত্তার বিষয়টি সঙ্গতকারণে মানতে নারাজ। ভারতের সার্বভৌমত্ব জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

ভবিষ্যৎ সংঘাতের আশঙ্কা সামনে রেখে কংগ্রেস নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ, যদিও কেউ কেউ তাতে বড় একটা ইচ্ছুক ছিলেন না। মন্ত্রিত্বের গদি ছেড়ে আসা রাজনীতিকদের পক্ষে কষ্টকর। তবু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত না মানলে বিপদ। এক্ষেত্রে ভারতীয় ইংরেজ সরকারের পক্ষেও সর্বসম্মত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো কঠিন ছিল। এর কারণ দুই প্রধান দলের পরস্পরবিরোধী অনড় অবস্থান।

এর পেছনে বলা বাহুল্য রাজনৈতিক স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ কাজ করেছে এবং তা লীগ-কংগ্রেস উভয় তরফেই। কংগ্রেস ঘোষিত সর্বভারতীয় একক-জাতীয়তার ধারণা সঠিক ছিল না। কারণ বাস্তবে ভারতীয় উপমহাদেশ বহুজাতি, বহুভাষা ও বহু ধর্মবিশ্বাসী মানুষের দেশ। সেক্ষেত্রে একক জাতীয়তার ধারণা চাপিয়ে দেয়া অসঙ্গত। বাংলা, তামিল, তেলেগুভাষীরা তা মানবে কেন?

অন্যদিকে লীগের ধুয়া সর্বভারতীয় মুসলিম জাতিত্ব নিয়ে যা একইভাবে যুক্তিসঙ্গত ছিল না। ধর্ম ও জাতি কখনো এক নয়– সমাজবিজ্ঞানসম্মত নয়। তাদেরও লক্ষ্য ধর্মীয় উন্মাদনার সাহায্য নিয়ে ব্যক্তির অহমবোধ ও দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করা।

এক্ষেত্রে এটাও সত্য যে দুই দলের পক্ষেই নেপথ্যে সরব ছিল হিন্দু ও মুসলিম মুৎসুদ্দি পুঁজির স্বার্থ। গান্ধির পক্ষে বিড়লা, ঠাকুরদাস প্রমুখ হিন্দু পুঁজিপতি এবং জিন্নার পেছনে ইস্পাহানি, আদমজী, দাউদ প্রমুখ পুঁজিপতি। এ দুই সাম্প্রদায়িক পুঁজিবাদের ইচ্ছা দুই স্বতন্ত্র ভুবনে প্রতিযোগিতাহীন রাজত্ব পরিচালনা (সুনীতিকুমার ঘোষ)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক নেতাদের লক্ষ্য ছিল প্রদেশকেন্দ্রিক ক্ষমতা অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। যেমন পাঞ্জাবপ্রেমী সিকান্দার হায়াত খান ও বাংলাপ্রেমী ফজলুল হক। তাদের একাধিক বক্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায় যে এ দুজনই জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাদের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকে। এটা বস্তুগত বা জাগতিক দিক। তাত্ত্বিক বা আদর্শগত দিকের কথা হলো প্রদেশের স্বশাসননির্ভর অখণ্ডতা। ইতিহাসবিদ কেউ কেউ লিখেছেন যে, জিন্না নিজেও দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা, ব্যক্তিগত অহমবোধ ও জেদের বশে তিনি ওই অসঙ্গত তত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়াররূপে গ্রহণ করেন। আমি তাদের সঙ্গে একমত নই।

ওই সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব জিন্না যে কারণেই গ্রহণ করে থাকুন না কেন বিষয়টা পরে তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের অংশ হয়ে ওঠে। সাহেবী মানসিকতার জিন্নার পরবর্তী বেশভূষা অর্থাৎ টুপি-শেরওয়ানি গ্রহণই শুধু নয়, তার বক্তব্য-বিবৃতিতে তীব্র সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ তেমন ধারণাই দেয়। এমনকি পাকিস্তান অর্জনের পর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় তার সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটানো বক্তৃতা তার ভেতরের বিশ্বাসটারই প্রকাশ ঘটায়। পুরো বক্তৃতাটি পড়লে তা বোঝা যায়। তখন পাকিস্তান নিশ্চিত এক রাষ্ট্রিক বাস্তবতা। তখন কি অতীত ইসলাম ও মক্কা-মদিনার সূত্র ধরে ইসলামী চেতনার পক্ষে উদ্দীপক বক্তৃতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো প্রয়োজন ছিল? ছিল। কারণ তিনি বুঝে ছিলেন যে বাঙালিরা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার প্রতি আসক্ত যা পাকিস্তান চেতনার বিরোধী। প্রথম পর্বে তিনি মুসলিম ভুবন প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মের সাহায্য নেন। দ্বিতীয় পর্বে বাংলা-বাঙালির অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ধর্মভিত্তিক বক্তৃতা দেন।

দুই

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের কালক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। প্রথমত মার্চ মাসে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সরকারবিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী অবস্থান গ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের রাঙামুলো প্রত্যাখ্যান করে গণভোটে গণপরিষদ গঠন, সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষণ, দেশি রাজ্যগুলোকে কেন্দ্রীয় সংবিধানের আওতায় আনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রবিশিষ্ট স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা প্রকাশ পায় কংগ্রেসের তখনকার বক্তব্যে।

স্বভাবতই বিরূপ প্রতিক্রিয়া লীগ ও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। শক্তিশালী কেন্দ্র যেমন কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য তেমনি লীগের লক্ষ্য বিকেন্দ্রীকরণের নীতি এবং স্বতন্ত্র মুসলমান ভূখণ্ড। প্রায় একই সময়ে (মার্চে) মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের পশ্চিমে ও পূর্বে মুসলমানপ্রধান অঞ্চল নিয়ে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। বাংলার 'শের' ফজলুল হক লাহোর মঞ্চে দাঁড়িয়ে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তখন তিনি পুরোপুরি মুসলিম লীগ নেতা। তবে তিনি প্রস্তাব রচয়িতা নন।

প্রস্তাব, বিশেষজ্ঞদের মতে যত অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে হোক এর নিহিত তাৎপর্য ছিল এক রূঢ় রাজনৈতিক সত্য। জিন্না কিছুতেই শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গণপরিষদ অর্থাৎ কংগ্রেস তথা হিন্দুপ্রধান শাসন মেনে নেবেন না। সে জন্য চাই স্বতন্ত্র স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারে যতই অযৌক্তিক বা উদ্ভট হোক। এভাবে যুদ্ধ সামনে রেখে লীগ-কংগ্রেস অনেকটা রাজনৈতিক যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৪০-এর মার্চে ভারত-ইতিহাসের এক অমোঘ কালক্ষণে।

সত্য বলতে কি এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে দুপক্ষের কেউ সদিচ্ছার পরিচয় দেয়নি। যারা দিয়েছেন তারা রাজনৈতিক শক্তির বিচারে গৌণ। লাহোর প্রস্তাব যা পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান প্রস্তাব আকস্মিক হলেও এর পূর্বসূত্র রয়েছে রহমত আলী, কবি ইকবাল এবং একাধিক ব্যক্তির চিন্তায় ও কাজে এবং লীগ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্বে। আর দেশ বিভাগের পেছনে যে রাজশক্তির সুস্পষ্ট মদত ছিল তা ইতিপূর্বে একাধিক ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে। পরেও তাদের কর্মকাণ্ডে স্পষ্ট হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান প্রস্তাবের অস্পষ্টতা কাটাতে অবশ্য পরবর্তী সময়ে বিষয়টা স্পষ্ট করা হয় এভাবে যে, দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে এবং অন্যটি পূর্বাঞ্চলে বঙ্গদেশ ও আসাম নিয়ে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে। এ বক্তব্য হডসনের, ১৯৪১ সালের একটি সংবাদপত্রভিত্তিক বিবৃতির ভিত্তিতে। তবে আমরা যতদূর জানি, পুরো বঙ্গদেশই প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তান পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল যা লীগেরই নীতিগত বক্তব্যের পরিপন্থী। অর্থাৎ হিন্দুপ্রধান পশ্চিবঙ্গ কেন দ্বিজাতিতত্ত্বের আলোকে মুসলিম-ভুবন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে? যে যুক্তিতে পাকিস্তান দাবি সে যুক্তিতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার পশ্চিমবঙ্গ দাবি। মাউন্টব্যাটেন তা মানতে বাধ্য হন।

এরপর রাজনৈতিক অঙ্গনে মহাতোলপাড়। যে যার মতো করে ব্যাখ্যা ও নিত্যনতুন খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করতে থাকেন বিবৃতির মাধ্যমে। বিস্ময়কর মনে হলেও সত্য যে পণ্ডিত নেহরু পাকিস্তান প্রস্তাবকে নিছক 'বোকামি' বলে উড়িয়ে দিলেও গান্ধি লেখেন 'মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ভারতের বাকি অংশের মতোই রয়েছে। আমরা এখন যৌথ পরিবার। যে কোনো সদস্য পৃথক হয়ে যাওয়ার দাবি করতেই পারে' (গান্ধি রচনাবলী, উদ্ধৃতি ঘোষ)।

এ বক্তব্য কি তার একান্ত ঘনিষ্ঠজন বিড়লার (ঘনশ্যাম দাস বিড়লা) প্রভাবে? সুনীতিকুমারের লেখা এবং বিড়লার কথাবার্তাতে তা বোঝা যায়। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা যে গান্ধি ও কংগ্রেসের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ এবং গান্ধির ওপর তার প্রভাব কতটা গভীর ছিল সমসাময়িক তথ্যাদি তা প্রমাণ করে। এমনকি ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত জিডি বিড়লার স্মৃতিচারণমূলক বই 'ইন দ্য শ্যাডো অব দ্য মহাত্মা'র পাতায় পাতায় তা পরিস্ফুট। বৃথা অভিযোগ নয় যে গান্ধির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুৎসুদ্দি পুঁজির গভীর প্রভাব। প্রভাব ওই স্বার্থের এবং এর সঙ্গে দেশবিভাগের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

গান্ধি আসলে এ সময় কোনো বিষয়েই মনস্থির করতে পারেননি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কী ভারত সরকার, কী মুসলিম লীগ কারো সঙ্গে একমত হতে পারছে না। তারা স্বাধীনতার দাবিতে অনড়। আসলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ (জিন্না) দুপক্ষই ব্রিটিশসিংহ কাদায় পড়ার কারণে চাপ দিয়ে নিজ নিজ রাজনৈতিক ফায়দা তুলে নিতে চাইছে। তাতে করে ত্রিপক্ষীয় সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে চল্লিশের দশকের প্রথম সাতটি বছর ছিল দুর্যোগময়। এর বড় পরিপ্রেক্ষিত বিশ্বযুদ্ধ ও লীগ-কংগ্রেসের সংঘাতে তৈরি সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

ইউরোপীয় মহাকাশে একইভাবে অবশ্য ভিন্ন চরিত্রে সংঘাতের ঘনঘটা। নিঃশব্দ প্রস্তুতির পর মহাপরাক্রমী জার্মান নাৎসিবাহিনীর সশস্ত্র অগ্রযাত্রা। এপ্রিল ১৯৪০ থেকে জার্মান বাহিনীর অভিযানে এক এক করে ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যান্ড, বেলজিয়াম হিটলারের হাতের মুঠোয়। জুন মাসে ফ্রান্সের পতন ইউরোপের জন্য এক বিশাল আঘাত। গোটা ইউরোপ যখন নাৎসি আঘাতে বিপন্ন। কাঁদছে গণতন্ত্রী বিশ্ব পারীর পতনে, এমনকি শান্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে আহ্বান জানান হিটলারি আঘাত ঠেকাতে মাঠে নামতে। ঠিক সে সময় গান্ধি তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়েও হিটলারি বিজয় অভিযানের শক্তিমত্তায় স্বস্তিবাণী উচ্চারণ করেন। তার ধারণা জন্মে এ যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয় অনিবার্য (সুনীতি ঘোষ)।

সে সময় রাজনীতিমনস্ক অধিকাংশ বঙ্গবাসীর একই ধারণা। বলতে সংকোচ বোধ করছি না। আমার মতো কমবয়সী রাজনীতিমনস্ক ছাত্রেরও অনুভূতি ছিল ব্রিটিশবিরোধী। কারণ একটাই। প্রায় দুশ বছর ধরে ওই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন আমদের সমৃদ্ধ দেশ শাসন-শোষণ করে তাকে নিরক্ত করে ফেলেছে। তার পক্ষে কি দাঁড়ানো যায়। তখন দেখা গেছে আমাদের মহকুমা শহরে শিক্ষিত শ্রেণীর প্রায় সবাই (হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত) কংগ্রেসী ও স্বল্পসংখ্যক প্রজাপার্টির মুসলমান সদস্য) হিটলারি বিজয় বার্তায় খুশি। তারা দেখতে চান ইংরেজের পতন।

খবরের কাগজ এলে সবাই তাতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। যুদ্ধের প্রতিটি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া, নাৎসিবাহিনীর অগ্রগতিতে মহা আনন্দ। এমন মন্তব্যও শোনা যায় 'এবার বোঝ মজা'। কাউকে দেখা যায় বিশ্বমানচিত্র পাটিতে বিছিয়ে জার্মান বাহিনীর অগ্রযাত্রা পিন দিয়ে চিহ্নিত করে রাখতে। এ ধরনের মানসিকতা রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক ছিল না। কিন্তু দখলদার অত্যাচারী শক্তির পরাজয়ই ছিল স্বাভাবিক ভাবে সবার কাম্য। যুদ্ধের পুরো সময়টা এভাবেই চলেছে।

কেউ ভেবে দেখেনি যে ব্রিটেনের পরাজয়ের পর বিজয়ী কোনো ফ্যাসিস্ট শক্তি ভারত দখল করে নিলে দেশের মানুষের কি অবস্থার উন্নতি ঘটত? চীনে জাপানি ফ্যাসিস্টদের নিষ্ঠুরতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। একই ঘটনা আবিসিনিয়ায় মুসোলিনির ইতালীয় ফ্যাসিস্ট বাহিনীর ক্ষেত্রে এবং স্পেনে স্বদেশী ফ্যাসিস্টদের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা তুলনারহিত।

তবু আমাদের গোটা দেশে তখন ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ছিল প্রবল। নেহরুর মতো আধা-সমাজবাদীর বক্তব্যও বিচার-ব্যাখ্যার বিষয় হয়ে ওঠে যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বলেন, 'ভারত নাৎসি বিজয়ের বিপক্ষে, কিন্তু তাই বলে নড়বড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উদ্ধার করতে ভারতের পক্ষে এগিয়ে যাওয়াও ঠিক নয়।' তাহলে এ সঙ্কটে সঠিক করণীয় কী হতে পারে? কী করবে ভারতবাসী, কোন পথ ধরে হাঁটবে? সত্যই তখন মহাসঙ্কটে ভারতবাসী।

অধিকাংশ বঙ্গবাসীর তো বটেই, সম্ভবত ভারতবাসীরও বোধহয় এ বিষয়ে ভিন্ন ধারণা ছিল না। নেহরুর বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট। গান্ধির কথা আগেই বলেছি। তবে মুসলিম লীগ ভিন্ন পথে হেঁটেছে, কিন্তু সাধারণ মুসলমান সমাজ ওই শহরে যতটা দেখেছি শাসক ইংরেজের পক্ষে ছিল না। কট্টর দলীয় অনুসারীদের কথা বাদ দিলে সাধারণ মানুষ কী হিন্দু কী মুসলমান তখন পরাধীনতাকে আপদ বলেই মনে করেছে।

কংগ্রেস নেতাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে ব্রিটিশসিংহ হিটলারের দাপটে গাড্ডায় পড়েছে, এ সুযোগে দরকষাকষি করে যদি দেশের স্বাধীনতা আদায় করে নেয়া যায়। কিন্তু বিষয়টা এত সহজ, সরল ছিল না। ব্রিটিশ বেনিয়া বুদ্ধি ও চাতুর্যের সঙ্গে বাঙালি ও ভারতীয় বুদ্ধি কখনো এঁটে উঠতে পারেনি। এবারো পারার কথা নয়। কংগ্রেস-মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পেছনে এই ধারণাই কাজ করেছে যে ব্রিটেন হারতে বসেছে। কিন্তু তাতে কোনো ইতিবাচক ফল মেলেনি। বরং সুবিধা পেয়েছে মুসলিম লীগ, কিছুটা ভারতীয় সরকার। কারো ধারণা মন্ত্রিসভার পদত্যাগ সঠিক সিদ্ধান্ত নয় যখন সুভাষের নীতিমাফিক সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করা যায়নি।

তবু ভাইসরয়ের চেষ্টা 'যুদ্ধ পরামর্শ কাউন্সিল' গঠন করে সব রাজনৈতিক দলের সমর্থন আদায় (আগস্ট প্রস্তাব), অবশ্য মুসলিম লীগকে বিশেষ ক্ষমতা উপহার দিয়ে। কংগ্রেসের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব বিশেষ করে গান্ধির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তার ওপর অধিকাংশ হিন্দু-ভারতের ছিল প্রবল আস্থা। কিন্তু এ সময়ে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কোনো প্রকাশ দেখা যায়নি। বরং প্রতিটি চালে ভুল, অথবা পিছু হটা। প্রকৃতপক্ষে বিপর্যস্ত ব্রিটিশ সিংহকে বাগে আনতে পরাধীন ভারতের পক্ষে দরকার ছিল সর্বাত্মক ঐক্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অনৈক্যই হয়ে ওঠে বড় বাধা। বিশেষ করে প্রধান দুই দল লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে। সে সুযোগ নিয়েছে ভারত সরকার। আগস্ট প্রস্তাব কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করলেও জিন্না তাতে সাদর সমর্থন জানিয়েছেন।

এমন এক অনৈক্যের পরিবেশে গান্ধির নির্দেশে কংগ্রেসের দলীয় ব্যক্তিভিত্তিক আইন অমান্য শুরু (অক্টোবর, ১৯৪০)। দলে দলে গান্ধিপন্থায় বিশ্বাসীদের সত্যাগ্রহ ও গ্রেফতারবরণ। এতে তেমন কোনো জনবিক্ষোভের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ দেখা যায়নি। বিভিন্ন ঘটনায় জিন্না ইতিমধ্যে দলে তার এমনই একনায়কী অবস্থান নিশ্চিত করে ফেলেছেন যে তার কথা বা সিদ্ধান্তের বাইরে আর কিছু নেই। তা সিদ্ধান্ত সঠিক বেঠিক যাই হোক। দলের সর্বস্তরে এ প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে।

ব্রিটিশরাজ বাইরে যত ঠাট দেখাক না কেন ইউরোপীয় পরিস্থিতির কারণে তাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। লন্ডনের নীল আকাশে দূর থেকে বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে আসছে। স্বদেশ রক্ষা, উপনিবেশ রক্ষা নিয়ে ব্রিটিশরাজের হিমশিম অবস্থা। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করতে ভাইসরয় নতুন করে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল' গঠনের সিদ্ধান্ত নেন– সদস্য সংখ্যা তিরিশ। এটা নিছকই পরামর্শক সভা (ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল)।

ভাইসরয়ের আমন্ত্রণে বাংলা, পাঞ্জাব ও আসামের তিন মুখ্যমন্ত্রী ওই পরামর্শক সভায় যোগ দেন। এবার জিন্নার পাল্টি খাওয়া। তার ইচ্ছায় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তাদের তাৎক্ষণিক পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। বলা যায় তাদের পদত্যাগে বাধ্য করে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন তবে জিন্নার 'উদ্ধত ও একনায়কী' আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে। এবং প্রতিবাদস্বরূপ তিনি লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন। এ দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন জিন্না। হককে লীগ থেকে বহিষ্কার করতে তাই বেশি বেগ পেতে হয়নি। দুর্বোধ্য কারণে পাঞ্জাবকেশরী সিকান্দার হায়াতের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। অন্য দুই লীগ সদস্য স্যার সুলতান আহমদ ও বেগম শাহনেয়াজের মতো জিন্নাকে অগ্রাহ্য করার দৃঢ়তা সিকান্দার দেখাতে পারেননি। অথচ সেটা তার কাছেই প্রত্যাশিত ছিল যেমন ছিল ফজলুল হকের কাছে। মাস কয়েক আগে তিনি পাঞ্জাব বিধানসভায় এক বক্তৃতায় পঞ্চনদ বিধৌত স্বশাসিত পাঞ্জাবকে নিয়ে যে আবেগঘন জাত্যভিমানের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তার প্রতিফলন দেখা যায়নি পাঞ্জাবি শেরের বিনম্র দীনতায়।

যে পাকিস্তানের ধারণা সিকান্দারের ছিল তা মেলেনি পাঞ্জাবের ভাগ্যে, মেলেনি তার উত্তরসূরি খিজির হায়াত খানের জিন্নাবিরোধী দৃঢ়তা সত্ত্বেও। হডসন হয়তো ঠিকই বলেছেন, জিন্নার হঠকারিতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে সিকান্দারের জন্য ভালোই হতো। কিংবা কে জানে ফজলুল হকের পরিণতিই হয়তো বরণ করতে হতো সিকান্দারকে। দুর্বুদ্ধি অনেক সময় সর্বনাশ ডেকে আনে, আবার কদাচিৎ অভীষ্ট পাইয়ে দেয়– জিন্না শেষোক্ত বিচারে ভাগ্যবান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কংগ্রেসে নীতিগত অন্তর্বিরোধ : যথারীতি গান্ধি-প্রাধান্য

তিরিশের দশকের শেষ দিকে বঙ্গীয় মুসলিম রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনার যে ইতিবাচক সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটে তার মধ্যমণি হতে পারতেন এ কে ফজলুল হক। কিন্তু নানা প্রতিকূল ঘটনার প্রভাব এবং হক সাহেবেরও কিছু ভুল পদক্ষেপ সে সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট করে দেয়। কথাটা প্রসঙ্গেক্রমে ইতিপূর্বে একাধিক সূত্রে উল্লিখিত। তবু স্মরণ করার মতো, ওই নির্বাচন উপলক্ষে প্রজাপার্টির লাঙল মার্কা বাক্সে ভোট দেয়ার জন্য নজরুলের কবিতা সামান্য পালটে নিয়ে বঙ্গবাসী চাষিদের কষে লাঙল ধরে জেগে ওঠার গান সত্যই ছিল নবজাগরণের সম্ভাবনাময়। এ সূত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি হক সাহেবের রাজনৈতিক পত্রিকা 'নবযুগ' ও তার সম্পাদক কবি নজরুলের উদ্দীপনার কথা। আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের আসনে প্রজাপার্টির প্রার্থী সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ বিশেষ কার্যকারণে পরাজিত হলেও ওই অজপাড়াগাঁয় 'লাঙল' সাড়া ফেলেছিল।

সেই বাঙালি মানসিকতার হক সাহেবকে কি না অবস্থা-বিপাকে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নামতে হলো? অবশ্য এর জন্য কংগ্রেসের দায়ও কম ছিল না। একটা কথা মানতেই হয় যে, কংগ্রেসের তাত্ত্বিক বক্তব্যে ও কাজে যথেষ্ট ফারাক দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে ক্রান্তিকালে।

কথাটা পরোক্ষে স্বীকার করেছেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার আত্মজৈবনিক গ্রন্থে। ১৯৪০ সালের মার্চে রামগড়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তার ভাষণের মর্মার্থ ছিল খুবই আদর্শবাদী ধারার। যেমন সেখানে বলা হয়, 'ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতা ও সমঝোতা সৃষ্টি করতে না পারলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যাবে না। সংবিধান অবশ্যই... জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে রচিত হবে।'

কিন্তু জাতীয় ঐক্য কংগ্রেস তৈরি করতে পারেনি। কখনো নিজের ভুল পদক্ষেপে, কখনো জিন্নার গোঁয়ার্তুমিতে। এসব নিয়ে কংগ্রেস শিবিরেও যে মতভেদ ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায় আজাদের স্বীকারোক্তিতে। মতভেদ

আদর্শগত বিচারে ডান-বামে, কখনো গান্ধি-নেহরু, গান্ধি-চিত্তরঞ্জন, কখনো গান্ধি-সুভাষের মধ্যে। মুসলিম লীগে জিন্নার মতো গান্ধিও ছিলেন কংগ্রেসে অঘোষিত একনায়ক যদিও একটু ভিন্নধারায়– উদ্ধত, জেদি ভঙ্গিতে নয় নম্র কিন্তু নিজস্ব কায়দার দৃঢ়তায়। ফলাফল একই।

অহিংসা নিয়ে গান্ধির 'অবসেশন' অনেক সময় সমস্যা তৈরি করেছে। যেমন ১৯৪০ সালে বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সমর্থন জোগানো নিয়ে গান্ধির অপরিবর্তনীয় মতামত। যুদ্ধটা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে হওয়ার কারণে ব্রিটেনকে নিয়ে ভারতের যে প্রগাঢ় সমস্যা সে সমস্যা নিয়ে কংগ্রেসের বিপর্যস্ত অবস্থায়– তার সমাধানে মাওলানা আজাদের বক্তব্যে ছিল বাস্তবধর্মী দূরদর্শিতা। যেমন, তার ভাষায়, 'আমার মতে স্বাধীনতার জন্য অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাইরের সংগ্রাম মূলত আলাদা।' অর্থাৎ আলাদাভাবে দুটো সংগ্রামে অংশ নেয়া।

বাস্তবিক এ দুটো সংগ্রাম উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আলাদা ধরনের ছিল। দুটোই দুভাবে চলতে পারে। কিন্তু তখন আমাদের মতো তরুণদের ও সাধারণ কংগ্রেস সমর্থকদের ঝোঁক ছিল ব্রিটিশবিরোধী সর্বাত্মক লড়াইয়ের। যে নীতির প্রয়োগ চলেছে বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেও। যেমন নেহরুর রোমান্টিক আবেগপূর্ণ বক্তব্যের উদ্দীপনায়, তেমনই সুভাষের তেজোদৃপ্ত স্বাধীনতার আহ্বানে। বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতায় কর্মসূচি নির্ধারণের চেষ্টা সে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ছিল না। ছিল না গান্ধির প্রভাবে। এমনকি আজাদও অহিংসপন্থার অনুসারী হন, সম্ভবত সহকর্মীদের ঐকমত্যের কারণে বা চাপে।

মনে পড়ছে মহকুমা শহরে আমাদের ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে গান্ধি-কংগ্রেস ও সুভাষপন্থার বিভাজনের কথা। মৃণাল খুব আবেগভরে বক্তৃতার ঢঙে বলেছিল– 'মাওলানা আজাদও বাপুজির সঙ্গে একমত।' বাপুজি মানে গান্ধিজী। বাঙালি সন্তানের কী অসীম ভক্তি গান্ধির প্রতি! আজাদের চেষ্টা ছিলো দলের সঙ্গে মানিয়ে চলা। যখন পারেন নি, নীরব থেকেছেন। তবু ভিন্নমতের প্রকাশ ঘটেছে কোনো কোনো ক্রান্তিক্ষণে। আজাদের ভিন্নমত কী নেহরুর, কী গান্ধির বিপরীতে হালে পানি পায়নি। এসব কারণেই বুঝি তার আত্মজীবনীর অংশবিশেষ দীর্ঘকাল প্রকাশের অপেক্ষায় অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি থাকে। সেটা প্রধানত নেহরুর কিছু ভুল রাজনৈতিক পদক্ষেপের বিপরীতে ভিন্নমতের কারণে।

তবে আত্মজীবনীতে প্রকাশ্যে আজাদ লিখেছেন, 'আগে আমাদের (গান্ধি ও আজাদ—লেখক) মধ্যে শুধু নীতিগত প্রশ্নেই মতানৈক্য ছিল, কিন্তু এখন দেখা গেল, ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ব্যাপারেও তার আর আমার মধ্যে মতবিরোধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টি হয়েছে।' এ উপলক্ষে 'টাইমস' ও 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকার মন্তব্য : 'গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের মতবৈষম্য ঘটেছে' (ভারত স্বাধীন হলো)। বিষয়টা যুদ্ধবিষয়ক। গান্ধির বিশ্বাস 'যুদ্ধপরিস্থিতি এমন ঘোরালো যে ভারতের সহযোগিতা পেতে তাকে স্বাধীনতা দেয়া ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের অন্য কোনো পথ নেই'। কিন্তু গান্ধির এ ধারণা যে সঠিক ছিল না পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলী তার প্রমাণ।

বাস্তবিক বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি সমস্যাসঙ্কুল হলেও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখনো সমঝোতামূলক স্বাধীনতার পক্ষে খুব একটা অনুকূল ছিল না। এর প্রধান কারণ ভারতবর্ষের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে ছিল প্রবল রাজনৈতিক বিরূপতা এবং সে সুবাদে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের অভাব। এ বাস্তবতা গান্ধি-কংগ্রেস পুরোপুরি বুঝতে না পারলে বা বুঝতে না চাইলেও তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ অনুধাবন করেছিলেন বলে মনে হয়। তাই তার বিশ্বাস জন্মে যে ইংরেজ ওই মুহূর্তে ভারতকে বড়জোর কিছু রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা কোনোমতেই নয়। অন্তত বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে তো নয়ই।

এ কথার প্রমাণ মেলে যখন দেখা যায় দুবছর পর গান্ধির আহ্বানে সূচিত 'ভারত ছাড়' (কুইট ইন্ডিয়া) আন্দোলনের প্রবলতা ভারতীয় ইংরেজ সরকার অবিশ্বাস্য পীড়নে দমন করে। ব্যাপক ধরপাকড়, নির্যাতন ও গুলি ফাঁসির সাহায্য নিতে সরকার পিছপা হয়নি। এমনকি আপস-আলোচনার ভিত্তিতে, এরপর ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অর্থাৎ ভারতকে কথিত স্বাধীনতা দিতে পুরো পাঁচ বছর সময় লেগেছে।

সময় ও ঘটনাবলী তখন শাসকশক্তির পক্ষেও ছিল না। পরে দেশজোড়া প্রবল নৈরাজ্য, চরম বিশৃঙ্খলা, নৌবিদ্রোহ, ভারতজুড়ে শ্রমজীবী ধর্মঘট এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচার নিয়ে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে প্রবল সরকারবিরোধিতা সরকারের জন্য সঙ্কট তৈরি করেছিল। অবশ্য এর বিপরীতে ছিল ১৯৪৬ সালে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তস্নান যা সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণ হয়ে ওঠে। এ উথাল-পাথাল অবস্থা বিশ্ববাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ১৯৪০ সাল তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি যে-কারণে শাসক ব্রিটিশরাজ পরাধীনতা থেকে ভারতকে মুক্তি দিতে পারে।

সত্যি বলতে কী ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের বিপক্ষে বড় কারণ ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরোধিতা, যা রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভাবতে অবাক লাগে, কংগ্রেসের বিদগ্ধ নেতাদের মধ্যে এই বাধার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। তারা জিন্না-লীগের পেছনে অধিকাংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় মুসলমান জনতা, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের ব্যাপক সক্রিয় সমর্থনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। এটা ছিল কংগ্রেসের জন্য পর্বতপ্রমাণ রাজনৈতিক ভুল যে ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে দেশবিভাগের মাধ্যমে।

এ বিষয়ে তাদের অন্ধতা এমনই ছিল যে, যখন ব্রিটিশরাজের কল্যাণে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি নিশ্চিত, তখনো কংগ্রেসের শীর্ষনেতাদের বিশ্বাস, পাকিস্তান গঠিত হলেও তা টিকবে না। এ ধরনের মতামত তাদের কারো কারো প্রকাশ্য বিবৃতিতে উচ্চারিত হয়েছে। সম্ভবত সেই জন্যই ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর নানা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের শীর্ষ নেতাদের নিয়মিত বলতে শোনা গেছে– 'পাকিস্তান টিকে থাকতেই এসেছে' (পাকিস্তান হ্যাজ কাম টু স্টে)। পাকশাসকদের মুখে এটা ছিল বাঁধা বুলি, বলা চলে আত্মবিশ্বাস জাগানিয়া জপমন্ত্র।

দুই

এসব তো অনেক পরের কথা। আমাদের উপলব্ধি হচ্ছে– কংগ্রেসে নীতিগত প্রশ্নে অন্তর্বিবাদ ও গান্ধিপ্রভাব এ দলের যতটা ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি করেছে ভারতীয় রাজনীতির। এ ক্ষেত্রে হিন্দিভাষী ভারতীয় বলয়ের প্রভাবই ছিল প্রধান। মাঝে মধ্যে বঙ্গীয় কংগ্রেস তাতে বাতাস দিয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারকে সমর্থন করা না-করা বিষয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বে মতবিরোধ বিষয়টিকে জটিল করে তোলে।

গান্ধি মনে হয় এ সময় তার চিন্তায় সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবোধে ছিলেন না। থাকলে তিনি খোলাচিঠিতে ব্রিটিশরাজকে লিখতে পারতেন না যে, হিটলারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ইংরেজের উচিত আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে জার্মান ফ্যাসিস্টদের মোকাবেলা করা। কারণ অহিংসার মাধ্যমে প্রকৃত জয় সম্ভব। হাস্যকর এ চিঠি নিয়ে যশবন্ত সিং তার জিন্না বিষয়ক বইতে বেশ সরস ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। মন্তব্য করেছেন মাওলানা আজাদও।

কংগ্রেস সভাপতি আজাদের মতামত ছিল এমন যে অহিংসা পন্থা হিসেবে ভালো। কিন্তু প্রয়োজনে বিকল্প সশস্ত্র যুদ্ধের পথও গ্রহণযোগ্য। এখানেই গান্ধির সঙ্গে তার গভীর মতবিরোধ ঘটে। এবং আশ্চর্য যে গান্ধির প্রভাবে কংগ্রেস হাইকমান্ডের নেতারা যেমন বল্লভভাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচারি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ডাকসাইটে নেতা গান্ধির যুদ্ধবিরোধী অহিংসনীতিতে মাথা মুড়িয়ে কংগ্রেস সভাপতিকে বিপাকে ফেলে দেন। এমনকি নির্বাহী কমিটি থেকে পদত্যাগের হুমকি দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা গান্ধিবাদীদের চিরাচরিত পন্থা অর্থাৎ অসহযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ীকে বা শক্তিমানকে পরাজিত করা। বিজয়ী সুভাষের বিরুদ্ধে তারা একসময় একই পদ্ধতি গ্রহণ করে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে আজাদ কিছুটা কৌশলে, কিছুটা আপসে সঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে নিতে পেরেছিলেন। তাকে সুভাষের মতো পদত্যাগ করতে হয়নি। এ ঘটনা জুলাই ১৯৪০ সাল এবং পরবর্তী সময়ের।

ভাইসরয় লিন্‌লিথগোর আগস্ট প্রস্তাবে আসলে কংগ্রেসের জন্য কোনো ইতিবাচক উপকরণ ছিল না। বরং তাতে অঢেল সুবিধা ছিল জিন্না-লীগের জন্য। ভিন্নমতের পরিপ্রেক্ষিতে 'ভেটো' দেয়ার ক্ষমতাও দেয়া হয় মুসলিম লীগকে, বিশেষ করে ভবিষ্যত সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে। এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ভাইসরয়ের আগস্ট প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়।

শুধু তা-ই নয়, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যুদ্ধবিষয়ক ব্রিটিশ সহযোগিতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব গান্ধির হাতে তুলে দেয়। গান্ধি কংগ্রেসের শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত তার একমাত্র অস্ত্র শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলনের আশ্রয় নেন। তার ভাষায় এর লক্ষ্য, ভারতের স্বাধীনতা অর্জন নয়, বাকস্বাধীনতার অধিকার আদায়, এবং সে জন্য সত্যাগ্রহীর ব্যক্তিগত কারাবরণ যা অতীতে তার নির্দেশে কংগ্রেসকর্মী ও নেতারা করে এসেছেন।

এ ঘোষণা ৫ অক্টোবর, ১৯৪০ সালের। ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেতাকর্মীদের আইন অমান্য ও কারাবরণ, যা গান্ধিবাদী বিনোবাভাবেকে দিয়ে শুরু। এরপর নভেম্বরে নেহরুর কারাবরণ। যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থায় বাকস্বাধীনতার ওপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে গান্ধিবাদী সত্যাগ্রহ কংগ্রেসে শক্তি সঞ্চারে আদৌ সহায়তা করেছিল কি না তা ভেবে দেখার মতো বিষয়। এভাবে ঘটনাবহুল ১৯৪০ সাল আপন তাৎপর্য নিয়ে শেষ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কংগ্রেসে ডান-বাম দ্বন্দ্ব ও সুভাষ সমাচার

তুলনায় ১৯৪১ সাল ছিল বিশ্বযুদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় জারিত। যেমন আন্তর্জাতিক পরিসরে তেমনি ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে বঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে। কংগ্রেসে বাম রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি গান্ধিবাদীদের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রামগড় কংগ্রেসে এবং অব্যবহিত পরে গান্ধির জোর চেষ্টা অহিংসানীতিকে কংগ্রেসের সর্বাত্মক নীতি হিসেবে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। মাওলান আজাদকে এ বিষয়ে তার যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু হিসাবটা পুরোপুরি ঠিক ছিল না। প্রমাণ ফ্যাসিস্টবিরোধী যুদ্ধে মাওলানা আজাদ গান্ধির সঙ্গে একমত হতে পারেননি। ইতিপূর্বেকার আলোচনায় তা স্পষ্ট। পূর্বতন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে গান্ধি মহাসমস্যায় পড়েছিলেন। কারণ সুভাষ পূর্বোক্ত বামঘরানার প্রতিনিধি। সর্বোপরি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী, তাছাড়া তিনি তখন যুদ্ধ-বিরোধী।

কথাটা মাওলানা আজাদও লিখেছেন তার আত্মজীবনীতে। তার ভাষায়, 'যুদ্ধের প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্র বসু যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করে আন্দোলন চালাতে থাকেন। এবং তার এই কার্যক্রমের ফলে শেষপর্যন্ত তাকে বন্দি হতে হয়। কিন্তু বন্দি অবস্থায় তিনি যখন অনশন শুরু করেন তখন তাকে মুক্তি দিয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি জানতে পারা যায় তিনি ভারত থেকে পালিয়ে গেছেন।'

রামগড় কংগ্রেসে বামঘরানার চাপে আপাত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করা হলেও সংখ্যাগুরু গান্ধিবাদীদের কারণে জয় গান্ধিরই। কারণ এ সম্মেলনে আন্দোলন পরিচালনা বা শুরু করার নীতিগত সব দায়িত্ব গান্ধিকে দেয়া হয়। গান্ধি স্পষ্ট ভাষায়ই বলেন, এ মুহূর্তে আন্দোলন শুরু করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এর অর্থ আর কিছু নয়, কংগ্রেসের বামস্রোত ঠেকানো।

কিন্তু অহিংসবাদী, শান্তিবাদী ও গণতন্ত্রী হয়েও সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে গান্ধি যে জিন্নার মতোই একনায়কী চরিত্রের তা তার কাজেকর্মে বুঝতে কষ্ট হয় না। তার সুভাষবিরোধী বক্তব্যে ও তৎপরতায় তা ভালোভাবেই প্রকাশ পায়।

রামগড় কংগ্রেসেও গান্ধির উপদেশমূলক বক্তব্যে তার একনায়কী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন তিনি বলেন, 'আমার সেনানীদের স্পষ্ট করে বলতে চাই যে এখানে গণতন্ত্রের কোনো জায়গা নেই। যে কোনো সেনাবাহিনীতে জেনারেলের (সর্বাধিনায়কের) মুখের কথাই আইন। আপসবাদিতা আমার প্রকৃতিরর অঙ্গ।' প্রসঙ্গত তিনি বামপন্থীদের সংগ্রামী স্পৃহাকে বিভ্রান্তিকর বলে আখ্যায়িত করে বলেন, এ মুহূর্তে সরকারকে বিব্রত করার প্রয়োজন নেই। তার মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে বন্ধু করে তোলার চেষ্টা চালাতে হবে (সুনীতিকুমার ঘোষ)। আমার বিশ্বাস এ সময়ে গান্ধি এক ধরনের অবাস্তব মানসিকতায় ভুগছিলেন, বিশেষ করে অহিংসাতত্ত্ব নিয়ে।

আর জওহরলাল নেহরু তার ডান-বাঁয়ে দোদুল্যমানতার পরিচয় দেন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে। সুভাষের অনুসারীরাও তার আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে কংগ্রেসে এমন এক আবহ তৈরি হয় যে গান্ধির নেতৃত্ব বাদে কোনো ধরনের জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা সম্ভব নয়। আশ্চর্য যে, সে সময় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি (সিএসপি) এমনকি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও একই ভাবনার শরিক। অর্থাৎ এরা সবাই নিজ নিজ হিসাবে সুভাষ-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর একজন একদা বিপ্লবী কমিউনিস্ট এমএন রায় (মানবেন্দ্রনাথ রায়) এ যুদ্ধ ফ্যাসিবাদবিরোধী বিধায় ব্রিটিশরাজের পক্ষে দাঁড়িয়ে যান। রায় এ সময় আর কমিউনিস্ট নন, তিনি র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট।

আগেই বলা হয়েছে, সুভাষচন্দ্রের সরকারবিরোধী কার্যক্রম তথা স্বাধীনতার পক্ষে তৎপরতা শুরু করার কথা। কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা টেনেই এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো ইতিবাচক দিক হল ভারতের দুটো মুসলমান-প্রধান প্রদেশ বাংলা ও পাঞ্জাব রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল অন্যগুলোর থেকে ভিন্ন। এ দুই প্রদেশেই মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধী মুসলমান শক্তি ছিল বেশ সবল। যেমন ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টি এবং সিকান্দার হায়াত খানের ইউনিয়নিস্ট পার্টি।

সেই সঙ্গে খানিকটা কাকতালীয় হলেও সত্য, এ দুই প্রদেশে সদ্যগঠিত সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক হয়ে ওঠে বেশ শক্তিমান। এবং পূর্বোক্ত দুই মুসলিমপ্রধান দলের সঙ্গে ফরেয়ার্ড ব্লকের ছিল সুসম্পর্ক, বিশেষ করে বঙ্গে। ফজলুল হক বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। এমনকি বসু পরিবারের সঙ্গেও ছিল রাজনৈতিক সখ্য। সুভাষ-রাজনীতির সঙ্গে হক-রাজনীতির সমান্তরালবর্তিতার বিশেষ দিক ছিল মূলত অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ঘিরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণ, সুভাষপন্থী কলকাতার ছাত্ররা যখন সুভাষের নেতৃত্বে কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে এবং যে আন্দোলনে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান ছাত্রও যোগ দেয় তখন লীগ-প্রজাপার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রধান (মুখ্যমন্ত্রী) হয়েও ফজলুল হক আন্দোলনকারীদের নিশ্চয়তা দেন এই বলে যে, তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন এবং অবশ্যই এ মনুমেন্ট এখান থেকে সরিয়ে নেয়া হবে (জুলাই, ১৯৪০)।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, এ সময়ই হিন্দু-মুসলিম অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সুভাষচন্দ্র কলকাতায় প্রধানত মুসলমান ছাত্রদের নিয়ে ৩ জুলাই (১৯৪০) 'সিরাজউদদৌলা দিবস' পালন এবং সে উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী চেতনার আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে বাঙালি জাতীয়তার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরাই ছিল তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য (আজাদ, ১০-০৭-১৯৪০)। এ সূত্রে শচীন্দ্রনাথ সেনের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করতে হয়। গ্রামোফোন রেকর্ডে সে নাটক হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্বাধীনতাকামী তরুণদের মনে উদ্দীপনা জোগাতে দেখা গেছে যদিও সিরাজের বাঙালিত্ব নিয়ে ভিন্নমত কম নয়। সুভাষের এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ফজলুল হকের সংশ্লিষ্টতা আবারো মনে করিয়ে দেয় বঙ্গীয় রাজনীতিতে হক-সুভাষ এ দুই নায়কের সমান্তরালবর্তী আচরণ। আশ্চর্য যে, সংগঠনগতভাবে তাদের রাজনৈতিক পরিণামও ভিন্ন নয়। গান্ধি বিরোধিতার জন্য সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত এবং জিন্না বিরোধিতার সূত্রে মুসলিম লীগ থেকে ফজলুল হকও বহিষ্কৃত। একইভাবে দুজনের সংগঠনগত রাজনৈতিক জীবনের প্রায় সমাপ্তি এবং এ ঘটনা সামান্য আগে ও পরে।

আরো স্মর্তব্য যে, এ ঘটনার কিছুকাল পর মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক মুসলিম লীগের আপত্তি সত্ত্বেও বাংলার সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য হিন্দু নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি বঙ্গীয় গভর্নরকে রাজি করান এ বিষয়ে ১০ মার্চ (১৯৪১) সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনার জন্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিতে (শীলা সেন)। এসব ঘটনা প্রমাণ করে ফজলুল হকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি বিশ্বাস এবং সুভাষের সঙ্গে এ বিষয়ে তার চেতনার ঐক্য।

দুই

সুভাষচন্দ্র ও ফজলুল হক এ দুজনের রাজনীতি ঘিরে যে সাদৃশ্য বা মিল লক্ষ্য করা যায় তা যেমন ইতিবাচক, তেমনি নেতিবাচক দিক থেকেও স্ববিরোধিতা এদের মধ্যে নেহাত কম ছিল না। যদি সুভাষচন্দ্রের কথাই ধরি, বিপ্লববাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুভাষ কীভাবে সমাজবাদ ও ফ্যাসিবাদকে মেলাতে চান এবং তা সেই তিরিশের দশকে। এ দুই রাজনীতি তো একেবারেই পরস্পরবিরোধী, যদিও হিটলারের দল মতাদর্শগত দিক থেকে জাতীয় সমাজবাদী হিসেবে পরিচিত।

অবশ্য 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' (ভারতীয় সংগ্রাম) বইটি লেখার (১৯৩৪) কয়েক বছর পর সুভাষ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বলা যায় একটু ভিন্নভাবে (১৯৩৮)। ততদিনে তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা অনেক পরিণত। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, ভারতে সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে চাই এবং তা অর্জনের পর আমরা সমাজতন্ত্রের পথ ধরে এগিয়ে যেতে চাই।... মার্কস ও লেনিনের লেখায় এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশ্য নীতিতে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে (উদ্ধৃতি, ঘোষ)।

আসলে পরাধীন ভারতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম যে গুরুত্বপূর্ণ এবং তা শ্রেণীসংগ্রামের আগেই সম্পন্ন হতে পারে এমন ধারণা মার্কসবাদবিরোধী নয়। বাস্তবে তেমনটাই ঘটে। দুটো অর্জন সব সময় একসঙ্গে ঘটে না। নয়া-ঔপনিবেশিকতার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। যেমন আমরা দেখেছি বাংলাদেশে সত্তর-একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামে যা ছিল মূলত জাতীয়তাবাদী চেতনাভিত্তিক। এখানেও লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জনের পর শ্রেণীবৈষম্য দূর করা ও সমাজ পরিবর্তনের সূচনা ঘটানোর কাজ শুরু করা। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি বিশেষ শ্রেণীশাসকদের আধিপত্যের কারণে। আর এখানেই সুভাষপন্থার দুর্বলতা। অর্থাৎ দুটো লড়াই একসঙ্গে চালানো দরকার। তা না হলে বুর্জোয়া শাসনে দ্বিতীয়টির অর্জন সম্ভব হয় না।

সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক চরিত্র বিচারে মূলত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং গান্ধি ও গান্ধিবাদীদের সঙ্গে তার প্রভেদ এখানে যে, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় আপসহীন সংগ্রামী। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গান্ধি-রাজনীতির সঙ্গে তার বিরোধ। ফজলুল হকও অনেকাংশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর। তবে তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার চেয়েও বড় বিবেচনার বিষয় ছিল বঙ্গীয় প্রজাসাধারণের শোষণমুক্তি।

তিন

সুভাষচন্দ্র, মূলত তার তীব্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার কারণে ইংরেজের চোখে বড় শত্রু হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। যখন ১৯৪০ সালে কংগ্রেসের বড় নেতারা মুক্ত তখন সুভাষ কারাগারে বন্দি, শেষ পর্যন্ত নিজ ঘরে অন্তরীণ। তিরিশের দশকের শেষ দিকে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তার বিশ্বাস জন্মে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়। এখানে গান্ধিপন্থীদের সঙ্গে তার প্রবল পার্থক্য এবং বৈপরীত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কথা, যে কোনো পন্থায় হোক মুক্তিসংগ্রাম শুরু করতে হবে। প্রয়োজনে শত্রুর কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে। সুনীতিকুমার ঘোষ এ সম্পর্কে লিখেছেন, সম্ভবত কংগ্রেস নীতিতে হতাশ হয়েই ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে তার মনে এমন চিন্তার উদয়– বিদেশে গিয়ে ব্রিটিশবিরোধী শক্তির সাহায্য নিয়ে এ সংগ্রাম সফল করে তোলা যায় কি না। কারণ ভারতীয় সেনাবাহিনী তখনো ব্রিটিশ সমর্থক।

তাই তার চিন্তা ছিল এবং ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে চেষ্টাও ছিল জাপান, জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা তার কাছে বড় একটা সুযোগ বলে মনে হয়েছে। যুদ্ধের শুরুতে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যাতে তাদের মাধ্যমে মস্কোতে আলোচনার জন্য বার্তা পাঠানো যায়।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এসএম বাটলিওয়ালা পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে সুভাষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তাকে সুভাষ বলেন (অক্টোবর, ১৯৩৯), 'আমি বিশ্বাস করি সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনই ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করবে না। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে আমি সোভিয়েত সামরিক সাহায্য নিতে প্রস্তুত।'

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় লন্ডনে যে যোগসূত্র খুঁজে বের করা হয় তার কাছে সুভাষের বিশেষ বার্তা নিয়ে তার ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয় বসু লন্ডন পর্যন্ত ছুটে যান কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই দৌত্য ফলপ্রসূ হয়নি। স্বগৃহে বন্দি থাকা অবস্থায় সুভাষ কীর্তি কিষান পার্টির সহায়তায় আফগানিস্তানেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। ওই পার্টির দুই সদস্যকে মস্কোয় পাঠানো হয়। কিন্তু তখনকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সুভাষের অনুকূল ছিল না। হয়তো তাই মস্কো থেকে সাড়া মিলেনি।

যাই হোক, এদিকে সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা মিয়া আকবর শাহ কলকাতায় এসে পরিস্থিতি দেখেশুনে পেশোয়ারে ফিরে যান সুভাষের বিদেশ যাত্রার ব্যবস্থা করতে। বলা যায় রীতিমতো রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার। স্থানীয় গোয়েন্দারা কিছু টের পাননি। আসলে তাদের কোনো ধারণা ছিল না যে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। সুভাষচন্দ্র সবার অলক্ষ্যে বিদেশে পাড়ি জমাতে পারেন।

১৭ জানুয়ারি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যরাত। পাগড়ি-কুর্তা-পেশোয়ারি পাজামা পরিহিত সুভাষ প্রহরীদের নজর এড়িয়ে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। এ যাত্রার পরিণতি তার জানা ছিল না। পেশোয়ারে তার নিরাপদ যাত্রার দায়িত্ব নেন কীর্তি কিষান পার্টির সদস্য ভগতরাম তলোয়ার। সুভাষ কাবুলে পৌঁছে যান ২৪ জানুয়ারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯৪১)। তারা সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু কোনো বার্তা আসেনি। শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা।

অগত্যা হতাশ সুভাষ জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ২ ফেব্রুয়ারি (১৯৪১)। আবার অপেক্ষা। সময়টা তার জন্য ছিল খুবই টেনশনবিদ্ধ। আফগানিস্তান তখন অনেকটা বাফার স্টেট বা মেক্সিকোর মতো। নানা রাষ্ট্রের গোয়েন্দা চরদের উপস্থিতিতে সরগরম কাবুল। তাই দ্রুত কাবুল থেকে সরে পড়া দরকার। এরপর বার্লিন থেকে সবুজ সঙ্কেত। কারণ ব্রিটিশরাজ-বিরোধী বিশিষ্ট ভারতীয় নেতাকে তো কাছে টানতেই হয়।

ইতালীয় পাসপোর্টে সুভাষ কাবুল ছাড়লেন ১৮ মার্চ, যাবেন মস্কো হয়ে বার্লিন। মস্কো হয়ে যাওয়ার সময় কী ভাবছিলেন সুভাষ? ভাবছিলেন, কেন মস্কো তাকে দূরে ঠেলে দিল? অবশ্য কারণ খুব দুর্বোধ্য নয়। ২২ জুন তো খুব দূরে ছিল না– মাত্র তিন মাস চার দিনের ফারাক। মস্কো সম্ভবত যুদ্ধাবস্থার কথা ও মিত্রশক্তির প্রয়োজন বিবেচনা করেই তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়নি। তার মৃত্যুরহস্য নিয়ে অনেক জল্পনার মধ্যে স্টালিনের সংশ্লিষ্টতার কথাও বলা হয়ে থাকে। তখন অবশ্য অবস্থা ভিন্ন। তবে একথাও ঠিক, সম্ভাব্য দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সুভাষের পক্ষে আর কিইবা করার ছিল জার্মানি হয়ে জাপান যাওয়া ছাড়া? ঘরে ফেরা তো সম্ভব ছিল না।

কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বক্তৃতায় জওহরলাল সুভাষ সম্পর্কে যত অপ্রিয় কথা উচ্চারণ করুন না কেন, প্রবাসে স্বাধীন ভারতীয় সরকার ও ব্রিটিশ সমরনেতাদের পেছনে ফেলে আসা ভারতীয় সেনাদের (হিন্দু-মুসলমান-শিখ) নিয়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন' এবং স্বাধীন ভারতীয় সেনাদের মণিপুর পর্যন্ত উপস্থিতি কংগ্রেসি বিরূপতা সত্ত্বেও ভারতীয় জনতা বিশেষ করে বাঙালি মানসে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রবল আবেগ, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ছাপ রেখেছিল। কলকাতায় রশিদ আলী দিবসের আন্দোলন ও মিছিলে তিন পতাকার উপস্থিতি (লীগ-কংগ্রেস-কমিউনিস্ট পার্টি) তার প্রমাণ। প্রমাণ তরুণদের গান্ধি নেহরুর তুলনায় সুভাষপ্রীতি। আমি তখন কিনি সুভাষের 'তরুণের স্বপ্ন'। আমরা তরুণ বন্ধুরা তখন সুভাষ অনুরাগী।

এ প্রসঙ্গে নকশাল নেতা সুনীতিকুমার ঘোষ মনে করেন, সুভাষের পূর্বোক্ত কর্মকাণ্ড তার স্বদেশী জনমনে যে গভীর দাগ কেটেছিল, এমনকি ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে, সে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের টানেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতে তাদের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান ঘটিয়ে পরোক্ষ শাসনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। এখানেই রাজনীতিক সুভাষ ও তার আজাদ হিন্দ ফৌজের (স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর) সাফল্য ও সার্থকতা। সুভাষ ট্র্যাজেডির নিশ্চিত কারণ বিশ্বযুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছু বিচারে মানতেই হয় গান্ধি নন, নেহরু নন, প্রকৃতপক্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষই 'শের-ই-হিন্দ্' যার যুদ্ধ-শ্লোগান ছিল 'চলো চলো দিল্লি চলো/লাল কেল্লা দখল করো'। সে লাল কেল্লা ব্রিটিশ পতাকালাঞ্ছিত লাল কেল্লা। তুলনা পুরোপুরি লাগসই না হলেও সীমাবদ্ধ বৃত্তে আমাদের মনে পড়ে যায় রাজনীতিক ফজলুল হক ছিলেন 'শেরে বাঙ্গাল'। এবং তা তখনকার বিভাগপূর্ব রাজনীতির বিচারে যুক্তবঙ্গেই। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বড় অর্জন অসাম্প্রদায়িক স্বদেশপ্রেম চেতনা যা ছিল ভারতীয় রাজনীতির জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপাদান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হক-জিন্না দ্বন্দ্বের নেপথ্যে ক্ষমতার চক্রান্ত

গান্ধী-সুভাষ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পর হক-জিন্না দ্বন্দ্বের সূচনা। উভয়ের ক্ষেত্রেই বিষয়টি রজনৈতিক ও সংগঠনগত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। গান্ধি চাননি কংগ্রেসে সুভাষের আধিপত্য। একইভাবে জিন্না চাননি মুসলিম লীগে ফজলুল হকের প্রভাব বাড়ুক। সে জন্য তার বিরোধিতায় সংশ্লিষ্ট হক-সিকান্দার হায়াতের জুটি থেকে তিনি শেষোক্তজনকে বের করে আনেন।

যেসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে হক-জিন্না দ্বন্দ্ব তা দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণ নয়। প্রকৃত কারণ রাজনৈতিক অঙ্গনে দুই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, অনেকটা অসমপ্রকৃতির দ্বন্দ্ব– যে দ্বন্দ্বে ফজলুল হকের জয়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কারণ জিন্না ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কেন্দ্রে ও প্রদেশে নিজের অবস্থান এতটা সুসংহত করেছিলেন যে তার একনায়কসুলভ আচরণ মেনে নেয়াটাই লীগ সংগঠনে নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ব্যতিক্রম বঙ্গদেশ। হডসন থেকে শীলা সেন– সবাই তাদের লেখায় জিন্নার উদ্ধত একনায়কী আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি যশবন্ত সিং, যিনি জিন্না মূল্যায়নে নমনীয় তিনিও ভিন্ন কথা বলেননি।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিলে যোগ দেয়ার ঘটনা অজুহাত মাত্র। কারণ জিন্নার ইচ্ছামতো ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ পাওয়ার পর হক কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন। তবে সিকান্দার হায়াতের মতো নিঃশর্তভাবে নয়, করেন নীতিগত আপত্তি জানিয়ে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ডিফেন্স কাউন্সিলে যোগদান করা মুসলিম লীগের নীতিবিরোধী নয়। তবু সর্বভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যের কথা বিবেচনা করে তিনি কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেছেন।

কিন্তু একই সঙ্গে জিন্নার অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদে তিনি মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল থেকেও পদত্যাগ করেন। প্রসঙ্গত তিনি জিন্না ও শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন। মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের নেতারা সংগঠনের সর্বোচ্চ পদগুলো ধরে রেখেছেন এবং যেভাবে মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশের (যেমন– বাংলা ও পাঞ্জাব) স্বার্থ নষ্ট করছেন তা মেনে নেয়া যায় না। এ বিষয়ে তার শেষ কথা, তিনি অবাঙালি

কাউকে বাঙালি মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে দেবেন না। কারণ তারা বাংলাদেশের স্বার্থ নিয়ে কখনো ভাবেন না।

শেষ কথা দুটোই ছিল মূল কথা এবং মারাত্মক কথা। এ সত্য হক বুঝেছেন দেরিতে, মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে। কিন্তু নিজ দল বিভক্ত করে নিজের সর্বনাশ তিনি নিজেই করেছেন। এরপর প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সেক্রেটারি নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন অনেক যুক্তিতথ্য দিয়ে। এমনকি একথাও বলেন, লীগের শীর্ষনেতারা যে কোনো বিষয়ে ঘটনার কার্যকারণ না জেনেই অন্ধভাবে জিন্নাকে সমর্থন করে থাকেন।

অভিযোগ কোনোটাই মিথ্যা বা ভুল ছিল না। অবাঙালি লীগ নেতারা শুধু বিভাগপূর্ব সময়ে নয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও যে পূর্ববঙ্গের ওপর কর্তৃত্ব ফলিয়েছেন তেমন প্রমাণ বাঙালির অভিজ্ঞতায়ই ধরা আছে, ইতিহাসে তো বটেই। কিন্তু ফজলুল হকের জন্য ট্র্যাজেডি হলো– এ সত্য যখন তিনি বুঝেছেন তখন জিন্না রাজনৈতিক-সাংগঠনিক দিক থেকে প্রবল-পরাক্রমী, অন্যদিকে ফজলুল হকের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান খুবই দুর্বল। প্রজাপার্টি বিভক্ত, অনুসারীদের অনেকে তার একদা নির্দেশেই লীগ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

লীগ সেক্রেটারির কাছে ৮ সেপ্টেম্বর (১৯৪১) ফজলুল হকের লেখা চিঠি শীলা সেনের মতে 'ঐতিহাসিক দলিল'। ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে একইভাবে এ চিঠির বক্তব্য উল্লেখ করে ফজলুল হকের বাংলাপ্রীতি এবং রাজনৈতিক সাহস ও দৃঢ়তার প্রশংসা করেছেন। সাহস তার বরাবরই ছিল কিন্তু সমস্যা হল তা হক সাহেবের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের কাছে প্রায়ই হার মেনেছে। পরবর্তীকালের ঘটনা উল্লেখ করে বলা যায়, ১৯৪৮ সালে ঢাকা সফরে জিন্নার বাংলা ভাষাবিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদ একমাত্র ফজলুল হকই করেছিলেন, অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতা নন। জিন্নাকে চ্যালেঞ্জ জানানো একমাত্র বাংলার শের-এর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

হক-জিন্না দ্বন্দ্বের বিষয়টি শুধু বঙ্গেই নয়, সর্বভারতীয় রাজনীতিতেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফজলুল হক তখনো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। জিন্নার একমাত্র লক্ষ্য ফজলুল হককে ক্ষমতাচ্যুত করে বঙ্গে নাজিমুদ্দিন বা সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশ শাসকদেরও নজর ছিল এ দুই নেতার রাজনৈতিক লড়াইয়ের দিকে। কারণ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে পাঞ্জাবের মতো বঙ্গের রাজনৈতিক গুরুত্ব কোনো দিক থেকে কম ছিল না। বঙ্গীয় গভর্নরেরও পছন্দসই ছিলেন না ফজলুল হক, যদিও তিনি যুদ্ধের শুরুতে এক পা বাড়িয়ে সরকারের ডিফেন্স কাউন্সিলে যোগ দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গীয় রাজ সরকারের এ বিষয়ে স্পর্শকাতরতার কারণ তাদের কাছে গোয়েন্দা সূত্রে খবর ছিল যে, ফজলুল হক বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতা বিশেষ করে তাদের মহা-অপছন্দের বাম ঘরানার নেতাদের সঙ্গে (যেমন– শরৎ বসু) যোগাযোগ রেখে চলেছেন। সরকারের লক্ষ্য তাদের পছন্দসই মন্ত্রিসভা গঠন, যেমন নাজিমুদ্দিনকে মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদে বসিয়ে অথবা সোহরাওয়ার্দীকে। উদ্দেশ্য কংগ্রেস যেন কোনোমতে ক্ষমতার অন্দরমহলে পা রাখতে না পারে। কারণ বিশ্বযুদ্ধবিষয়ক প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের অনেক দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে।

ফজলুল হক নিজেও জানতেন, মুসলিম লীগের সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। শেষ সুতোটা ছিন্ন হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। এর মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘর গুছিয়ে নেয়া দরকার। মাওলানা আকরম খাঁর পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ' তখন উঠে পড়ে লেগেছে হক নিন্দার ঢাকঢোল পেটাতে। তেমনি পেটাচ্ছে 'স্টার অব ইন্ডিয়া'। এ একাজটা অবশ্য মাওলানা সাহেবের পত্রিকা পরবর্তীকালে বরাবর চালিয়ে এসেছে পরম নিষ্ঠাভরে।

যাই হোক পূর্ব কথায় ফিরি। ফজলুল হকের গোপন প্রচেষ্টার কথা সম্ভবত লীগ নেতাদেরও অজানা ছিল না। তাই ফজলুল হকের বিরুদ্ধে মুসলমান-জনমত সংহত করতে সোহরাওয়ার্দীও প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। তিনি ১১ সেপ্টেম্বর (১৯৪১) কলকাতা ময়দানে আয়োজিত এক মুসলমান জনসভায় লীগ সভাপতি জিন্নার প্রতি ফজলুল হকের কিছু মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। কারণ ইতিমধ্যে কলকাতার কাগজগুলোতে লিয়াকত আলীকে লেখা ফজলুল হকের চিঠির গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রকাশিত হয়, বিশেষ করে যেখানে ছিল জিন্নার অযৌক্তিক হক-বিরোধিতা ও হঠকারিতার সমালোচনা।

সোহরাওয়ার্দীর সমালোচনার জবাব দিতে দেরি করেননি ফজলুল হক। তিনি বলেন, 'একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাঙালির জাতীয় বৈশিষ্ট্য। মুসলিম লীগ সেক্রেটারির কাছে লেখা চিঠিতে আমি ব্যক্তিবিশেষের একনায়কী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা প্রসঙ্গে' (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২.০৯.১৯৪১)।

কংগ্রেসের অন্দরমহলেও এ বিষয়ে চলেছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও চিঠি চালাচালি। যেমন– তেজবাহাদুর সাপ্রুকে লেখা শিব রাওয়ের চিঠি। এ ক্ষেত্রে মূল কথা, সাম্প্রদায়িক পরিবেশের বিষয় বিবেচনা করে কংগ্রেস যেন ফজলুল হকের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চালায়। বিশেষ করে কংগ্রেসের হাইকমান্ড যাতে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে। সাপ্রুও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। জিন্নার সঙ্গে ফজলুল হকের আর সুসম্পর্ক তৈরি হওয়ার নয়, যা হবে তা সাময়িক ও কৌশলগত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে সিন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতা আল্লাবক্‌শও জিন্নার ঔদ্ধত্যপূর্ণ নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এদিকে পরিস্থিতি বিচারে হক-জিন্না দুজনই এক ধরনের তাৎক্ষণিক সমঝোতায় আসেন। আসলে দুজনই জানতেন, এ সমঝোতা সাময়িক। লীগ ওয়ার্কিং কমিটির চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সমঝোতার চিঠি লিখতে হয় হক সাহেবকে। তিনিও খানিকটা সময় কিনতে চেয়েছিলেন সমঝোতার বিনিময়ে।

জিন্না যে ফজলুল হককে বিশ্বাস করতেন না তার প্রমাণ তিনি হক সাহেবের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য তার ব্যক্তিগত দূত হিসেবে হাসান ইস্পাহানিকে নিয়োগ করেন। ইস্পাহানিরও প্রজাপার্টির নেতা হককে পছন্দ করার কথা নয়। সত্যি বলতে কি রাজনীতিতে ব্যক্তিগত ভালোলাগা-মন্দলাগার বিষয়গুলো ঘটনার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক ইতিহাস তেমন প্রমাণই দেয়। স্বভাবতই ইস্পাহানি ফজলুল হক সম্বন্ধে জিন্নার কাছে বিরূপ প্রতিবেদনই পেশ করেন (অমলেন্দু দে)।

জিন্না সাহেবও আর সময় নষ্ট করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তার নির্দেশে ১ ডিসেম্বর (১৯৪১) বাংলার হক মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করেন। তাদের ধারণা ছিল, ফজলুল হক মুসলিম লীগের সহায়তা ছাড়া মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবেন না। কিন্তু অন্তত এ ক্ষেত্রে তাদের হিসাব সঠিক ছিল না। কারণ হাওয়া বুঝে ফজলুল ইতিমধ্যে শরৎ বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে বৈঠকে বসে সম্ভাব্য এমন এক সঙ্কটে করণীয় ঠিকঠাক করে রেখেছিলেন।

তারা গঠন করে রাখেন প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি ফজলুল হক, শরৎ বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিনিধিত্বে। তারিখ ২৮ নভেম্বর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ। দলগতভাবে এ কোয়ালিশনে ছিলো প্রজাপার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দুমহাসভা ও স্বতন্ত্র তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা। এবারো কংগ্রেস পুরনো ভুলের পুনরাবৃত্তি করে। হিন্দুমহাসভার মতো হিন্দুত্ববাদী দলের সঙ্গে মিলে মন্ত্রিসভা গঠনের কারণে মুসলমান জনমানসে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, বিশেষ করে লীগের প্রচারের ফলে।

কংগ্রেস দল কোয়ালিশনে এগিয়ে এলে হিন্দুমহাসভার সঙ্গে ঐক্যের প্রয়োজন হতো না। কারণ হিন্দু মহাসভার সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১২। দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে হিন্দু মহাসভার মতো সম্প্রদায়বাদী দলের সঙ্গে ঐক্য ফজলুল হকের জন্য ছিল অশুভ আঁতাত। তাছাড়া শাসক-সরকারও ছিল হকবিরোধী যে জন্য বঙ্গীয় গভর্নর ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানাননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার প্রত্যাশা তাদের প্রিয়পাত্র নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ যদিবা সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারে, সে ক্ষেত্রে লীগ নেতাকেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হবে। ঘটনা কাকতালীয় হলেও প্রগ্রেসিভ ফ্রন্টের জন্য, ফজলুল হকের জন্য বিরাট আঘাত যে ওই দিনটিতেই ভারতরক্ষা আইনে শরৎ বসুকে গ্রেফতার করা হয়। আমার বিশ্বাস এটা সরকারের পরিকল্পনাপ্রসূত। উদ্দেশ্য হককে সঙ্কটে ফেলা।

জিন্না-লীগও বসে থাকেনি। ফজলুল হককে জিন্নার তারবার্তা। অশোভন ভাষায় হককে বিশ্বাসঘাতক ও ভারতে মুসলিম স্বার্থ বিনাশের হোতা অপবাদ দিয়ে, কৈফিয়ৎ চেয়ে শেষ পর্যন্ত ১০ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে ফজলুল হকের শূন্যস্থান পূরণ করা হয় হাসান ইস্পাহানিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এভাবেই হক-জিন্না বিরোধের নিষ্পত্তি প্রথমোক্ত জনের মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

বস্তুত ফজলুল হককে তার রাজনৈতিক জীবনে একাধিক বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। এ পর্বের প্রধান প্রতিপক্ষ মুসলিম লীগ সভাপতি জিন্না এবং পরোক্ষ প্রতিপক্ষ (কিন্তু শক্তিমান প্রতিপক্ষ) শাসক রাজ। রাজশক্তি নানা-ভাবে ফজলুল হককে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে। শুধু চেষ্টা নয়, বাস্তবে করেছেও। যেমন– বাংলার গভর্নর সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতা ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানাতে বড় একটা ইচ্ছুক ছিলেন না।

যদিবা তাকে ডাকা হলো সেদিনই ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎ বসুকে গ্রেফতার করা হয়, যে শরৎ বসু ছিলেন সম্ভাব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিকে দুর্বল করা। একই কথা আইনসভায় দুঃখ করে বলেন ফজলুল হক। জেল থেকে শরৎ বসু লেখেন : 'হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক শান্তি পুনরুদ্ধার করা এবং বাংলার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। অনেক বছর এই সম্ভাবনা কার্যকর করার জন্য পরিশ্রম করেছি। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে আমাকে বলি দেয়া হয়েছে' (ঘোষ)।

কথাটা মিথ্যা ছিল না। অন্যদিকে ছিল শরৎ বসুর অবর্তমানে শ্যামাপ্রসাদের অধিকতর গুরুত্ব এবং এর ফলে মুসলিম লীগের পক্ষে সাম্প্রদায়িক প্রচারের সুবিধা হয়। মনে পড়ে শহরের মুসলিম লীগ নেতাদের তিক্ত ও বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা'কে কেন্দ্র করে। এর প্রভাব পড়েছিল মুসলিম মানসে। অবশ্য আবুল মনসুর আহমদ বলেছিলেন, জিন্না ও লীগের বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্রোহ করে ফজলুল হক দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে। আর আবুল হাশিমের মতে, 'ফজলুল হক কখনো অবাঙালিদের বশ্যতা স্বীকার করেননি। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিন জিন্নার লেজুড়বৃত্তি করেছেন। ফজলুল হক ছিলেন খাঁটি বাঙালি।'

লেওনার্ড গর্ডন তার 'ডিভাইডেড বেঙ্গল' (বিভাজিত বাংলা) বইতে সঠিক কথাই বলেছেন, ব্রিটিশরাজ, জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতো সংগঠন ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে বঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সহযোগিতার প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে মাত্র এক দশক সময়ের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনার বঙ্গীয় রাজনীতির সম্ভাবনা ওই ত্রিশক্তির টানে গঙ্গায় ভেসে যায়।

ঘটনাটি পরের, তবু প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করছি। বাংলায় প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির মন্ত্রিসভা গভর্নর জন হার্বার্টের একেবারে পছন্দসই ছিল না। তাই মুসলিম লীগকে দিয়ে নানাভাবে ওই মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গভর্নর হার্বার্ট শেষ পর্যন্ত অনৈতিকভাবে, প্রায় জোর করেই ফজলুল হকের পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর আদায় করেন। পরিণামে এক সময় হক মন্ত্রিসভার পতন এবং নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বঙ্গে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন। এ সম্বন্ধে ব্রুমফিল্ড খোলামেলা ভাষায়ই বলেছেন, শাসকরাজ তাদের ইচ্ছানুযায়ী ইউরোপীয় ব্লকের সাহায্যে হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েছিল।

যে সোহরাওয়ার্দী ইউরোপীয় ব্লকের সদস্য হামিলটনের উত্থাপিত খাদ্যসামগ্রীর মজুতদারি ও কালোবাজারির অভিযোগের পক্ষে আবেগময় বক্তৃতা দিয়ে হাততালি কুড়ান, সেই সোহরাওয়ার্দীই কিন্তু নাজিম মন্ত্রিসভার খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে ৫০ লাখ দরিদ্র গ্রামবাসী বাঙালির মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠেন পঞ্চাশের (১৯৪৩) মহামন্বন্তরে। তখন ফজলুল হকের পক্ষে সঠিক পদক্ষেপ হতো আইনসভায় তাকে হন্তারক হিসেবে চিহ্নিত করা। কিন্তু ফজলুল হকের স্বভাবে তা ছিল না। সেসব অবশ্য পরের ঘটনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিকান্দার হায়াতের পাকিস্তান বনাম পাঞ্জাব-ভাবনা

ব্রিটিশ-ভারতে বাংলা ও পাঞ্জাব এ দুই প্রদেশ রাজনীতির বিচিত্র তৎপরতায় বরাবরই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাতে স্ববিরোধিতাও কম ছিল না। ব্রিটিশরাজের ক্ষমতা হস্তান্তর পর্বের এক দশক আগেকার অর্থাৎ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭– এই সময়-পরিসরে বাংলা-পাঞ্জাব যেন অদ্ভুত এক স্ববিরোধিতা নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ নামক বিশাল ভূ-খণ্ডটিকে নিয়তি-নির্ধারিত বিভাজনের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং একই সঙ্গে এর বিপরীত ইতিবাচক সম্ভাবনাও ধারণ করে।

নিজ নিজ জাতিগত বৈশিষ্ট্যের আবেগ ধারণ করে উল্লিখিত সময়কার দুই রাজনীতিবিদ মুখ্যমন্ত্রী আশ্চর্য এক সাদৃশ্যের পথ ধরে চলেছেন। তাদের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যে ও কর্মতৎপরতায়ও অবিশ্বাস্য মিল। তৎকালীন রাজনীতির অঙ্গনে প্রাদেশিক নেতা হয়েও দেশের রাজনৈতিক তাৎপর্য বিচারে এরা জাতীয় রাজনীতিতে নায়কের ভূমিকা পালন করেছেন এবং তা উপমহাদেশের অবশেষ পরিণতির ক্ষেত্রেও।

এদের প্রথমজন বাঙালি রাজনীতিবিদ একে ফজলুল হক। প্রথম জীবনে সম্প্রদায়-স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতিতে হাতেখড়ি সত্ত্বেও এক সময় কৃষকজনশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাংলার রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। সঠিক-বেঠিক পথে সৃষ্টি করেছেন ইতিহাস, যা কিছুটা হলেও ইতিমধ্যে আমাদের লেখায় উঠে এসেছে।

এদিক থেকে তার রাজনৈতিক সমগোত্রীয় নায়ক পাঞ্জাবের সিকান্দার হায়াত খান। দুজনই জাতীয়তাবাদী চেতনার মানুষ ও মনে-প্রাণে সেক্যুলার রাজনীতিবিদ। জাতিসত্তা ও ভূখণ্ড নিয়ে তাদের গর্ব ও আবেগ মনে হয় সমপরিমাণ। একজন খাঁটি বাঙালি, অন্যজন খাঁটি পাঞ্জাবি। আবার রাজনৈতিক ভুল-ভ্রান্তিতে দুজনের মধ্যেই বিস্ময়কর মিল। মিল জিন্নার কাছে নিজেদের রাজনৈতিক জীবন, স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বিকিয়ে দেওয়ায়। সে ভুলের মাশুল তারা দুজনেই দিয়েছেন এবং সে মাশুল আদায় করেছেন চতুর বোম্বাই-গুজরাটি রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আলী জিন্না। অকালমৃত্যু না হলে সিকান্দার হায়াতের পরিণতিও আমার মনে হয় ফজলুল হকের মতোই হতো– হতেন হকের মতোই স্বখাত সলিলে নিমজ্জিত রাজনৈতিক ট্র্যাজেডির নায়ক।

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (সূচনা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) পরিপ্রেক্ষিতে দুজনের পদক্ষেপে আশ্চর্য মিল– ভাইসরয়ের 'ডিফেন্স কাউন্সিলে' যোগদান ও জিন্নার চাপে পদত্যাগ এবং নিজস্ব সেক্যুলার দলটিকে সম্প্রদায়বাদী মুসলিম লীগের সঙ্গে এক করে দেয়া। তাদের বড় ভুল ছিল মুসলিম লীগে যোগদান। মুসলিম লীগ রাজনীতি তাদের জন্য সঠিক ছিল না, তাদের রাজনৈতিক মেজাজের সমান্তরাল ছিল না।

কারণ এরা দুজনই নিজ নিজ প্রদেশে মুসলিম লীগের উপস্থিতি সত্ত্বেও সেক্যুলার রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। বঙ্গে ফজলুল হকের হাতে কৃষক প্রজাপার্টি এবং পাঞ্জাবে সিকান্দার হায়াতের ইউনিয়নিস্ট পার্টি। শেষোক্ত পার্টিতে ছিল মুসলমান, হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিত্ব। অথচ পাঞ্জাব বিপুল সংখ্যায় মুসলমান-প্রধান প্রদেশ। তা সত্ত্বেও সিকান্দার হায়াত খান ও তার ইউনিয়নিস্ট পার্টির লক্ষ ছিল সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য বজায় রাখা, যাতে তার সাধের পাঞ্জাব ধর্মীয়-সম্প্রদায়গত অজুহাতে বিভক্ত না হয়।

কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক নিয়তির কী পরিহাস যে, ভারত বিভাগের টানাপড়েনে শুধু বাংলা-পাঞ্জাবই বিভক্ত হলো, তাও ভ্রাতৃঘাতী রক্তস্রোতে। অথচ ওই বিভাগ কাম্য ছিল না বঙ্গ ও পাঞ্জাবের দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ও সিকান্দার হায়াত খানের। আমার মনে হয় এ দুই নেতাই বুঝতে পেরেছিলেন কি ভুল তারা করেছেন জিন্নার ডাকে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে। কিন্তু ততদিনে পাশার দান পড়ে গেছে, সংশোধনের সুযোগ অনেক দূরে সরে গেছে।

তবু ফজলুল হক তার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আর সিকান্দার হায়াত সে চেষ্টা কিছুটা করেছেন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। কাজে লাগাতে চেয়েছেন তার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির প্রভাব। কারণ সাম্প্রদায়িক সংঘাত, কংগ্রেসের ভুলভ্রান্তি ইত্যাদি মিলে মুসলমান জনগোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্নতার ঝোঁক ও পাকিস্তান ঘিরে যে স্বপ্ন তৈরি হতে শুরু করে তাতে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন স্যার সিকান্দার।

ভিপি মেনন তার 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, অবস্থা বিচারে সিকান্দার হায়াত সদলবলে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে মুসলিম লীগে ধরে রাখা হয়। বলতে গেলে তিনি তখন অবস্থার শিকার। মুসলিম লীগে থেকে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও দেশবিভাগের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক লড়াই ছিল অর্থহীন, এক অর্থে আত্মহনন। তবু রাজনৈতিক চিন্তায় তার অবস্থান স্পষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে সিকান্দার হায়াত খান, বিশেষ করে পাকিস্তান ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পাঞ্জাব বিধানসভায় যে দীর্ঘ ভাষণ দেন (১১ মার্চ, ১৯৪১) মেননের মতে তা 'ঐতিহাসিক' তাৎপর্য বহন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পাকিস্তান-ভাবনার মর্মবস্তু হলো প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সীমিত শক্তির কেন্দ্র। সেখানে দেশবিভাগ নেই, প্রদেশ বিভাগ নেই, পাঞ্জাব বিভাগ তো দূরের কথা। তার বিবেচনায় ভারতীয় মুসলমান শক্তিশালী কেন্দ্রের বিরোধী। কারণ শক্তিশালী কেন্দ্রের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সম্প্রদায়বাদী শাসনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মুসলমান সেটা চায় না সমগ্র ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে। শাসিত হওয়ার ভয় রয়েছে তার মনে। সে ভয় অমূলক হতে পারে। কিন্তু এর গুরুত্ব উড়িয়ে দেয়া যায় না।

তাই তার পরিকল্পনামাফিক ইউনিটগুলোকে (হতে পারে তা প্রদেশ, একটি বা দুটি) পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে যেগুলো মিলে অঞ্চল বা জোন গঠন করবে। ইউনিটের প্রতিনিধি অঞ্চলে এবং কেন্দ্রে তাদের ভূমিকা পালন করবে। ফলে কেন্দ্র ইউনিট বা প্রদেশের ওপর জবরদস্তিমূলক প্রভাব খাটাতে পারবে না। কেন্দ্র হবে নমনীয়। তার হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা, রাজস্ব ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাঠকের হয়তো ভাবতে অবাক লাগবে রাজনৈতিক ইতিহাসের বিস্ময়কর পুনরাবৃত্তি লক্ষ করে। সিকান্দার হায়াতের পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের চিন্তা উচ্চারিত হয় আড়াই দশক পর আরেক জাতীয়তাবাদী বাঙালির কণ্ঠে। নাম শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু পাঞ্জাব তখন তার বিরোধিতায়। কারণ সে পাঞ্জাব তো সিকান্দার হায়াত বা খিজির হায়াত খানের অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রী জাতীয়তাবাদের পাঞ্জাব নয়। পাঞ্জাব তখন আধিপত্যবাদী ধর্মীয় চেতনার ভিন্ন এক পাঞ্জাব। সে পাঞ্জাব ফজলুল হকের বাংলা, শেখ মুজিবরের বাংলাকে তার ন্যায্য অধিকার দিতে অনিচ্ছুক।

এমন একটি গণতান্ত্রিক শাসন পরিকল্পনা তুলে ধরে সিকান্দার হায়াত খান বলেন, 'আমরা এমন স্বাধীনতা চাই না যেখানে একদিকে মুসলমানরাজ, অন্যদিকে হিন্দুরাজ। এই যদি পাকিস্তান হয়ে থাকে তাহলে এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এ কথা আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি। বলছি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে।' ইতিপূর্বে তার বক্তব্যে পাকিস্তানের বিকল্প প্রস্তাব এসেছে যেখানে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা নেই। নেই সাম্প্রদায়িকতার স্লোগান-দ্বিজাতিতত্ত্বের নামে যে স্লোগান দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না।

আবেগজড়িত কণ্ঠে সেদিন সিকান্দার হায়াত বলেছিলেন, 'আপনারা যদি পাঞ্জাবের সত্যিকার স্বাধীনতা চান অর্থাৎ এমন পাঞ্জাব চান যেখানে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সব সম্প্রদায়ের যুক্তিসঙ্গত অংশীদারিত্ব থাকবে তাহলে সে পাঞ্জাব পাকিস্তান নয়, সে পাঞ্জাব একান্তভাবেই পাঞ্জাব, পঞ্চনদ বিধৌত ভূ-খণ্ডের পাঞ্জাব। নয়া সংবিধানমাফিক আমার প্রদেশের জন্য, আমার দেশের জন্য এমন রাজনৈতিক ভবিষ্যতই আমি দেখতে চাই। চাই মুসলমান, হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান সবার জন্য (ভিপি মেনন)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আগেই বলেছি তার চোখে পাকিস্তান মানে 'ম্যাসাকার'। এ বক্তব্যের (১৯৩৮) সূত্রে হডসনের মন্তব্য : 'নয় বছর পর পাকিস্তানের অর্থ 'ম্যাসাকার'ই হয়ে দাঁড়ায়।' কিন্তু তা দেখার জন্য স্যার সিকান্দার বেঁচে ছিলেন না। হডসনের মতে, কৌশলগত কারণের চাপে সিকান্দার হায়াত খানকে 'লাহোর প্রস্তাব' সমর্থন করতে হয়েছিল। সে প্রস্তাব মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) উপস্থাপন করেন ফজলুল হক।

পূর্বোক্ত বক্তৃতায় সিকন্দার হায়াত খান হিন্দু-মুসলমান-শিখসহ সব ভারতবাসীর সহাবস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, যে সাতটি প্রদেশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানকার মুসলমানদের উচিত তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। চারটি প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেসব প্রদেশে হিন্দু ও শিখদের পক্ষে উচিত হবে অপর পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করা। আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। বাস্তবতা মেনে চলতে হবে।

তিনি 'খাল্‌সারাজ, হিন্দুরাজ ও মুসলমানরাজ স্লোগান তুলে জনগণের মন বিষাক্ত না করার' আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আসুন প্রদেশে শান্তি-সংহতি রক্ষা করে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাহসের সঙ্গে বাইরের বিপদের মোকাবেলা করি।' স্যার সিকান্দারের এই সেক্যুলার আহ্বান হালে পানি পায়নি মূলত জিন্নার ভিন্নমতের কারণে। বিশেষ করে স্যার সিকান্দারের অকালমৃত্যুর কারণে আবহাওয়ার বদল ঘটে। যেমন ঘটেছিল বাংলায় চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যুতে। বাতিল হয়ে যায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার সম্প্রীতির সেতু 'বেঙ্গল প্যাক্ট'।

সিকান্দার হায়াতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বান এবং বিধানসভায় তার দীর্ঘ রাজনৈতিক বক্তব্য মনে হয় পরিকল্পিতভাবে জিন্নার সঙ্গে মতবিরোধের কারণে প্রকাশ পেয়েছিল। কিছু নেপথ্য ঘটনায় তেমন আভাস মেলে। জিন্না এ সময়ে 'পাকিস্তান' ইস্যুটিকে যেভাবে সাম্প্রদায়িক ইস্যু হিসেবে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তা লীগেরও দুচারজন উদার রাজনীতিকের পছন্দসই ছিল না। হয়তো এ কারণেই ভারতে ভিন্নমতের মুসলিম রাজনীতির প্রকাশ দেখা দিতে শুরু করে। কিন্তু তারা ঠেকাতে পারেননি মুসলিম লীগের সম্প্রসারণ।

মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণ ছিল একাধিক। যতটা ইতিবাচক পথে তার চেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাবে। এর মধ্যে কংগ্রেসের বিভ্রান্তিকর বিরূপ প্রচার শিক্ষিত মুসলমান সমাজে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করে। লাহোর প্রস্তাবকে 'অর্থহীন' বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় শুধু নেহরু একাই তৎপর ছিলেন না, ছিলেন শীর্ষ নেতাদের অনেকে। এর প্রতিক্রিয়া লীগের পক্ষে গেছে, কংগ্রেসের পক্ষে নয়। তাছাড়া মুসলিম মানসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগের প্রভাব অস্বীকার করা কংগ্রেসের পক্ষে বাস্তব চিন্তার পরিচায়ক ছিল না। অখণ্ড ভারতের স্বার্থে তাদের উচিত ছিল লীগের সঙ্গে যতটা সম্ভব সমঝোতার পথ ধরে এগোনো। কুশলী রাজনীতির কৌশলগত প্রকাশ ঘটানো। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হন অহমিকার কারণে।

বড় অদ্ভুত যে লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত করে তোলার পুরো দায় যে 'হিন্দু প্রেস তথা প্রচার মাধ্যমের', তির্যক হাসিতে সেকথা শুধু জিন্না-ই বলেননি, পূর্বোক্ত বক্তৃতায় কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে কথাটা বলেছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খানও। তাদের ভাষায় 'পাকিস্তান' শব্দটির সঙ্গে মুসলমানদের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করেছে কংগ্রেস ও হিন্দু প্রেসের প্রচার'। তবে বিশেষভাবে হিন্দু মহাসভার বিরোধিতা মুসলিম লীগের প্রতি শিক্ষিত মুসলমানশ্রেণীর সমর্থন জোরদার করেছে। জিন্না ঠিকই বলেছেন, তিনি পাকিস্তান প্রস্তাব পেয়েছেন হিন্দুদের কাছ থেকে। অদূরদর্শিতা আর কাকে বলে!

অবশ্য লীগের প্রাপ্তি সবই নেতিবাচক পথে নয়। জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রচার মুসলিম লীগের শক্তি সংহত হতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রাখে বাংলা, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ। বিশেষভাবে বাংলা ও পাঞ্জাবের দুই মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে আবুল কাশেম ফজলুল হক ও স্যার সিকান্দার হায়াত খানের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ও তৎপরতা। এ কাজ জিন্না ও তার মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যে কথা আগে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে নেপথ্য শক্তি ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নার রাজনৈতিক চাতুর্য ও ক্রমশ গড়ে ওঠা ব্যক্তিত্বের প্রভাব। তবে চল্লিশের দশকের প্রায় মধ্যপর্যায় থেকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম ও তার সহকর্মীদের সাংগঠনিক শক্তি বঙ্গদেশে মুসলিম লীগকে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে সাহায্য করে তাদের শ্রমে ও বিচক্ষণতায়।

আমরা জানি সমাজে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রবল প্রভাবের কথা। আর এ দুই শক্তি ঐক্যবদ্ধ হলে তার সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য তা হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। প্রথম উপকরণটি যদি সর্বভারতীয় মুসলমান সমাজকে আত্মপরিচয়ে ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে তাহলে বলতে হয় দ্বিতীয় কারণটি লড়াইয়ের বাস্তব ভিত তৈরি করেছিল। প্রথম কারণটি সমগ্র ভারতের মুসলমান সমাজকে বিভ্রান্ত করতে সাহায্য করে। কিন্তু বঙ্গদেশে? বাংলার পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজে দুটো উপকরণই যুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ভুবন পাকিস্তানের পক্ষে জোয়ার সৃষ্টি করে। একা ফজলুল হক বা তার প্রজাপার্টির গণতন্ত্রী বা বামপন্থী নেতাদের সাধ্য কি সে জোয়ার ঠেকায়?

তারা পারেননি। পারেননি জোয়ার-পূর্ববর্তী ভিন্ন ঢেউ ওঠা লগ্নেও। পারেননি পাঞ্জাবি সেক্যুলার নেতা সিকান্দার হায়াত খান। পারেননি সিন্ধুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাবকশ। তবে দেরিতে হলেও তাদের চেষ্টার অভাব ছিল না। ১৯৪১ সালের মার্চে পাঞ্জাবের বিধানসভায় পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক বক্তৃতা ও পরিকল্পনা উপস্থাপনের পরও থেমে ছিলেন না সিকান্দার হায়াত খান।

এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে লিখেছেন : '১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসেই জিন্নার সঙ্গে বাংলা ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ও স্যার সিকান্দার হায়াত খানের মতান্তর প্রকাশিত হয়। তারা জিন্নাকে যেভাবে চ্যালেঞ্জ করেন তাতে অনেকেই বিস্মিত হন। এ বিষয়ে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ও শিব রাও-এর মধ্যে পত্রালাপ হয়। বাংলা ও পাঞ্জাবের রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তাই ছিল আলোচ্য বিষয়।' বাস্তবিকই ওই ঘটনা বাংলা ও পাঞ্জাবের রাজনীতিতে ঢেউ তুলেছিল।

'স্যার সিকানদার শিব রাওকে বলেন, 'কংগ্রেস ও জিন্না-বিরোধী মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এই দুই অংশ এখন সহজেই মিলিত হতে পারে, এমনকি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গেও মীমাংসায় পৌঁছতে পারে।' না, ওই দুই অংশ মিলতে পারেনি। পারেনি গান্ধি প্রমুখের প্রভাবে অনুসৃত কংগ্রেসের অদূরদর্শী নীতির কারণে। আর ব্রিটিশ সরকার যে এদের পক্ষে নয়, বরং জিন্নাকে যে তারা শিখণ্ডি দাঁড় করিয়ে কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এ সত্যটা স্যার সিকান্দার কেন বুঝতে পারেননি সেটাই বিস্ময়কর।

তবে এটাও ঠিক যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাদের পক্ষে ছিল না। কংগ্রেস উল্টোপথে হেঁটেছে আর ঘটনাও তাদের পক্ষে দাঁড়ায়নি। প্রমাণ আল্লাবকশ হত্যাকাণ্ড, সিকান্দার হায়াতের অকালমৃত্যু, বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, সুভাষচন্দ্রের ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টার মতো ঘটনাবলী। জিন্না ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে 'যুদ্ধ মানুষের জন্য অভিশাপ হলেও তার রাজনীতির জন্য আশীর্বাদ বয়ে এনেছে।' কংগ্রেসকে সামাল দিতে ভাইসরয় লিনলিথগোকে জিন্নার দিকে প্রসন্নমুখ ফেরাতে হয়েছে। জিন্না সে সুযোগ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন।

এ জন্যই আমাদের মন্তব্য : ঘরে-বাইরে পরিস্থিতি সেক্যুলার জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে ছিল না। হক-সিকান্দার তাই জিন্নার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি। সিকান্দার যত পরিকল্পনাই করুন ঘটনা ধীরে-সুস্থে হলেও দেশবিভাগের দিকে এগিয়ে গেছে। সে বিভাজন স্পর্শ করেছে বাংলা ও পাঞ্জাবকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্যাসিস্টশক্তির অগ্রযাত্রায় স্থানিক প্রতিক্রিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) ইউরোপে শুরু হলেও এর প্রভাব বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় ভাইসরয় যখন বলেন, 'ভারত এখন যুদ্ধাবস্থায়' তখন বুঝতে পারা যায় যুদ্ধের বাতাস ভারতের গায়েও লাগছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকা দিয়ে তা শুরু। তবে রাজনৈতিক অঙ্গনে সে প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায় ২২ জুন, ১৯৪১ থেকে যখন অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে হিটলার হঠাৎ সোভিয়েত ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়। ঘটে বিশ্বযুদ্ধে গুণগত পরিবর্তন, চরিত্রগত পরিবর্তন, যা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পাল্টে দেয়। বিশ্বের প্রগতিবাদী রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে উঠে আসে যুদ্ধের নতুন ব্যাখ্যা। দেখা দেয় সংকট।

সোভিয়েত ভূখণ্ডে জার্মান আক্রমণের প্রচণ্ডতা (ব্লিৎসক্রিগ) এতটাই ছিল যে, প্রাথমিক পর্বে বিশ্ববাসীর মনে এমন ধারণা জন্মে যে অচিরেই হিটলার রুশ দেশ দখল করে নেবে। হতে পারে রুশী শীতের প্রবলতা মাথায় রেখে (নেপোলিয়নের পরাজয় স্মরণে রেখে) হিটলার বাহিনী মধ্যগ্রীষ্মে আক্রমণ শুরু করে এবং দ্রুত বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। যুদ্ধবিশারদরা বলতে পারবেন সময়, প্রস্তুতি ও কৌশল বিবেচনায় রাশিয়া শুরুতেই সর্বশক্তির প্রতিরোধ তৈরি না করে জার্মান বাহিনীকে দেশের ভেতরে টেনে নিয়েছিল কিনা। কারণ পরবর্তী রুশী প্রতিরোধ বিশ্ববাসীকে চমকে দেয়।

যুদ্ধের বিস্তার ও আক্রমণের তীব্রতা সোভিয়েত রাশিয়াকে বাধ্য করে সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে। সেই সঙ্গে মতাদর্শের ক্ষেত্রে নমনীয়তায় সমঝোতার পথ ধরতে। কারণ বিষয়টা অস্তিত্ব রক্ষার। তাই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়। এভাবে যুদ্ধে মিত্রশক্তির আবির্ভাব। আতঙ্কিত বিশ্বপরিস্থিতিতে গণতন্ত্রী বিশ্বকে আশ্বস্ত করতে রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা 'আটলান্টিক সনদ'। ১৯৪১ সালের আগস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরে 'অগাস্টা' নামক রণতরীতে বসে যুদ্ধনীতি তথা শান্তিনীতির যে ঘোষণা দেন তাতে যেকোনো জনগোষ্ঠীর তাদের ইচ্ছামতো পদ্ধতির সরকার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পায় এবং জোর করে যাদের সে

অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে তাদের সেই সার্বভৌম অধিকার ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠা তারা দেখতে চান। এটাই আটলান্টিক চার্টারের মূলকথা।

এ ঘোষণা পরাধীন দেশগুলোতে বিশেষ করে ভারতে আশার সঞ্চার ঘটায়। আর সে আশায় পানি ঢেলে দিয়ে রক্ষণশীল দলীয় চতুর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল অতি দ্রুত (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) কমন্স সভায় এক বিবৃতিতে বলেন, 'আটলান্টিক চার্টারের' সুবিধা ভারত ও বার্মার মতো উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং ১৯৪০ সালের আগস্টে ভারত সরকার যে সমঝোতা ঘোষণা দিয়েছিল ব্রিটিশ নীতি সে পথ ধরেই চলবে (ভিপি মেনন)। আসলে যুদ্ধের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির মুখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার উপনিবেশ সম্পদ হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না।

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি তখনো মিত্রশক্তি বা ব্রিটেনের অনুকূলে নয়। বিশ্বফ্যাসিস্ট শক্তি ইতালি, জার্মানি, জাপান তখন এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা করছে। জার্মানির অব্যাহত অগ্রগতি তাদের উৎসাহিত করছে। তাদের লক্ষ্য ভাগ করে বিশ্বশাসন এবং ভোগদখল। জয়ের উন্মাদনায় তারা মার্কিন রণশক্তি পরিমাপ করতে ভুল করেছিল, সে ভুলের টানে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিন নৌঘাঁটি ব্যাপক বোমাবর্ষণে ধ্বংস করে ফেলে, আমেরিকাকে যুদ্ধে টেনে আনে। এ ভুলের মাসুল ভালোভাবেই জাপানকে দিতে হয়েছে এবং তারা এখনো তা দিচ্ছে। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ না দিলে অন্তত দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধের ফল কী হতো বলা কঠিন।

মনে হয় পরিকল্পনা এমন ছিল যাতে এশিয়ায় জাপান, ইউরোপে জার্মানি এবং অন্যত্র বিশেষত আফ্রিকায় জাপান ও ইতালি তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেয়ার ফলে মিত্রপক্ষের রণশক্তি অনেক বেড়ে যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ মহাদেশ হাতের মুঠোয় থাকার বহুমাত্রিক সুবিধা। তাছাড়া রয়েছে তাদের ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা। এত সব সুবিধা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের রণপ্রস্তুতির কারণে জার্মানি ও জাপানের প্রাথমিক রণসাফল্য ছিল অভাবিত। জার্মানির ইউরোপ দখলের মতোই জাপানেরও একই ব্লিৎসক্রিগ কায়দায় পার্ল হার্বার ধ্বংস ৭ ডিসেম্বরে (১৯৪১), এক সপ্তাহ পর সিঙ্গাপুর দখল। এরপর বার্মা। স্বভাবতই জাপানের নজর ভারতের দিকে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। জার্মানি ও জাপান মিলে ইউরোপ ও এশিয়ায় যেন নরকের আগুন জ্বেলে দিয়েছিল।

কেমন ছিল ভারতে বা বঙ্গে এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া। এ সময়কার কাগজগুলোতে ছিল যুদ্ধে পিছু হটা ব্রিটিশ সিংহকে নিয়ে বিদ্রূপ ও ঠাট্টাতামাশা– বিশেষ করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দক্ষিণ এশিয়ায় 'সম্মানজনক পশ্চাদপসরণ'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে। সারা ভারতে যেমনই হোক বঙ্গের রাজনীতিমনস্ক শিক্ষিতশ্রেণী উল্লসিত জাপানি অগ্রযাত্রায়। জাপানি বেতারে প্রচার চলে যাতে এ সুযোগে ভারত তার পরাধীনতা ঘোচাতে ঘুরে দাঁড়ায়। জাপানি অগ্রযাত্রার সমর্থনে বাঙালির উল্লাস মহকুমা শহর পর্যন্ত দেখা গেছে। যত আলোচনা স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে তার চেয়ে কম নয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পিছু হটার সুসংবাদে।

দুই

ঔপনিবেশিক শাসকশক্তির প্রতি পরাধীন দেশের মানুষের এ বিরূপতা যুক্তিসঙ্গত। তাই জাপানি আগ্রাসনে জাতীয়তাবাদী চেতনার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখেনি চীনে জাপানি সেনাদের বর্বরতা ও নৃশংসতার কথা। সুভাষচন্দ্রের জাপানে অবস্থান বিষয়টিকে জটিল করে তোলে। কড়াই থেকে উনানে পড়ার কথা না ভেবেই ইংরেজের পরাজয়ের সম্ভাবনায় রাজনীতিমনস্ক মানুষ খুশি। এ বিষয়ে কংগ্রেসে মতভেদ। নেহরু-আজাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না ফ্যাসিস্ট শাসককে সমর্থন। কিন্তু তা সম্ভব হয় গান্ধি, প্যাটেল ও প্রসাদদের পক্ষে।

অন্যদিকে যে বিষয়টা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে অধিকতর বিতর্ক তা হলো সোভিয়েত ভূমিতে জার্মান আগ্রাসনের ফলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এ যুদ্ধ ফ্যাসিস্টবিরোধী যুদ্ধ, জনযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে যুদ্ধে সরকারের প্রতি সমর্থনের নীতি ঘোষণা করে। আতে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের তিক্ত সম্পর্ক তৈরি হয়, এমনকি হয় ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গেও। বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিক জগতও একইভাবে বিভাজিত হয় অনেকটা রাজনৈতিক অঙ্গনের মতোই।

একদিকে কমিউনিস্ট পার্টির চেষ্টায় গড়ে ওঠে ফ্যাসিস্ট বিরোধী কবি-শিল্পী-নাট্যকার-সংগীতকারদের নিয়ে সংগঠন। আর তাই নিয়ে কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব আরএসপির সঙ্গেও। যা পরে দেখা যাবে ব্যাপকভাবে, তীব্রভাবে ভারত ছাড়ো নামের আগস্ট আন্দোলনের (১৯৪২) সময়। গোপাল হালদারের মতো ধীরস্থির বুঝদার লেখকও আগস্ট আন্দোলনের সমর্থকদের রচনা চিহ্নিত করেন 'বিয়াল্লিশি বিলাস' বলে। আপাতত থাক সেসব কথা। পরে যথাস্থানে তা আলোচিত হবে।

কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ ও প্রগতিবাদীদের ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের বিবাদ বিশ্বযুদ্ধ উপলক্ষ নতুন করে দেখা গেলেও মূল বিরোধিতা ছিল আদর্শভিত্তিক। অনেক সময় এক মঞ্চে দাঁড়িয়েও দুই পক্ষ দুই মেরুতে। আসলে বিশ্বযুদ্ধ সবকিছুই তালগোল পাকিয়ে দিয়েছিল—রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে পরস্পর বিরোধিতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন যুদ্ধের সমর্থন ও বিরোধিতা নিয়ে কংগ্রেসের ভেতরেই মতভেদ। বারদৌলি কংগ্রেস (ডিসেম্বর ১৯৪১) তার প্রমাণ। নেহরু-আজাদ প্রমুখ নেতা অহিংসার নীতি বর্জন করে শর্তসাপেক্ষে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগ্রহী। অন্যদিকে গান্ধি ও তার অনুসারী প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতা কোনোক্রমেই অহিংসানীতি বর্জনে রাজি নন। এমনকি স্বাধীনতার বিনিময়েও নন, শেষ কথাটা গান্ধির। এবং তা ওয়ার্ধা বৈঠকে।

ভারত বা বঙ্গের রাজনীতি তখন এমন এক অদ্ভুত দোটানায়, তিনটানায়– বলা চলে অনিশ্চিত টানাপড়েনে। মতভেদ যেমন কংগ্রেস হাইকমান্ডে, তেমনি কংগ্রেস বনাম ফরোয়ার্ড ব্লকে– কেন্দ্রবিন্দুতে সুভাষ। অন্যদিকে প্রবল বিরোধিতা কংগ্রেস ও জনযুদ্ধের স্লোগান– তোলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। দুপক্ষের সংস্কৃতি অঙ্গন যুদ্ধতালে সমান তৎপর। যুদ্ধের শুরুতে কমিউনিস্ট নেতারা সবাই সরকারি কল্যাণে কারাগারে। জনযুদ্ধের কল্যাণে তারা সবাই মুক্ত। যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থার কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত। চাল, কাপড়, চিনি, কেরোসিন, নুন ইত্যাদি ক্রমে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হতে শুরু করেছে। নিজের অভিজ্ঞতা বলি। সিনিয়র স্কুলছাত্র বিমলের জবরদস্তিতে শহরতলি পেরিয়ে গ্রামে ঘুরে এসেছি। মানুষ কেন জানি শঙ্কায় ভুগছে। বিমল ছাত্র ফেডারেশন কর্মী। সাধারণ শিক্ষিত সমাজ তাদের সমর্থক নয়।

AMARBOI.COM

যুদ্ধ-বিষয়ক নিরাপত্তা বিবেচনায় সরকার গড়ে তুলেছে শহরের জন্য 'সিভিকগার্ড' ও গ্রামের জন্য 'হোমগার্ড' বাহিনী– অনেকটা পুলিশ কনস্টেবল ক্যাডার পর্যায়ের। জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছে কমিউনিস্ট কর্মীরা। তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বোধহয় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মহকুমা শহরে বসে এসব তৎপরতা চোখে পড়ছে। মাঝে মধ্যে টাউন হলে এসব বিষয়ে সরকারি তত্ত্বাবধানে সভা-বৈঠক হয়। কী হচ্ছে দেখার ও বোঝার জন্য একবার এমন এক সভার সর্বপেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারি চারদেয়ালের বাইরে মানুষ যুদ্ধে ব্রিটিশবিরোধী, ইংরেজের পরাজয় প্রত্যাশী।

হোমগার্ড, সিভিকগার্ডদের নিয়ে শহুরে মানুষের মধ্যে অনেক ঠাট্টা-রসিকতার প্রচলন বুঝিয়ে দেয় শিক্ষিত শ্রেণী এসব প্রচেষ্টা কী চোখে দেখেছে। তখন ঠিক বোঝা যায়নি সামাজিক দুরবস্থার মূল কারণ শাসনব্যবস্থায় নৈরাজ্য ও যুদ্ধকালীন অভ্যন্তরীণ সরকারি নীতি। প্রদেশ থেকে প্রদেশে খাদ্য চলাচল নিয়েও ছিল খবরদারি। কারো মানবিক চেতনায় প্রশ্নটা ঘণ্টা বাজায়নি যে খাদ্যসামগ্রী চলাচলে কড়াকড়ি ও অবহেলা এ দুই কারণে, প্রান্তিক প্রদেশে সাধারণ মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাপানি আক্রমণের অগ্রযাত্রা এবং যুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর ক্রমাগত পরাজয় ও পিছু হটা ব্রিটিশ রাজের মনোবলে কিছুটা হলেও চিড় ধরিয়ে ছিল। তা না হলে তাদের কাজকর্মে অস্থিরতা ও অবিবেচনা দেখা দিত না। এ সবের সর্বাধিক প্রভাব পড়ে বঙ্গদেশে, পূর্বপ্রান্তের ও বার্মাসংলগ্ন প্রদেশ হওয়ার কারণে। জাপানি আতঙ্ক যে শাসকদের কতটা প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ মেলে বঙ্গে নৌকা ধ্বংস করার উন্মাদ আচরণে।

ভাবখানা এমন যে, জাপানিরা ঠিকই বার্মা হয়ে পূর্ববঙ্গে পৌছে যাবে এবং নৌকা না পেলে তারা আর এখান থেকে এগোতে পারবে না। যত হাস্যকর চিন্তা ও কর্মকাণ্ড! আর এ পাগলামির কারণে বছরখানেক পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় পদ্মাবোটটি রক্ষা করতে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই বোটটিকে নিয়ে গঙ্গা-পদ্মা পাড়ি দিয়ে সুদূর পতিসরে গিয়েছিলেন। এসব বেশ কিছু সময় পরের কথা।

কিন্তু এ সময়ের স্থানীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের ঘোষণা এবং মূলত কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ব্যাপক কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার এবং সেই সঙ্গে মুসলিম লীগেরও ভূমিকা। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের অনুগত ও অনুসারীদের বাইরে অনেকটাই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কংগ্রেসের সাধারণ সমর্থকদের দৃষ্টিতে তখন তারা ইংরেজ শাসকের দালাল।

এ পরিস্থিতি বিশেষভাবে তৈরি হয় ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ব্যাপক প্রতিক্রিয়ায়। রাজনীতিমনস্ক শিক্ষিত জনশ্রেণী পরাধীনতা বনাম স্বাধীনতার বিষয়টাকে সঙ্গত কারণে এতটা গুরুত্বে গ্রহণ করে যে তারা ফ্যাসিস্ট বিরোধিতার রাজনৈতিক তাৎপর্যের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। প্রায় দুশো বছরের উপনিবেশবাদী শাসকদের পরাজয় ছিল তাদের কাম্য।

কিন্তু তারা হিসাব করতে চাননি যে ইংরেজ রাজশক্তির পরাজয়ের জের ধরে জাপানের মতো নতুন পরাক্রমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতের শাসনভার হাতে নিয়ে নিতে পারে। তারা নতুন করে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে। সেদিক থেকে জাপান তো এক পায়ে খাড়া। কারণ তারা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মণিপুর কোহিমায় কড়া নাড়তে শুরু করেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কি সাধ্য ছিল তাদের প্রতিহত করে? দিল্লির লোভনীয় সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে দেয়া কি সম্ভব হতো বিজয়ী জাপানের পক্ষে? যতই তারা প্রতিশ্রুতি দিক না সুভাষ ও তার ফৌজি নায়কদের? রাজনীতির এ কূট হালচাল শিক্ষিত বঙ্গবাসীর বড়সড় অংশ আমলে নেয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা বুঝতে চাননি যে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল ব্রিটিশরাজের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত সমঝোতার ভিত্তিতে ফ্যাসিস্টবিরোধী যুদ্ধে সহায়তাদানই ভারতবাসীর জন্য ভবিতব্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রে যুদ্ধশেষে ক্ষমতার হস্তান্তর নিয়ে বড় বাধা লীগ-কংগ্রেসের পারস্পরিক বৈরিতা এবং তা আবার সাম্প্রদায়িক টানাপড়েনে। কোনো প্রস্তাবেই তারা একমত হতে পারেনি। এটা ছিল স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারতবাসীর জন্য বড় দুর্ভাগ্য।

তবু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরাজকে মিত্রশক্তির বিজয় লাভের দুবছরের মধ্যে ভারতের শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। এবং তা সমঝোতার ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে। ১৯৪২ সাল থেকে ক্রিপস প্রস্তাবের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া শুরু এবং ১৯৪৭-এর মধ্যআগস্টে সমঝোতা প্রক্রিয়া শেষ। মধ্যিখানে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে রক্তস্রোতের বড় বড় ঢেউ– কী প্রবল অমানবিক বিদ্বেষ ও ঘৃণার প্রকাশ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে!

অন্যদিকে জনযুদ্ধের নামে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার চালচিত্রটা ছিল ব্যাপক, যে কথা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ফ্যাসিস্টবিরোধী তৎপরতাও নেহাৎ কম শক্তিমান ছিল না। তিরিশের কবি বিষ্ণু দের একাধিক কবিতা '২২ জুন'ই শুধু নয়, আরো অনেকের যেমন সমর সেনের বা সুভাষ-সুকান্তর কবিতায়, লেখায় তা প্রকট। বিস্ময়ের ঘটনা যে মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত-ভূমির প্রতি সহমর্মিতায় নিয়মিত খবর নিতেন যুদ্ধের, যদিও রুশী জয়টা দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় 'বোঁচা গোঁফের হুমকি' নিয়ে তির্যক ছড়া কাটতে কসুর করেননি। তবে এ যুদ্ধ যে নতুন রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক পরাশক্তির উদ্ভব ঘটাতে যাচ্ছে সে অশুভ বার্তা তার জানা ছিল না। জানার কথাও নয়। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে নানা তথ্যে ওই মহাসত্যটার ইঙ্গিত মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে প্রধান বিশ্বশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বযুদ্ধের দুবছর পেরিয়ে গেছে, তবু চলছে নরহত্যার নির্বিকার প্রক্রিয়া। ১৯৪২ সালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা বছরটা উত্তেজক ঘটনাবলীতে জারিত। যেমন আন্তর্জাতিক পরিসরে তেমনি আমাদের দেশি রাজনীতির ক্ষেত্রে। এ সময় বিশ্বযুদ্ধের যেমন বাঁক ফেরার ইঙ্গিত তেমনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চাপে রক্ষণশীল ব্রিটিশমন্ত্রী চার্চিলের ভারতে সমঝোতা দূত পাঠানো ছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারার কূট-চাতুরী। অন্যদিকে হঠাৎ করেই গান্ধিরাজনীতির পার্শ্ব পরিবর্তন।

পার্ল হার্বার অঘটনের প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান আসলেই ছিল রাজনৈতিক বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মিত্রশক্তি যেমন তাতে শক্ত মাটিতে পা রাখার সুযোগ পায় তেমনি এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যুক্তরাষ্ট্রই মিত্রবাহিনীতে বড় তরফ। যুদ্ধের বাঁক-ফেরা গতি যেমন তাতে বেড়েছে তেমনি বেড়েছে সর্বত্র মার্কিনি প্রভাব। তাই আশ্চর্য হওয়ার কথা নয় যদি বঙ্গের এক অখ্যাত মহকুমা শহরে ডাকবাংলোর মাঠে তাঁবুতে থাকা তিন সৈনিকের মূল ব্যক্তিটি একজন তরুণ আমেরিকান (শ্বেতাঙ্গ) হয়ে থাকে। মনে হয় ওদের অন্য কোনো দায়িত্ব ছিল না ঘুরেফিরে শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ছাড়া। অন্তত ওদের দেখে আমার তা-ই মনে হয়েছিল।

যুদ্ধে যোগ দিয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচক্ষণ বা দূরদর্শী কোনো কোনো মার্কিন কূটনীতিকের বোধহয় তাদের ভবিষ্যৎ শক্তি ও অবস্থান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণাই হয়ে থাকবে। তা না হলে ব্রিটেনে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ কেনেডি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পাঠানো তার গোপন ডেসপাচে এমন ইঙ্গিত দিতে পারতেন না যে, যুদ্ধের ফল যা-ই হোক এ যুদ্ধ ব্রিটেনকে বিশ্বশক্তির ওপরের ধাপ থেকে নিচে নামিয়ে আনবে। ইংরেজিভাষী বিশ্বের নেতৃত্ব আমাদের হাতেই আসবে (উদ্ধৃতি 'কুইট ইন্ডিয়া' গ্রন্থের)। আসলে ইংরেজিভাষী নয়, গোটা বিশ্বের নেতৃত্বই যুদ্ধের পরিণামে ক্রমে তাদের হাতে পৌঁছেছে।

ওই ঘটনা যুদ্ধের সূচনা-লগ্নের এবং এক বছর পর বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন একজন বিশিষ্ট মার্কিন শিল্পপতি ভার্জিল জর্ডান বলেন, 'যুদ্ধের পর নব্য সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতায় ব্রিটেন হবে বড়জোর আমাদের এক কনিষ্ঠ অংশীদার। কারণ অর্থনৈতিক, সামরিক, এমনকি নৌ-শক্তি সবকিছুরই মূল কেন্দ্রীয় শক্তি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।' বাস্তবিকই এরা বিশ্বরাজনীতির ভবিষ্যৎটা দেখতে পেয়েছিলেন তাদের বাস্তবচিন্তায়।

আর নেহরুর (জওহরলাল) মার্কিনি শক্তি সম্পর্কে মন্তব্য কী ভেবে লিখিত বলা কঠিন। কারণ আপাতবিচারে এবং মাঝে মধ্যে কথাবার্তায় সমাজবাদী বক্তব্য প্রদানে অভ্যস্ত নেহরু (যে জন্য গান্ধি চিন্তিত ছিলেন না– কারণ তিনি জানতেন ঘরের পাখি ঠিক সময়ে ঘরে ফিরবে– এবং সেজন্যই তিনি নেহরুকে তার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি) মার্কিনি গণতন্ত্রের প্রশংসা করে লিখতে পেরেছেন যে 'বিশ্বে পরবর্তী শতক হবে আমেরিকার শতক'। তার ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্যে পরিণত হবে সেকথা হয়তো তিনি ভাবেন নি। এ কথাও লেখেন যে, 'আমেরিকার ওপর রয়েছে দায়িত্বের বিশাল বোঝা এবং সঠিক নেতৃত্বের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষ।'

সত্যই কি তাই? সমাজবাদী গণতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত জওহরলাল নেহরুর পক্ষে এ ধরনের মতামত বিস্ময়কর নয় এ কারণে যে রাজনীতিতে তিনি বরাবর স্ববিরোধী বক্তব্য ও আচরণের জন্য পরিচিত। তৎকালীন কংগ্রেসী রাজনীতিতে তিনি সুভাষ-বিরোধিতার জন্যও পরিচিত। কখনো কখনো চড়াসুরে বা আবেগে সমাজতন্ত্রের পক্ষে বক্তব্য রেখেও বারবার ওয়ার্ধায় গান্ধিক্যাম্পে ফিরে গেছেন। এবং সেটা গান্ধির রাশটানার কারণে। গান্ধি নেহরু-চরিত্র সঠিকভাবে মেপে নিতে পেরেছিলেন বলেই জওহরলালের আবেগদৃপ্ত ভাষণে বিচলিত হতেন না– তা সে ভাষণ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে হোক বা সমাজতন্ত্রের পক্ষে হোক।

তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যখন সমাজবাদী চেতনার রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত জওহরলাল নেহরু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চারিত জনযুদ্ধ স্লোগানের সমালোচনা করেন এবং কানপুরে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২) কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন যে, তারাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শক্তি জুগিয়ে চলেছে (নির্বাচিত রচনাবলী)।

মিত্রশক্তির সদস্য হওয়ার কারণে রাশিয়া ও চিয়াং কাইশেকের চীনের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। এবং শ্রমজীবী জনতাকে সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশরাজের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে সক্রিয় হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। আবার এই জওহরলালই যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিয়াং কাইশেকের সম্মানীয় অতিথি হয়ে চীন ভ্রমণ করে আসেন এবং ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে চিয়াং কাইশেক যখন সদলবলে ভারতে আসেন তখন তার সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক রাজনৈতিক আলোচনায়ও মিলিত হন।

বিশ্বযুদ্ধের অবস্থাদৃষ্টে নেহরুর মনে হয়তো এমন ধারণা জন্মে যে, ক্ষয়িষ্ণু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন। এটা নেহাৎ সময়ের ব্যাপার মাত্র। হয়তো ভেবে থাকবেন, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য সময়ের নিয়মে ভেতর থেকে ক্রমশ ক্ষয় পেতে পেতে এক সময় তা স্বাভাবিক নিয়মে বা বিশেষ কোনো ঘটনার চাপে হঠাৎ করেই ভেঙে পড়বে। ঘটনা সেক্ষেত্রে উপলক্ষ মাত্র। ইতিহাসে তা প্রায়ই দেখা যায়। যেমন ভারতবর্ষে দীর্ঘকালীন পাল সাম্রাজ্য বা মুঘল সাম্রাজ্য। এ বিষয়ে গান্ধির ধারণাও ভিন্ন ছিল না।

হয়তো ব্রিটেনের বাস্তবচিন্তার রাজনীতিক কারো কারো মনেও এমন ধারণা বাসা বেঁধে থাকতে পারে, যেমন শ্রমিক দল ও উদারনৈতিক দলের সদস্য ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ও তার সহযোগী কেউ কেউ। তাই তাদের চিন্তা ভারতের সঙ্গে একটা সম্মানজনক সমঝোতার পক্ষে-যাতে 'রাজ'-এর ঐতিহ্যবাহী গৌরব নষ্ট না হয়, আবার বাস্তব অবস্থাও সামাল দেয়া যায়। সে সমঝোতার মধ্যমণি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।

এ ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়, অন্তত ভারতবাসীর জন্য। ইতিহাস পাঠকের মনে থাকতে পারে, নাৎসি বাহিনীর ইউরোপ আক্রমণের বর্বরতা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাদের বাঁচাতে, বিশেষ করে ফ্যাসিস্টদের প্রতিরোধে সাহায্য করতে রুজভেল্টের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের একাংশে সমালোচিত হয়েছিলেন।

শুধু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টই নন, একাধিক রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে ব্রিটেনের ওপর এ চাপ তৈরি হয়েছিল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমন্স সভায় রক্ষণশীল প্রাধান্য সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থে ব্রিটেনে তখন শ্রমিক দল ও উদারনৈতিক দল নিয়ে 'জাতীয় সরকার' গঠন করা হয়, যাতে সমস্যার কার্যকর মোকাবেলা সহজ হতে পারে।

ভাবতে অবাক লাগে আমরা রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-বিধানাদি পাশ্চাত্য থেকে, ব্রিটেন বা আমেরিকা থেকে আমদানি করলেও তাদের স্বদেশহিতকর ভূমিকা অনুসরণ করি না। সঙ্কটে জাতীয় সরকার গঠন দূরে থাক, দলীয় সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না। রাজনীতির এসব দিক বিবেচনায় আমরা বড়ই অদূরদর্শী। জাতীয় স্বার্থ আমাদের কাছে কখনো প্রাধান্য পায় না। পায় ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থ। এদিক থেকে পশ্চিমের রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রশংসা দাবি করতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

ব্রিটিশ রাজনীতিতে ভারত বিষয়ক সমঝোতার ধারণা সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানের দ্রুত আগ্রাসী তৎপরতা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতো তাদের মনেও ভয় পাছে জাপান ভারত আক্রমণ করে বসে। রেঙ্গুন থেকে আসাম বা পুবের বঙ্গদেশ তো একেবারে হাতের নাগালে। তদুপরি সুভাষচন্দ্রের রয়েছে নিজস্ব ফৌজ নিয়ে দিল্লি দখলের পরিকল্পনা। সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধ-শ্লোগান– 'চল চল দিল্লি চল, লালকেল্লা দখল কর' বাঙালি তরুণদের মাতিয়ে তুলেছিল।

সঙ্গত কারণে এবং পূর্ববাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে জাপানি আগ্রাসন সম্বন্ধে চীনের ভয়ভীতিও কম ছিল না। চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা চিয়াং কাইশেক তখন চীনের হর্তাকর্তা-বিধাতা। চীনও তখন বিশ্বযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সদস্য। চীনেরও ইচ্ছা ভারতবর্ষ এ যুদ্ধে মিত্রশক্তির সহায়তায় এগিয়ে আসুক। এ চিন্তা মাথায় রেখে ফেব্রুয়ারিতে (১৯৪২) ভারত সফরের সময় চিয়াং মাদাম চিয়াং কাইশেকসহ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

বিষয়টা মাওলানা আজাদের আত্মজীবনীতেও যথাযথ গুরুত্বে স্থান পেয়েছে। আজাদ লিখেছেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ভারতবিষয়ক সহানুভূতির কথা। সেই সঙ্গে লিখেছেন যে, 'চীনের রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাইশেকও একই অভিমত পোষণ করতেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি জোরের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নেয়ার জন্য ইংরেজদের পরামর্শ দিচ্ছিলেন। জাপান পার্ল হার্বার আক্রমণের পর তিনি আরো জোরের সঙ্গে তার অভিমত ব্যক্ত করতে থাকেন'। তার ভাষায় :

'চিয়াং কাইশেক প্রথম থেকেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়ার জন্য চাপ দিয়ে এসেছেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন, ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতা না করলে তার কাছ থেকে যথোপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যাবে না।' তবে ভারতে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সময় চিয়াং কাইশেক অবশ্য তাৎক্ষণিক স্বাধীনতার বদলে পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

আর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাওলানা আজাদ চিয়াং কাইশেককে বলেছিলেন, 'ব্রিটেন যদি যুদ্ধ চলাকালে ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয় এবং শাসনকার্যে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয় তাহলে কংগ্রেস অবশ্যই ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব মেনে নেবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আরো বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি যুদ্ধের পরে ভারতকে স্বাধীনতা দেয়ার কথা স্বীকার করে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে সর্বব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।'

কিন্তু সমস্যা ছিল লড়াইয়ের মতোই রাজনীতির একাধিক ফ্রন্টে। যেমন মাওলানা আজাদের মতামত নিয়ে তাদের দুই বিপরীত গ্রুপেই ভিন্নমত ছিল। এবং তা মূলত পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা ও অহিংসা নীতি নিয়ে। অন্যদিকে ব্রিটিশ পক্ষেও ছিল ভিন্নমত প্রচ্ছন্নভাবে, কূটনৈতিক ও রাজনীতিক চাতুরীর মাধ্যমে। ক্রিপস সাহেবের সমঝোতা-দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার সেটাও বোধহয় অন্যতম কারণ। দায় অবশ্য ভারতীয় রাজনীতিকদেরও ছিল। এ ক্ষেত্রে মাওলানা আজাদ ছিলেন স্পষ্টবাদী, রাজনৈতিক কূটকৌশল বা ছলচাতুরীতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না।

কিন্তু কূটনৈতিক খেলা রাজনীতির বড় তরফ। সেখানে নীতি-নৈতিকতা অপাঙ্‌ক্তেয়। 'ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয়', অর্থাৎ 'সত্যের জয় অসত্যের পরাজয়' নিছক আপ্তবাক্য। যে যত চাতুর্যে খেলতে পারবে দাবার ছকের লড়াইয়ে তারই জয়। বিয়াল্লিশে ভারতীয় ভবিষ্যৎ নিয়ে কত যে কুশীলবের প্রকাশ্য ও নেপথ্য চাল– তাই নিয়ে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হতে পারে। আমরা আশ্চর্য হই দেখে যে একপক্ষেই একাধিক স্রোত, তার কিছুটা প্রকাশ্য, অনেকটাই প্রচ্ছন্ন। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অহমবোধ প্রাধান্য পেয়েছে, নষ্ট করেছে জাতীয় স্বার্থ, দেশি স্বার্থ।

ব্রিটিশ-ভারতীয় মঞ্চে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় কত বড় এক মহাকাব্যিক নাটক যে অভিনীত হয়েছিল, সংখ্যায় কত যে এর পাত্রপাত্রী এবং কী অবিশ্বাস্য গুরুত্বে ও তাৎপর্যে সেই খেলা, ক্ষমতার হস্তান্তরের বিপুল পরিমাণ তথ্যাবলীতে তার কিছুটা আভাস মেলে। ঘটনার পরস্পরবিরোধী স্রোতের অবিশ্বাস্য পরিণামে এ যেন মিনি কুরুক্ষেত্রেরও অধিক। সংঘাতময় কুটিল-জটিল এ মহানাটক, যে যেমনই বলুক, আমার বিশ্বাস ১৯৪২ থেকে '৪৭ আগস্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ ক্রিপস মিশন থেকে কেবিনেট মিশন পর্যন্ত এ নাট্য-অভিনয় চলেছে– মধ্যখানে বিচিত্র ঘটনাবলীর টানাপড়েন। রয়েছে এর পূর্বকথা শুরু থেকে, সঙ্গে নানা স্রোত অনুকূল-প্রতিকূল, অন্তত ভারতের ভবিষ্যৎ পরিণাম রচনায়। সেখানে রক্তস্রোতও কম ছিল না। বরং সেটাই ছিল বিভাজনের 'টার্নিং পয়েন্ট' (বাঁকফেরা বিন্দু)।

বিভাজনের চাবিকাঠি যেসব ঘটনাতেই থাকুক, ভারতবাসীর হাতে ব্রিটিশরাজের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রধান প্রেক্ষাপট ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের ক্ষয়ক্ষতি ও অর্থনৈতিক মন্দা। নিয়মমাফিক অর্থনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্দা কাটাতে উপনিবেশ ধরে রাখা এবং শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখারই কথা। সে চেষ্টা যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্রিটেন করেনি তা নয়। যে জন্য যুদ্ধাবস্থায়ই সমঝোতা মিশন পাঠানো। লক্ষ্য করার বিষয় যে এসব সত্ত্বেও ভারতীয় উপনিবেশ ছেড়ে আসার ব্যাপারে মনস্থির করতে তাদের অন্তত ৫ বছর সময় লেগেছে– অর্থাৎ ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ।

ক্ষমতা ছাড়ার পক্ষে যেমন প্রবল চাপ ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দিক থেকে তেমনি ছিল ভারতীয় রাজনীতির অভ্যন্তরীণ চাপ। ছিল ভূকম্পনের মতো ভারতীয় রাজনীতির বিরূপ পরিবেশ। এমনকি 'রাজ' সমর্থকদেরও কেউ কেউ রীতিমতো নড়েচড়ে ওঠেন, আহ্বান জানান সুসম্পর্ক বজায় রেখে আসন ছেড়ে দিতে। অন্যদিকে গান্ধি যতই কংগ্রেসে অহিংসার পক্ষে প্রস্তাব পাস করান না কেন তার বুঝতে বাকি থাকে না যে অহিংসা-বিরোধীদের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে।

তাই তিনি যখন তার ওপর অর্পিত একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে চিঠি লেখেন তখন তা গৃহীত হয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের প্রতি সহযোগিতার নীতিই বহাল রাখে এবং তা বরাবরের মতো লীগ ও মুসলিম স্বার্থ বিষয়ক দাবি মেনে নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। বলা দরকার যে ভাইসরয় লিনলিথগোর রক্ষণশীল চাতুর্যের কারণে ক্ষমতার হস্তান্তর বিলম্বিত হয়েছে, ক্রিপস প্রস্তাব ব্যর্থ হয়ে অবাঞ্ছিত পথে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে।

ভি.পি মেনন ঠিকই বলেছেন, ১৯৪২ সালের শুরুতে বহু সংখ্যক ভারতীয় নেতা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বিলেতে ব্রিটিশরাজের প্রতি জোরালো আহ্বান জানাতে শুরু করেন। যেমন তেজবাহাদুর সাপ্রু, এম জয়কর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যার রাধাকৃষ্ণান, মুহম্মদ ইউনূস, স্যার জগদীশ প্রসাদ, স্যার শিবস্বামী আয়ার প্রমুখ খেতাবপ্রাপ্ত বিদগ্ধজন। আমরা দেখেছি, এর আগে ফজলুল হক-আল্লাবক্স-সিকান্দার হায়াত খান প্রমুখ রাজনীতিক একই দাবি জানিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

এক কথায়, ক্ষুব্ধ ভারতভূমি। অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের মানসিক ও অর্থনৈতিক চাপ। এমনকি চাপ 'জাতীয় সরকারের' উদারনৈতিক সদস্যদের পক্ষ থেকে। স্বভাবতই বেনিয়া চাতুর্যের প্রতিনিধি উইনস্টন চার্চিল একজন উদারনৈতিক সদস্যকেই সমঝোতা প্রস্তাবসহ ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। উদ্দেশ্য এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিপস প্রস্তাব নিয়ে নানা টানাপড়েন

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার একটি ছত্র, এখানে অবশ্য ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত : 'সময় হয়েছে নতুন খবর আনার'। ব্রিটেন-ভারতের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনে সমঝোতার নয়া বার্তা নিয়ে ভারতে এসে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন উদারপন্থী রাজনীতিবিদ স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস। ভারতীয় রাজনীতিকদের জন্য এই প্রথম ব্রিটিশরাজ-এর তরফ থেকে নতুন বার্তা নিয়ে দিল্লি আসেন তাদের প্রতিনিধি স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের রাজশক্তি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবী তৎপরতা শক্ত হাতে, ডাণ্ডা হাতে ঠাণ্ডা করেছে। গুলি, ফাঁসি, জেল-জুলুম-নির্যাতন কিংবা আন্দামান কিছুই বাদ যায়নি। ভারত দখলের একশ বছরের মাথায় যে বিদ্রোহ তা নৃশংস বর্বরতায় দমন করা হয়। তাতে ছিল প্রতিহিংসার প্রকাশ। পরবর্তী ৯০ বছরের লড়াইও ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে ১৯৩০-৩১ সময়-পর্বের বিপ্লবী সংগ্রাম। বেশ চলেছে তাদের বিভাজন নীতি, সম্প্রদায়গত বিভাজনের চতুর খেলা।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝড়ো হাওয়া উপনিবেশ শাসনের নিশ্চিন্ত আরাম হারাম করে দেয়। ইউরোপে জার্মান-ঝড়ের পর এশিয়ায় তথা ভারত মহাসাগরে জাপানি পীতবোমার হঠাৎ হামলা। পদ্ধতি জার্মান 'ব্লিৎসক্রিগের' মতোই। পাখিদের মতো ঝাঁকবেঁধে হামলা। পার্ল হার্বার ঘাঁটি ধ্বংসের দুমাস পর আবার হঠাৎ জাপানি আক্রমণ– সিঙ্গাপুর ও বার্মার যথাক্রমে পতন ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৪২) ও ৭ মার্চ (১৯৪২)। ব্রিটিশ বাহিনীর বিপর্যস্ত পরাজয়ের কালো ছায়া পূর্ব ভারতের আকাশে।

এ অবস্থায় পীত আগ্রাসন থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে এবং সেখানকার রাজনৈতিক, অস্থিরতা প্রশমনে নতুন করে ভারত-নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজন ভারতের নানামাত্রিক সহায়তা। যুদ্ধ মোকাবেলায় ব্রিটেনে তখন সর্বদলীয় যুদ্ধমন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল রক্ষণশীল রাজনীতির হলেও পার্লামেন্টে উদারপন্থীদের প্রাধান্য। তারা ভারত সম্বন্ধে কিছুটা নমনীয়। হয়তো তাদের মাথায় সংস্কৃত শ্লোকের নীতিকথার মতো চিন্তা

AMARBOI.COM

কাজ করেছে যে 'সর্বনাশের মুখে অর্ধেক পরিত্যাগ বিচক্ষণতার পরিচায়ক'। অর্থাৎ আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দিয়েও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা সম্ভব। নিদেনপক্ষে ভবিষ্যতে স্বাধীনতার ছাড়পত্র দিতে হলে 'কমনওয়েলথ'-এর গোয়ালে ধরে রাখা।

এ উপলক্ষে মন্ত্রিসভার প্রথম পরিকল্পনায় পেরেক ঠোকেন ভাইসরয় লিনলিথগো। ভাইসরয়ের আপত্তির মুখে অ্যাটলি সাহেবের সভাপতিত্বে নতুন কমিটির তৈরি খসড়া প্রস্তাব কিছুটা বাস্তবোচিত হলেও ধোপে টেকেনি। ইতিমধ্যে এসেছে ভাইসরয়েরও একটি বিকল্প প্রস্তাব। কিন্তু ওই যে বলে, ব্যাটে-বলে হচ্ছে না। ভাইসরয় এবং মন্ত্রীমণ্ডলের মতের মিল হচ্ছে না। ভাইসরয়ের গুরুত্ব এক্ষেত্রে অধিক এ কারণে যে সমঝোতা প্রস্তাব গৃহীত হলে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব ভাইসরয়ের। তাই তাকে ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না। আমার বিশ্বাস লিনলিথগো এ সুযোগটাই নিচ্ছিলেন। ভারতীয় স্বশাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি।

এ তাত্ত্বিক অচলাবস্থা দূর করতে শেষ পর্যন্ত স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসকে পরিত্রাতার ভূমিকায় নামতে হয়। বিশেষ করে ভারত সম্বন্ধে তার পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে। তিনি ভারতবান্ধব হিসেবে পরিচিত। বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কিছুদিন পর তার বেসরকারি ভারত সফর, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা বিশেষ করে যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা সম্পর্কে। ওই সফরে মাওলানা আজাদ তাকে বলেছিলেন, 'সবই নির্ভর করছে ব্রিটিশরাজের সদিচ্ছার ওপর।'

এরপর স্টাফোর্ড ক্রিপস মস্কোতে যান ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত হয়ে। তার দৌত্যে মস্কো-লন্ডন সম্পর্কে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। মাওলানা আজাদের মতে, এ সময় কূটনীতিক হিসেবে তার সাফল্য নিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রশংসা তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে নতুন মাত্রা যোগ করে। দেশে ফিরে যুদ্ধ-মন্ত্রিসভায় যোগ দেন, নির্বাচিত হন কমন্স সভায় দলনেতা। সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহলের চাপা আলোচনার মধ্যমণি স্যার ক্রিপসের মাথায় ব্যর্থতার বোঝা চাপিয়ে তার রাজনৈতিক জীবনে ধস নামাতেই কি চার্চিলের কূটবুদ্ধি স্যার ক্রিপসকে ভারত মিশনে পাঠাতে বেছে নেয়? হতে পারে।

দিল্লি সফরকালে স্যার ক্রিপস কথা প্রসঙ্গে হডসনকে জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'ভারতীয় সমস্যার সমাধান অবশ্যই করতে হবে।' আমার বিশ্বাস, ভারতের স্বশাসন সম্বন্ধে ঘরে-বাইরে চাপের কারণে বিরক্ত চার্চিল হয়তো ভারত সম্পর্কে অতিউৎসাহী ক্রিপসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক ডানা ছেঁটে ফেলতে ও এক ঢিলে দুই পাখি মারতে তাকে সমঝোতা প্রস্তাব দিয়ে ভারতে পাঠান যা 'ক্রিপস প্রস্তাব' নামে রাজনৈতিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ।

চার্চিলের জানা ছিল ভারতে হিন্দু-মুসলমান ও লীগ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব এবং সাম্প্রদায়িকতার পাথুরে দেয়াল এত শক্ত যে তা ভেঙে রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানো ক্রিপস কেন, কারো পক্ষেই সহজ নয়। তদুপরি রয়েছে ভাইসরয়ের এ বিষয়ে ভিন্নমত। কাজটা তার জন্য কঠিনই হবে, অসম্ভবও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্রিপসের ব্যর্থতা তার জনপ্রিয়তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। ঘটনার তেমন পরিণামই ইতিহাসে লেখা রয়েছে। এ নাটকের নায়ক প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও ভাইসরয় লিনলিথগো। আর পরোক্ষে গান্ধি-জিন্না অর্থাৎ লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব।

প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১১ মার্চ (১৯৪২) কমন্সসভায় জানান, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য দিল্লিতে পাঠানো হচ্ছে। নীতি হিসেবে তিনি ঘুরে-ফিরে ভাইসরয়ের আগস্ট (১৯৪০) প্রস্তাবের গুরুত্ব উল্লেখ করেন যা প্রধান ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো গ্রহণ করেনি। এমন একটি প্রস্তাব নিয়ে ক্রিপস ভারতে আসেন যা একদিকে কাটলেও অন্যদিকে কাটবে না। তদুপরি ভারতের শাসকগোষ্ঠীতে ছিল একাধিক প্রতিকূল স্রোত যা ক্রিপস-দৌত্য ব্যর্থ করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিমান।

এইচ ভি হডসন তখন ভারতে রিফর্মস কমিশনার। ভাইসরয় লিনলিথগোর সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম। অনেক সময় বড় সাহেবের রাজনৈতিক পরিকল্পনার শাব্দিক রূপ তৈরি করে দেন চৌকস লেখনীতে। এভাবে হয়ে ওঠেন বড়লাটের কাছের মানুষ। কাজেই রাজনীতির হাঁড়ির খবর তার জানা। তার জবানিতে জানা যায়, ব্রিটিশ কেবিনেটের নমনীয় সিদ্ধান্ত পছন্দসই ছিল না বড়লাট লিনলিথগোর। আবার তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন দক্ষিণ এশীয় যুদ্ধে পিছুহটা ব্রিটিশ বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপতি লর্ড ওয়াভেল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনদণ্ডের দুই প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে ব্রিটিশরাজের ভারত নিয়ে ভাবনায় প্রচ্ছন্ন মতানৈক্য যে স্টাফোর্ড ক্রিপসের ভারত-পরিকল্পনার ওপর বিরূপ ছায়া ফেলবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যতই তাদের মতামত অগ্রাহ্য করে ক্রিপস তার নিজস্ব চিন্তা এবং ব্রিটিশ উদারনীতিকদের মনোভাবের প্রকাশ ঘটান না কেন তার ভারত বিষয়ক রাজনৈতিক প্রস্তাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তখন অস্থিরতা বিরাজ করছে। সে অস্থিরতার অবসান ঘটাতেই ক্রিপস পরিকল্পনা। যুদ্ধ পরিস্থিতির অনুধাবনে ব্রিটিশরাজের ইচ্ছা ভারতকে যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট করা, ভারত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা এবং যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নেয়া। পরিবর্তে ভারতকে রাজনৈতিক সুবিধাদান। কিন্তু লীগ-কংগ্রেস অনৈক্য এবং ঝানু ব্রিটিশ আমলাদের অনিচ্ছা ক্রিপসের সাফল্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বড় বাধা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও ভারতীয় ভাইসরয় লিনলিথগো। দুজনই নাটের গুরু।

তাই ১৪ মার্চ হডসনের এক প্রশ্নের জবাবে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো স্পষ্টই বলেন, 'ব্রিটিশরাজের নীতি বাস্তবায়ন ক্রিপসের পক্ষে সম্ভব হবে না।' তার অনেক তির্যক কথার মর্মার্থ থেকে বুঝতে পারা যায়, ভারতীয় শ্বেতাঙ্গ শাসক ও আমলাগোষ্ঠী তাদের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা নিয়ে ক্রিপসকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল না। হোক না তা রাজাদেশ বা রাজপরিকল্পনা। তাই ক্রিপসের রাজনৈতিক দেনদরবারের প্রক্রিয়া থেকে কূট চাতুর্যে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন ভাইসরয়। অবশ্যই তার পার্ষদগণ ছিলেন একই পথের যাত্রী। লিনলিথগো বিষয়টাকে যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়েছিলেন তা বোঝা যায় হডসনকে বলা আরো কিছু কথায়। তার মতে ক্রিপসের উচ্চাশা ভবিষ্যতে ভারতের ভাইসরয় বা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়া। কিন্তু ভাইসরয় হওয়ার পথ তো এটা নয়। আর প্রধানমন্ত্রী? কোনো বিচক্ষণ রাজনীতিক কি ব্যর্থতার ঝুঁকি নিয়ে এমন কাজে হাত লাগাবে, এবং পাঠক ভেবে দেখতে পারেন ক্রিপস প্রস্তাব নিয়ে সাতসাগরের এপারে ওপারে কত বিচিত্র স্রোত উপস্থিত ছিল। তাই ক্রিপসের সেসব স্রোতে হাবুডুবু খাওয়াই স্বাভাবিক।

ক্রিপস তার প্রস্তাব নিয়ে দিল্লিতে আসেন ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ। এরপর কত যে আলোচনা বিভিন্ন দলের সঙ্গে, নিজেদের মধ্যে আর টাইপরাইটারের ক্রমাগত খটাখট, পাতার পর পাতা বদল! আজাদ, নেহরু, গান্ধি, জিন্নার সঙ্গে পালাক্রমে একাধিকবার সাক্ষাৎকার আর পরিকল্পনায় কাটছাঁট ও যোগ-বিয়োগ।

স্বভাবতই ক্রিপসের জন্য এ দৌত্য ছিল নানা স্রোতের টানে নাকানি-চুবানি খাওয়ার শামিল। বাস্তবে তাই ঘটেছে। তবে এ ক্ষেত্রে হডসনের একটি মন্তব্য খুবই যুক্তিনিষ্ঠ যে ভারতীয় রাজনীতির মূলে রয়েছে দুটো উপাদান। কংগ্রেসের অনমনীয় লক্ষ্য অবিলম্বে ক্ষমতা হাতে পাওয়া আর মুসলিম লীগের দাবি সমান ক্ষমতার অধিকার ও ভবিষ্যতে ক্ষমতার টানাপড়েনে 'ভেটো' দেয়ার অধিকার।

এমন এক জটিল পরিস্থিতিতে ভাইসরয় লিনলিথগোর উদ্দেশ্য ছিল এ টানাপড়েনের সুযোগ নিয়ে দীর্ঘসময় ধরে রাজনৈতিক খেলা চালু রাখা, যাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রদত্ত কাঠামোর বাইরে তাদের যেতে না হয়। কিন্তু হডসনের ভাষায় লন্ডনস্থ মন্ত্রীদের ভাবনা ছিল ভিন্নরকম। বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে হডসনের জবানিতে বলা যায় যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পরিকল্পনার সঙ্গে লিনলিথগো ওয়াভেলের ভাবনাগত মিল ছিল না নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এবং লিনলিথগো হডসনকে দিয়ে পাল্‌টা পরিকল্পনা তৈরি করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যাতে ক্রিপস খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছাতে না পারেন।

এর মধ্যে আবার ঘটে মার্কিনি অনুপ্রবেশ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চার্চিলের ওপর ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। যাতে ব্রিটিশসিংহ ভারত থেকে তাদের থাবা গুটিয়ে নেয় এবং কংগ্রেসের ভিন্নমতের নেতারা ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধবিষয়ক সমঝোতায় পৌঁছাতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠেন। উল্লেখ্য যে নেহরু ও রাজাগোপালাচারি এবং শর্তসাপেক্ষে মাওলানা আজাদ প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। শর্ত হচ্ছে যুদ্ধশেষে তাদের দাবি মেনে নেয়া।

পরিস্থিতি সে ক্ষেত্রে এমনই দাঁড়ায় যে নেহরু ক্রিপস প্রস্তাবের পক্ষে, এমনকি জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করারও পক্ষে। ইতিপূর্বে দেখা গেছে তার সুভাষবিরোধী ভূমিকা। ধীরস্থির রাজাগোপালাচারি প্রস্তাবের পক্ষে, আজাদের কথা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে। অন্যদিকে গান্ধি-প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনিসহ গান্ধিপন্থীরা ক্রিপস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন?

কারণ গান্ধির দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে, এ যুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয় নিশ্চিত। কাজেই সম্ভাব্য পরাজিত শক্তির সঙ্গে সমঝোতা আলোচনা অর্থহীন। গান্ধির ভাষায় ক্রিপস প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে “একটি দেউলিয়া ব্যাংকের ওপর দেয়া ‘পোস্টডেটেড চেক’ বৈ কিছু নয়”। এমন ধারণার প্রধান কারণ জাপানি বাহিনীর ক্রমান্বয় অগ্রযাত্রা ও ব্রিটিশ বাহিনীর ক্রমাগত পিছু হটা। কাজেই গান্ধি ও তার সমর্থকরা ক্রিপস প্রস্তাব মেনে নিতে আগ্রহী ছিলেন না। তারা নিশ্চিত যে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয় সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এমনিতেই ঘটনার নেপথ্যে ছিল মতামতের সংঘাত, এর মধ্যে নতুন জটিলতা আমেরিকান অনুপ্রবেশে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কর্নেল জনসনের দলেবলে দিল্লি আগমন এবং ক্রিপস-প্রস্তাবের আলোচনায় অংশগ্রহণ বিষয়টাকে আরো জটিল করে তোলে, অন্তত হডসনের এমনই ধারণা। প্রস্তাব নিয়ে নেপথ্যে যে নাটক অভিনীত হলো তার অবশেষ পরিণতি জনসন– ক্রিপস ফর্মুলা, যা নিয়ে আবার টানাপড়েন।

আর এ নয়া প্রস্তাব ক্রিপসকেই উভয় সঙ্কটে ফেলে দেয় গ্রহণ-বর্জন নিয়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিত বিচারে। এরপরও চলেছে প্রস্তাবের ওপর প্রলেপ বুলানো, চলেছে ভাইসরয় মহোদয়ের চতুর খেলা। কয় দিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালাবেন স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস? না, পারেননি স্যার ক্রিপস। নিজেদের অন্দরমহলেই নয়, কংগ্রেসেরও নেতিবাচক ভূমিকা ছিল এক্ষেত্রে। ছিল জিন্নার দড়ি টানাটানি।

আশ্চর্য যে রাজনীতির এ চতুর খেলায় নানাজনের সঙ্গত অংশগ্রহণের মধ্যে ভাইসরয়ের কল্যাণে একজন রিফর্মস কমিশনারের মতো আমলাও গুরুত্বপূর্ণ নায়ক হয়ে ওঠেন এবং স্যার ক্রিপসকে বারবার তার শরণাপন্ন হতে হয় ভাইসরয় লিনলিথগোর মতামত তথা তার দাবার চাল জানতে। ক্রিপস কি বুঝতে পারেননি যে, এ মানুষটি একান্তই ভাইসরয়ের খাস তালুকের লোক। তার কাছ থেকে কি সত্যের সন্ধান মিলবে?

ভাইসরয়ের সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়ে মূল প্রস্তাব থেকে অনেকটা সরে এসেছিলেন স্যার ক্রিপস। একের পর এক পরিমার্জিত রূপে প্রস্তাবনা যেখানে ভাইরসয় ও সেনাপ্রধানের সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া ক্রিপস ক্ষুব্ধ হন তার পেছনে অর্থাৎ তার অজান্তে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে ভাইসরয়ের টেলিগ্রাম পাঠানোর ঘটনায়। তাদেরই প্রস্তাব আর তা নিয়ে তাদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব– ভাইসরয় হয়ে ওঠেন ক্রিপসের শক্তিমান প্রতিপক্ষ– দাবার ছকে মন্ত্রী না হলেও ঘোড়া– লাফিয়ে চলায় যার শক্তি।

যুদ্ধাবস্থায় ভারতকে স্বশাসনের প্রস্তাব দিয়ে এই খেলা, বলা যেতে পারে নাটক। এটা সত্যিই আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। তবু ঘটেছে। তাই বিলম্বিত হয়েছে ভারতের স্বশাসন এবং তা ঘটেছে রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে। অ্যাটলি সাহেবের ইচ্ছাপূরণ হয়নি তাদের কুশীলবদের নানামুখী চালের জন্য। পরে এই অ্যাটলির প্রধানমন্ত্রিত্বকালেই ভারতীয় রাজনীতিকদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর (আগস্ট, ১৯৪৭)।

অথচ পরিমার্জিত ক্রিপস প্রস্তাব খুব একটা অগ্রহণযোগ্য ছিল না। একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়ে যুদ্ধ মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে আরেক যুদ্ধ মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব– মন্দ ছিল কি? লীগ কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়ারই কথা। জিন্নার জন্য এক-তৃতীয়াংশের বদলে অর্ধাংশ পাওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রিপস প্রস্তাব অর্থাৎ ভারতের স্বশাসন প্রস্তাব ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

এর জন্য কে বা কারা দায়ী? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। যেমন তখনকার ওই অদ্ভুতনাট্যের চরিত্র গান্ধি, নেহরু, আজাদ কিংবা লিনলিথগো, ওয়াভেল, আমলা হডসন প্রমুখ, তেমনি 'ক্ষমতা হস্তান্তর' শীর্ষক তথ্য-সঙ্কলনের মধ্যমণি ভিপি মেনন। মনোযোগী পাঠক লক্ষ্য করতে পারেন এদের, বিশেষ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে লেখকদের প্রবণতা ব্যক্তিবিশেষ বা সংগঠনের কাঁধে দায়িত্ব চাপানো, অবশ্য তথ্য, উক্তি, বিবৃতি বা ঘটনা উদ্ধৃত করেই।

তবু ফাঁক থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষায় বলা যায়, 'ব্যাখ্যায় করিতে পারি ওলটপালট'। নকশাল নেতা সুনীতিকুমার ঘোষের তথ্যবহুল দুইখণ্ডের রচনা 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাজ'-এর মূল টার্গেট কংগ্রেস, বিশেষ করে গান্ধি, অংশত জওহরলাল। সম্প্রতি এ বিষয়ের লেখায় যশবন্ত সিং প্রায় একই পথের যাত্রী। তিনি দেশভাগের জন্য মূলত কংগ্রেসকেই দায়ী করেছেন।

তবে ক্রিপস মিশন সম্পর্কে তার একটি উদ্ধৃতি তাৎপর্যপূর্ণ। উদ্ধৃতিটি রুজভেল্ট-প্রতিনিধি জনসনের বক্তব্য। তার মতে এ ব্যর্থতার দায় ক্রিপসের নয়, দায় প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের। মনে হয় এ মন্তব্য খুব একটা ভুল নয়। জনসন ঠিকই ধরে ছিলেন চার্চিলের চাতুরী। তার মতে ভারতের স্বরাজ সম্বন্ধে ক্রিপস আন্তরিক ছিলেন এমনই তার অভিমত। প্রস্তাব নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা পাঁচ মিনিটে নিষ্পত্তি করা যেত। যদি তার হাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকত ও তার প্রধানমন্ত্রী অতটা অনড় না হতেন। চার্চিল চেয়েছিলেন ভাইসরয় ও সেনাপ্রধানের যৌথ সম্মতি। নেপথ্য চিন্তা– প্রস্তাবকের ব্যর্থতা, এবং কংগ্রেসকে এ বিষয়ে 'কালোভেড়া' বানানো ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পাল্টা জবাব দেয়া। এটাই চতুর রাজনীতিক চার্চিলের এক ঢিলে দুই পাখি মারা। তবে শেষ রক্ষা হয়নি, এই যা। দেখা যাক ঘটনার ভেতরমহলের চালচিত্রটা কেমন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ও ব্রিটিশ চাতুর্য

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস তার লক্ষ্য নিয়ে আন্তরিক হলেও তার প্রস্তাবে ও তা বাস্তবায়নে ছিল অনেক জটিলতা। ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ-বর্জনের পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। রয়েছে একাধিক ব্যক্তির ক্ষমতাস্পৃহা ও অহম্‌বোধ, সেই সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক উপলব্ধি ও ঘটনার ভুল মুল্যায়ন। ইংরেজ নায়কদের আপাতত একপাশে রেখে দেখা যাক দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস এবং তার সভাপতি মাওলানা আজাদ এ সম্বন্ধে কী বলেন।

মাওলানা আজাদ ক্রিপস প্রস্তাব কেন গ্রহণযোগ্য নয় সে সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে যা বলেছেন তার মর্মার্থ হলো প্রস্তাব যেভাবে উত্থাপিত তাতে দেশি প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কাউন্সিলের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স) ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। যুদ্ধাবস্থায় ভাইসরয় ও সেনাধ্যক্ষের প্রাধান্যই থাকবে কাউন্সিলের ওপর। এ ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্যদিকে যুদ্ধশেষে ভারতের স্বাধীনতার কথা প্রস্তাবে বলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে অনিশ্চয়তাও রয়েছে। আর প্রদেশগুলোর ফেডারেশনে যোগদান বিষয়ক স্বাধীনতা কংগ্রেস মেনে নিতে পারছে না। কারণ কংগ্রেস বরাবরই অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে এসেছে। দেশীয় রাজ্যগুলো সম্বন্ধেও একই রকম আপত্তি কংগ্রেসের। কাজেই কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছে না।

এ সম্বন্ধে মাওলানা আজাদের ব্যক্তিগত অভিমত হলো প্রাথমিক অবস্থায় ক্রিপস প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা অনেকখানিই ছিল। কিন্তু আলোচনার শেষ পর্যায়ে ক্রিপস সম্ভবত ভাইসরয় ও তার বশংবদ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার পূর্বভূমিকা থেকে সরে গেছেন। তাছাড়া সরে যাওয়ার অন্য কারণ হতে পারে লন্ডন থেকে প্রাপ্ত নতুন কোনো নির্দেশ। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের প্রশ্ন ওঠে। আসলে এটাই বড় কথা।

চার্চিলের পরবর্তী সময়ের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, তিনি ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন না। অ্যাটলি প্রমুখ উদারনৈতিক নেতা এবং মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্টের চাপের মুখে তিনি সমঝোতার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। অবশ্য ব্রিটিশ উপনিবেশের সূর্যাস্তকাল যে তখন আসন্ন সে সত্য তার মতো বিচক্ষণ রাজনীতিকের না বোঝার কথা নয়। তবু কি কেউ স্বেচ্ছায় নিজের সংসার ভাঙতে চায়? কিন্তু ৭ই মার্চ (১৯৪২) জাপানিরা রেঙ্গুন দখল করে নেয়ার পর বার্মা থেকে একদিকে শ্বেতাঙ্গ সৈন্য, অন্যদিকে বাদামি রং সেনা, এছাড়া অসংখ্য ভারতীয় বাস্তুত্যাগী বেসামরিক মানুষের কাফেলা এক অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী তৈরি করেছিল। সব কিছু মিলেই হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রিপসকে ভারতে পাঠানো। এবং ক্রিপসের ব্যর্থতায় চার্চিলের ইচ্ছাপূরণ।

দুই

কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে এতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, ক্রিপস দৌত্যের ব্যর্থতা তিনি মেনে নিতে পারেননি। নিয়তিতাড়িত ১০ এপ্রিলের (১৯৪২) দিনটিতে যখন কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেয় এবং ১১ এপ্রিল চার্চিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে সে সংবাদ জানিয়ে দেন তখনও আশা ছাড়েননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি তক্ষুনি চার্চিলকে এই বলে পাল্টা তারবার্তা পাঠান যে, ক্রিপস আরো কটা দিন ভারতে অবস্থান করুন, আরেকবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। জবাবে সম্ভবত হাসি চেপে রেখে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জানান ক্রিপস ইতিমধ্যে লন্ডনের পথে ভারত ত্যাগ করেছেন। তাই নতুন করে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু কেন এ অবস্থা? কাদের চালে সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল? কংগ্রেস সভাপতি তো কিছুটা আশাবাদীই ছিলেন? কিন্তু গান্ধি? তার বরাবরই এমন বিশ্বাস দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধপরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যে, ইংরেজের পরাজয় নিশ্চিত। তাহলে কেন পরাজিতদের সঙ্গে সমঝোতা আলোচনা? একমাত্র স্বাধীনতা ঘোষণার বিনিময়ে বিশ্বযুদ্ধে যোগদান সম্ভব। এ দুই ভাবনার মধ্যবিন্দুতে নেহরু– কিন্তু পেন্ডুলামের মতো একবার এ প্রান্ত, পরক্ষণে অপর প্রান্ত ছুঁয়ে যাচ্ছেন।

কী ঘটেছে পর্দার আড়ালে যে বারবার স্যার ক্রিপসকে প্রস্তাবের শর্তগুলোর অদল-বদল করতে হচ্ছে। কখনো তাতে কংগ্রেসের আধা-সম্মতি, কখনো অসম্মতি। সেই নাটকের কুশীলবদের একজন তো রিফর্মস কমিশনার হডসন। তার বিবরণের মর্মার্থ থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, প্রথম থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইরসয় লিনলিথগো সমঝোতা প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন না। তার ইচ্ছা ছিল না ভারত ক্রিপসের মাধ্যমে কোনো রকম রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাক। হয়তো তাই সর্বশেষ সংশোধিত প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য মনে করেননি ভাইসরয় এবং ব্রিটিশ সরকার ভাইসরয়ের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ অবস্থায় ক্রিপস দৌত্য ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ক্রিপস খুব আশা নিয়ে খুশিমনে ভারতে এসেছিলেন। পূর্ব সফরের অভিজ্ঞতা থেকে তার মনে হয়েছিল ভারতীয় রাজনীতিকদের তিনি সমঝোতার বৃত্তে নিয়ে আসতে পারবেন। সম্ভবত সেই আত্মবিশ্বাস থেকে এবং তার পেছনে ব্রিটিশরাজ তথা মন্ত্রিসভার সমর্থন রয়েছে ধরে নিয়ে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভাইসরয়কে তার করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় হয়তো ততটা গুরুত্ব দেননি যতটা ভাইসরয় প্রয়োজন মনে করেছেন। কিন্তু ভাইসরয় তো ভুলতে পারেন না যে তিনি ভারতের হর্তাকর্তা বিধাতা। তিনি ভাইসরয়। তার মাধ্যমেই সব কিছু ঘটবে।

এর মধ্যে গোল বাধায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দূত জনসনের অনধিকার প্রবেশ। অনধিকার এ জন্য যে ক্রিপস প্রস্তাবের আলোচনায় তার অংশগ্রহণের কোনো বৈধতা ছিল না। যেহেতু বিষয়টাতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিশেষ আগ্রহ ছিল হয়তো তাই স্যার ক্রিপস কর্নেল জনসনকে দূরে ঠেলে দিতে পারেননি। বিশেষ করে যখন বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা মিত্রশক্তির সহায়ক বড়তরফ।

কিন্তু বড়তরফ হলে কী হবে? ব্রিটিশ রাজমহিমার আভিজাত্যবোধ আলাদা। রাজসিংহাসন-মনোনীত লর্ড-ব্যারনদের মতো অভিজাতকুলের সদস্যগণই সাধারণত ভারতশাসক (ভাইসরয়-গভর্নর জেনারেল) হয়ে থাকেন। স্বভাবতই ঘটনাক্রমে ভাইসরয় লিনলিথগোর আঁতে ঘা লাগার কথা। সেখানে আবার সমর্থন জানাচ্ছেন আরেক লর্ড, যদিও পরাজিত পিছুহটা সেনাপতি, ওয়াভেল।

আরো চমৎকার যে বিষয়টি নিয়ে ভাইসরয় আলাপ করেছেন এমন একজনের সঙ্গে যিনি লর্ড, ব্যারন বা শাসকশ্রেণীর শীর্ষসদস্য নন, তিনি একজন আমলা অর্থাৎ রিফর্মস কমিশনার। ভাইসরয়ের প্রচ্ছন্ন মনোবেদনা বুঝতে হডসনের অসুবিধা হয়নি। বরং বড়লাটের একান্তজন হওয়ার সুবাদে তার জানতে বাকি থাকেনি যে ক্রিপস প্রস্তাবের বাহারি বেলুন ফুটো হওয়ার পেছনে চক্রান্তে ছিল ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর হাত। তাতে হাওয়া জুগিয়েছিলেন দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সেনাপতি লর্ড ওয়াভেল।

ব্রিটিশ রাজশাসনের পেছনে বণিকগোষ্ঠীর যত অবদানই থাকুক বিশেষ করে ভারত জয়ের ক্ষেত্রে, সিংহাসনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন রাজপুরুষ। তাই রাজআভিজাত্য, রাজমহিমা তাদের শাসন পরিচালনায় অংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে থেকেছে। পরবর্তীকালে কমন্সসভা তথা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশশাসন নয়, দেশ পরিচালনা করেছেন। মূল শাসক ওই রাজপুরুষ লর্ড, ব্যারনগণই। লর্ড সভার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা নেহাৎ কম ছিল না। বিশেষ করে উপনিবেশ শাসনের ক্ষেত্রে।

তাই কূটনীতির চালে ভুল করেছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস রাজপুরুষকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দিয়ে। তাই চালে মাত হয়ে গেলেন তিনি। কূটনীতির রাজনীতিতে পরাজিত হয়ে ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে দিল্লি থেকে লন্ডন ফিরে গেলেন সম্ভাব্য পরবর্তী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস। এ যাত্রা সফল হলে তার মাথায় পরবর্তী প্রধানমন্ত্রিত্বের 'তাজ' শোভা পেতেও পারত।

কারণ জনমত যাচাইয়ে দেখা গেছে কথিত লৌহমানব চার্চিলের প্রধানমন্ত্রিত্বে (রক্ষণশীল টোরি দলের নেতা) বিশ্বযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধশেষে শ্রমিক দলই (লেবার পার্টি) জনসমর্থন আদায় করে নেয়, রক্ষণশীল দল নয়। এবং পূর্বোক্ত সিনিয়র নেতা ক্লেমেন্ট অ্যাটলি হন প্রধানমন্ত্রী। যদিও এসব পরের কথা তবু প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে বলি যুদ্ধশেষে টালমাটাল ভারতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যখন একই উদ্দেশ্যে গঠিত 'কেবিনেট মিশন' ১৯৪৬-এর মার্চে দিল্লিতে আসে সেই মিশনের তিন সদস্যের একজন (অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি) ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস। তিনি তখন অ্যাটলি মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কেবিনেট মিশনের এক নম্বর ব্যক্তি অবশ্য সঙ্গতকারণেই হন বিদেশ সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স।

সব বিবরণ বিবেচনায় যে কোনো নিরপেক্ষ ইতিহাস পাঠকের মনে হবে ক্রিপস সমঝোতা প্রস্তাব ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে চক্রান্ত করেন ভাইসরয় লিনলিথগো লর্ড ওয়াভেলের সমর্থন নিয়ে। তার বিরোধিতা স্বচ্ছ হলে মিশন-প্রধান ক্রিপসের অজ্ঞাতে অর্থাৎ গোপনে তার আপত্তি জোরালো ভাষায় জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছে তারবার্তা পাঠাতেন না। এবং চার্চিলেরও এমন পরিণাম আকাঙ্ক্ষিত ছিল বলে ক্রিপসের সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে কোনো রকম আলোচনা না করেই তাকে দ্রুত দিল্লি ত্যাগের নির্দেশ দেন তিনি। দ্বিতীয় চিন্তা না করে ভাইসরয়ের মতে মত মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। এসবের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ও কমন্সসভার উদারপন্থীদের একহাত নেয়া।

তিন

ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব নিয়ে অধিকাংশ সময় চুপচাপই ছিল জিন্না-মুসলিম লীগ। জিন্না ঘটনাস্রোত পর্যবেক্ষণে মনোযোগী ছিলেন। প্রস্তাবে প্রদেশগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করা হলেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ আসাম (যদিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিলেট জেলা এককভাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ) এক সমস্যা এবং ফজলুল হকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ বিভক্ত ও দুর্বল বলেই বোধহয় দ্বিতীয় বিবেচনায় জিন্না ক্রিপস প্রস্তাব শেষ মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করেন। লিনলিথগো শাসনের সঙ্গে একাত্ম এবং রাজশক্তির প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেয়া জিন্নার ওই প্রত্যাখ্যানে ছিল রাজনৈতিক কূটচাতুর্য। তার পদক্ষেপে সম্ভবত অখুশি হননি ভাইসরয়। জিন্নার উদ্দেশ্য ছিল আসাম বাংলা মিলে পাকিস্তান। কিন্তু কংগ্রেসের ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পেছনে ছিল একাধিক স্ববিরোধী কারণ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতামতও ছিল দ্বিভাজিত। নেহরু, আজাদ, রাজাগোপালাচারি প্রমুখ অনেকেই প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। মাদ্রাজের বিশিষ্ট নেতা রাজাগোপালাচারি প্রয়োজনে নীতি হিসেবে ভারত বিভাগ মেনে নিয়েও মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি ক্রিপস প্রস্তাব-বিষয়ক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে করেননি। তিনি এ যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সমর্থনের পক্ষে ছিলেন।

মাদ্রাজের এ প্রবীণ নেতা মাদ্রাজ কংগ্রেসের বিধায়কদের এক সভা ডেকে তার বক্তব্য তুলে ধরেন এবং পূর্বে উদ্ধৃত তার মতামতনির্ভর সিদ্ধান্ত কংগ্রেস কমিটিতে পাঠিয়ে দেন (২৩ এপ্রিল, ১৯৪২)। সেসব মতামত ২৯ এপ্রিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এলাহাবাদ অধিবেশনে বাতিল হয়ে যায়। প্রতিবাদে রাজাজি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। শুধু তাই নয়, মাদ্রাজ বিধানসভার সাত জন অনুসারীসহ ওই বিধানসভার সদস্য পদ থেকেও অব্যাহতি নেন। এর পর প্রচার করতে থাকেন তার নিজস্ব মতামত। যে জন্য তিনি নিন্দিত হন পাকিস্তানপন্থী হিসেবে। এ ঘটনা তখন খুবই আলোড়ন তোলে এবং দৈনিকগুলোতেও এ বিষয়ে লেখালেখি চলে। বেশ মনে আছে ওই সময় ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ-বর্জনের চুলচেরা বিশ্লেষণ না করেই দেশের স্বাধীনতাপন্থীরা রাজাজির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। সেই ঢেউ দিল্লি-কলকাতা হয়ে দূর মহকুমা শহরকেও স্পর্শ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতবর্ষকে সত্যকার অর্থে স্বশাসনের অধিকার দেয়ার জন্যই কি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল? প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' এবং 'না' দুই-ই। কারণ তৎকালীন যুদ্ধমন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভাবশালী সদস্য ও শ্রমিক দলের নেতা অ্যাটলিসহ একাধিক উদারপন্থী রাজনৈতিক নেতা যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ্য করে মূলত যুদ্ধে ভারতীয় সহযোগিতা লাভের জন্য ভারতকে রাজনৈতিক সুবিধাদানের সিদ্ধান্ত নেন। তারা মন্ত্রিসভাকে বোঝাতে সমর্থ হন যে বিরাজমান পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের স্বার্থে এ ব্যবস্থাই সর্বোত্তম পন্থা। তদুপরি ভারতের শাসনের জন্য মন্ত্রিসভার ওপর যথেষ্ট চাপ ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানো আরো একটি প্রশ্ন উঠে আসে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই প্রচেষ্টা কি একেবারেই নিঃস্বার্থ ছিল? আমার ধারণা বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভঙ্গুর অবস্থায় সদ্যজাগ্রত মার্কিন রাজনৈতিক শক্তি তার গণতন্ত্রী ভাবমূর্তি বিশ্বের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ভারতপন্থী ভূমিকা নিয়েছিল। ইচ্ছা, একটি আদর্শগত উদাহরণ তৈরি। তবে কেউ কেউ মনে করেন জীর্ণ, ভগ্নদশা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থান ভিন্নভাবে দখল করা এবং এশিয়া-আফ্রিকা মহাদেশে আপন প্রভুত্ব স্থাপনের লক্ষ্য নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ আপাত-গণতান্ত্রিক চিন্তার পদক্ষেপ। এমন ধারণা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

তাদের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বউপনিবেশে ও অন্যত্র মার্কিন পণ্যের জন্য বাজার দখল এবং সেই সঙ্গে নতুনরূপে বিশ্ব রাষ্ট্রসভায় নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আরো স্পষ্টভাষায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তার এবং তা সরাসরি পুরনো উপনিবেশবাদী পন্থায় নয়। মার্কিন রাজনৈতিক প্রশাসন ও শিল্পপতিদের স্বপ্ন : ইংরেজ কয়েক শতক ধরে উপনিবেশের রস আস্বাদন করেছে। এবারের শতক নয়া সামরিক শক্তি আমেরিকার। বিশ্বযুদ্ধ তাদের জন্য এ সুফল বয়ে এনেছে। বাস্তবিক তাদের স্বপ্ন যে সত্য হয়েছে তার প্রমাণ এখন বিশ্ববাসীর চোখের সামনে।

এবার পূর্বোক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা যায় অ্যাটলি, ক্রিপসসহ শ্রমিক দলীয় নেতাদের পাঠানো প্রস্তাবের পেছনে সদিচ্ছার অভাব হয়তো ছিল না। প্রমাণ ১৯৪৬-এ আবার 'কেবিনেট মিশন' পাঠানো এবং তাদের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাটলি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৪৭-এর আগস্টে ব্রিটিশরাজের ভারত ত্যাগ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, ভারতীয় ভাইসরয় লিনলিথগো ও শ্বেতাঙ্গ আমলাদের কূটবুদ্ধি মূলত ক্রিপস দৌত্য ব্যর্থ হবার কারণ। অবশ্য এতে ভারতীয় রাজনীতিকদেরও কিছুটা ভূমিকা ছিল। তবে বিদায় নেয়ার আগে ভারতবর্ষকে দুভাগ করার ব্রিটিশ রাজনীতির চাতুরী যে ইংরেজের চিরাচরিত বেনিয়া বুদ্ধিজাত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বশাসন প্রস্তাবের চোরাবালিতে স্থানীয় রাজনীতি

যুদ্ধে যখন ব্রিটেন কোণঠাসা তখন ব্রিটেনের তরফ থেকে ভারতের জন্য ঘোষিত সহযোগিতা-ভিত্তিক স্বশাসনের প্রস্তাবে কতটা আন্তরিকতা ছিল মূল প্রস্তাবকের তা বিবেচ্য বিষয়। সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী তলিয়ে দেখতে চাইলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা চিত্র বেরিয়ে আসে, যে কথা এ পর্যন্ত আলোচনায় আভাস-ইঙ্গিতে উঠে এসেছে। এবার এ সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট কথা বলা দরকার। তবে প্রসঙ্গত একটা মোটা দাগের কথা হলো এ প্রস্তাব নানা দিক বিবেচনায় যেমন ভারতীয় রাজনৈতিক দল এবং বিশিষ্টজনের (যেমন সাপ্রু, আম্বেদকর প্রমুখ) কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি যার যার বিবেচনায়, তেমনি হয়নি ভারতে ব্রিটিশ শাসন-প্রতিনিধি ভাইসরয় লিনলিথগো ও তাঁর আমলাতন্ত্রের কাছে।

এ বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করা যাক। এ সম্বন্ধে 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থের লেখক ভি. পি. মেনন মনে করেন, এক্ষেত্রে 'স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও ভাইসরয়ের মধ্যে বোঝাবুঝির অভাব ছিল। যেমন ছিল ক্রিপস ও ব্রিটিশ কেবিনেটের মধ্যে।' আমাদের মতে এ বক্তব্যের অন্যদিকও রয়েছে। যেমন, একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব যার মূল কথা ভারতের জন্য ভবিষ্যৎ স্বশাসন সেটি ভালোভাবে না বুঝে নিয়ে ক্রিপসের মতো একজন সফল রাজনীতিক-কূটনীতিক ভারতে চলে এলেন কেন?

মেনন মনে করেন ক্রিপসের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এর কারণ। ভারতীয় রাজনীতিবিদ, বিশেষ করে কংগ্রেসের সঙ্গে তার পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে সম্ভবত ক্রিপস ভেবে থাকতে পারেন যে প্রস্তাব গ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে তিনি সফল হবেন। কিন্তু হননি। আবার ঘটনাক্রমে দেখা যায়, ভাইসরয় পূর্বাপর এ ধরনের প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন না। এমন কি প্রস্তাবের সাফল্য চাননি খোদ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল।

প্রমাণ চার্চিলের তৎকালীন তৎপরতা এবং চার বছর পর (১৯৪৬) কমন্স সভায় তার বক্তৃতা। ওই বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টই বলেন যে ক্রিপস যতদূর এগিয়ে সমঝোতা সফল করে তুলতে চেয়েছিলেন তাতে তাদের সরকারের সম্মতি ছিল না (মেনন)। তাহলে বলতে হয় অতি-উৎসাহী ক্রিপসকে গাড্ডায় ফেলে দেয়াই

ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের উদ্দেশ্য। সে জন্যই তাকে একটি অকেজো বা অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাব সহকারে ভারতে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো একই মঞ্চে দাঁড়ানো। বরং তার বিরোধিতা ছিল সবার চেয়ে বেশি। ক্রিপস প্রধানমন্ত্রীর চাল ধরতে পারেননি কেন? ভারতে সাফল্য লাভের উচ্চকাঙ্ক্ষার টানে? হয়তো তাই, তবে তার চেষ্টায় ঘাটতি ছিল না।

স্বভাবতই ব্যর্থতার দায় ঘটনা বিচারে পুরোপুরি ক্রিপসের নয়। দায় চার্চিল, ভাইসরয়সহ আরো অনেকের। আর সেই 'অনেকের' মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গান্ধি ও গান্ধি-কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল। বাদ যান না জিন্নাও। তবে গান্ধির দায় স্থানীয় বিচারে সর্বাধিক। দৌত্যে ব্যর্থ ক্রিপস ১২ এপ্রিল (১৯৪২) লন্ডনের পথে রওনা হয়ে যাওয়ার ঠিক পরদিনই গান্ধির মন্তব্য : 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ প্রস্তাবে ব্যর্থতার কারণ ব্রিটিশ সরকার।'

তিনি আরো বলেন, 'দুর্ভাগ্য যে প্রগতিবাদীদের মধ্যেও প্রগতিবাদী এবং ভারতের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ক্রিপসকে কি না এমন একটি প্রস্তাব দিয়ে ভারতে পাঠানো হয়েছিল।' অর্থাৎ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। তার মতে 'ক্রিপসের দিক থেকে সদিচ্ছার অভাব ছিল না।' তাই যদি হবে তাহলে প্রস্তাবের আগাপাছতলা না দেখে প্রথমেই কেন তিনি এ সম্বন্ধে নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন?

কেন অগ্রিম প্রত্যাখ্যান? অথচ নেহরু শুরুতে প্রস্তাবের পক্ষে, মাওলানা আজাদ অংশত। ক্রিপস প্রস্তাব ঘিরে একটি সঙ্কট তৈরির পেছনে ছিলেন অনেক কুশীলব। চার্চিলের বক্তৃতাই শুধু নয়, ভারত সচিব আমেরিও কমন্স সভায় (২৮ এপ্রিল, ১৯৪২) এমন কথা বলেন যে 'কংগ্রেসের জাতীয় সরকার গঠনের দাবি এখানকার পার্লামেন্টের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। তেজবাহাদুর সাপ্রু ও তার সহকর্মী বা কংগ্রেসের দাবি হিন্দুরাজ গঠনের দিকে যাবে যা মুসলিম বা অন্য সংখ্যালঘুরা মেনে নেবেন না।' সেই পুরাতন 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি!

আর ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো– কী তার ভাবনা? তার মতে 'এ প্রস্তাব কংগ্রেসই মানবে না। আর এতে করে মুসলমান, ইউরোপীয় ব্লক ও আমলাতন্ত্রে বিরূপতা দেখা দেবে। কাজেই যুদ্ধপরিস্থিতি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কোনো ঘোষণা না দেয়াই উচিত। মুসলমান, দেশীয় রাজ্য ও অন্য সংখ্যালঘুদের দেয়া আমাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি যেন নষ্ট না হয়।' তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল 'ডিফেন্স' তথা প্রতিরক্ষা নিয়ে। ভাইসরয় চাননি ওখানে ভাগাভাগি হোক।

সব মিলিয়ে ক্রিপস ও ভাইসরয়ের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। তৃতীয় মেরু থাকলে বলা যেত সেখানে গান্ধি-কংগ্রেসের অবস্থান। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিন্ন মনোভাব নিয়ে ক্রিপস ও ভাইসরয় ভিন্ন বক্তব্য দিয়ে তারবার্তা পাঠান ব্রিটিশ সরকারকে। সরকার মেনে নেয় ভাইসরয়কে। ব্যস, সব খতম।

দুই

উল্লিখিত ব্যর্থতার দায় ক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ওপর চাপালেও হডসন মনে করেন মার্কিন দূত জনসনের আলোচনায় অনুপ্রবেশ, ক্রিপসের কৌশলগত দুর্বলতা (ভাইসরয়ের সঙ্গে যথোচিত মিথস্ক্রিয়ার অভাব), সর্বোপরি কংগ্রেস অর্থাৎ গান্ধির ভূমিকা আলোচনা ভেঙে যাওয়ার জন্য দায়ী। অবশ্য এতে জিন্নার কিছুটা হলেও ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস লেখক হয়েও হডসন যুক্তিহীনভাবে ভাইসরয়ের পক্ষে বেশ সাফাই গেয়েছেন। ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা এর কারণ হতে পারে।

তার মতে এ বিষয়ে 'কংগ্রেস নেতৃত্ব ছিল ত্রিধাবিভক্ত। একদিকে মি. গান্ধি ও তার ঘনিষ্ঠ শিষ্যগণ যাদের লক্ষ্য ক্ষমতা, তাও আবার যুদ্ধ না করে তাদের বহু অনুসৃত অহিংস পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় গ্রুপে মধ্যপন্থী মাওলানা আজাদ, রাজাগোপালাচারি প্রমুখ উদারনীতিকগণ যারা যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সহযোগিতায় ইচ্ছুক তবে তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদানের শর্তে। তৃতীয় গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত সরদার প্যাটেলের মতো সংক্ষিপ্ত কঠিনপন্থার অনুসারী নেতৃবৃন্দ যারা যুদ্ধে সহায়তার বিরোধী না হলেও তাৎক্ষণিক স্বল্পকালীন বৃহৎ ত্যাগের বিনিময়ে স্বশাসন অর্জনের পক্ষপাতী। আর এদের মধ্যে দোদুল্যমান পণ্ডিত নেহরু এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে' (হডসন, পৃ. ১০৪-১০৫)।

আমার বিশ্বাস রাজাজি ও মাওলানা আজাদকে পুরোপুরি এক কাতারে ফেলা যায় না– উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট অমিল রয়েছে। আর 'হার্ডনাট' প্যাটেল মুখে যাই বলুন, ঘুরেফিরে ওয়ার্ধায় গান্ধি ক্যাম্পেই তার শেষগতি। একই কথা খাটে জওহরলাল নেহরু সম্পর্কেও– বিচিত্র ভুবনে বিচরণ শেষে তারও শেষগতি গান্ধি-আশ্রমে। এর অর্থ, কংগ্রেসে ঘুরে ফিরে গান্ধিবাদেরই রাজত্ব– মতাদর্শ বিচারে সেখানে মূল কথা অহিংসপন্থায় সংগ্রাম।

মাওলানা আজাদ অবশ্য আলোচনা ভেঙে যাওয়ার দায় মূলত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা, চার্চিল এবং অংশত ক্রিপসের ওপর চাপিয়েছেন। যদিও স্বীকার করেছেন যে সেক্ষেত্রে ক্রিপসের জন্য অন্য পথ খোলা ছিল না। কারণ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের বাইরে এক-পা বাড়ানোর ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়নি। তবে একথাও ঠিক যে আজাদ এ বিষয়ে গান্ধি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার ভিন্নমত পোষণ করেও গান্ধিকে দৌত্যে-ব্যর্থতার জন্য সরাসরি প্রকাশ্যে দায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেননি। নিজ দল বলে কথা। তাছাড়া দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত মেনে নেয়া গণতন্ত্রের রীতিনীতিসম্মত। তবে নেহরুর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা রেখেও তার দোদুল্যমানতার সমালোচনা করেছেন আজাদ। কিন্তু গান্ধি সম্পর্কে করেননি।

'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাজ' গ্রন্থের লেখক, যিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন তিনি প্রধানত চার্চিলের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকেই ক্রিপস প্রস্তাবের বিফলতার জন্য দায়ী করেছেন। সেই সঙ্গে দায়ী করেছেন ভারতসচিব অ্যামেরি, ভাইসরয় লিনলিথগো ও তাদের সহকর্মীদের এবং ভারতীয় পক্ষে গান্ধিকে। তার মতে, ক্রিপস দৌত্যের ব্যর্থতায় উল্লিখিত সব কজনই খুশি হয়েছিলেন। সাম্রাজ্য রক্ষা পাওয়ায় পূর্বোক্তদের খুশি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু গান্ধির খুশি হওয়ার কারণ দুর্বোধ্য হলেও এর কিছুটা আভাস মেলে তার পরবর্তী তৎপরতায় (ভারত ছাড় আন্দোলনে)। তিনি কি ভেবেছিলেন তার আন্দোলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাপান ভারত আক্রমণ করবে? তারপর দুয়ে দুয়ে চার। কিন্তু দুর্বোধ্য জাপানের আচরণ আসাম প্রান্তে এসে কালক্ষেপণ।

ক্রিপস প্রস্তাব সম্বন্ধে গান্ধির বিরূপতা যেমনই হোক না কেন নেহরুর ব্যক্তিগত অভিমত ছিল কিছু অদলবদলের মাধ্যমে তা গ্রহণের পক্ষে। কিন্তু দলগত অভিমত, বিশেষত গান্ধির দৃঢ় অভিমতের বিরুদ্ধে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নানা সূত্রে তার বক্তব্যে– যেমন জনসনের সঙ্গে ও ক্রিপসের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তা বোঝা যায়। এমন কি তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে রুজভেল্টের কাছে লেখা চিঠিতে ক্রিপস-দৌত্যের ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশে। এজন্য তিনি ক্রিপসকে নয়, ব্রিটিশ সরকারকে পরোক্ষে দায়ী করেছেন। এমনকি ভারতে জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুজভেল্টকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাসও ব্যক্ত করেন। এ ধরনের দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতা নেহরুর রাজনৈতিক আচরণে একাধিক বার দেখা গেছে।

সবকিছু মিলিয়ে দেখলে মনে হয় ক্রিপস প্রস্তাবের মধ্যেই এর ব্যর্থতা নিহিত ছিল। কারণ প্রস্তাবটি ছিল দৃঢ়সংবদ্ধ কাঠামোর যেখানে বড়সড় অদলবদল সম্ভব নয়। অথচ যে কোনো সমঝোতা চুক্তির সাফল্য নির্ভর করে এর নমনীয়তা ও শর্ত অদলবদলের সুযোগের ওপর, যা এক্ষেত্রে ছিল না বা থাকলেও তা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া সাফল্যের বড় চাবিকাঠি তো প্রকৃতপক্ষে উভয়পক্ষের সদিচ্ছা। সে সদিচ্ছার অভাব যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ছিল তা কম বেশি অধিকাংশের মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা প্রস্তাবটি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার, ক্রিপসের একার নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কংগ্রেস অর্থাৎ গান্ধি এ প্রস্তাব গ্রহণের জন্য গোড়া থেকেই প্রস্তুত ছিলেন না। কংগ্রেসের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও এ অপ্রিয় সত্য সবারই জানা ছিল যে জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত না থাকলেও গান্ধির ইচ্ছাই শেষ কথা হিসেবে বরাবর কংগ্রেস সংগঠনে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

এ বিষয়ে এমন চুটকি বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল যে অভাবিত কোনো রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখে গান্ধি সে দায় বহন না করে বলতে অভ্যস্ত ছিলেন যে তিনি 'কংগ্রেসের চারি আনার সদস্যও নন'। কিন্তু ওই 'চারি আনার' বাইরের মানুষটির মতামত অগ্রাহ্য করার সাহস বা ক্ষমতা কোনো কংগ্রেস নেতার ছিল না।

যাদের ছিল তাদের ক্ষেত্রে নীরবতাই ছিল আশীর্বাদস্বরূপ– যেমন হসরত মোহানী বা মাওলানা আজাদ। আর বিদ্রোহী হওয়ার পরিণতি দল থেকে বহিষ্কার, যেমন সুভাষচন্দ্র। চিত্তরঞ্জনকেও ভিন্ন মতের জন্য মূল কংগ্রেসের নীতির বাইরে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করতে হয় আর সুভাষ বসুকে 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। তাই বলতে হয়, ভারতীয় রাজনীতি তথা কংগ্রেস রাজনীতিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি তার বিশাল ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও কিন্তু বিতর্কের ঊর্ধ্বে নন। ভারতীয় রাজনীতির ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে গান্ধি নেতৃত্বের সফলতা-ব্যর্থতা দুইই প্রশ্নবিদ্ধ। যেমন মতাদর্শের ক্ষেত্রে তেমনি কর্মের বাস্তবতায়।

ক্রিপস প্রস্তাব সম্বন্ধে গান্ধির একাধিক আচরণের পেছনে যে কয়েকটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বযুদ্ধের গতি প্রকৃতি দেখে গান্ধির মনে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে এ যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় অনিবার্য, যে কথা এর আগে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় জনতার (প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের) চরম ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব। এমন কি তারা ইউরোপে জার্মানির ও এশিয়ায় জাপানের বিজয়ী অগ্রযাত্রায় উল্লসিত। এর কারণ ফ্যাসিস্ট সমরশক্তির বর্বরতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকার মতো রাজনৈতিক সচেতনতা তাদের ছিল না।

ছিল না বঙ্গের শিক্ষিত শ্রেণীর বড়সড় অংশের মধ্যেও। এমনকি ছিল না জাতীয়তাবাদী ধারার লেখক-শিল্পী-সাংবাদিকদের মধ্যে। তাই বিখ্যাত 'ফসিল' গল্পের লেখক, প্রগতিবাদী নামে পরিচিত কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ লিখতে পারেন কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদের নামে প্রতিক্রিয়াশীল উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' যা শুধু ভাষার গুণেই সাহিত্য পদবাচ্য। চরম কমিউনিস্ট বিদ্বেষে আক্রান্ত এ উপন্যাসে রয়েছে জাপানি আক্রমণের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন। বিশেষ করে যখন গণনাট্য সংঘ ও ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পী সংঘের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে লেখকের কলমে ঊর্মিলা কাঞ্জিলালের গীতনৃত্যের পরিবেশনে উচ্চারিত হয়:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অশথ কেটে বসত করি। জাপানি কেটে আলতা পরি'র মতো পঙ্ক্তি। কী চমৎকার শৈল্পিক রসিকতা! এ ধরনের রচনা কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের দীক্ষিত সাহিত্যিক-সাংবাদিকের কলমেও প্রকাশ পেতে দেখা গেছে। যেমন 'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)।

শুধু লেখালেখিতে নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও বলা যায়, দেশের রাজনীতিমনস্ক মানুষের ইচ্ছা– ইংরেজ হারুক। যুদ্ধের শুরুতে ইউরোপে হিটলারি জয়ে তাদের আনন্দ-উল্লাস, ১৯৪২ সালে পৌঁছে সে আনন্দ জাপানি আগ্রাসন ঘিরে। যেন জাপান এসে ভারতকে স্বাধীনতা উপহার দেবে। সুনীতিকুমার ঘোষ একটি বাক্যে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছেন এই বলে যে 'জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী ঘৃণা তীব্র হয়ে উঠেছিল।'

এপ্রিলের গোড়ার দিকে (১৯৪২) এশিয়া অঞ্চলের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে। কলম্বো ও বিশাখাপত্তমে জাপানি বোমাবর্ষণ তার প্রমাণ। কলকাতায় জাপানি বোমার ভয়ে কী নাটকই না ঘটে গেল। জাপানি বোমা নিয়ে কত না ছড়া শোনা গেছে যেমন– 'সা রে গা মা পা ধা নি/ বোম্ ফেলেছে জাপানি/ বোমের মধ্যে কেউটে সাপ/ ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ'। মনে হয় দক্ষ হাতে লেখা। এ জাতীয় অনেক ছড়ায় যুদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালির উদ্ভট চেতনার প্রকাশ যা রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক নয়। তখন ব্রিটিশরাজ ভারতরক্ষা নিয়ে আতঙ্কিত। তারা তৈরি ছিল পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে আসাম-বঙ্গকে জাপানের মুখে ফেলে দিয়ে বিহারে এসে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলার জন্য।

ভারতে ব্রিটিশরাজের এমন বিপর্যস্ত অবস্থা সত্ত্বেও জাপান কেন ভারতের পূর্বদ্বারে পৌঁছে বসে ছিল ভবিষ্যতে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় তুলে নিতে সেটা সত্যই বিচার্য। 'জাপান কেন ভারত আক্রমণ করছে না' এমন কথা তখন অনেকের মুখে শোনা গেছে। একাত্তরের (১৯৭১) স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যেমন বহুকণ্ঠে বলতে শোনা গেছে– 'ভারত পাকিস্তানিদের আক্রমণ করে আমাদের মুক্ত করছে না কেন'? অন্যের শক্তিতে মুক্তি কি জনস্তরে আমাদের আরাধ্য বরাবরই, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না রেখে?

খ্যাতনামা মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ দামোদর কোসাম্বিও বিস্ময়ের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে 'জাপানিদের তাৎক্ষণিক সজোর আঘাতে তথাকথিত গোটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তো'। অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তখন এতটাই দুর্বল ছিল। তবু দুর্বোধ্য কারণে জাপানিরা সময়মতো আঘাতের কাজটি করেনি। করলে হয়তোবা দখল করে নিতে পারত ভারতের পূর্বাঞ্চল অনেকটা মালয়, সিঙ্গাপুর ও বর্মার মতন। আমাদের জন্য পরিণাম যেমনই হোক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এদিকে বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গান্ধি-কংগ্রেস অপেক্ষা করেছে জাপানি আক্রমণের জন্য। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দুর্বলতা ইতিমধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই দেখে খুশি কংগ্রেসের রক্ষণশীল অংশ। এডগার স্নো'র বক্তব্য থেকে জানা যায় ভারতীয় বড়বড় শিল্পপতির অনেকে জাপানকে অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি ছিলেন। জাপানি ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে কী ভুল ধারণা! এসব কারণেই ভারতীয় কমিউনিস্টদের 'জনযুদ্ধ' স্লোগান হালে পানি পায়নি। জনসমর্থন মেলেনি বামপন্থীদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় কমিউনিস্টদের 'জনযুদ্ধ'

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বরাবরের সমস্যা তত্ত্বে ও বাস্তবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারা। দাদা পার্টির তত্ত্বে ভর দিয়ে তাদের পথচলা। এখানেই চীনা পার্টির সঙ্গে তাদের প্রভেদ। প্রভেদ সাফল্যে-ব্যর্থতায়। কারো কারো যুক্তি— এর কারণ মূলত শাসক শ্রেণীর প্রচণ্ড দমননীতি। কিন্তু কমিউনিস্টদের ওপর নির্যাতন ও দমননীতি কোথায় চলেনি? চীন, ভিয়েতনাম, ক্যাম্পুচিয়া, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশে কোথায় নয়? হিটলারের অভ্যুত্থানের পর নাৎসি জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টিকে তো 'উইচ হান্টিং'-এর মতো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। আমাদের মনে পড়ে 'অগ্নিগর্ভ' (ফায়ার আন্ডারগ্রাউন্ড) বইটির বক্তব্য। আত্মগোপনে থেকেও রেহাই পাননি অনেক কমিউনিস্ট নেতা। দেশত্যাগ করতে হয়েছে ব্রেখটের মতো খ্যাতনামা কবি, নাট্যকারকে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে। এমনি আরো অনেককে।

তৎকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যে এ জাতীয় কিছু প্রমাণ ধরা রয়েছে। আমরা এখনো মনে করি জুলিয়াস ফুচিকের ফাঁসির মঞ্চ থেকে। মনে করি লোর্কা বা নেরুদার কিছু কিছু রচনা। সেই সঙ্গে কডওয়েল, রাল্‌ফ ফক্স প্রমুখ শহীদের কথা। আসলে বিশ্বের দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি উগ্র জাতীয়তাবাদী বা স্বৈরশাসনের নির্যাতন ও দমনপীড়নের মধ্য দিয়ে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এজন্য তাদের বিপরীত আদর্শের সংগঠন ব্যবহার করতে হয়নি ভারতীয় পার্টির মতো।

ব্রিটিশ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক বিপ্লব বা সর্বহারা বিপ্লবের মতাদর্শ নিয়ে সংগঠিত হতে চেষ্টা করেনি। বরং শাসকগোষ্ঠীর চাপ প্রতিহত করতে কংগ্রেসের সঙ্গে পথ চলতে চেষ্টা করেছে যা মতাদর্শভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত ছিল না। ভারতীয় রাজনীতির সম্প্রদায়গত প্রভাবের কারণে এক সময় কমিউনিস্ট পার্টি লীগ কংগ্রেসের ঐক্য চেয়ে শ্লোগান তুলেছে যা বাস্তবে কখনো হওয়ার ছিল না। তাছাড়া ওরা কমিউনিস্ট পার্টিকে বরাবরই সহযাত্রী নয়, শত্রুই ভেবেছে। কেন্দ্র থেকে প্রান্তিক স্তরে দলগুলোতে এমন ভাবনাই দেখা গেছে।

AMARBOI.COM

তাই মহকুমা শহরে দেখেছি পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দল লীগ ও কংগ্রেসের দুই নেতা কালান্দার সাহেব ও জ্যোতিষ চক্রবর্তীকে কমিউনিস্টদের ঐক্যের স্লোগান নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে ও কমিউনিস্ট পার্টিকে 'ইংরেজের দালাল' সম্বোধনে মজা পেতে। লীগ নেতা ভুলে গিয়েছিলেন যে জিন্নার একহাত বরাবর ইংরেজশাসকের দিকে বাড়ানো ছিল। কেন জানি কমিউনিস্ট পার্টি এসব বাস্তবতা বুঝতে চায়নি। বুঝতে পারে নি।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পরনির্ভরতার কারণ নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থার প্রভাব নাকি যোগ্য নেতৃত্বের অভাব? পার্টি সেক্রেটারি পি.সি জোশি তো একক শক্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলা কঠিন মনে করতেন। অথচ এক পর্যায়ে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মতপথের দ্বন্দ্বে তারা সঠিক দিক-নিশানা খুঁজে পাননি। রাজনৈতিক দোদুল্যমানতা তাদের শক্তিমান গণসংগঠন গড়ে তুলতে দেয়নি। আমার ধারণা, সঠিক নীতি ও রণকৌশল গ্রহণে ব্যর্থতা ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা।

দুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর যুদ্ধের চরিত্র নিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আলোচনায় বসে। অর্থাৎ যুদ্ধটা দুই 'কুকুরের লড়াই' না অন্য কিছু তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলেছে। শুরুতে এ যুদ্ধ তাদের বিচারে ছিল দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বত্বদখলের লড়াইয়ের মতো। পাঠকের মনে পড়তে পারে এ দেশে একাত্তরে উগ্র চীনাপন্থীদের ছোট একটি গ্রুপের 'দুই কুকুরের লড়াই' শীর্ষক থিসিসের কথা।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালে যুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকায়। যুদ্ধে ভারতবাসীর ভূমিকা সম্পর্কে তাদের নীতি ও স্লোগান 'না এক পাই, না এক ভাই'। অর্থাৎ মাংসখণ্ডের অধিকার নিয়ে দুই কুকুর লড়াই করতে থাকুক। ওই ধারণা বড় একটা ভুল ছিল না। তবু এর মধ্যে একটু 'কিন্তু' ছিল।

বিশদ বিচারে দু-চারজনের কথা জানি (অবশ্য বছর কয় পরে) যাদের হিসাব ছিল একটু ভিন্ন। অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট বনাম ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তুলনামূলক বিচার। কিন্তু আসল সমস্যা ছিল সিপিআই-এর নিজের মধ্যে অর্থাৎ কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তির মধ্যে। অবশ্য এ কথাও মানতে হবে যে ভারতে ইংরেজ শাসক যতটা কংগ্রেস বা বিপ্লবী-বিরোধী ছিল তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ভীত, আতঙ্কিত ছিল কমিউনিস্টদের নিয়ে– এক কথায় 'লাল জুজু'র ভয়। 'সব লাল হো জায়েগা'র ভয়। সেজন্য একটি শ্রমিক আন্দোলনের বই বা রুশবিপ্লব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ক বই নিষিদ্ধ হয়ে যেত বিপ্লববাদীদের পুস্তিকার মতো। ভাবতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ নিয়ে কী ভয় ভারতীয় শ্বেতাঙ্গ শাসকদের?

এমন এক বাস্তবতায় অর্থাৎ প্রচণ্ড দমননীতির মুখে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' ('সিপিআই') নিজের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করেনি। চেয়েছে কংগ্রেসের আড়াল নিয়ে চলতে। এ নীতি সঠিক ছিল না। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পরও নিজের মতো করে নিজস্ব পথে চলাই ঠিক– তাতে দমন-নির্যাতন-উৎপীড়নের ধারা সত্ত্বেও। শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয়ের সম্ভাবনা ভুল হিসাব ছিল না। বিশ্ব ইতিহাসে মুক্তিসংগ্রামের ধারা লক্ষ্য করে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে বিপ্লবী গণসংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমেই বিপ্লবের সাফল্য।

কিন্তু সিপিআই-এর বড় সমস্যা ছিল অন্যত্র। তারা কখনো কখনো কাগজে-কলমে সংগ্রামের মতপথ অর্থাৎ নীতি ও কৌশল বিচারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে পারেনি। পার্টির নীতি নির্ধারণে শুরু থেকেই ছিল বাইরে থেকে আসা 'থিসিস' অনুসরণ– এবং তা দেশীয় বাস্তবতা হিসাব-নিকাশ না করে। পার্টিতে বিদগ্ধ তাত্ত্বিকদের উপস্থিতি সত্ত্বেও নিজ পথ নিজে নির্ধারণের বিষয়টা আমলে আনা হয়নি। কাজেই মতপথের ভুলভ্রান্তি যথেষ্ট মাত্রায় চলেছে। এ বিষয় নিয়ে একাধিক ডক্টোরাল থিসিস রচিত হতে পারে।

যাইহোক মূল প্রসঙ্গে ফিরি। তার আগে বহুবার লেখা কথাটা প্রাসঙ্গিকতার টানে বলতে হয় যে রাজনীতি-সচেতন ভারতবাসী বিশেষ করে বাঙালি বিশ্বযুদ্ধে প্রবলভাবে ইংরেজ-বিরোধী। এ অবস্থায়ও ১৯৪১-এর শেষদিকে সিপিআই-এর সিদ্ধান্ত : বিশ্বের একমাত্র সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসি বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে যুদ্ধের চরিত্রবদল ঘটেছে। এ যুদ্ধ এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একার যুদ্ধ নয়, এটা এখন সমাজবাদ রক্ষার দায়ে 'জনযুদ্ধ'। এ যুদ্ধে মিত্রশক্তি তথা সোভিয়েত পক্ষে কাজ করতে হবে ভারতকে।

এ পার্শ্বপরিবর্তনের কারণ সম্ভবত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির ভারত ও যুদ্ধবিষয়ক থিসিসের প্রভাব। বিশেষ করে কিছুটা দক্ষিণঘেঁষা ব্রিটিশ কমরেড রজনী পামদত্তের লেখার প্রভাব। লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রেও ব্রিটিশের জাতীয় স্বার্থ ব্রিটিশ মার্কসবাদীদের বিচার-বিশ্লেষণে প্রাধান্য পেয়েছে, যা আমরা পরবর্তীকালে দেখব মস্কো, বেইজিং-এর নীতিগত বিবেচনায়। এই উদ্ভট নীতির চরম প্রকাশ : 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' স্লোগান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্ষেত্রে অবশ্য সিপিআই-এর হিসেবে আন্তর্জাতিকতা প্রাধান্য পেয়েছে স্বদেশী স্বার্থের চেয়ে। এ জাতীয় এ ভুল আমরা সবাই করেছি, বরাবর করেছি।

পার্টির সংহত সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যেও নাকি এ বিষয়ে সাধারণ সদস্যের পক্ষ থেকে ভিন্নমত, বিরুদ্ধমত উচ্চারিত হয়েছিল (একাধিক সূত্র থেকে উদ্ধৃতি, সুনীতি ঘোষ)। হওয়ারই কথা। কারণ জনস্তরে ব্রিটিশের পক্ষে সমর্থন মেনে নেয়ার কথা নয়। ছাত্র ও শিক্ষিতদের সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাও একই রকম। তবু সিপিআই এ নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়েছে যেমন ছাত্রফ্রন্টে তেমনি বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনে– যথা শ্রমিক ফ্রন্ট ও পেশাজীবী সংগঠনে, এমনকি কিসান সভায়। বাদ পড়েনি সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ থেকে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগঠনগুলো জোরেশোরে এ নীতি চালু করেছে।

তাই তারা চিহ্নিত হয়েছে 'ইংরেজের দালাল' পরিচয়ে। সংঘাতমূলক পরিবেশ তৈরি হয়েছে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, সিএসপি, আরএসপিআই-এর মতো রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে। শহর ঢাকায় তুলনামূলক বিচারে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও আরএসপিআই ছিল সংগঠনগত দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিমান। ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে দলগত রেষারেষি। আর কমিউনিস্ট পার্টির ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জমায়েত কেন্দ্র করেই ঢাকায় সংঘটিত হয় তরুণ লেখক-কমিউনিস্ট নেতা সোমেন চন্দ হত্যাকাণ্ডের বর্বরতা। এতেই বোঝা যায় বিষয়টা রাজনৈতিক আবেগ কতখানি স্পর্শ করেছিল। অবশ্য এতে দলগত দ্বন্দ্বও ছিল প্রধান।

আপাতত এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের পেছনে যুক্তি থাকলেও এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসেবে গ্রহণ করা ব্রিটিশ আধিপত্যের পরাধীন ভারতে প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। অন্তত জনচিন্তার আলোকে। মানুষ চেয়েছে ইংরেজের পরাজয়। আগস্ট আন্দোলন থেকে '৪৫ সাল পর্যন্ত নানা উত্তেজক ঘটনা তার প্রমাণ। দৈশিক বাস্তবতা বিচারে কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম হওয়া দরকার ছিল দুই ফ্রন্টে– যেমন ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতায়, তেমনি সংঘবদ্ধভাবে স্থানীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায়। এ দুয়ের সমন্বিত যাত্রায়, সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে জনসমর্থন পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু ওই একতরফা 'জনযুদ্ধ' স্লোগানের কারণে ওই কটা বছর কমিউনিস্ট পার্টি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন নয়।

তাৎক্ষণিক এ নীতির কারণে ক্রিপ্‌স প্রস্তাব তাদের বিচারে 'অসম্পূর্ণ' হলেও ইতিবাচক ও আলোচনাযোগ্য। এমন পরামর্শই তারা দেন লীগ-কংগ্রেসকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সঙ্গে তাদের প্রতি আহ্বান, যাতে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে সদর্থক ভূমিকা পালন করে। জার্মানি-জাপান-ইতালিয় অক্ষশক্তির পরাজয়ে সহযোগিতা করে। কিন্তু কংগ্রেসসহ অন্য বাম দলগুলো উল্লিখিত পথে হাঁটতে রাজি ছিল না।

রাজি না হওয়ার প্রধান কারণ ভারতে ইংরেজ শাসকের অনুসৃত জন-বিরোধী নীতি। খাদ্য মজুতদারির পাশাপাশি খাদ্য পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা ও নৌকা বাজেয়াপ্ত করার মতো ঘটনাবলী বাংলায় চরম জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বার্মা ফেরত শ্বেতাঙ্গ অশ্বেতাঙ্গ ফৌজের ক্ষেত্রে খাদ্য, আশ্রয়, পরিবহন বিষয়ক চরম বৈষম্যমূলক আচরণ এবং খাদ্য ও পানির অভাবে বার্মা ফেরত হাজার হাজার সাধারণ উদ্বাস্তুর নিদারুণ দুর্দশা ও মৃত্যুর ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে জনমনে প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলে ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের বিপক্ষে।

তবু ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে গ্রহণ-বর্জন দুদিকেরই বাস্তবতা স্বীকার্য। এ উপলক্ষে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ভারত বিষয়ক স্বশাসনের ঘোষণা আন্তর্জাতিক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়, যে জন্য প্রায় চার বছর পর আবারও তাদের অনুরূপ মিশন পাঠাতে হয় ভারতে। তবে এ কথাও সত্য যে, তাদের অনুসৃত পরোক্ষ সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধি এবং দেশবিভাগের পটভূমি তৈরি করে। আশ্চর্য যে বিভাগপূর্ব এক দশকের (১৯৩৭-১৯৪৭) প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনা যেন এক অদৃশ্য শক্তির টানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে, অনিবার্য হয়ে ওঠে দেশবিভাগ। সে শক্তির একটির বড় অংশে রয়েছে ব্রিটিশ চাতুর্য, রাজনৈতিক খেলা।

তিন

অবশেষে মতাদর্শগত বাস্তবতার নিরিখে 'জনযুদ্ধ' বিষয়ক তৎপরতার চরিত্র বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন বোধহয় দরকার। দরকার বিশেষ করে এ কারণে যে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের বিষয়টি ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যে সেখানে স্বদেশী স্বার্থ ঠাঁই পায় না। এমনকি স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। স্বদেশের স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের সমন্বয় ঘটানোর কথা তাদের বিবেচনায় আসেনি।

দুই ফ্রন্টে সংগ্রামের নীতি সঠিকভাবে গ্রহণ করতে না পারার কারণে দেশের আর্থসামাজিক সমস্যা, সঙ্কট নিরসনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি সংস্কারবাদী বদ্ধাবস্থায় আটকে পড়ে। সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী নীতির কারণে চাল, নুন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিনিসহ অন্যান্য খাদ্যপণ্যের সঙ্কট সমাধানে 'ফুড কমিটি'তে অংশ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি মজুতদারি, কালোবাজারির বিরুদ্ধে সামাজিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কথা বলেছে ঠিকই, কিন্তু সরকারি নীতির ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়নি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির শ্লোগান ভুল ছিল না। কিন্তু গরিব কৃষকের পক্ষে সামন্তবিরোধী শ্লোগান জোরেশোরে উচ্চারিত হওয়া দরকার ছিল।

জনযুদ্ধের টানে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাঁচাতে গিয়ে স্বদেশ বা স্বদেশীদের বাঁচানোর গুরুত্ব গৌণ হয়ে দাঁড়ায় কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বিচারে। সমাজবাদী মতাদর্শ রক্ষার পাশাপাশি স্বদেশী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের তথা স্বাধীনতার দাবি যে মার্কসবাদী বিচারেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ সংগ্রামী সত্য মনে হয় ভারতীয় কমিউনিস্টদের হিসাবে ছিল না। থাকলে প্রতিটি দেশের জাতীয় সংগ্রামের গুরুত্ব তাদের চেতনায় প্রতিফলিত হতো। হতো স্বদেশে জাতীয় সংগ্রামের গুরুত্ব। এবং উদাহরণ হিসেবে চার্চিলের যুদ্ধকালীন উপনিবেশ বিষয়ক বক্তৃতা তাদের মতাদর্শগত নীতি নির্ধারণে সহায়ক হতো। বিশেষ করে পূর্বঘোষণাদি ভুলে গিয়ে যখন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বলেন (নভেম্বর, ১৯৪২) যে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসযজ্ঞে সভাপতিত্ব করার জন্য তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হননি।' জনযুদ্ধবাদীরা এ সহজ সত্য বুঝতে চাননি যে দুর্যোগের মুখে গর্তে পড়ে গেলেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চরিত্র পাল্টায় না। ভারতীয় ভাইসরয় ও ব্রিটেনের শাসককুল তাদের পিছুহটা অবস্থায়ও ভারতীয়দের সঙ্গত দাবির ক্ষেত্রে নমনীয় হয়নি, দাবি মেনে নেয়া তো দূরের কথা। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো থেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। আসলে বিশ্বযুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা আদায়ে এক মহাসঙ্কট ও জটিলতা সৃষ্টি করেছিল।

চার

আরো একটি বিষয় প্রসঙ্গত বিবেচ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চরিত্র বিচারে ততক্ষণ পর্যন্ত সহযোগিতার যুদ্ধ হিসেবে গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিস্ট শক্তি দ্বারা আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত। কিন্তু তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর ইঙ্গমার্কিন যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে ভারত-ব্রিটিশ দ্বন্দ্ব তখন পূর্ব গুরুত্ব পেয়ে যায়। ব্রিটিশ রাজশক্তির সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর লড়াই তখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিমুখী লড়াইয়ের তত্ত্ব উপনিবেশ দেশগুলোর জন্য বিশেষভাবে সত্য। লড়াই ছাড়া প্রকৃত মুক্তি কখনো অর্জিত হয় না। ভারতে শাসকদের হাত দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বেচ্ছাকৃত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের তীব্রতা থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত বাংলা এবং ভারতজুড়ে যে ধর্মঘট আর বিদ্রোহ, মিছিলে মিছিলে আন্দোলন সেসবের অভিঘাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু ও পোকায় কাটা শিকড় ধরে টান দিয়েছিল।

প্রত্যক্ষ না হলেও এসবের পরোক্ষ প্রভাব ব্রিটিশরাজকে বাধ্য করেছিল ভারতীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে, সমঝোতা প্রস্তাব নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে। সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারা সত্ত্বেও ভারত পরিত্যাগ করা ছাড়া তাদের জন্য কোনো বিকল্প ছিল না।

সবদিক বিচারে তাই কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ'তত্ত্ব ছিল নির্দিষ্ট ঘটনা-নির্ভর সময়-পরিসরে সাময়িক সত্য, পরে যার চরিত্রবদল ঘটে। ঘটে পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রামের লাখ লাখ দরিদ্র কৃষক-কারিগর শ্রেণীর নারী-পুরুষ-শিশুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। অসংখ্য মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে জয় জনযুদ্ধের নয়, জয় মিত্রশক্তির। সে জয়ের সুফল পেতে ভারতবাসীকে যুদ্ধশেষে আরো দুবছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

ক্ষমতার বহু-আকাঙ্ক্ষিত হস্তান্তর ঘটেছে কংগ্রেসের অনাকাঙ্ক্ষিত দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে। মুসলিম লীগের মতো ভূস্বামী-প্রধান উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে সমর্থন জানাতে পারে তা বুঝে ওঠা কঠিন। আর সাজ্জাদ জহিরের মতো ধীমান কমিউনিস্ট নেতাইবা কীভাবে জিন্না-লীগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন কিংবা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের পক্ষে স্লোগান তোলেন তাও বুঝে ওঠা মুশকিল। চৈতন্যে আদর্শগত দুর্বলতার জন্যই কি তিনি নিজ জন্মভূমি ভারতের যুক্তপ্রদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে হিজরত করেন?

তার চেয়েও দুর্বোধ্য কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে– আসা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব কোন্ যুক্তিতে জিন্না-লীগের দেশবিভাগ সমর্থন করে, যে-বিভাগ দেশময় রক্তস্রোত বইয়ে দিয়েছিল। তাও আবার নেতাদের নয়, নিরপরাধ সাধারণ মানুষের। 'রাজাজি ফর্মুলা'য় দেশবিভাগ সমর্থন কমিউনিস্ট নীতির জন্য বিস্ময়কর বটে! দেশবিভাগ সমর্থন এক পর্যায়ে কংগ্রেসেরও।

'জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'– বহুকথিত এ নীতি এক্ষেত্রে খাটে না এ কারণে যে, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতিসত্তা এক বিষয় নয়। জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ভূত কমিউনিস্ট নেতাদের কাঁধে চেপেছিল, বিশেষ করে চল্লিশের দশকে এসে। তারা বুঝতে চাননি যে জিন্নার 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' তথা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানির ফল কী ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের পটভূমি তৈরি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাক সেসব কথা। জনযুদ্ধের বাস্তবতা ও অবাস্তবতার সঠিক নীতিগত মূল্যায়ন করতে পারেনি তাত্ত্বিক কমিউনিস্ট ধীমানগণ। তাদের একপেশে ও ভুল দৃষ্টিভঙ্গি মাঝে মধ্যে গৃহীত সঠিক নীতি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। জনযুদ্ধের টানে তারা আগস্ট আন্দোলনের (১৯৪২) সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস-সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টি ওই আন্দোলনের চরিত্র নির্ধারণে। কারণ গান্ধি-সূচিত ওই আন্দোলন দ্রুতই জনতার আন্দোলনে পরিণত হয় রাঢ়বঙ্গ থেকে বিহার ও উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে। আর সে কারণে গান্ধি নিজেই ওই আন্দোলন প্রত্যাহার করেন 'আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী'– এ অজুহাতে, যেমন করেছিলেন চৌরিচৌরার ঘটনায়। আন্দোলন তবু চলেছে নেতৃত্বহীন নৈরাজ্যে, সে জন্য লিনলিথগোর পক্ষে প্রচণ্ড দমননীতি তথা ফাঁসি-জেল-জুলুমের মাধ্যমে ওই আন্দোলন দমন করা সম্ভব হয়। বাদ যায় নি আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়াল্লিশের ক্রান্তিকালে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃত্ব

চল্লিশের দশকের প্রথম ৭ বছরের প্রতিটি বছরই ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে ক্রান্তিকাল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য– এরপরও কি দুর্যোগের পুরোপুরি অবসান ঘটেছিল পাকিস্তানি পূর্ববঙ্গে? পূর্বোক্ত সাত বছর তো যুক্তবঙ্গের রাজনীতির জন্য আশা-নিরাশার টানটান উত্তেজনার কাল। সেই রাজনৈতিক সংঘাত, সাম্প্রদায়িক সংঘাত– দড়ি টানাটানির খেলা, শ্বেতাঙ্গ রেফারির মর্জিমাফিক বাঁশি বাজিয়ে তাতে ইতি টানা।

কিন্তু বিয়াল্লিশে ক্রিপ্‌স সাহেবের আসা-যাওয়া, কংগ্রেসের নতুন করে সরকার-বিরোধী অহিংস আন্দোলনের ডাক, জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক সাম্প্রদায়িক স্লোগান নিয়ে এগিয়ে চলা– এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কী করছিলেন তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক? তিনি তো তখন অসাম্প্রদায়িক প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন ফ্রন্টের অন্যতম প্রধান নেতা। সিরাজউদ্দৌলা নাটকের অনুকরণ করে বলতে হয়, শুধু বাংলার নয়, ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা, নাকি তেমন আশঙ্কা। 'ঘনঘটা' তখনো শুরু হয়নি। সম্ভাব্য দুর্যোগের মোকাবেলা করতে চেয়েছিলেন ফজলুল হক।

তখন বাংলা পাঞ্জাব এই দুই মুসলমানপ্রধান প্রদেশের ওপর জিন্নার ছিল ভরসা। বিশেষ করে তার চেষ্টা বাংলাকে বাগে আনা। ফজলুল হক সে ক্ষেত্রে বড় একটা বাধা। জিন্না তাকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেছেন। কিন্তু ভাঙতে পারেননি হককে। ফরোয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভার সাহায্যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন ফজলুল হক। হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মন্ত্রিসভা? এ সুযোগ কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন জিন্না সাম্প্রদায়িক প্রচারের কৌশলে।

রাজধানী কলকাতায় শুরু হয় লীগের পক্ষ থেকে ব্যাপক কুৎসা ও অপপ্রচার। মূল বক্তব্য ফজলুল হক হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মুসলমান স্বার্থ নষ্ট করে চলেছেন। এ ক্ষেত্রে শহরে ছাত্রযুবা এবং গ্রামাঞ্চলে মোল্লা-মৌলবিরা মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারে নেমে গেলেন। এতে বেশ কাজও হলো। তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পাওয়া গেল। সত্যি বলতে কি সাম্প্রদায়িক

রাজনৈতিক দল হিন্দুমহসভার সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়াটা কৌশলগত দিক থেকে ভুল ছিল। এ উপলক্ষে মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ ব্যবহার করা লীগের পক্ষে খুব সহজ হয়ে ওঠে। এ সময় ছোট একটা মহকুমা শহরে দেখা গেল কলেজের কিছুসংখ্যক মুসলমান ছাত্র জোট বেঁধে চিৎকার করছে 'শ্যামাহক মন্ত্রিসভা ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক'। সেই সঙ্গে কিছু অশালীন বাক্যবন্ধ। সেখানে এমন কয়েকজন ছাত্র যুবা উপস্থিত যাদের সবাই সদাচারী বলে জানে। এরা মাত্র কয়েকজন। তবু মানুষ কৌতূহলী? কী করেছেন হক সাহেব– শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক? এমনকি হক-বিরোধী প্রচারে আদালত প্রাঙ্গণে দু-তিনজন নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীকেও উত্তেজিত অবস্থায় দেখা গেল– লীগের কট্টর সমর্থক তারা।

ফজলুল হক এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে তা রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ শুনতে খুব একটা প্রস্তুত ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের প্রচারে সাম্প্রদায়িকতার বিষপ্রভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। তবু ফজলুল হক বাংলার পাশাপাশি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রমুখী রাজনৈতিক প্রচার শুরু করেন। সেই সঙ্গে সেক্যুলার মুসলিম রাজনীতি সংগঠিত করার চেষ্টা। মুসলিম লীগ পর্বে যা বলেছেন, তার বিপরীত ধারায় প্রচার। কিন্তু লীগপন্থীরা তার পূর্ব বক্তৃতার সুযোগ নিয়েছে ভালোভাবেই।

বঙ্গদেশে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ফজলুল হক নতুন করে সেক্যুলার ধারার মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের প্রভাব বাংলায় অনেকটা বেড়েছে। ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ ও সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে যথাক্রমে সভাপতি ও সেক্রেটারি মনোনীত করে যে সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন ফজলুল হক তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।

এবার ১৯৪২ সালের ২০ জুন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলনের আয়োজন করেন কলকাতা টাউন হলে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদের নবাব। কংগ্রেস, কৃষক প্রজাপার্টি, প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ শীর্ষক রাজনৈতিক সংগঠন সম্মেলনে যোগ দেয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন হক সাহেব। তার ভাষণে তিনি দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সবার প্রতি আহ্বান জানান। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের মূল শর্ত যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, সম্মেলনে মূল বক্তাদের ভাষণে সে কথাই ফুটে ওঠে। সভাপতিও একই সুরে কথা বলেন।

বলেন মন্ত্রী শামসুদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী হাশেম আলী খান, মেয়র হেমচন্দ্র নস্কর, হুমায়ুন কবির, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, ড. নলিনাক্ষ সান্যাল, একে এম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাকারিয়া, মৌলানা আহমদ আলী, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায়, আবদুল হালিম গজনভি, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সৈয়দ নওশের আলী প্রমুখ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নেতা। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সংহতি নিশ্চিত করতে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করারও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এই সম্মেলনে (অধ্যাপক অমলেন্দু দে)।

কিন্তু ফজলুল হকের এ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জিন্না বঙ্গীয় মুসলিম লীগকে তৎপর করে তোলেন। বাংলার গভর্নর, এমনকি গভর্নর জেনারেল লর্ড লিনলিথগো পর্যন্ত ফজলুল হকের এ রাজনৈতিক তৎপরতা সুনজরে দেখেননি। কারণ এ রাজনীতি তো তাদের চিরাচরিত 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির ঠিক বিপরীত। সেই সঙ্গে তাদের স্বার্থবিরোধীও বটে।

দুই

শুধু বঙ্গদেশেই নয়, ফজলুল হকের লক্ষ্য ছিল নতুন করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠন করা। কিন্তু লীগ-কংগ্রেসের মতো দু-দুটো বড় দলের উপস্থিতিতে এ কাজ মোটেই সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও হক সাহেব সংগঠন না হলেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মঞ্চ গঠনের কথা চিন্তা করেন। এ জাতীয় মঞ্চের রাজনৈতিক দাবিও হবে অসাম্প্রদায়িক ও দেশহিতনির্ভর।

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স তার প্রস্তাব নিয়ে দিল্লিতে আসেন ২৩ মার্চ (১৯৪২)। পরিস্থিতি বিবেচনায় তার আসার আগেই তিন মুসলমান নেতা বাংলার ফজলুল হক, সিন্ধুর আল্লাবকশ ও সীমান্ত প্রদেশের ডা. খান সাহেব ১০ মার্চ (১৯৪২) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারবার্তা পাঠান ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে। এ তিন মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন রাজনৈতিক বিচারে জাতীয়তাবাদী এবং বলাবাহুল্য অসাম্প্রদায়িক।

মজার বিষয় হল ওই ১০ই মার্চ চার্চিল আসন্ন ক্রিপস মিশন সম্বন্ধে ভাইসরয়কে জানান যে যুদ্ধ নিয়ে গুজব, প্রচার এবং মার্কিনি চাপের কারণে এই মিশন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভারতীয় রাজনীতিকরা যদি এটা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে দুনিয়ার কাছে ব্রিটেনের ভারত বিষয়ক উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা প্রমাণ হবে। অর্থাৎ চার্চিল জানতেন ক্রিপস ব্যর্থ হবেন। লিনলিথগোর পদত্যাগের হুমকিতে তাকে আশ্বস্ত করেন তিনি।

পরে ক্রিপ্সের সঙ্গে ফজলুল হক দেখা করে জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্বাস দেন। যে কারণেই হোক ক্রিপ্স এ বৈঠকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি। যেমন করেননি সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী আল্লাবকশের সঙ্গে বৈঠকের। এ সম্পর্কে মাওলানা আজাদ তার আত্মজীবনীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং তার ক্ষুব্ধ বক্তব্যে ব্রিটিশ-রাজনৈতিক চাতুরীর বেশ কিছু ইশারা-ইঙ্গিতের হদিস মেলে। হতে পারে এরা আঞ্চলিক নেতা হওয়ার দরুন ততটা গুরুত্ব পাননি।

সম্ভবত ভাইসরয় লিনলিথগোর প্রভাবে স্যার ক্রিপ্স মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং আল্লাবকশ বিষয়ক ঘটনা অসৌজন্যমূলক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। আজাদের ভাষায়, 'স্যার স্টাফোর্ড ভারতে আসার সময় কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভাইসরয়কে বলেছিলেন। এই নেতাদের মধ্যে মি. আল্লাবকশও ছিলেন।

'আল্লাবকশ ভাইসরয়ের নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে দিল্লিতে এসে স্যার স্টাফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু সাক্ষাতের দিনক্ষণ স্থির হলো না। ব্যাপারটা বিশ্রী অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে দেখে আমি স্যার স্টাফোর্ডের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করি। তিনি তখন বলেন, শিগগিরই তিনি আল্লাবকশের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু সাক্ষাতের কোনো ব্যবস্থাই হলো না। ফলে আল্লাবকশ রীতিমতো বিরক্ত হয়ে দিল্লি পরিত্যাগ করবেন বলে স্থির করেন।'

এরপর মাওলানা আজাদের হস্তক্ষেপে ক্রিপ্স-আল্লাবকশের সাক্ষাৎকার ছিল নিতান্তই মামুলি আলোচনা, দায়সারা আলোচনা। এ বিষয়ে ক্ষুব্ধ মাওলানা আজাদের মন্তব্য : জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে দেখা করার অনিচ্ছা থাকলে সেটা আগেই স্থির করা উচিত ছিল। আমার মতে, ক্রিপ্স এ ব্যাপারে রাজনীতিকদের মতো ব্যবহার করেননি।

আমাদের ধারণা এ ব্যাপারে জিন্নার মতামতও হয়তোবা ক্রিপ্সকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। কারণ মুসলিম লীগের বাইরে কোনো মুসলমান নেতার সঙ্গে শাসক-প্রতিনিধিদের সাক্ষাতের বিষয়ে জিন্নার বরাবরই প্রবল আপত্তি দেখা গেছে। এমনকি দেখা গেছে, মাওলানা আজাদের ব্যাপারেও। কারণ জিন্নার মতে তিনিই মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র। কিন্তু আজাদ তখন কংগ্রেস সভাপতি। তার সঙ্গে দেখা না করে কি পারা যায়? জিন্নার এ ধরনের অযৌক্তিক একগুঁয়েমিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন ইংরেজ শাসকরা। বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

চল্লিশের দশকের শুরুতে জিন্না যখন মুসলিম লীগের মাধ্যমে সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে থাকেন এবং তা বেশ জোরেশোরে, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগবৃত্তের বাইরে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান নেতা ও সংগঠনের সক্রিয় উপস্থিতি ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে। কিন্তু তারা লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে পারেননি। এমন কি চেষ্টাও করেন নি। সেটা যেমন দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের জন্য তেমনি সর্বভারতীয় রাজনীতির জন্যও। কংগ্রেস তাদের দলের মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের নিয়েই খুশি ছিল। চেষ্টা করেনি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম রাজনৈতিক মঞ্চ গঠনের, যে চেষ্টা অনেক পরে, বলা চলে দেরিতে শুরু করেন ফজলুল হক। এতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে।

কংগ্রেসের রক্ষণশীল হিন্দু রাজনীতির প্রভাবও সম্ভবত নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ গঠনের বিপক্ষে কাজ করে থাকবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও কথাটা সত্য যে, কংগ্রেস মুসলিম লীগ রাজনীতির শক্তি ও ব্যাপকতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বরাবর ভুল ধারণা পোষণ ও অপরিণামদর্শী হিসাবনিকাশ করে এসেছে। এমনকি জিন্নার কূটকৌশলী নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিতে চায়নি। এ ব্যাপারে তারা বরাবর এক ধরনের আত্মতুষ্টিতে ভুগেছে। এর ফল যে ভারতীয় রাজনীতিতে কতটা সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। এর মাসুল তারা দেয়নি, দিয়েছে সেক্যুলার ভারত ও সেক্যুলার বঙ্গের সমর্থক ও অনুরূপ বিশ্বাসের রাজনীতিকরা। সর্বোপরি সাধারণ মানুষ।

কারা ছিলেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মুসলমান নেতা এবং কী পরিচয় ছিল তাদের সংগঠনের? দেশি-বিদেশি ইতিহাসবিদদের লেখায় তারা প্রায় অনালোচিত থেকে গেছেন। তাদের মধ্যে দু-চারজন নেতা যেমন ফজলুল হক, সিকান্দার হায়াত খান, আল্লাবকশ প্রমুখ সম্পর্কে কিছু কথা লেখা হয়েছে এই যা। এদের বাইরে অধিকাংশই অনুল্লিখিত। অবশ্য তার কারণও আছে। ভারতীয় রাজনীতির বিশেষ কালক্ষণে সম্ভাবনা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাবে তারা সেই রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ কোনো ভূমিকা বা প্রভাব রাখতে পারেননি। পারেননি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে। তাছাড়া অভাব ছিল জিন্নার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার।

অথচ চল্লিশের ওই কালক্ষণে কিছুসংখ্যক বঙ্গীয় দৈনিকে এদের সম্বন্ধে খবর প্রকাশিত হতে দেখেছি। স্বল্পসংখ্যক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমর্থক মুসলমান ছাত্র-যুবার তাদের সম্বন্ধে, ওই সেক্যুলার মুসলিম রাজনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ দেখা গেছে, কিন্তু তারা সংখ্যায় অল্প। জিন্না-লীগের দ্রুত বাংলা দখলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা এঁটে উঠতে পারেননি। পারেননি তাদের অগ্রজ রাজনীতিকরা, ব্যক্তিগত মতভেদ ও বিভেদ ভুলে একাট্টা হতে না পারার কারণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

তবে ফজলুল হক কিছুটা হলেও চেষ্টা করেছিলেন বাংলার বাইরে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নামে পরিচিত সেক্যুলার রাজনৈতিক খণ্ডগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে। যেমন বিহারের মোমিন ও পাঞ্জাবের আহরার সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সংগঠন, পাঞ্জাবের খাকসার নামক জঙ্গি সংগঠন (নেতা আল্লামা মাশরেকি, যিনি ছিলেন প্রচণ্ড রকম জিন্নাবিরোধী), আধারাজনৈতিক সংগঠন 'জামিয়াত-উলেমাই হিন্দ', সীমান্তের 'খুদাই খিদমতগার' (যারা আবার লালকুর্তা নামে পরিচিত)– এদের সুপরিচিত নেতা আবদুল গাফফার খান, ডা. খান সাহেব, সিন্ধুর আল্লা বকশ ও জিএম সৈয়দের মতো জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিয়ে ঐক্য। শেষোক্তের স্লোগান ছিল 'জিয়ে সিন্দ্'। আর সীমান্তের লালকুর্তা নেতারা তো কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন।

আগেই বলেছি দলীয় মতাদর্শ বা অন্য যে কোনো কারণে হোক এরা একমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। হতে পারলে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি ভিন্ন ধারার অধ্যায় সংযোজিত হতো এবং ফজলুল হকের বঙ্গদেশও ভিন্ন বাংলার পথ খুঁজে পেত বলে আমার বিশ্বাস। তবে এ বিষয়ে কিছু চেষ্টা নেয়া হয় ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্রিপস সাহেবের দিল্লি আসার প্রাক্কালে। জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দিল্লিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে।

সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী আল্লাবকশের সভাপতিত্বে এ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী মুসলিম লীগবিরোধী মুসলমান নেতারা অংশ নেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কংগ্রেসের আসফ আলী, পাঞ্জাবের অসাম্প্রদায়িক নেতা মিয়া ইফতেখারউদ্দিন, বাংলার ফজলুল হক, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী এবং পূর্বোক্ত জাতীয়তাবাদী চেতনার ৯টি সংগঠনের নেতাকর্মী। ছিলেন সীমান্তের ডা. খান সাহেবও।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ভারতীয়দের ঐক্য যাতে ভারতের স্বাধীনতা দিতে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়। প্রস্তাবে আরো বলা হয়, 'মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিনিধি (আয়েশা জালালের ভাষায় 'একমাত্র মুখপাত্র'– 'সোল স্পোক্‌সম্যান) এই দাবি তুলে ও শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে মি. জিন্না ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করছেন। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদের হাতে ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত।' ভাইসরয় লিনলিথগো ও ভারতসচিব অ্যামেরির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে এসব প্রস্তাবের টেলিবার্তা পাঠানো হয়। পরে তিন ভারতীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একই দাবি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছে পাঠানো হয়, যে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সম্মেলনকে ইংরেজ সরকার সুনজরে দেখেনি এবং তাদের গোপন প্রতিবেদনে তেমন প্রমাণ রয়েছে। সেসব তথ্য মেলে 'ক্ষমতা হস্তান্তর' (ট্রান্সফার অব পাওয়ার) বিষয়ক রচনাবলীতে। সম্ভবত এ কারণেই ক্রিপ্‌স জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসেননি এবং ভাইসরয় থেকে বাংলা ও সিন্ধুর গভর্নরদের ছিল ওইসব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব। আল্লাবক্‌শ হত্যাকাণ্ড কি এ জাতীয় একাধিক কারণের পরিণাম?

তাই আমরা দেখি যুদ্ধাবস্থায় শাসকস্বার্থ সঠিকভাবে পালিত না হওয়ার অজুহাতে এ দুই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শাসককুলের বিরাগভাজন হন। শাসকগোষ্ঠী তাদের কংগ্রেসী কাতারের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এদিকে যুদ্ধের কারণে বাংলায় জাপানি আক্রমণের ভয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে শীর্ষ শাসকদের গৃহীত সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ জনস্বার্থবিরোধী হয়ে ওঠে। আর এ দায় বহন করতে হয় ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যাবে জোর করে হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর পর নাজিম মন্ত্রিসভা ও খাদ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর শাসনামলে বাংলার বুকে দুর্নীতি, কালোবাজারি, মজুতদারি এবং মন্বন্তর ও মৃত্যুর কী ব্যাপক কালোছায়া নেমে আসে। কিন্তু তাতে মন্ত্রিসভার পতন ঘটেনি। মৃত্যুর বিশাল কাফেলা তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে ওঠেনি।

এ আলোচনার মূল কথা ভারত ও বাংলার রাজনীতিতে ১৯৪২ সালে ও পরবর্তী কিছু সময়ে সুস্থ রাজনীতির যে সম্ভাবনা তৈরি হয় সঠিক ঐক্য ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের অভাবে, সর্বোপরি কংগ্রেসের সহযোগিতার অভাবে তা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। কথাটা অধ্যাপক অমলেন্দু দে তার হক বিষয়ক বইতে লিখেছেন এভাবে : 'যদি বাংলাদেশে কংগ্রেস ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-বিরোধী জাতীয় মোর্চা গঠন করত এবং শাসনতন্ত্রের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে জনসাধারণের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করত, তাহলে হয়তো বাংলাদেশের ইতিহাস অন্য ধরনের হতো। আর ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো গোটা ভারতের সাম্প্রদায়িক ঘূর্ণিঝড়কে পূর্বাঞ্চলে ঠেকাতে পারত।'

কথাগুলো বহু ধীমানের লেখনী থেকে উৎসারিত। যেমন নীতিশ সেনগুপ্তের বিশাল গ্রন্থ 'দ্য ল্যান্ড অব টু রিভারস'। সেই সঙ্গে আরো একটি বিষয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংযোজনের মতো যে, পূর্বোক্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান সম্মেলনের পথ ধরে রাজনৈতিক সংগঠন বা মোর্চা গঠিত হলে তা আরো ভালোভাবে ওই 'ঘূর্ণিঝড়' প্রতিহত করাই নয়, বরং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির নয়া ধারা তৈরিতে সহায়ক হতো। সম্ভবত নিজস্ব দলীয় স্বার্থের কারণেই কংগ্রেস ওই পথে পা বাড়ায়নি। ফলে ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে যা কিছু অবাঞ্ছিত তার সবকিছুই ঘটেছে। জয় হয়েছে মানবিক মূল্যবোধহীন রাজনীতির, এমনকি দ্বিভাজিত ভূখণ্ডের সীমান্তরেখার এপারে-ওপারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভারত ছাড়' আন্দোলন

যেমনটা আগে বলা হয়েছে চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধ পরবর্তী বছর দুয়েকের মতোই অভাবনীয় ঘটনায় তাড়িত। যেমন 'লাহোর প্রস্তাব' (১৯৪০), বিশ্বযুদ্ধের তাপ, কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ' সিদ্ধান্ত তেমনি হক-সিকান্দারের বিচিত্র পদক্ষেপ ও ক্রিপ্‌স প্রস্তাব। ভারতীয় স্বশাসনের উদ্দেশ্যে রচিত ক্রিপ্‌স প্রস্তাব ভারতের রাজনৈতিক মহল কর্তৃক প্রত্যাখ্যান যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি করে তা পূরণ করতেই কি অহিংসাপন্থী জননেতা গান্ধির 'ভারত ছাড়' (কুইট ইন্ডিয়া) প্রস্তাব?

কারো কারো মতে 'শূন্যতা' নয়, হতাশা। আপসপন্থী দক্ষিণী কংগ্রেস নেতা রাজাগোপালাচারীর হতাশা বোধহয় সর্বাধিক। মনে হয় ওই হতাশার কারণে তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন ও লীগ-কংগ্রেস ঐক্যের স্লোগান তোলা। এতে মহাখুশি জিন্না ও তার অনুসারী শীর্ষস্থানীয় লীগ নেতারা। অন্যদিকে কংগ্রেস মহাবিরক্ত– একদিকে 'ক্রিপ্‌স প্রস্তাব' ভণ্ডুল হওয়ায়, অন্যদিকে রাজাজির আচরণে। তারা বিশেষভাবে বিরক্ত কারণ দেশবিভাগ মেনে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রিপ্‌স প্রস্তাব বাতিলের এটাও একটা কারণ যদিও ওই প্রস্তাবে সরাসরি দেশভাগের কথা ছিল না।

আসলে লিনলিথগো ওয়াভেলের বিরোধিতা ও ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় ক্রিপসের বিরুদ্ধে কানভারি করার ফলে ক্রিপসের ওপর চাপ সৃষ্টি, ফলে ক্রিপসের অবস্থান পরিবর্তন। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা বিভাগে ভারতীয় অন্তর্ভুক্তি এদের ক্রোধের কারণ। তাছাড়া ওদের এমন ভাবনাও ছিল যে ক্রিপস কংগ্রেসকে বেশি সুবিধা দিয়েছেন। অগত্যা ক্রিপসের পিছুহটা এবং কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ২৯ এপ্রিল (১৯৪২) তাদের এলাহাবাদ অধিবেশনে ভারত বিভাগবিরোধী রাজনৈতিক প্রস্তাব কঠোর দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করে। সেইসঙ্গে ছিল যে কোনো প্রকার আগ্রাসনের প্রতিরোধ বিষয়ক সিদ্ধান্ত এবং ব্রিটিশরাজকে শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করার আহ্বান। শেষোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধির ক্রমান্বয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ, যার

মূল কথা ব্রিটিশ শাসনের স্বেচ্ছা-অবসান যা ব্রিটেন সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে করতে পারে। কিন্তু বাধ্যতামূলক না হলে কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কখনো তা করে না।

বিশ্বযুদ্ধ, জাপানি আগ্রাসন ইত্যাদি ঘটনা বিশেষ করে ক্রিপ্‌স দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ করে গান্ধিকে দেখা গেল আন্দোলনের মেজাজে। বলাবাহুল্য যথারীতি তার অহিংস আন্দোলন। এর নান্দীমুখ হিসেবে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে (৬ জুলাই, ১৯৪২) বিশেষ প্রস্তাব– অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাই। অন্যথায় কংগ্রেস গান্ধির নেতৃত্বে দেশব্যাপী অহিংস আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হবে।

নয় (৯) দিনের তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠকের মূল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জিন্নার বিবৃতি ছিল তীব্র সাম্প্রদায়িক চেতনায় জারিত। তার কথা, এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য 'ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা'। দুর্বোধ্য কারণে হিন্দু মহাসভা ও সাভারকরের মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা কংগ্রেস সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন জানাননি। এমনকি তেজবাহাদুর সাপ্রুর মতো মধ্যপন্থী নেতারা দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত বাতিল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

আর ব্রিটিশরাজ বা তাদের প্রতিক্রিয়া? ভারতসচিব আমেরি এবং স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের বিবৃতির মূল কথা হলো, বর্তমান যুদ্ধপরিস্থিতি বিচারে এ জাতীয় আন্দোলন ভারতীয় জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। ব্রিটিশ সরকার এখনো ক্রিপ্‌স প্রস্তাব কার্যকর করার পক্ষে। এ অবস্থায় ভারত সরকারের পক্ষে কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। শ্রমিকদলীয় মুখপত্র 'ডেইলি হেরাল্ড'-এরও একই সুর (মেনন)।

দুই

এর মধ্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লক্ষ্য করার মতো। প্রথমত বর্তমান যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং জেল থেকে কমিউনিস্ট নেতাদের মুক্তি প্রক্রিয়া শুরু। দ্বিতীয়ত ভাইসরয়ের নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের বিভাজন। এতে 'যুদ্ধ বিভাগ' প্রধান সেনাপতির অধীনে এবং 'ডিফেন্স' তথা প্রতিরক্ষা বিভাগ একজন ভারতীয় সদস্যের অধীনে। যেমনটা সর্বশেষ ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে বলা হয়েছিল– কিন্তু তখন ভাইসরয় সাহেব তাতে মত দেননি। নতুন সম্প্রসারিত কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ১৪ এবং তাদের ১১ জনই হবেন ভারতীয়। সবকিছুই জিন্নার জন্য সুসংবাদ। কিন্তু ক্রিপ্‌সের উপস্থিতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কাজগুলো করা হয়নি। বুঝতে অসুবিধা নেই, কেন করা হয়নি। ভাইসরয় কংগ্রেসকে সুবিধা দিতে রাজি নন।

এরপর সেই ক্রান্তিক্ষণ, ৭ আগস্ট (১৯৪২)। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। 'গান্ধীর' নেতৃত্বে অহিংস জনসংগ্রাম। অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদের প্রস্তাব হলো প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও ব্রিটেনে রুশ রাষ্ট্রদূতের কাছে এ বিষয়ে আহ্বান জানানোর জন্য।

কিন্তু এর মধ্যেই আকস্মিক আঘাত। সরকার প্রস্তুত ছিল। আগস্টের ৯ তারিখ প্রত্যুষে গান্ধিসহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্য গ্রেফতার। সরকার এতটাই প্রস্তুত যে, দেশব্যাপী কংগ্রেস নেতাদের ঝাঁকে ঝাঁকে তুলে এনে জেলে পোরা হলো। কংগ্রেস কমিটি ও সমাবেশ অবৈধ ঘোষণা করা হয়। আন্দোলন পরিচালনার মতো কংগ্রেস-নেতৃত্ব আর জেলের বাইরে থাকেনি। ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক চাতুর্যের কাছে গান্ধি-কংগ্রেসের হার। বলতে হয় সাংগঠনিক দিক থেকে দূরদর্শিতার অভাব। এত বড় একটি আন্দোলন, বিশেষ করে যুদ্ধাবস্থায়, সরকার যথাশক্তিতে পাল্টা আঘাত করবে এটাই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে আন্দোলনের জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি থাকবে না এটাইবা কেমন কথা। শীর্ষ নেতাদের দু-চারজন বাদে অন্যদের এবং শহুরে নেতাদের আত্মগোপনের প্রস্তুতি থাকা উচিত ছিল– তা না হলে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন কারা? নেতৃত্বহীন আন্দোলন দ্রুতই স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু গান্ধির একক নেতৃত্বের আন্দোলন তার নিজস্ব হিসাব-নিকাশ অনুযায়ীই চলে। এক্ষেত্রে চলেনি। কারণ মানুষ আন্দোলন হাতে তুলে নিয়েছে, দমননীতির জবাবে সহিংস হয়েছে।

কংগ্রেসী প্রতিপক্ষ কারাগারে। জিন্নার ওয়ার্কিং কমিটি ওই আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত থাকেনি, ভারতীয় মুসলমানদের এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকার আহ্বানও জানানো হয়। এ সুযোগে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারস্বরূপ পাকিস্তান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভাইসরয়ের প্রতি আহ্বান জানায় ওয়ার্কিং কমিটি। জিন্না নিজেও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ইতিহাস লেখক সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে জিন্নার জন্য সুযোগ এসে যায় গোটা মুসলমান সমাজকে কাছে টানার। বস্তুত ওই কবছরে মুসলিম লীগের ব্যাপক সাংগঠনিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। শুরুটা ১৯৪২ আগস্ট থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে আরেক অঘটন যা জিন্নার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ডিসেম্বরের শেষ দিকে সিকান্দার হায়াতের আকস্মিক অকালমৃত্যু জিন্নার আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে দেয়। অন্যদিকে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ইতিহাসে একটি তাৎপর্যময় কালখণ্ড হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ আন্দোলন ভারত শাসনের বয়োবৃদ্ধ ব্রিটিশ সিংহ কঠোর থাবায় দমন করে।

তবে আন্দোলন মূলত রাঢ়বঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের অংশবিশেষকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হলেও আন্দোলনের প্রভাব গোটা ভারতজুড়ে অনুভূত হয়। এ আন্দোলন দমন করতে সেনাবাহিনী নামাতে হয়। অজ্ঞাত কারণে হডসন 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েক লাইন লিখে যতি টেনেছেন এই বলে যে 'প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যে আন্দোলন দমন করা হয় এবং বিদ্রোহের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ব্যর্থতা প্রমাণ করে ভারতে ইংরেজ সরকার এখনো কতটা শক্তিমান।' কিন্তু ঘটনা কি এমন কথা বলে? হডসন এ বিদ্রোহ চিহ্নিত করেছেন 'সামান্য ঝঞ্ঝাট' (লিটল ট্রাবল) বলে। ভি. পি মেননও আগস্ট আন্দোলনের উল্লেখে তেমন কালি খরচ করেননি।

কিন্তু কী ঘটেছিল 'ভারত ছাড়' আহ্বানের প্রতিক্রিয়ায়? মনে হয় মানুষ তৈরি হয়েই ছিল কিছু একটা ঘটানোর জন্য। গান্ধির ঘোষণা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' গান্ধির জন্য নয় আন্দোলনের কুশীলবদের জন্য সত্য হয়ে উঠেছিল। গান্ধিসহ কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃবৃন্দ যখন কারাগার নামক আগা খান প্রাসাদের মনোরম পরিবেশে বন্দি তখন মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে যে যার মতো কিছু 'করেছে ও মরেছে'। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদেরই যথারীতি অগ্রণী ভূমিকা। তারাই হরতাল ডেকে প্রথমে রাজপথে, পরে মাঠে-ময়দানে নামে।

তাদের পথ ধরে সাধারণ মানুষ, মূলত রাজনীতিমনস্ক মানুষ ঘরের বাইরে সরকারবিরোধী তৎপরতায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। গান্ধির অহিংস আন্দোলন সরকারি দমননীতির পাশাপাশি প্রথম থেকেই সহিংস রূপ নিতে শুরু করে। পুলিশের লাঠি-গুলি যখন আন্দোলন দমনে ব্যর্থ তখন রণাঙ্গনে নামানো হয় সামরিক বাহিনী। তাদের তৎপরতায় রাজপথ এবং মাঠ-ময়দান রক্তলাল হতে থাকে।

আর আন্দোলনরত বিদ্রোহীদের হাতে আক্রান্ত হতে থাকে থানা, পোস্টঅফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, ইত্যাদি। সেই সঙ্গে চলে রেললাইন ও টেলিগ্রাফপোস্ট উপড়ে ফেলার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। থানা পুড়েছে, অফিস পুড়েছে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ। এসব ঘটনা যদি 'সামান্য ট্রাবল'ই হবে তাহলে রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতো ধীমান লিখতেন না– 'জনশক্তি পাটনায় সরকারের অস্তিত্ব শেষ করে দিয়েছে' কিংবা নামাতে হতো না সেনাবাহিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরুতে বিহারের রাজধানী পাটনা হয়ে ওঠে শহুরে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিতে কয়েকটি মৃত্যু আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার ঘটায় (১১ আগস্ট, ১৯৪২)। ক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নামে। কয়েক দিনের জন্য পাটনা মুক্ত এলাকা। দ্রুত ছুটে আসে সেনাবাহিনী, দখল করে নেয় পাটনা। এভাবে প্রতিটি শহরে দখল ও পাল্টা দখলের ঘটনা ঘটতে থাকে। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আদিম অস্ত্র নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না আন্দোলনকারীদের। এ আন্দোলনের চরিত্র মনে করিয়ে দেয় ১৯৭১-এর প্রথমার্ধে সুশিক্ষিত পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরোধ সংগ্রামের দিনগুলো।

তিন

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িষ্যা থেকে দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো শহরে। এ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য গ্রামাঞ্চলে এর বিস্তার। তবে বিহার ও রাঢ়বঙ্গ হয়ে ওঠে সহিংস আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতায় এ আন্দোলনের চরিত্র পরিচয় ধরা রয়েছে। বিশেষ করে পাঠক মনে করতে পারেন সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' কিংবা মনোজ বসুর 'সৈনিক'-এর মতো রচনাদি।

বামপন্থী লেখক-রাজনীতিক গোপাল হালদার এগুলোকে 'বিয়াল্লিশি বিলাস' বলে যতই ঠাট্টা করুন, 'জনযুদ্ধে'র চিন্তা মাথা থেকে দূর হওয়ার পর কমিউনিস্ট লেখকগণ উপলব্ধি করেছেন যে, আগস্ট আন্দোলনের মূল্যায়নে ও চরিত্র বিচারে তারা ভুল করেছিলেন। কারণ একটাই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 'জনযুদ্ধ'। কিন্তু তাই বলে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদবিরোধী আন্দোলনের বাস্তবতা তো অস্বীকার করা চলে না। কোনো মতেই না।

অস্বীকার করা চলে না কমিউনিস্ট পার্টির এ বিষয়ে অনুসৃত বিভ্রান্তিকর নীতির কথা। বিভ্রান্তিকর এ অর্থে যে এ আন্দোলন গান্ধির ডাকে শুরু হলেও গান্ধি এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ছিলেন না। আত্মগোপনে থাকা তাদের কিছুসংখ্যক মধ্যম সারির নেতৃত্ব উপস্থিত থাকলেও আন্দোলন মূলত পরিচালিত হয় স্থানীয় ছাত্র নেতৃত্ব, আরএসপিআই, সিএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কিসান সভার নেতাদের দ্বারা। উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দু-একটি নাম যথা– জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অরুণা আসফ আলী প্রমুখ।

গান্ধি বরং ব্রিটিশ বিতাড়নের এ সহিংস আন্দোলনের প্রতি নিন্দা জানিয়ে ১৯৪৩ সালের শুরুতে বিবৃতি প্রচার করেন এবং আন্দোলনের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করেন। সুনীতিকুমার ঘোষ হয়তো ঠিকই অনুমান করেছেন যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলন থেকেই উঠে এসেছিল নেতৃত্ব, পরিচিত কয়েকটি নামের বাইরে যাদের নাম আমাদের জানা নেই। কমিউনিস্ট নেতাদের বোঝা উচিত ছিল, এ আন্দোলনের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট শক্তির দেশজয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এ আন্দোলন পুরোপুরি স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশ থেকে বিদেশি শক্তি ব্রিটিশরাজ তাড়ানোর লড়াই।

আন্দোলন সহিংসতা নিয়ে যেভাবে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে ইতিবাচক ফল দেখা দিতে পারত। কংগ্রেস এর দায় অস্বীকার না করে দিকনির্দেশনা দিলেও হয়তো কিছুটা সুফল মিলত। মিলত শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে এলে। কিন্তু কংগ্রেস ও সিপিআই নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠন এ আন্দোলনে যোগ দেয়নি অর্থাৎ যোগ দিতে বাধা দেয়া হয়েছে। আশ্চর্য যে, কমিউনিস্ট পার্টি এ আন্দোলনের নিন্দায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ব্যক্তি রাজাগোপালাচারী প্রমুখের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা সংগ্রাম তাদের কাছে দাম পায়নি।

'জাগরী'র প্রতিনায়ক কমিউনিস্ট নীলুর বক্তব্যই ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য এবং ফাঁসির আসামি বড় ভাই বিলু সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া– 'সবকিছুই অবজেকটিভলি বিচার করে দেখতে হবে।' অর্থাৎ এ আন্দোলন চরিত্র-বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল। তাই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু ওই মূল্যায়ন সঠিক ছিল না।

AMARBOI.COM

চার

এ আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামাঞ্চলে এর জনসংশ্লিষ্টতা– বিহার, ওড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে। যেমন ওড়িষ্যার বিখ্যাত বালাসোর অঞ্চল কিংবা পশ্চিমবঙ্গের তমলুক, কাঁথি প্রভৃতি মহকুমা অঞ্চল এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা, পুনে, সুরাট ইত্যাদি স্থানে। আন্দোলন এতই জোরাল হয়ে ওঠে যে প্রতিটি ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিমানবাহিনীকে তলব করতে হয়। এ লড়াইকেই তো বরং অঞ্চল বিশেষে জনযুদ্ধ বলে আখ্যা দিতে হয় বা বলা যায় কৃষক-জনতার অভ্যুত্থান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় মেদিনীপুরের তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় গণঅভ্যুত্থানের কথা। সেখানে আন্দোলনের সূত্রে গড়ে ওঠে 'মুক্তিবাহিনী' বেশ কয়েক হাজার গ্রামবাসীর সমন্বয়ে। এরা আক্রমণ চালায় থানা ও সরকারি দপ্তরে। দখল করে নেয় কয়েকটি থানা। সরকারি বাহিনীর গুলিতে শহীদ হন বর্ষীয়সী জননেত্রী মাতঙ্গিনী হাজরাসহ বেশ কিছুসংখ্যক সংগ্রামী নারী। তমলুক-কাঁথির স্বাধীনতা সংগ্রাম বাস্তবিকই ছিল নিম্নবর্গীয়দের সমন্বয়ে সংগঠিত ও জনযুদ্ধের চরিত্রসম্পন্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান সম্প্রদায় ও কমিউনিস্ট সদস্যরা বাদে স্থানীয় অধিবাসী সবাই শাসকবিরোধী এ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। কৃষক সমিতিও হয়ে ওঠে লড়াইয়ের সমর্থক। গড়ে ওঠে নিজস্ব শাসনে মুক্তাঞ্চল। কিন্তু দেশের ছোট একটি অংশে মুক্তি ধরে রাখা যায়নি। যায়নি সরকারের বিশাল ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বাহিনীর তৎপরতায়। স্বভাবতই চলে সামরিক বাহিনীর অনাচার– বর্বরতা যার নাম গণগ্রেফতার, গণধর্ষণ। সবকিছুই বিদ্রোহ দমনের নামে জায়েজ বিবেচিত হয়।

চট্টগ্রামের মতো মেদিনীপুরও সংগ্রামী ঐতিহ্যে ইতিহাস রচনা করেছে বিভিন্ন সময়ে। তিরিশের দশকের মতো ১৯৪২ সালের শেষপর্ব তেমনই একটি কালখণ্ড, যা সংগ্রামী চরিত্রে উজ্জ্বল। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ওই সংগ্রাম 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' গঠনের কৃতিত্ব নিয়ে ইতিহাসে বেঁচে রয়েছে। আশ্চর্য যে, ওই স্বাধীন সরকার ১৯৪৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত টিকেছিল। শেষ পর্যন্ত গান্ধির ব্যক্তিগত প্রচারে ও নির্দেশে সংগ্রামীদের পিছু হটতে হয়। ভেঙে দেয়া হয় জাতীয় সরকার।

আমরা অবাক হই হডসনের বক্তব্যে, তিন সপ্তাহে শাসক-সরকার নাকি গুঁড়িয়ে দেয় আগস্ট আন্দোলন, যেখানে কাঁথি-তমলুকের জাতীয় সরকার স্বেচ্ছায় ভেঙে দেয়া হয় ১৯৪৪ সালের আগস্টের পর। অর্থাৎ ছোট ছোট পকেটে হলেও এ আন্দোলন চলেছে অন্তত দুবছর সময় ধরে। সন্দেহ নেই আগস্ট আন্দোলন কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইংরেজ শাসনের ভিত। হয়তো তাই এর রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে সমকালে, এমনকি বছর কয় পরেও বিচার-ব্যাখ্যা চলেছে। চলেছে বিতর্ক। এ আন্দোলন নিয়ে বাংলায় রচিত হয়েছে সাহিত্য। কিন্তু আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। তেমনি কম সঠিক ইতিহাস রচনা। অথচ ওই ক্রান্তিকালে কী তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ওই আন্দোলন। ভাইসরয় লিনলিথগো তা বুঝলেও বুঝতে পারেনি কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি– ভারতের তিন প্রধান দল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগস্ট আন্দোলনের চরিত্রবিচার ও কুশীলবগণ

আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২) তথা 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন গান্ধির আহ্বানে শুরু হলেও তা দ্রুত জনস্তরে ছড়িয়ে পড়ে গান্ধির অহিংস নীতি বর্জন করে। কারণ বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত সরকারের যুদ্ধনীতির কারণে ক্ষুব্ধ জনসাধারণ বিশেষ করে বৃহদ্বঙ্গীয় জনতা সরকারবিরোধী আন্দোলনের জন্য তৈরি হয়েছিল। তা না হলে আন্দোলন এত দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ত না। আর সরকারের দমননীতিও এত তীব্র ও ব্যাপক হয়ে উঠত না।

একটা ছোট সাদামাটা উদাহরণ দিই। বিশেষ কারণে আমি তখন মাস কয়েকের জন্য নিজ গ্রামে। যাতায়াতের বিচারে দুর্গম, সেই প্রত্যন্ত গ্রামে আগস্ট আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে দেখে অবাক হই। ভাদ্রমাস। থইথই পানি। নৌকা করে একদল সশস্ত্র পুলিশ স্কুলসংলগ্ন শ্যামগ্রামের এক বাড়ি থেকে স্থানীয় কংগ্রেসনেতা নুটুবিহারীকে (পদবি মনে নেই) গ্রেফতার করে নৌকায় তোলে। অদৃশ্য হয়ে যায় নৌকা।

প্রতিবাদে স্কুলের ছাত্রদের ধর্মঘট, রাস্তায় মিছিল। স্লোগান ওঠে 'ইংরেজ ভারত ছাড়'। আশ্চর্য, মুসলমান ছাত্ররা ওই মিছিলে যোগ দেয়নি, ব্যতিক্রম দু-চারজন। কারণ বড়দের নিষেধ। পরে জেনেছি নিষেধের মূল উৎস জিন্না সাহেব ও মুসলিম লীগ। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক চিন্তার অবদানও কম নয়– 'ওটা হিন্দুদের আন্দোলন'। যেন দেশটা শুধু হিন্দুদের, মুসলমানের নয়। আসলে মূল কারণ লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব। এরই জের ধর্মীয় সম্প্রদায় পর্যন্ত গড়ায়।

আরো একটি উদ্ভট ঘটনা, বলা যায় গ্রামীণ রটনা, কীভাবে তৈরি কেউ জানে না। রটনার মর্মকথা– গান্ধি মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কাজেই আন্দোলন জায়েজ। সেজ চাচাকে ওই সংবাদে খুব উত্তেজিত দেখেছিলাম। কদিনের মধ্যেই রটনার বেলুন চুপসে যায়। তখন অবস্থা পূর্ববৎ। বুঝতে পারা যায় রাজনীতিতে সম্প্রদায় চেতনার প্রভাব চল্লিশের দশকের শুরুতেই কতটা ব্যাপক হতে শুরু করেছিল।

এমন একটি সম্ভাবনাময় আন্দোলন কি না সূচনার মাস কয় পরেই গান্ধি অস্বীকার ও বর্জন করেন। ব্যাপকভিত্তিক দক্ষ নেতৃত্বের অভাবে এবং কংগ্রেসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরোধিতায় আন্দোলনের মৃত্যু ঘটে। অবশ্য শাসনযন্ত্রের অবিশ্বাস্যরকম দমননীতি, সেনাবাহিনীর তৎপরতাও এ জন্য দায়ী। সৈন্যদল নামিয়ে যে আন্দোলন স্তব্ধ করতে হয় তা হডসন তুচ্ছ জ্ঞান করেন কীভাবে?

সিভিলিয়ান লেখক না বুঝলেও ঠিকই বুঝেছিলেন শাসক, ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো। আর সে কারণেই উদ্বিগ্ন ভাইসরয়ের তারবার্তা প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে এই বলে যে '১৮৫৭ সালের পর এটা এমনই মারাত্মক বিদ্রোহ যে সামরিক নিরাপত্তার কারণে এর গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বিশ্বের কাছ থেকে গোপন রাখতে হয়েছে' (ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ২য়, পৃ. ৮৫৩)। এ তারাবার্তা এবং রক্তাক্ত দমন নীতি থেকে বোঝা যায় আগস্ট আন্দোলন শাসক-শক্তির ভিত্তিতে কতটা জোরে আঘাত করেছিল। আর এটাই সত্য তা কেউ মানুন বা না মানুন। এ সত্য বুঝতে ভুল করেনি শাসক ইংরেজ।

এ আন্দোলন দমন করতে সামরিক শক্তির ব্যবহার সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় লাগার কারণ গ্রামাঞ্চলে এর বিস্তার। বাংলা সাহিত্যে এর ব্যাপকতা ও চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আভাস মেলে যা ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে আছে। এ আন্দোলনের জনসংশ্লিষ্টতা ও নেতৃত্ব পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে বলে মনে হয় না। যে জন্য উল্লিখিত দুটো বিষয় নিয়ে তথ্য-প্রমাণে ঘাটতি রয়ে গেছে।

অর্থাৎ আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ কোন পর্যায়ে, কী প্রকৃতিতে এবং কারা এর মূল কুশীলব– কৃষক-কারিগর শ্রেণি না শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনসাধারণ তা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। একে পুরোপুরি 'কৃষক বিদ্রোহ' (সুনীতি ঘোষ) বলা বোধহয় ঠিক নয়। শহুরে শিক্ষিত শ্রেণি এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষক- অকৃষক জনসাধারণ আগস্ট আন্দোলনের কারিগর বলে মনে হয়। তবে প্রাধান্য শিক্ষিত ছাত্র-যুবাদের।

আর নেতৃত্ব? তাও ছিল বহুবিচিত্র। স্থানীয় কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী নেতা, আন্দোলন থেকে উঠে আসা নেতা, তাছাড়া সংগঠনগতভাবে আরএসপিআই, ফরোয়ার্ড ব্লক ও সিএসপি তো বটেই। এমনকি কংগ্রেস হাইকমান্ড, মূলত গান্ধি আন্দোলনের প্রতি নিন্দা জানানো এবং অভ্যন্তরীণ চাপ সত্ত্বেও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি (সিএসপি) আন্দোলন থেকে সরে আসেনি। কিন্তু একাধিক সংগঠন ও স্থানীয় ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার কারণে এতে একমুখী নেতৃত্ব ও সংহতির অভাব ছিল।

গোটা দেশব্যাপী আন্দোলন পরিচালনায় সংগঠনগত দুর্বলতা অবশেষে পরিণামে ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এদিক থেকে সিপাহি বিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতা মহাবিদ্রোহের সঙ্গে এর পরিচালনা ও নেতৃত্ব দুর্বলতার মিল রয়েছে এবং মিল শাসকপক্ষের উভয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রেই সংগঠনগত দক্ষতা, উন্নতমান অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ও কুশলতা। তাছাড়া কংগ্রেসের মতো বিশাল একটি সংগঠনের নেতৃত্বে অনুপস্থিতিও ব্যর্থতার একটি বড় কারণ।

গণআন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও এতে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণির সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ না করার গুরুত্ব কম নয়। আগেই বলা হয়েছে শিল্প-কারখানার শ্রমিকশ্রেণির পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ' নীতি, শাসকশ্রেণিকে যুদ্ধকালে বিব্রত না করার নীতি। তাছাড়া শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নগুলোর একটি বড় অংশ ছিল কংগ্রেসের ('নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'– এআইটিইউসির) নিয়ন্ত্রণে।

অথচ এ আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণি শক্তিমান উপকরণ (অংশীদার) হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। হলে অবস্থা ভিন্নরূপ নিতে পারত। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চরিত্রবদল ঘটার সম্ভাবনাও সেক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ছিলনা।

দুই

সুনীতিকুমার ঘোষের বিচারে বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশে আগস্ট আন্দোলন কৃষক বিদ্রোহের চরিত্র অর্জন করে। সেসব অঞ্চলে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ইংরেজ শাসন অচল হয়ে পড়েছিল। সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ব্রিটিশ রাজকে ওইসব অঞ্চলে কর্তৃত্ব উদ্ধার করতে হয়। তার মতে, 'লড়াই ছিল ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে, কিন্তু জমিদার ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে নয়।' সে ক্ষেত্রে এ বিদ্রোহকে কি চরিত্রবিচারে মতাদর্শগত বিচারে কৃষক বিদ্রোহ রূপে চিহ্নিত করা যায়? না, যায় না।

আগস্ট আন্দোলনের ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, ব্যাপক জনসংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও এর পরিচালনায় ছাত্র, যুব ও শিক্ষিত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক নেতাকর্মীর প্রাধান্য। কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্ব আন্দোলনের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব প্রত্যাহার করলেও তাদের লড়াকু নেতাকর্মী-সমর্থকরা আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট। সংশ্লিষ্ট পূর্বোক্ত তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এ উপলক্ষে আরএসপিআই-এর জয়প্রকাশ নারায়ণ বা সিএসপির অরুণা আসিফ আলীর দেশব্যাপী সংগ্রামী ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল।

কংগ্রেস হাইকমান্ড আন্দোলনের তুঙ্গ পর্যায় থেকেই সহিংসতার অজুহাতে তাদেরই ডাকা আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। বিশেষ করে গান্ধিকে দেখা গেল ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী, কিন্তু ভাইসরয় গান্ধির সমঝোতার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন না। বরং সর্বশক্তি দিয়ে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত এবং সে দমনে সাম্রাজ্যবাদী নির্মমতার যথেষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থাদৃষ্টে কংগ্রেসের চেষ্টা যাতে আত্মগোপনে থাকা তাদের সমাজতন্ত্রী নেতারা আত্মসমর্পণ করেন। এ চেষ্টা ছিল তাদের নীতিগত সিদ্ধান্তে। শুধু একা গান্ধিরই নয়, কংগ্রেস সভাপতি আজাদও তখন ওই একই নীতির অনুসারী। তখনকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাতা উল্টে দেখলে কংগ্রেসের ওই স্ববিরোধী ভূমিকার প্রমাণ মিলবে। গান্ধি-কংগ্রেস সেজন্যই তখন সচেতন তরুণ সমাজের সমর্থন হারিয়েছিল। সে সমর্থন গিয়েছিল সুভাষের দিকে। যদিও সুভাষ তখন অক্ষশক্তির সঙ্গে যুক্ত। সমর্থন নামে সুভাষের দিকে হলেও তা প্রকৃতপক্ষে ছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের দিকে।

কিন্তু আগস্ট আন্দোলনের নেতারা আত্মসমর্পণ করেননি। বরং তাদের চেষ্টা ছিল এ আন্দোলনের মাধ্যমে যুদ্ধে পিছুহটা রাজশক্তির ভারতীয় মসনদ ধরে টান দেয়া, রাজাকে খান খান করার চেষ্টা। হয়তো সে কারণেই লিনলিথগোরও আপ্রাণ চেষ্টা তা যত অমানবিক চরিত্রেই হোক আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দেয়া। কিন্তু কাজটা তাদের জন্য কঠিন ছিল। মেদিনীপুর, বীর মেদিনীপুর তার প্রমাণ। ছাত্র-জনতা মিলে মেদিনীপুরের কাঁথি তমলুকে সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল, যাকে বলে স্বশাসন।

শ্রেণিচরিত্র বিচারে এ আন্দোলন মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির। যদিও এতে জনসাধারণ এবং কৃষক শ্রেণির সংশ্লিষ্টতা ছিল। এর সঙ্গে একাত্তরে সংঘটিত বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্রেণিগত মিল কিছুটা হলেও রয়েছে। সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ছাত্র-যুবার প্রাধান্য, সঙ্গে কৃষক-জনতার অংশবিশেষ। তবে পার্থক্য বিয়াল্লিশের আন্দোলনে শিল্পপতি, পেশাজীবী ও বণিক শ্রেণি এক কথায় বুর্জোয়া, বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণি প্রথম দিকে দোদুল্যমান ছিল। হয়তো তারা বুঝে দিতে চেয়েছিল আন্দোলনের পাল্লা কোন দিকে ভারি– জয় না পরাজয়ের। তাই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা সময় ব্যয় করেছে। হয়তো ভয় ছিল শাসকের রক্তচক্ষুর। তাই তারা জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অবশেষ সিদ্ধান্তে তারা ব্রিটিশ রাজের প্রতি সমর্থন জানিয়ে কমপ্রেডর পুঁজিপতির নিশ্চিন্ত ভূমিকাই পালন করেছে। এদিক থেকে বিড়লা, টাটা প্রমুখ সবাই এক কাতারে যে জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

এসব বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর কংগ্রেসকে অর্থসাহায্য বহুকথিত ঘটনা। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা তো ছিলেন গান্ধির একান্তজন, প্রধান ভরসাস্থল এবং শাসক শ্রেণির সঙ্গে যোগাযোগের সেতু। বিড়লা ছাড়া গান্ধি অচল এবং বিড়লাও তার 'বাপুজি' কে ছাড়া অচল। কারণ বাপুর মাধ্যমে তিনি তার নিজস্ব অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন... কারো কারো মতে, দেশবিভাগের নেপথ্য নায়ক তো বিড়লাসহ বৃহৎ শিল্পপতিগণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

আগস্ট আন্দোলন শুরুর দায় কার বা কাদের– এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, অবশ্যই গান্ধির– স্লোগানগুলো তারই। আর সংগঠনগতভাবে কংগ্রেস এ আন্দোলনের আহ্বায়ক। তবে এমনটাও মনে করা হয় যে, এ আন্দোলনের নামে চাপ দিয়ে গান্ধি ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার হিসাবে ভুল ছিল। ব্রিটিশ শাসক তখন ক্রিপস প্রস্তাবের বাইরে পা বাড়াতে রাজি ছিল না। তার কারণও ছিল। সে কারণ আন্তর্জাতিক।

ঐতিহাসিক স্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের সময়কাল আগস্ট ১৯৪২ থেকে শুরু। সে অসমসাহসীযুদ্ধে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে রুশবাহিনী কঠিন জার্মান ব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়, যে ঘটনা যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বযুদ্ধে এক বাঁকফেরা বিন্দু (টার্নিং পয়েন্ট)। হিটলারের বিশাল বাহিনীর অগ্রগতি স্টালিনগ্রাদ থেকে স্তব্ধ। সম্ভাব্য জয়ের সুবাতাস বুঝে নিতে চতুর চার্চিলের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাই আগস্ট আন্দোলনের দায় সম্বন্ধে গান্ধির বিচার ব্যাখ্যা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। তারা পাল্টা শক্তিপ্রয়োগ জারি রাখার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

আর একথাও ঠিক যে, আন্দোলন তখন গান্ধির হাতে নেই। এর ধ্বংসাত্মক রূপ ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেল-জুলুম, ফাঁসি-গুলি মানুষকে নিরস্ত করতে পারছে না। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ভারতের পক্ষে নব্য দূতিয়ালি প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আর মেনে নিতে রাজি নন। এমনকি কাজে আসছে না টাটা, বিড়লা, ঠাকুরদাস প্রমুখ শিল্পপতি এবং উদারপন্থী রাজনীতিক রাজাগোপালাচারি, তেজবাহাদুর সাপ্রু, জয়াকর প্রমুখের রাজ বনাম কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা তৈরির চেষ্টা। লিনলিথগো এ বিষয়ে কঠোর ও অনড়। অনড় প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল।

সর্বশেষ বিচারে দেখা যায় যে আগস্ট আন্দোলন পুরোপুরি স্তব্ধ করে দিতে সেনাবাহিনীর সাহায্য সত্ত্বেও ভারত সরকারের দুবছর সময় লেগেছিল। এ তথ্য থেকেই আগস্ট আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভব করা যায়। অথচ ভারতীয় এবং বঙ্গীয় কমিউনিস্ট পার্টি তাদের অন্ধ আন্তর্জাতিকতার তাড়নায় আগস্ট আন্দোলনের ভুল মূল্যায়ন করেছে। এমনকি করেছেন বাংলার মননশীল মার্কসবাদী লেখকগণ। এ ধরনের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি বিদগ্ধ মার্কসীয় তাত্ত্বিক-লেখকদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশাপাশি একথাও ঠিক যে আগস্ট আন্দোলনের সমর্থকবৃন্দ বিশেষ করে ছাত্র-যুব নেতৃত্বে এ বিষয়ে ছিল আতিশয্য। তাদের কেউ কেউ এ আন্দোলনকে 'বিপ্লব' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন যা আদৌ ঠিক ছিল না। কারণ গান্ধির নির্দেশিত এ আন্দোলনে বিপ্লবের কোনো দিকনির্দেশনা বা মতাদর্শগত তত্ত্ব উপস্থিত ছিল না। ছিল না এর পেছনে বিপ্লবী মতাদর্শের কোনো জনসংগঠনের নেতৃত্ব। শুকনো মাঠে রোদেতাপে খড়বিচালি এতটাই তেতে ছিল যে তাতে জ্বলে ওঠার জন্য দরকার ছিল স্ফুলিঙ্গ। আগস্ট আন্দোলন সেটাই জুগিয়ে দেয়।

ছোট একটি ঘটনা প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার কিছুকাল পর ফরোয়ার্ড ব্লকের ছাত্রফ্রন্ট নিখিলবঙ্গ ছাত্র কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বর্ধমানের মহারাজার অতিথিশালায়। আর ওই সম্মেলনে গরমে-গুমোটে বিন্দুমাত্র অতিষ্ঠ না হয়ে ছাত্রনেতাগণ রাতভর উত্তপ্ত বিতর্কে ব্যস্ত ছিলেন এ সত্য নির্ধারণ করতে যে 'আগস্ট আন্দোলন বিদ্রোহ না বিপ্লব'— তাদের ভাষায় 'রিভোল্ট অর রেভল্যুশন'। যতদূর মনে পড়ে ওই সম্মেলনে বিতর্কের সুরাহা হয়নি। তবে বিদ্রোহপন্থীরা ছিলেন দলে ভারী। এবং সেখানে ছিলেন বসু পরিবারের ছাত্র-যুব নেতাগণ। তবে আমার কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছিল বঙ্গীয় সম্মেলনে তাবৎ বাঙালি ছাত্র-যুবাদের উপস্থিতিতে নেতাদের ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা ও তর্ক-বিতর্ক। বাঙালি সন্তানের এই দুর্মতি ঔপনিবেশিক শাসনসূত্রে ধার করা। রবীন্দ্রনাথ বৃথা চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসকে এ ঝোঁক থেকে ফেরাতে।

আগস্ট আন্দোলন এর উপকরণ ও চরিত্রবিচারে ছাত্র-যুব-জনতার স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস। এর তীব্রতা ও ব্যাপকতা অনেকের হিসাবে ছিল না। সবদিক বিচারে বিপ্লব নয়, এতে স্বাধীনতা-প্রয়াসী প্রতিবাদী বিদ্রোহেরই প্রকাশ ঘটেছে যদিও স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ এলাকায়, রাঢ়বঙ্গ থেকে বিহার হয়ে মহারাষ্ট্র অবধি। বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র নেতৃত্বে সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং এর নেতৃত্বে একক বিপ্লবী মতাদর্শ ও সংগঠন না থাকার ফলে আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারেনি। আগস্ট আন্দোলন, গোপাল হালদার যা-ই বলুন 'বিয়াল্লিশী বিলাস' নয়, অবশ্যই ছাত্র-যুব-জনতার স্বাধীনতার আন্দোলন। এ আন্দোলন সুশৃঙ্খল বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র নিয়ে পরিচালিত হলে সাফল্য দেখা দিতেও পারত— এবং তা শেষ সমঝোতায় বা রক্তাক্ত যুদ্ধে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দুঃশাসনের কালোছায়া

স্বদেশ-বিদেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় ১৯৪২ সাল নিঃসন্দেহে এক তাৎপর্যপূর্ণ কালখণ্ড। এর মধ্যে আগস্ট মাস বিশেষ একটি সময়বিন্দু। এ সময়ের দুটো ঘটনায় তা প্রতিফলিত। প্রথমত, ভারতে গান্ধি ঘোষিত 'ইংরেজ ভারত ছাড়' প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত এবং সেই সূত্রে ব্যাপক প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা যা সরকারি দমননীতির প্রতিক্রিয়ায় দ্রুত সহিংস রূপ ধারণ করে। ভাইসরয় লিনলিথগোর প্রশাসন তা কঠোর হাতে দমনের সিদ্ধান্ত নেয়।

দ্বিতীয়ত, স্টালিনগ্রাডে রুশী আত্মদান ও বীরত্বের প্রভাবে আগস্টের শেষ দিক থেকে যুদ্ধের গতি পরিবর্তন যা বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বিশ্বের শান্তিবাদী মানুষের জন্য স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধ স্বস্তির সম্ভাবনা বয়ে আনে। বিশ্বযুদ্ধের এ নাটকীয় গতি পরিবর্তন মিত্রশক্তির অন্যতম সদস্য ব্রিটিশরাজের পায়ের নিচে মাটি শক্ত হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দেয় এবং উপনিবেশে বিশেষত ভারতে তাঁদের প্রশাসনিক ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে।

এমনিতেই যুদ্ধকালীন গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রান্তিক ভারত বিশেষত বঙ্গদেশের জন্য নানামুখী দুর্ভোগের কারণ হয়ে উঠেছিল। আগস্ট আন্দোলন তাতে বিদ্রোহী হাওয়ার জোগান দেয়। এর ওপর চলে পাল্টা দমননীতির নির্মমতা। এর সর্বাধিক প্রকাশ দেখা যায় বিহার-বঙ্গে। বাংলায় তখন ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন ফ্রন্টের সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করছে।

এ মন্ত্রিসভার প্রতি বিরূপ যেমন শ্বেতাঙ্গ শাসক তেমনি বেসরকারি শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠী এবং বিশেষ করে বাংলার গভর্নর। আর বঙ্গীয় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক বিরোধিতা তখন রাজনীতির নৈতিকতা ও সব রকম সৌজন্যবোধের সীমা অতিক্রম করে, বিশেষভাবে বঙ্গীয় লীগ নেতাদের ভাষণে ও আচরণে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্যার নাজিমুদ্দিন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তারা বিধানসভায় এবং রাজপথে-ময়দানে বক্তৃতায় হক মন্ত্রিসভাকে অভিযুক্ত করেন মিত্রশক্তির বিরোধী এবং ফ্যাসিস্টশক্তি ও সুভাষ বসুর রাজনৈতিক সহযোগী হিসেবে বর্ণনা করে (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্যবিবরণী)।

এর মূল কারণ, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সুভাষ– ভ্রাতা শরৎ বসু ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে ফজলুল হকের সৌহার্দ্য এবং ফরোয়ার্ড ব্লক কোয়ালিশন ফ্রন্টের শরিক বলে। অবাক হওয়ার নয় যে, নাজিম-সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে কাজ করেছে শাসক-সহযোগী 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা, মূলত এর সম্পাদক আর্থার মুরের কল্যাণে। পরিস্থিতি এমনি দাঁড়ায় যে, ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তিকর নিবন্ধ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে জন্য হক সাহেব সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন (প্রাগুক্ত, অমলেন্দু দে)।

জিন্না ও মুসলিম লীগ কীভাবে ভারতীয় ইংরেজ শাসকদের পোষ্যপুত্র হয়ে ওঠে তা চল্লিশের দশকের সাত বছরব্যাপী ইতিহাসের পাতায় পাতায় রাজনৈতিক ঘটনার চরিত্র নিয়ে ধরা আছে। আমলা গোষ্ঠী, শ্বেতাঙ্গ সমর্থক পত্রিকা ও বেসরকারি ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে শুরু করে বঙ্গীয় গভর্নর ও ভাইসরয় পর্যন্ত সবাই প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে জিন্না-লীগকে নগ্ন ও প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানাতে লজ্জাবোধ করেনি, তাদের নৈতিকতায় বাধেনি। শাসনযন্ত্র এ সময় কট্টর কংগ্রেস-বিরোধী, বিরোধী কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট বাম ঘরানার, জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংগঠন ও প্রজাপার্টিরও।

আরো একটি বিষয় বিবেচনায় রাখা দরকার যে, মূলত ফজলুল হক প্রমুখের আত্মঘাতী পদক্ষেপ এবং হিন্দুমহাসভার মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গে আঁতাত মুসলমান সমাজে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এর প্রমাণ মেলে ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল কাউন্সিলের নির্বাচনী ফলাফলে।

এ সময় থেকে ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত নানা ঘটনা লীগ রাজনীতিকে ক্রমাগত শক্তিশালী করেছে। আর মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পথে টেনে নিয়ে গেছে, যেমন ওই পথে হেঁটেছে কংগ্রেসের রক্ষণশীল অংশ এবং সাভারকর ও হিন্দুমহাসভার মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। এর সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে বঙ্গে। কারণ বঙ্গীয় মুসলমান তুলনামূলক বিচারে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে পশ্চাদপদ।

এ অবস্থায় মুসলিম লীগের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো। এ বিষয়ে মুসলিম লীগ সদস্যরা ফজলুল হকবিরোধী অপপ্রচারে এতটাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে দূর মফস্বল শহরে থেকেও তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। যুদ্ধাবস্থাও মুসলিম লীগকে সাহায্য করেছে। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতির মতো বিষয়াদি ছিল সামরিক কর্তৃপক্ষ ও আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল, মন্ত্রিসভা সেখানে অনেকটা অসহায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য নিয়মমাফিক মন্ত্রিপরিষদই দায়ী হওয়ার কথা। আর এ উপলক্ষে নাজিমুদ্দিন-সোহরাওয়ার্দী, বিশেষভাবে সোহরাওয়ার্দী হক মন্ত্রিসভাকে শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতার জন্যই দায়ী করেন না, ব্যক্তি ফজলুল হককে দায়ী করেন হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের দূত হিসেবে। বিধানসভায় তার বক্তব্যে এমন উদ্ভট অভিযোগও উত্থাপিত হয় (প্রাগুক্ত)।

এ সম্বন্ধে অমলেন্দু দে বিধানসভায় সোহরাওয়ার্দীর ২৭ মার্চের (১৯৪৩) দীর্ঘ বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত করেছেন তার বইতে। এমনকি একই সুরে পরিবেশিত নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতাও তুলে ধরেছেন, যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়কে ফজলুল হক সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। অবশ্য এসব উদ্ভট বক্তব্যের বাস্তবতা নাকচ করে বক্তৃতা করেছেন কিরণশংকর রায়, এমনকি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও। একই দিনে (২৭ মার্চ) ফজলুল হক তার দীর্ঘ বক্তৃতায় উল্লিখিত অভিযোগের যুক্তিনিষ্ঠ জবাব দেন। তিনি বলেন, 'সোহরাওয়ার্দী সারাজীবন ধরেই তার শত্রুতা করেছেন। তিনি কখনই তার ক্ষতি করার সুযোগ নষ্ট করেননি। করেননি তার একান্ত নিকটজন হওয়া সত্ত্বেও' ইত্যাদি (প্রাগুক্ত)।

হক বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলিম লীগের ক্রমাগত অপপ্রচার এবং গভর্নর হার্বার্টের মরিয়া প্রচেষ্টার কারণে এ মন্ত্রিসভা বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। তা ছাড়া দেশের অবস্থাও নানাদিক থেকে সংকটের সম্মুখীন। তাই তিনি সর্বদলীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে 'জাতীয় সরকার' গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সে ক্ষেত্রে গভর্নর রাজি হলে তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত রয়েছেন বলে জানান।

গভর্নর এ সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে পরদিনই (২৮ মার্চ) ডেকে পাঠান এবং জাতীয় সরকার গঠনের কোনো প্রক্রিয়া শুরু না করে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে তার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে অনেকটা জোর করেই পূর্বপ্রস্তুত একটি পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর দিতে তাকে বাধ্য করেন। এটা ছিল সরকার তরফে হকবিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ, যেখানে ন্যায়নীতি ও যুক্তির কোনো বালাই ছিল না। এভাবেই হক মন্ত্রিসভা বাতিল এবং ৯৩ ধারাবলে বঙ্গে গভর্নরের শাসন জারি। আশ্চর্য যে, পাকিস্তান আমলে প্রায় একইভাবে ৯২-ক ধারা জারি করে পূর্ববঙ্গে হক মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয় (৩০ মে, ১৯৫৪)।

দুই

এদেশে ইংরেজ শাসকগণ লর্ড, ব্যারন, স্যার যাই হোন না কেন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তাদের জুড়ি ছিল না। বেনিয়াবৃত্তিতেও তারা তুলনারহিত। কথা দিয়ে কথা না রাখা অর্থাৎ বিশ্বাস হননে অদ্বিতীয় ব্রিটিশ শাসকদের ঐতিহ্যের ধারক গভর্নর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন হার্বার্টও কথা দিয়ে কথা রাখেননি। তাকে এহেন অপকর্মে সমর্থন জুগিয়েছেন গভর্নর জেনারেল লর্ড লিনলিথগো। তাতে তার নীতিবোধ আহত হয়নি। সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা বলে কথা।

গভর্নর হার্বার্ট যে বঙ্গে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তার বিশেষ ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার করে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে পারেন তা প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতাদের একেবারে অজানা ছিল না। কিন্তু হক পরিস্থিতির শিকার এবং 'রাজ'শক্তির কাছে তার হার না মেনে উপায় ছিল না। তবু ফজলুল হক ও শামসুদ্দিন আহমদ ভাইসরয়ের কাছে প্রেরিত তারবার্তায় সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিবাদ জানান এবং গভর্নরকেও চিঠি লেখেন (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৩)। কিন্তু তাতে কোনো সুবিচার মেলেনি।

সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের বদলে গভর্নরের চেষ্টায় স্যার নাজিমের নেতৃত্বে বঙ্গে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ২৪ এপ্রিল (১৯৪৩)। সমর্থন আদায় করা হয় কয়েকজন তফসিলি সদস্যের অবশ্য দুই দুইটি মন্ত্রিত্বের বিনিময়ে। জিন্না এ রাজনৈতিক বিজয় (ইংরেজ শাসকের বদৌলতে) উদ্‌যাপন করেন দিল্লিতে মুসলিম লীগ অধিবেশনে দীর্ঘ বক্তৃতায় এবং ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে।

ইংরেজ শাসকের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিশাল এক সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুর হালিম গজনভি। প্রধান বক্তা একে ফজলুল হক। তিনি সভায় ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ পেশ করেন। এ সভায় সৈয়দ বদরুদ্দোজাসহ একাধিক নেতা বক্তৃতা করেন। নিন্দা জানানো হয় গভর্নরের অন্যায় ও অসাংবিধানিক আচরণের। ঐতিহ্যবাহী এ টাউন হলে অতীতে রবীন্দ্রনাথ এবং একাধিক রাজনৈতিক নেতা সরকারি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তৃতা করেছেন যা ঐতিহাসিক তাৎপর্যে মূল্যবান।

প্রসঙ্গত 'রাজ' শাসন সম্পর্কে দু-চার কথা বলা দরকার, বিশেষ করে ক্লাইভ-হেস্টিংস-ডালহৌসিদের সঠিক উত্তরসূরি ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো এবং তার গভর্নরকুল ও প্রশাসন সম্বন্ধে। 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির চরম প্রকাশ্য উদাহরণ রেখেছিলেন ভাইসরয় লিনলিথগো ও তার অধীনস্থ গভর্নরগণ। তাদের স্বেচ্ছাচারিতার চরম উদাহরণ দেখা গেছে বঙ্গে, আসামে, সিন্ধুতে।

জবরদস্তি করে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে যেভাবে জাতীয় সরকার গঠনের নামে ধোঁকা দিয়ে শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করানো হলো তাতেই ক্ষান্তি ছিল না বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্টের। আরো ষড়যন্ত্র লুকানো ছিল তার আস্তিনের ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির অনাচার হিসেবে পরিচিত হর্স ট্রেডিং অর্থাৎ দলবদলের সুযোগ করে দিতে গভর্নরের উদ্যোগে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ১৩-তে উন্নীত করা হয়। সেই সঙ্গে একই সংখ্যক পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির পদ অনুমোদন করা হয়। অথচ মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক অনেক চেষ্টা করেও তার মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা আট থেকে আর বাড়াতে পারেননি। গভর্নর সাহেব অনুমতি দেননি। এমনই ক্ষমতা ছিল গভর্নরদের এবং তা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বদৌলতে। সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগে অনেক লোভী রাজনীতিক কে কাছে টানা সহজ হয়ে ওঠে। সহজ হয় মন্ত্রিসভা গঠন।

সিন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতা মুখ্যমন্ত্রী আল্লাবক্সও অনুরূপ অন্যায়ের শিকার। 'খান বাহাদুর' ও 'নাইটহুড' খেতাব বর্জনের অপরাধে স্থানীয় গভর্নর তাকে পদচ্যুত করেন এবং মুসলিম লীগকে ডেকে এনে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা করে দেন গভর্নর। একই সময়ে (১৯৪২) আসামে মুসলিম লীগ দলকে একইভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ করে দেয়া হয়। এভাবে ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে বিশেষভাবে মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান শক্তিসঞ্চারে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে 'রাজ' শাসকগোষ্ঠী।

তিন

বঙ্গের দুর্দিনে এ সময়ে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে গান্ধি কংগ্রেসের আঁতাত তৈরির তথা সমঝোতার চেষ্টা, বিশেষ করে যখন আগস্ট আন্দোলনের জেরে দেশ জ্বলছে, দেশ পুড়ছে। আন্দোলন, গুলি, মৃত্যু, ফাঁসি তখনকার নিয়মিত ঘটনা। সমঝোতা স্থাপনে ব্যর্থ হলে গান্ধির চিরাচরিত প্রতিক্রিয়া অনশন। অনশন শুরু ৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৩) থেকে ২১ দিনের জন্য ২ মার্চ পর্যন্ত।

ইতিহাস লেখকদের মতে অনশনের কারণ দুর্বোধ্য– তবে আপাতদৃষ্টিতে নিঃশর্ত মুক্তির জন্য। নেপথ্য কারণ জনমনে এবং শাসনযন্ত্রের ওপর প্রভাব সৃষ্টি। কারণ গান্ধির মতো রাজনৈতিক ভাবমূর্তিসম্পন্ন ব্যক্তির অনশনে মৃত্যু বিশ্ববোদ্ধামহলে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। কিন্তু ভাইসরয় লিনলিথগো তবু অনড়। তার মতে, এ জাতীয় অনশন এক ধরনের রাজনৈতিক 'ব্লাকমেইল' ছাড়া কিছু নয়। রাজশাসকের সঙ্গে গান্ধির সমঝোতা প্রচেষ্টা হালে পানি পায়নি। বৃথা গেছে একুশ দিনের অনশন। এক বছরেরও পর তার বন্দিত্ব ও অন্তরীণদশার অবসান ঘটে (৬ মে, ১৯৪৪)।

যাই হোক, আবার বঙ্গীয় প্রসঙ্গে আসা যাক। সত্যি ১৯৪৩ সাল বাংলার রাজনীতিতেই নয়, জীবনযাপনের জন্যও ছিল সঙ্কটের কাল। আগস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনের জের তখনো ভালোভাবেই চলছে। এর মধ্যেই পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে সরকারি (শাসকরাজের) নীতির কারণে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষের অশুভ ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, পরে যা পঞ্চাশের মহামন্বন্তর নামে কুখ্যাতি অর্জন করেছে।

সরকারি নীতির কারণে এমন সম্ভাবনা লক্ষ্য করেই ১৯৪২ সালের আগস্টে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বঙ্গীয় গভর্নরকে তাদের খাদ্য মজুদ ও সরবরাহ নীতি পরিবর্তনের জন্য চিঠি লিখে আহ্বান জানান। কিন্তু গভর্নর তাতে কান দেয়া দরকার মনে করেননি। অন্যদিকে এপ্রিলে গঠিত নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেনি। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন খাদ্যমন্ত্রী। শীলা সেন লিখেছেন, সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় লঙ্গরখানা খুলে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর মোকাবেলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসলে খাদ্য মজুত ও সরবরাহের পদক্ষেপ সোহরাওয়ার্দীর আগেই নেয়া উচিত ছিল। কারণ লঙ্গরখানা খোলা সত্ত্বেও কয়েক লাখ দরিদ্র গ্রামীণ জনতার মৃত্যু ঘটে কীভাবে?

প্রকৃতপক্ষে যাদের বদান্যতায় মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন তাদের জনবিরোধী খাদ্যনীতি ও অন্যান্য নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা বা ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস বা শক্তি কোনোটাই মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন বা খাদ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর ছিল না। এ ব্যর্থতা গোটা মন্ত্রীমণ্ডলীর। এর ফলে পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রামীণ দরিদ্র জনসংখ্যার মৃত্যু সরকারি হিসাবে ১৫ লাখ, সমকালীন অন্য হিসাবে ৩৫ লাখ এবং বহু কথিত নানা সূত্রের হিসাবে ৫০ লাখ। বাংলায় এ অমানবিক মৃত্যু নিয়ে রচিত হয়েছে মন্বন্তর সাহিত্য, দেখা গেছে শিল্পী জয়নুল আবেদীনের রেখাচিত্রে মৃত্যুর ভয়াবহতা।

AMARBOI.COM

আশ্চর্য যে তা সত্ত্বেও এ দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর মিছিল, 'ফ্যান দ্যাও' আর্তি নাজিম মন্ত্রিসভার অস্তিত্বে সামান্যতম আঁচড় কাটতে পারেনি। মজুতদার, কালোবাজারি দুর্বৃত্তরা লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে অর্থেবিত্তে ফুলে ফেঁপে কলাগাছ হয়ে ওঠে। কিন্তু মন্ত্রিসভা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা চালায়নি। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এ মৃত্যু বাঙালি মধ্যবিত্তকে স্পর্শ করেনি। করেছে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে। তবে শিল্পী সাহিত্যিককুলের চৈতন্য গভীরভাবেই স্পর্শ করেছিল।

শুধু চালের সঙ্কটই নয়, এ সময় চিনি, কেরোসিন, নুন ইত্যাদি অত্যাবশ্যক সামগ্রীও দুর্মূল্য হয়ে ওঠে, কোথাও কোথাও দুষ্প্রাপ্য। এ সময়ে সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী নড়াইল মহকুমা শহরে এসে টাউন হলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার দোআঁশলা বাংলায়– তাই নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি! টাউন হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র ও শহুরে মধ্যবিত্ত ছাড়াও ছিল সিভিকগার্ড-হোমগার্ড ও কমিউনিস্ট নেতাকর্মীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। মন্ত্রীর আশ্বাসে আশ্বস্ত হননি শহরের মানুষ।

ভাবতে অবাক লাগে এমন এক জাতীয় দুর্যোগ ও গণমৃত্যু সত্ত্বেও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ফজলুল হকের মতো ধীমান রাজনীতিকদের কেউ অভিযোগের আঙুল তোলেননি। না বিধানসভায়, না ময়দানে জনসভায়। দাবি তোলেননি তাদের ব্যর্থতাজনিত পদত্যাগের। বরং সে সময়কার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলায় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক শক্তি ক্রমবর্ধমান। কী আশ্চর্য স্ববিরোধী ঘটনা। আরো চমৎকার ঘটনা যে এ সময় বঙ্গে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহের 'সোল এজেন্ট' ছিল জিন্নার আশীর্বাদধন্য ইস্পাহানি। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর দায় তাদের ওপরও বর্তায় (পড়ুন বঙ্গীয় বিধানসভায় খাদ্য পরিস্থিতির ওপর মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা, ৫ জুলাই, ১৯৪৩)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হক সোহরাওয়ার্দী দ্বন্দ্ব : লীগের অগ্রযাত্রা

গ্রামবাংলায় দুর্ভিক্ষের নেপথ্য নায়ক যেমন নাজিমুদ্দিন-সোহরওয়ার্দী মন্ত্রিসভা ও 'রাজ' তেমনি ব্যবসায়ীকুল বড়-ছোট সবাই। ইস্পাহানি গ্রুপ তখন বাংলায় খাদ্যপণ্য সরবরাহের প্রধান এজেন্ট। পঞ্চাশের সেই মহামন্বন্তর ঘটার পূর্বাহ্নে হাসান ইস্পাহানি ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে রাজনৈতিক মেলবন্ধন ভালোই ছিল। দুজনই প্রচণ্ড রকম হকবিরোধী। একজন জিন্নার অতীব বিশ্বাসভাজন দূত হিসেবে দ্বিতীয়জন বঙ্গের মসনদে বসার উচ্চাশায়।

কিন্তু কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ফজলুল হককে বিদায় করে দেয়ার পর গভীর হতাশা নিয়ে সোহরাওয়ার্দী লক্ষ্য করেন তার বদলে কমিটিতে নেয়া হয়েছে জিন্নার বিশেষ আস্থাভাজন হাসান ইস্পাহানিকে, যে ইস্পাহানি মূলত ব্যবসায়ী, রাজনীতিক নন। সোহরাওয়ার্দী ও তার অনুসারীদের ধারণা ছিল ওই শূন্যস্থান সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে পূরণ করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। কারণ জিন্নার হিসাব-নিকাশ ছিল অন্যরকম।

প্রথমত বঙ্গীয় মুসলিম লীগ রাজনীতি ছিল জিন্নার জন্য সমস্যা-সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে তার জন্য দরকার নিরেট, অন্ধ অনুসারী। লক্ষ্য করার বিষয় যে একনায়কী মনোভাবাপন্ন জিন্না মুসলিম লীগে কোনো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিককে সহ্য করতে পারেননি, সহ্য করতে পারতেন না। তার প্রয়োজন লিয়াকত-খালিকুজ্জামান বা নাজিমুদ্দিন, রাজা গজনফর আলীর মতো অন্ধসমর্থক, যারা তার কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবেন না। এই নিরেট সমর্থনে তার পক্ষে পাকিস্তান আদায় অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসে গান্ধির একাধিপত্য থাকলেও সেখানে ভিন্নমতের অভাব ছিল না। কিন্তু মুসলিম লীগে জিন্না হিটলারি ধরনের একনায়ক। বিরোধিতা মানে বহিষ্কার। যেমনটা ফজলুল হকের বেলায় ঘটেছে।

হাসান ইস্পাহানিকে ওই গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনীত করার পেছনে দুটো সম্ভাব্য কারণ– ইস্পাহানিকে বিশ্বস্ত রাখতে খুশি করা, সেই সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলিম

লীগের অর্থ-তহবিল মোটামুটি নিশ্চিত করা। সম্ভবত অন্য কারণ- সোহরাওয়ার্দীকে পুরোপুরি বিশ্বস্ত মনে না করতে পারা। কিছুটা হলেও সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আশঙ্কা এবং বঙ্গীয় লীগ নিয়ে তার দুশ্চিন্তা। ফজলুল হক তেমন উদাহরণ।

বঙ্গীয় মুসলিম লীগে তাই জিন্না বরাবরই চেয়েছেন খাজা নাজিমুদ্দিনের মতো বিশ্বস্ত রাজনীতিক কিংবা ইস্পাহানির মতো ধনাঢ্য অনুরাগী সমর্থক। একচ্ছত্র নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে তিনি সোহরাওয়ার্দীকে হকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী শহীদ সোহরাওয়ার্দীও চোখ বন্ধ করে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারণায় নামেন। যে প্রচারণা অনেকটা অপপ্রচারের মতোই ছিল। উদ্দেশ্য দলের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ক্রমশ মই বেয়ে ওপরে ওঠা। কিন্তু জিন্না! তিনি ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাই সোহরাওয়ার্দীর আশা পূর্ণ হয়নি।

ক্ষুব্ধ সোহরাওয়ার্দী ও তার সমর্থকরা। তাদের কেউ কেউ জিন্নার কাছে এ ব্যাপারে আবেদন জানিয়ে থাকবেন। যেমন কিছুকাল আগে জানিয়েছিলেন কলকাতা লীগের কর্তাব্যক্তি গোঁড়া সম্প্রদায়বাদী, অবাঙালি রাগিব আহসান। দুর্বোধ্য কারণে হক বহিষ্কৃত হওয়ার পর খাজা নাজিমুদ্দিন জিন্নার সিদ্ধান্তে সমর্থন জানিয়েও মৃদুকণ্ঠে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে আবেদন জানান, যাতে ভবিষ্যতে তাকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেয়া হয়।

সোহরাওয়ার্দীর কাছে জিন্নার প্রচ্ছন্ন বার্তা বোধহয় এভাবেই পৌঁছে যে ফজলুল হক লীগের শত্রু, মুসলমান সমাজের শত্রু। তার বিরুদ্ধে লেগে যাও, তাকে মুসলিম রাজনীতি, বঙ্গীয় রাজনীতিতে কোণঠাসা করে ফেল।...সোহরাওয়ার্দী কী বুঝেছিলেন তিনিই জানেন। তিনি সর্বশক্তি নিয়ে হকের বিরুদ্ধে ময়দানে নামেন। হক রাজনীতির বড় প্রতিপক্ষ নাজিমুদ্দিনও এতটা বিরূপতা ও তেজ নিয়ে হক সাহেবের বিরুদ্ধে নামতে পারেননি। অবশ্য নাজিমুদ্দিন সাহেবের এতটা শক্তিসাহস কোনোটাই ছিল না। ছিল না তুখোড় রাজনৈতিক নেতা সোহরাওয়ার্দীর মতো সাংগঠনিক ক্ষমতা। সর্বোচ্চ নেতার প্রতি বিশ্বস্ততাই তাকে রাজনীতিতে টিকিয়ে রেখেছিল। যাইহোক সোহরাওয়ার্দী সম্ভবত দলে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে আপাতত নাজিম-বিরোধিতা শিকেয় তুলে হকের বিরুদ্ধে ঘরবাহির গরম করে তুলতে থাকেন। ওই ব্যাপারে, বিশেষ করে সাংগঠনিক কার্যক্রমে তার দক্ষতা ছিল অনস্বীকার্য- যা দেখা গেছে বিভাগোত্তর কালেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

সম্ভবত বঙ্গীয় রাজনীততে তার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করতে জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রচণ্ড বেগে হকবিরোধী প্রচারণায় নেমে ফজলুল হকের সমর্থক মুসলমান তরুণ সমাজ বিশেষ করে ছাত্রদের মন সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিষিয়ে তোলেন এবং তাতে সফলও হন। কারণ নিছক ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য হিন্দু মহাসভাপ্রধান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে টেনে এনে বঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন মুসলমান সমাজ ভালো চোখে দেখেনি। এমনকি দেখেনি নিরপেক্ষ গ্রুপও। সম্প্রতি প্রকাশিত শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তেও এমন প্রমাণ মিলবে।

এসব প্রচারে ফজলুল হককে 'বিশ্বাসঘাতক', মুসলমান সমাজের 'মীরজাফর' নামে আখ্যায়িত করা হয়। ছাত্রসমাজকে এতটা বিক্ষুব্ধ করে তোলা হয় যে তারা হক সাহেবের বিরুদ্ধে আপত্তিকর স্লোগান দিতেও দ্বিধা করেনি। আর এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল মুসলমান পরিচালিত পত্র-পত্রিকা, বিশেষ করে 'আজাদ', 'স্টার অব ইন্ডিয়া' ইত্যাদি। আর রাগিব আহসানের হক বিরোধিতা সব নিয়মনীতি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। হকের জনসভায় হামলা, গুণ্ডামি তাদের নিয়মিত কর্মকাণ্ড হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সংবাদ মাধ্যমে অপপ্রচার। মাওলানা আকরম খাঁর পত্রিকা আজাদ বরাবরই ফজলুল হকের বিরুদ্ধাচরণ করে গেছে, এমনকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও। শীলা সেন মনে করেন, 'নবযুগ' কাগজ প্রকাশের পেছনে হক সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দেয়া (পৃ. ১৩০)।

তবে সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়বাদী শক্তির বিরুদ্ধে তার একক লড়াই খুব একটা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। লড়াইটা ছিল অনেকাংশে একক শক্তিতে। অবশ্য এজন্য তিনি নিজেও কম দায়ী ছিলেন না। তবে তার বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দীর কুৎসা ও অপপ্রচার ফজলুল হককে খুবই ক্ষুব্ধ করেছিল।

কিন্তু তিনি নিজেই যেখানে সম্ভাবনাময় প্রজাপার্টি নামক রাজনৈতিক বৃক্ষটির শিকড় কেটেছেন সেখানে ওই বৃক্ষের মহীরুহ হয়ে ওঠা একেবারে অসম্ভব ছিল। স্বতন্ত্র নির্বাচন ও স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে প্রবীণ রাজনীতিবিদ ফজলুল হকের সমন্বয়বাদী রাজনীতির লড়াই শক্তির সমাবেশ ঘটাতে পারেনি। বঙ্গীয় মুসলিম লীগে নাজিম বনাম সোহ্‌রাওয়ার্দীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় নরমপন্থী বা উদার রাজনীতিকদের প্রত্যাশা ছিল হক-সোহরাওয়ার্দীর পরস্পর নির্ভরতা, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। যেমন পূর্ববঙ্গে ১৯৫৩ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হক-সোহরাওয়ার্দীর সম্পর্ক ছিল যান্ত্রিক, ছাত্রদের চাপে বাধ্যবাধকতার, যে জন্য তা ভাঙতে দেরি হয়নি।

অথচ অখণ্ড বঙ্গের প্রথম হক মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়ার্দী সদস্য ছিলেন। এরা মিলিতভাবে জনসভায় যোগও দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে আন্তরিক সদ্ভাব বড় একটা দেখা যায়নি। আরো একটি বিষয় বিবেচ্য যে, এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবনার মিল ছিল না। প্রজাপার্টির ফজলুল হক এক পর্যায়ে মুসলিম লীগে যোগ দিলেও বাঙালি চেতনার ভিতটা তার মধ্যে কখনো নষ্ট হয়ে যায়নি। এমনকি মুছে যায়নি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব। তাই মাঝে মধ্যে সর্বভারতীয় রাজনীতি এবং নেতৃত্ব তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কিন্তু বঙ্গবাসী হওয়ার কারণে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। যেমন হয়েছিলেন কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন, সুভাষ। তেমনি লীগে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী। আঞ্চলিক নেতৃত্বের উর্ধ্বে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যদের তেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিল না।

তবে হক সাহেবের পক্ষে ওই উত্তরণে প্রধান বাধা তার ব্যক্তিত্ব, তার বাঙালিত্ব চেতনা। আর এ দুই কারণেই জিন্নার সঙ্গে তার রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র হয়ে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিণত হয়। বঙ্গীয় রাজনীতিতে অবাঙালি প্রভাব ফজলুল হক মানতে চাননি। অন্যদিকে চেয়েছেন বাংলা-বাঙালির উন্নতি যা মোহাম্মদ আলী জিন্নার মোটেই পছন্দসই ছিল না। এদিক থেকে সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বের উর্ধ্বে ওঠার প্রতিযোগিতায় কয়েক পা এগিয়ে ছিলেন। কারণ বাংলা বাঙালি নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তিনি নাজিমুদ্দিনের মতো পুরোপুরি বাঙালিও ছিলেন না। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার তিনি বিরোধী ছিলেন। মুসলিম লীগ রাজনীতি, স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতি তথা পাকিস্তান রাজনীতির তিনি আন্তরিক সমর্থক ছিলেন। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি নিয়ে ফজলুল হকের মতো 'আত্মিক দ্বন্দ্ব' তার ছিল না। তবু রাজনৈতিক বিবেচনায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্নার একান্তজন হয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু কেন?

এ বিষয়ে বঙ্গীয় রাজনীতির ইতিহাসলেখক ও আলোচক, বিশ্লেষকদের কাছ থেকে সদুত্তর মেলে না। অনুমান যে জিন্না তার প্রতি সোহরাওয়ার্দীর একচেটিয়া বিশ্বস্ততা নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। ঘটনা কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মনে প্রাণে পাকিস্তানবাদী মুসলিম লীগ নেতা। তিনি কখনো জিন্নার বিরুদ্ধে দাঁড়াননি, বিদ্রোহ দূরের কথা। তবে ব্যক্তিত্ব-সংঘাতের সম্ভাবনা হয়তো জিন্নার মনে ছিল কিন্তু সে ধারণা ঠিক ছিল না। পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দেখা গেছে পাক আমলে জিন্না-লীগ গঠন করতে যা ছিল তার স্ববিরোধিতার আরেকটি উদাহরণ। লাহোর প্রস্তাবের দুই পাকিস্তানের 'S' অক্ষর মুছে এক পাকিস্তান করার ষড়যন্ত্রে তিনিই তো জিন্নার ডান হাত। সেজন্য ক্ষুব্ধ হন আবুল হাশিম।

তিন

মুসলিম লীগ থেকে ফজলুল হকের বহিষ্কারের পর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে মুসলিম লীগের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ-বিরোধী চরিত্র নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। এ চরিত্র শুধু কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ছিল বঙ্গীয় নেতৃত্বের শীর্ষস্তরে। রাগিব আহসান থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বা মাওলানা আকরম খাঁর মতো ব্যক্তি এ ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হক বিরোধিতায় তা ন্যক্কারজনকভাবে প্রকাশ পায়। ফজলুল হকের জনসভায় হামলা, মিছিল করে অশ্লীল শ্লোগান, কর্মীদের মারধর কোনো কিছুতেই কমতি ছিল না লীগ কর্মীদের। এক কথায় গুণ্ডামি ও মাস্তানি যা বিশেষভাবে দেখা গেছে নির্বাচনী প্রচার ও নির্বাচনকালে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষ উৎস ও গবেষকদের বিবরণ একই কথা বলে। এ ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি ছিল ছাত্রযুবা ও পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডবাহিনী। এদের তৈরি করা হয় লাঠালাঠি-কাটাকুটির জন্য।

AMARBOI.COM

রাজধানী কলকাতার মুসলমান সমাজে উর্দুভাষী ও রক্ষণশীলদের ছিল প্রাধান্য। ছিল রাগিব-সোহরাওয়ার্দীদের ক্ষমতার প্রাধান্য। তুলনায় ফজলুল হক ছিলেন এদিক থেকে পিছিয়ে। তার রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র ছিল বরিশাল তথা পূর্ববঙ্গের গ্রাম।

আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলার গভর্নররা, বিশেষ করে ওই সময়কার গভর্নর হার্বার্ট ছিলেন বিশেষভাবে ফজলুল হকবিরোধী। তাদের সমর্থন ছিল মুসলিম লীগের প্রতি, গভর্নরের চোখের মণি খাজা নাজিমুদ্দিন।

তাদের ক্ষমতায় রাখতে এরা অনেক সময় নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাদের সমর্থক স্থায়ী আমলা শ্রেণি, বিশেষভাবে শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তা। আর বিধান সভার ইউরোপীয় সদস্যরা। তাদের সংখ্যা কম ছিল না। কখনো কখনো সংখ্যাধিক্য নির্ধারণে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এক কথায় 'রাজ'-বিরোধী গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে ইংরেজ শাসক ও তাদের প্রশাসন ও শ্বেতাঙ্গগোষ্ঠী সবাই ফজলুল হক-বিরোধী অবস্থান নেন যে কারণে রাজধানী-কেন্দ্রিক রাজনীতিতে ফজলুল হক কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

রাজধানীর মুসলমান সমাজে তার প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় কমে আসে। সংসদীয় রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য তাকে হাত বাড়াতে হয় কংগ্রেস,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরোয়ার্ড ব্লক এমনকি হিন্দু মহাসভার দিকে। আগেই বলেছি শেষোক্ত দলের সঙ্গে আঁতাত মুসলমান বিরোধিতার কারণ হয়ে ওঠে। শাসনযন্ত্রে যে হক বিরোধিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কিছু বিবরণ শীলা সেনের 'বঙ্গীয় মুসলিম রাজনীতি'তে সূত্রসহ লিপিবদ্ধ।

আশ্চর্য যে এসব ন্যক্কারজনক হকবিরোধী ঘটনায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। মনে হয় রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে সামাজিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। শীলা সেন উদ্ধৃত নোয়াখালী ঘটনা তার প্রমাণ। প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির মন্ত্রিসভা রক্ষার জন্য ফজলুল হককে এক হাতে দুই ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়েছিল– অর্থাৎ ইংরেজ শাসনযন্ত্র এবং মুসলিম লীগ সংগঠন। এক্ষেত্রে জয় কীভাবে সম্ভব? না, আদৌ সম্ভব ছিল না।

কী ভূমিকা ছিল এ পরিস্থিতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর? একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে শুধু ছাত্রদেরই হকবিরোধী রাজনীতিতে দীক্ষা দেননি তিনি। একই সঙ্গে জঙ্গি ছাত্রদের সহায়তায় গ্রাম-গঞ্জে-শহরে একের পর এক জনসভায় যোগ দিয়েছেন, ভাঙা দোঁআশলা বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। সাম্প্রদায়িক বিরূপতায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নিশ্চয়তা দিয়েছেন এই বলে যে পাকিস্তান জিতে নিতে পারলে সব অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর হয়ে যাবে।

এসব জনসভার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ফজলুল হককে মুসলমান স্বার্থবিরোধী রাজনীতিক হিসেবে চিত্রিত করা। এ কাজটা বেশ ভালোভাবেই করতে পেরেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এভাবেই জনমত ধীরে ধীরে হকবিরোধী, হিন্দুবিরোধী তথা সম্প্রদায়বাদী হয়ে ওঠে। নির্বাচনের বেশ আগেই এ কাজটা সম্পন্ন হয়। পরে কিছুটা ভিন্ন ধারায় তা সার্থক করে তোলেন আরেক দক্ষ সংগঠক বর্ধমানের আবুল হাশিম, বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারি। তার প্রচারে পাকিস্তান হাসিলের স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সরাসরি প্রচার ছিল না।

কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার জনসভার প্রচার সম্পর্কে পূর্বাহ্নে প্রশাসনকে নিশ্চিন্ত করেন এই বলে যে তাদের বক্তব্য ও প্রচার ব্রিটিশবিরোধী হবে না। বরং এর লক্ষ্য মুসলমান জনতাকে হক রাজনীতি কংগ্রেস রাজনীতি থেকে সরিয়ে আনা (শীলা সেন)। এটাই চেয়েছে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। এরপর নির্বিঘ্নে রাজশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গীয় মুসলিম লীগ তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক প্রচার সুষ্ঠুভাবে চালিয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলন ক্রমে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমন একজন রাজনীতিককে কীভাবে, কোন যুক্তিতে 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তা বুঝে ওঠা কঠিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেক্রেটারি। এ পর্যায়ে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ থেকে শুরু হয় ভিন্নমতাবলম্বীদের বহিষ্কার। যেমন ঢাকার নবাববাহাদুর খাজা হাবীবুল্লাহ, হাশেম আলী খান, সৈয়দ বদরুদ্দোজা প্রমুখ– এক সময়কার হক সমর্থক রাজনৈতিক নেতা।

বঙ্গীয় লীগ এর ফলে পুরোপুরি জিন্না সমর্থক হয়ে ওঠে। জিন্না এটাই চেয়েছিলেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগে তখন জিন্নার তিন বিশ্বস্ত অনুসারী কলকাতা ত্রয়ী (ক্যালকাটা ট্রায়ো) তথা দুষ্টচক্রের প্রাধান্য। এদের নাম হাসান ইস্পাহ-ানি, খাজা নুরুদ্দিন ও আবদুর রহমান সিদ্দিকী– সব কজন উর্দুভাষী। তারাই নিয়ন্ত্রণ করবেন বঙ্গীয় মুসলিম রাজনীতি।

এদের সঙ্গে যুক্ত হয় আরেক দুষ্টমতি খাজা শাহাবুদ্দিন। এই শাহাবুদ্দিনই ভবিষ্যতে পাকিস্তানের তথ্য সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করবেন রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করে এমনটা তখন কেউ ভাবেনি। কিন্তু সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

এমন এক রাজনৈতিক চক্র যেখানে পাকিস্তান বাস্তবায়নের মন্ত্রণাদাতা সে পাকিস্তানের রাজনৈতিক চরিত্র কী হতে পারে তার প্রমাণ মিলেছে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের দুই দশক সময় পরিসরে। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ রাজনীতির এই চক্রের মূল বা আসল চক্রধারী মাওলানা আকরম খাঁ। এদেরকে রাজনৈতিক বাতাস দিয়েছে মাওলানা আকরম খাঁ ও খাজা পরিবার মিলে তৈরি তিন ইংরেজি বাংলা সংবাদপত্র– 'আজাদ', 'স্টার অব ইন্ডিয়া' ও 'মর্নিং নিউজ'।

এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব ছির না ফজলুল হকের। সম্ভব হয়নি লীগ রাজনীতির অভ্যন্তরে থাকা সত্ত্বেও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। জিন্নার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হতে না পারার কারণে ক্ষমতার জন্য সোহরাওয়ার্দীকে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। বঙ্গীয় গভর্নরের আশীর্বাদ ও দাক্ষিণ্যে ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে যখন বঙ্গে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন মুখ্যমন্ত্রিত্বের আসনটি নির্ধারিত হয় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দু বছরের ছোট খাজা নাজিমুদ্দিনের জন্য। সবই জিন্নার মর্জিমাফিক এবং গভর্নর হার্বার্টের সমর্থনের জোরে। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় লীগ রাজনীতির অন্দরমহলে অভিনীত হয়েছে অনেক নাটক, ঘটেছে অনেক কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান আন্দোলন : সাহিত্যচর্চায় প্রভাব

লাহোর প্রস্তাব, ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন সমকালীন পত্র-পত্রিকার কল্যাণে অতিদ্রুত পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এ পরিচিতির দায় জিন্না বা মুসলিম লীগের যতটা তারচেয়ে অনেক বেশি কংগ্রেস ও তাদের সমর্থক পত্রিকাগুলোর প্রচারের। যাকে বলে নিজের পায়ে কুড়োল মারা। স্বতন্ত্র ভুবন হিসেবে 'পাকিস্তান' শব্দটি ক্রমে বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে থাকে। পাকিস্তান হয়ে ওঠে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব, অথবা বলা যায় তাদের জন্য 'জাদু-ই-চেরাগ'।

এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে যা পরবর্তী সময়ে শিক্ষিত শ্রেণিতে পাকিস্তানি চেতনা প্রসারিত করতে সাহায্য করে। বাঙালি সমাজের সম্ভবত একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রাজনীতির তুলনায় আদর্শগত দিকে সাহিত্য-সংস্কৃতির এগিয়ে থাকা, অন্য কথায় রাজনীতির ওপর সংস্কৃতির অধিকতর চালিকাশক্তির প্রভাব। উনিশ শতকের কথিত রেনের্সাঁস এবং হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক প্রভাব থেকে একাধিক কালপর্বে এমনটাই দেখা গেছে। যেমন দেখা গেছে ১৯৫২ সালের পূর্ববঙ্গীয় ভাষা-আন্দোলনে।

পাকিস্তানবাদী চেতনার প্রসার ঘটাতে ১৯৪২ সালে কলকাতায় গঠিত হয় 'পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। পাকিস্তান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখনো একটি অনিশ্চিত প্রকল্প। তা সত্ত্বেও রাজধানী কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সংস্কৃতির ভুবনে পাকিস্তান ঘিরে তৈরি হয় যথেষ্ট আবেগ। ধর্মীয় সংস্কৃতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীর চেষ্টায় গঠিত হয় এই সোসাইটি।

এর মতাদর্শগত উদ্দেশ্য উদ্যোক্তাদের ভাষায়, 'পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ন' এবং সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চায় ইসলামী 'তাহজিব, তমদ্দুনের' প্রকাশ ঘটানো। তাদের মতে প্রচলিত 'বাংলা সাহিত্য হিন্দু সাহিত্য'। তাই মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি করতে হবে ভিন্ন চরিত্রের সাহিত্য যা তার ধর্মীয়

সংস্কৃতির সঙ্গে সমান্তরাল। এবং সে হিসেবে পাকিস্তানি আদর্শের সমান্তরাল। কারণ সাহিত্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদী পাকিস্তানি ভাবধারার প্রচারও ছিল উদ্যোক্তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ (মাওলানা আকরাম খাঁর পুত্র), মোহাম্মদ মোদাব্বের, আবদুল হাই প্রমুখ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে পরিচিত-অপরিচিত মানুষ। তবে অবাক লাগে এদের সঙ্গে সাহিত্যিক-রাজনীতিক হবীবুল্লাহ বাহার কী ভেবে যুক্ত হয়েছিলেন। আর সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী কি পথ ভুলে, দিকভ্রষ্ট হয়ে এই ধর্মীয় চেতনাপুষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগঠনে?

১৯৪২ সাল নাগাদই কি বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণিতে পাকিস্তানি স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা এতটা প্রবল হয়ে ওঠে যে, তাদের মননশীলতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঘাটতি পড়েছিল এবং বাঙালিত্ববোধ অনেক অনেক পিছিয়ে পড়ে। মনে হয় এটাই ছিল বাস্তবতা। তাই কিছুদিন পর আবুল মনসুর আহমদ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে রেনেসাঁ সোসাইটির অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা রূপে পরিগণিত হন। অন্যদিকে ঢাকায় ইসলামী চেতনার দুই অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও সৈয়দ আলী আহসান এদের ভাবধারার গভীর সমর্থকই হয়ে ওঠেননি, এক বছর পর ঢাকায় গঠন করেন অনুরূপ আদর্শে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৪৩)।

এই দুই সংগঠনের মধ্যে তত্ত্বগত কোনো প্রভেদ ছিল না। উভয়ের লক্ষ্য ধর্মীয় সংস্কৃতিভিত্তিক সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শিক্ষিত শ্রেণিতে পাকিস্তানি চেতনার প্রসার ঘটানো। সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খোলনলচে বদলে বাংলা ভাষায় এন্তার আরবি-ফারসি শব্দ যোগ করে পাকিস্তানি বাংলা নামে এক ধরনের মিশ্রভাষা তৈরি করা। বিষয়ে শৈলীতে ইসলামি বাংলার পত্তন ঘটানো। আর এক্ষেত্রে সাহিত্য সৃষ্টির মূল আদর্শ পুঁথিসাহিত্য।

এ বিষয়ে আধুনিক-অনাধুনিক সবাই একমত। ঢাকার তুলনায় কলকাতার সংগঠনটি অর্থাৎ রেনেসাঁ সোসাইটি ছিল অধিকতর শক্তিমান এবং তা সম্ভবত রাজধানী কলকাতায় অবস্থিত বলে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে দুটো সংগঠনই সম্প্রদায়বাদী (কারো ভাষায় স্বাতন্ত্র্যবাদী) এবং প্রগতিবিরোধী। পরবর্তী সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের সাহিত্যচর্চায় ও প্রবন্ধাদিতে পরিস্ফুট বক্তব্যে সমাজবাদ-বিরোধিতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন কবি গোলাম মোস্তফার লেখায় ও নিরন্তর প্রচারে।

সংগঠিত হওয়ার পর অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে এরা পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের তত্ত্ব হাজির করে ব্যাপকভাবে সে বিষয়ে প্রচার চালান। এর সর্বাধিক প্রকাশ ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে (১-২ জুলাই) অনুষ্ঠিত রেনেসাঁ সোসাইটির মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে। সম্মেলন উদ্বোধনে ইসলামি পতাকা ও পাকিস্তানের মানচিত্র সামনে রাখা হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সংগঠনের আদর্শিক প্রেরণা ইসলাম ও পাকিস্তান।

বাংলা সাহিত্যকে এরা কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন? তার প্রমাণ মেলে সম্মেলনের সভাপতি মহোদয়গণের বক্তব্যে ও কিছু শব্দ ব্যবহারে। 'হাজেরান বন্ধুগণ' সম্বোধনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দিন বলেন, পূর্বপাকিস্তানি সাহিত্যের তমদ্দুনি বিশিষ্টতা খুঁজতে হবে পুঁথিসাহিত্যে এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি হবে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা। একই কথা বলেন আরো বিস্তারিতভাবে সম্মেলনের মূল সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ তার দীর্ঘ বক্তৃতায়।

তিনি বক্তৃতা শুরু করেন সমাগত সুধীদের 'হাজেরানে মজলিস' সম্বোধনে স্বাগত জানিয়ে। সোজাসাপটা পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা দিয়ে আবুল মনসুর আহমদ বলেন, 'রাজনৈতিক বিচারে পাকিস্তানের অর্থ যাই হোক না কেন সাহিত্যিকের কাছে তার (অর্থাৎ পাকিস্তানের) অর্থ তমদ্দুনী আজাদী, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারেল অটনমি।...তমদ্দুনী আজাদী ছাড়া কোনো সাহিত্য বাঁচা তো পরের কথা– জন্মাতেই পারে না' (মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫১)।

তিনি বলেন, পাকিস্তান একটি বিপ্লব। এ বিপ্লব আসবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। তার মতে বাংলাসাহিত্য মুসলমানের সাহিত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাষায়ই বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গিয়েছেন। তবু এ সাহিত্য পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য নয়।' রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নার সুরে সুর মিলিয়ে বলেন : 'ভারতের হিন্দু মুসলমান এক জাতি নয়।...ইসলাম আমাদের ধর্ম। ধর্ম আমাদের দীনে মোকাম্মেল। কোনো সংস্কারের এতে গুঞ্জায়েশ নেই। ...ধর্ম থেকে সংস্কৃতির জন্ম।...সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান যে আলাদা জাত এতে কোনো তর্কের অবকাশ নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যুক্তিতর্কের অবকাশ ওই বক্তব্যের একাধিক বিষয়ে ছিল এবং আছে। জানি না, মহাসম্মেলনের মূল সভাপতির এ জাতীয় বিতর্কিত বক্তব্যের বিপরীতে শুদ্ধ বাঙালি সাহিত্যবাদীদের কেউ কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন কি না। যেমন হুমায়ুন কবির বা এস ওয়াজেদ আলী কিংবা কাজী আবদুল ওদুদ। এরা ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কি না তাও আমাদের জানা নেই। মনে হয় তারা উপস্থিত ছিলেন না।

তবে যে কোনো যুক্তিবাদীই বলতে পারেন– হ্যাঁ পাকিস্তান তো বিপ্লবই– তবে তা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক চেতনার এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার। অর্থাৎ প্রতিবিপ্লব। আর এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে ধর্ম থেকে সার্বিক সংস্কৃতির জন্ম নয়, বরং সংস্কৃতি একটি ভাষিক জাতির জীবনযাত্রার বহুবর্ণিল রূপ। ধর্ম সে সংস্কৃতির অংশ বা অন্যতম উপকরণ। সংস্কৃতির রয়েছে আরো নানা দিক, নানা মাত্রা। আর এ তর্ক তো বহুদিন আগেই নিষ্পন্ন যে জাতি এবং ধর্ম এক জিনিস নয়। জাতিসত্তার অনেক ব্যাপক রূপ, তার ভিত্তি এবং বিস্তৃতি ও গভীরতা অনেক বেশি। তাই জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিষয়ক মার্কসীয় তত্ত্ব জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ধর্মের বিষয়ে নয়।

আসলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিভ্রান্তিকর টানে ধর্মকে জাতির অবস্থানে এনে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রান্ত রাজনীতির সাহায্যে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও বিভাজিত করা হয়। মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাধান করতে স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির আবির্ভাব। সেখানে সাধারণ মিলনক্ষেত্র সাহিত্যকে রাজনীতির তরবারির আঘাতে বিভক্ত করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু করেছিলেন কিছু সংখ্যক ধর্মীয় চেতনার মানুষ– লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী মূলত তাদের রক্ষণশীল চিন্তার প্রভাবে।

সত্যি বলতে কি পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর স্বতন্ত্রভাবে উন্নয়নের চিন্তাই নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক চিন্তা শিক্ষিত মুসলমান-মনে চেপে বসেছিল। এর প্রভাব দেখা গেছে সাহিত্য-সংস্কৃতির বড়সড় অংশে। রাজনীতির টানে মধ্যপন্থীরাও সাহিত্য অঙ্গনে বিভাজিত চেতনার অংশীদার। তাই দেখা যায় উল্লিখিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব। সে প্রভাবের চাপে তারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলের চেয়ে ভেদটাই খুঁজে ফিরেছেন।

যেমন পূর্বোক্ত বক্তৃতায় আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, 'এ কথা মানি যে হিন্দুর সংস্কৃতি ও মুসলমানের তমদ্দুনে একশ একটা মিল রয়েছে। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে তাদের মধ্যে গরমিলও রয়েছে প্রচুর। মিলটাই সত্য নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরমিলটাই সত্য।' কী উদ্ভট কথা। মানুষের মধ্যে মিলের চেয়ে গরমিলটাকে যে বা যারা বড় করে তুলতে বা দেখতে চান তার বা তাদের চেতনায় সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বড় হয়ে ওঠার কথা। সে প্রভাব সাহিত্যে পড়তে বাধ্য। বাস্তবে তা পড়েছেও। কিন্তু এ প্রভাব সম্প্রদায়বাদী, পাকিস্তানবাদীরা ধরে রাখতে পারেননি এই যা। চুয়াল্লিশ থেকে বায়ান্ন– আট বছরের মধ্যেই রক্ষণশীলতার অচলায়তনে ভাঙন শুরু। বায়ান্নে-চুয়ান্নে পাকিস্তানি চেতনার সেখানে হার।

রাজনৈতিক মিল-গরমিলের প্রশ্নে উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, 'বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে...সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এখানে আমাদের জাতিভেদের কোনো ভাবনা নেই' (রচনাবলী ২৩)। কিন্তু চল্লিশের দশকে বিভাজন ভাবনা তৈরি করা হয় রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে। বিভেদের বীজ এমন গভীরভাবে মাথায় গেঁথে গিয়েছিল যে আবুল মনসুর আহমদের মতো বাংলা ভাষার সাহিত্যিক বিভ্রান্তির অচলায়তনে বন্দি হয়ে পড়েন।

আবুল কালাম শামসুদ্দিনের পথ অনুসরণ করে আবুল মনসুর আহমদও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা খুঁজেছেন পুঁথিসাহিত্যে। আধুনিকতাকে বিসর্জন দিয়ে অনাধুনিক পথটাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন তারা। তাই বলতে দ্বিধা হয়নি : 'মাদ্রাসা মক্তবে শিক্ষিত লাখ লাখ মুসলমান পাঠক পুঁথিসাহিত্য থেকেই জীবনের প্রেরণা পাচ্ছে।' কাজেই পুঁথিসাহিত্য থেকেই বাঙালি মুসলমানকে সাহিত্যের পাঠ নিতে হবে। এমন উদ্ভট কথাও আমাদের অগ্রজ কারো কারো কাছ থেকে শুনতে হয়েছে।

আর ভাষা? সে সম্পর্কে তাদের বক্তব্য আরো নির্মম, আরো যুক্তিহীন। আসলে পাকিস্তান নামক স্বপ্ন আমাদের শিক্ষিত শ্রেণির একাংশের চিন্তাভাবনা সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছিল। তাই ভাষা সম্পর্কে এমন উদ্ভট কথা আবুল মনসুর আহমদের পক্ষে বলা সম্ভব হয় : 'বাঙলা বর্তমান বর্ণমালার আবর্জনা আমরা রাখব না।...মাত্র কুড়িটি হরফ ও চারটি হরকত বা কার থাকবে। ফলা বা যুক্তাক্ষর কিছুই থাকবে না।' আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্র বাঙলার পক্ষে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলে আবুল মনসুর আহমদ তার দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করেন।

এভাবে ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে সম্প্রদায়বাদী পাকিস্তান রাজনীতির ধারায় প্রচলিত বাংলা ভাষার ইসলামী সংস্কার ও ধর্মীয় সংস্কৃতিবাদী সাহিত্য সৃষ্টির প্রস্তাব নিয়ে রেনেসাঁ সোসাইটির দুদিনব্যাপী সাহিত্য সম্মেলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ হয়। সভাপতির ভাষণে ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি বদলের রূপরেখা যাতে আধুনিকতা বা প্রগতির নামগন্ধ ছিল না। ছিল ওই দুই দিকেই বিরোধিতা। এবং তা এমন দু-একজনের হাত ধরে যারা এক সময়ে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে উদার আধুনিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যেমন হবীবুল্লাহ বাহার বা আবুল মনসুর আহমদ। এবং তারা প্রচলিত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

তাই তাদের এ অভিযোগ খাটে না যে বাংলা সাহিত্য তাদের নয় এবং বাংলাভাষা বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল নয়। তা সত্ত্বেও তারা বিশেষ করে পূর্বোক্ত দুজন বাদেও অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (সাহিত্য শাখার সভাপতি), মুজিবর রহমান খাঁ (তাহজিব তমদ্দুন শাখার সভাপতি) অধিকতর উগ্র ভাষায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্যের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। অথচ তাদের দাবি তারা 'মুসলিম বাঙলার ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্টের প্রতীক'।

ইন্টলেক্ট-চর্চা তথা বুদ্ধি ও মননের চর্চা যে ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় ভর করে একসঙ্গে চলে না, যুক্তি ও মানবিক চেতনাকে সঙ্গে নিয়ে চলে পাকিস্তানবাদী রাজনীতির বিভ্রান্তির টানে তারা এ সত্য ভুলে গিয়েছিলেন, তাই অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসায়েন রবীন্দ্রনাথ তো বটেই সেক্যুলার নজরুলকেও বাতিল করে হালি ও ইকবালের উত্তরসূরি হিসেবে পুঁথিসাহিত্যনির্ভর সাহিত্য সৃষ্টির আহ্বান জানান। আর 'তওহিদপন্থী মুসলমানের সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের সংঘর্ষ অনিবার্য,' এমন মন্তব্য করেন মুজিবর রহমান খাঁ।

তুলনায় শিক্ষা শাখার সভাপতি হবীবুল্লাহ বাহার সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা করে কিছুটা নমনীয় ভাষায় 'গণতান্ত্রিক ইসলামী সভ্যতা ও বিপ্লবী ইসলামী সংস্কৃতি' অনুসরণের কথা বলেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দিয়ে অনুকূল স্রোতেরই অনুগামী হন। তারা সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানবাদী এক সঙ্কীর্ণ ও রক্ষণশীল চিন্তা দ্বারা তাড়িত হয়ে পরবর্তী সাত-আট বছর ওই ধারার প্রচারেই ব্যস্ত থাকেন। বিশেষ উগ্রতা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। তাই ডা. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পাকিস্তানি পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রথম সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে এদের 'মতিচ্ছন্ন' হওয়ার কথা বলে ভুল কিছু বলেননি।

চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধেই পাকিস্তানবাদী সাহিত্য রচনা নিয়ে রেনেসাঁ সোসাইটি বা সাহিত্য সংসদের ধারক-বাহকদের উন্মাদনা সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ গলিপথ ধরে পাকিস্তানের পক্ষে দামামা বাজিয়ে প্রচারে নামে। সে প্রচারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মাদনায় মধ্যপন্থী বা প্রচলিত সাহিত্যপন্থী কোনো কোনো কবি, লেখকও ভেসে যান। যেমন কবি শাহাদাত হোসেন বা সৈয়দ এমদাদ আলী, লেখক-সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ ইদরিস। শুরু হয় 'পাকিস্তান সংগীত' বা 'পুণ্য পাকিস্তান' বন্দনায় কবিতা লেখা।

তাই সৈয়দ আলী আহসান লিখতে পারেন মিশ্র ভাষায়– 'কোরবানি' শীর্ষক নাটক ('খোদার লা'নতে মৃত্যু হরিল কাফেরের প্রাণ কণা') ও মিশ্র ভাষায় কবিতা (পদ্য বলাই সঙ্গত)। একই বছরে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে মূল সভাপতি সৈয়দ এমদাদ আলী তার ভাষণে বলেছেন, 'মনের দিক দিয়া আমাদের খাঁটি মুসলমান হইতে না পারিলে আমাদের প্রকৃত নবজীবন লাভ সম্ভব হইবে না' (মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৫১)।

তিনিও যথারীতি রেনেসাঁস অর্থাৎ নবজাগরণের সম্ভাবনাকে ধর্মীয় জাগরণের পথে চালিয়ে দেন অনেকটা উনিশ শতকী রেনেসাঁসের সাহিত্যধারার মতো করে। বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এমন পথধরা কিছুটা অভাবিতই ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি রাজনীতি এ ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সঞ্চার করে থাকবে। তাই এ সম্মেলনেও বলা হয় 'জাগরণকে স্থায়ী করিবার জন্য আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি এবং জাতীয় ভাব ও আদর্শের পরিপূরক সাহিত্যই সৃষ্টি করিতে হইবে। মুসলিম হিসাবে বাঁচিয়া থাকার ইহাই একমাত্র পথ ও প্রকৃষ্ট পথ' (প্রাগুক্ত)।

এ বক্তব্যে উগ্রতা না থাকলেও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ধর্মবাদী পথের ঠিকানাই নির্দেশ করা হয়। সমন্বয়ের আহ্বান থাকলেও তা পূর্বোক্ত সম্প্রদায়বাদী উগ্রতায় ভেসে যায়। আসলে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সাধনা এ সময়পর্বে মুসলিম লীগের সম্প্রদায়বাদী রাজনীতি ও দ্বিজাতিতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে তাদের পথচলায় ধর্মীয় রক্ষণশীলতার প্রভাব বড় হয়ে ওঠে, যা ছিল পাকিস্তানি রাজনীতির সমান্তরাল।

তাই হিন্দু মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি– এই রাজনৈতিক তত্ত্বের পথ ধরে ধর্মীয় ভেদরেখায় বাংলা সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য ও মুসলমান সাহিত্য এই দুই ধারায় দ্বিখণ্ডিত করার তামদ্দুনিক আদর্শ নিয়ে প্রচারে নামে রেনেসাঁ সোসাইটি। এই সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় পথ অনুসরণের আশঙ্কা করে সম্মেলনে উপস্থিত বঙ্কিম মুখার্জি ভিন্ন ধারায় সঠিক বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেন, 'উনিশ শতকের হিন্দু রেনেসাঁসের মতো এই রেনেসাঁ আন্দোলনও যেন বিপথে না যায়।' তার আশঙ্কা ভুল ছিল না।

পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী সাহিত্যচর্চায় নিরন্তর পাকিস্তান বন্দনায় ব্যস্ত থেকে বিপথকেই তাদের পথ হিসেবে বাছাই করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেন। তারা বাংলা সাহিত্যকে বিভাজিত করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক প্রচারে ভারত বিভাগ নিশ্চিত করার পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। প্রতিপক্ষের ভুল-ত্রুটি তাদেরও ভুল পথে যাত্রায় উৎসাহিত করে। শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগ অর্থাৎ ভারত বিভাগ ও বঙ্গবিভাগ অনিবার্য পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়। তবে মনে রাখতে হবে মুসলিম বাংলায় আধুনিক ও প্রগতিশীল ধারার সাহিত্যিক একই সময়ে সৃষ্টিশীল ছিলেন। তারা ছিলেন সংখ্যায় কম কিন্তু সৃষ্টিগুণে অধিকতর মান সম্পন্ন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, এস. ওয়াজেদ আলী, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কংগ্রেস রাজনীতির আপসবাদ

হ্যাঁ, ইংরেজ আমলার উদ্যোগে এবং ভারতীয় শিক্ষিত এলিটশ্রেণির বিশিষ্ট কয়েকজনের সহযোগিতায় গঠিত সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল এই বিশেষ শ্রেণির জন্য শাসকদের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। তা আর যা-ই হোক ভারতীয় জনতার স্বার্থভিত্তিক দাবি-দাওয়া বা সুযোগ-সুবিধা নয়। শুরুতে তা যে বিদেশি শাসন থেকে মুক্তির অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবি নয় তা বলাই বাহুল্য। তবু সংগঠনের মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবি-দাওয়ার একটা ইতিবাচক দিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কংগ্রেস এ পর্যায়ে নিঃসন্দেহে ব্রিটিশরাজের সহযোগিতায় বিশ্বাসী এবং আপসবাদী। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, দেশে বা বিদেশে তৎপর বিপ্লববাদীরা চেয়েছেন বিদেশি শাসনমুক্ত স্বদেশ অর্থাৎ স্বাধীন স্বদেশ এবং সেজন্যই তাদের লড়াই ও আত্মত্যাগ। 'রাজা পঞ্চম জর্জের সংসারে একটু সুবিধাজনক অবস্থান' তাদের লক্ষ্য ছিল না।

তবে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ভারতীয় রাজনীতির জন্য দুর্ভাগ্য যে, এই আত্মত্যাগের উজ্জ্বল মহিমার মধ্যে ছিল সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার প্রভাব সেখানে বিভাজনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিহিত। এর দায় উনিশ শতকী হিন্দুরিভাইভালিজম ও আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরানী জাতীয় উপন্যাসের ধর্মীয় আহ্বানের ফল, ধীরেসুস্থে যা বাংলা থেকে মারাঠাস্থান হয়ে দূর পাঞ্জাব পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মুগ্ধ নায়কগণ কেন জানি না এ সত্য অনুধাবনের চেষ্টা করেননি যে, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা অহিন্দু। এবং রাজনৈতিক তৎপরতার প্রতিক্রিয়ায় তারা এক সময় আত্মসচেতন হয়ে উঠবেই। বাস্তবিক এ সত্যটাই পরে এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল।

এ সত্য স্বল্প সংখ্যায় হলেও নিরপেক্ষ রাজনৈতিক লেখকগণ স্বীকার করেছেন। সুপ্রকাশ রায় থেকে সুনীতিকুমার ঘোষ এবং সাবলটার্ন তত্ত্বের স্বনামখ্যাত ব্যক্তি প্রায় সবাই ভারতীয় রাজনীতির এ ঐতিহাসিক সত্যের দিকে

আলোকপাত করেছেন। আমরাও একই কথা লিখছি গত ৬০ বছর যাবত প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে। লিখেছেন কমরেড মুজফফর আহমদ বা ভবানী সেন থেকে মুশিরুল হাসান ও সমমনা কোনো কোনো লেখক– বামপন্থী বা গণতন্ত্রী। আবার বামপন্থী কোনো কোনো বাঙালি লেখকই এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

সে কথা থাক। কারণ ভিন্নমত যে কেউ লালন করতে পারেন সেখানে যুক্তি থাকুক না থাকুক। অবশ্য সুনীতিকুমার ঘোষ তার বইতে স্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেন যে, 'বুর্জোয়াশ্রেণি থেকে আগত এসব বিপ্লবী তৎপরতায় ছিল হিন্দুত্ববাদী তত্ত্ব, হিন্দুধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার– তাদের সংগঠনে ও প্রচারে, যে কারণে তারা মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তবে তা প্রাথমিক পর্যায়ে' ('ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাজ' ১ম খণ্ড)। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিপ্লববাদ আগাগোড়াই হিন্দুত্ববাদে মোড়া ছিল যেজন্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে মুসলমান তরুণ এই মহতী উদ্যোগে শরিক হতে চায়নি। এ কথা লিখেছেন কমরেড মুজফফর আহমদ, এমনকি মাওলানা আজাদও।

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক তথা 'সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল' সম্মেলনে (১৯০৭) মাদাম কামা ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন (রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস)। কিন্তু কংগ্রেস তার প্রতিষ্ঠাবর্ষের ৪৫ বছর পর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে (জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাব, ১৯২৭) এবং তখনো তা গান্ধির অমতে। এর আগে ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে হসরত মোহানির উত্থাপিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গান্ধির তীব্র বিরোধিতার কারণে বাতিল হয়ে যায়। অথচ এক বছর পর বাঙালি কবি নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য তার 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবিতে নিবন্ধ লেখেন এই কথা বলে, 'স্বরাজ টরাজ বুঝি না কারণ এর মানে একেকজন একেক রকম করে থাকেন। ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়'।

কিছুটা পরিণত পর্যায়ে কংগ্রেসের দাবি অবশ্য হোমরুল বা স্বরাজ, আবার তার ব্যাখ্যায় নানা মত, যে কথা উল্লেখ করেছেন কবি নজরুল। তবে কংগ্রেস এ বিষয়ে ভিন্নপথ ধরতে পারত যদি এম. কে. গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে কংগ্রেসের হাল না ধরতেন এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সংগঠনের সর্বাধিনায়ক না হয়ে উঠতেন। সর্বোপরি তার অহিংসা, সত্যাগ্রহ, অনশন, চরকা-খাদি এবং নরমপন্থী আপসবাদী নীতি যদি কংগ্রেস গ্রহণ না করত। তবু অহিংসার প্রবল প্রতাপের মধ্যেও কংগ্রেসে বাম ঘরানার বিকাশ ঘটেছিল এবং শেষদিকে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এ ধারার যোগ্য প্রতিনিধি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান্ধি প্রথম থেকেই কংগ্রেসের আপসবাদী ধারার পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন। চাপ-আপস-চাপ এই নীতিই তিনি বরাবর পালন করে গেছেন। যেমন অসহযোগ তেমনি আইন অমান্য আন্দোলন এমনকি সর্বশেষ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনেও। তার চেয়েও বড় কথা- জনগণের কথা বলে, কংগ্রেসকে জনগণের দাওয়ায় পৌঁছে দিয়েও জনস্বার্থের দাবি আদায়ে কিংবা পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে বিপ্লবীপন্থা বা ব্যাপক কৃষক শ্রমজীবী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না গান্ধি, ছিলেন এর বিরোধী।

যখনই কোনো আন্দোলন তৃণমূলস্তর থেকে ব্যাপক তীব্রতা নিয়ে উঠে এসেছে, রাজশক্তির শিকড় ধরে টান দিয়েছে- হোক তা কৃষক, কারিগর, সেনাসদস্য বা ক্রুদ্ধ শিক্ষিতশ্রেণির, অমনি সে আগুন নেভাতে তৎপর হয়েছেন গান্ধি। এমনকি তার নিজের ডাকা আন্দোলনেও একাধিকবার এ জাতীয় ঘটনা দেখা গেছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে চৌরিচৌরার ঘটনা উপলক্ষে এবং পরে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সহিংস ব্যাপকতায় আন্দোলন প্রত্যাহার। তবু তাকে ভুল বুঝেছে ইংরেজ সরকারের শীর্ষ প্রতিনিধি অনেকে এবং খোদ ব্রিটিশরাজ।

১৯১৫ সালে (৩১ মার্চ) কলকাতায় এক জনসভায় গান্ধি বিপ্লববাদের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন। এক বছর পরে একই সুরে তিনি ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশরাজের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও আস্থার কথা উল্লেখ করেন (ঘোষ, প্রাগুক্ত)। এমনি অনেক উদাহরণ তুলে ধরা যায় গান্ধির বক্তৃতা ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ থেকে, সেখানে তিনি বিপ্লববিরোধী, কৃষক বিদ্রোহবিরোধী, এমনকি সেনাবিদ্রোহবিরোধী। সর্বশেষ উদাহরণ বহুখ্যাত নৌবিদ্রোহ।

সেসব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শেষোক্ত ক্ষেত্রে তিনি তার ঘনিষ্ঠ অনুসারী বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদদের সহযোগিতায় বিদ্রোহী নৌসেনাদের আত্মসমর্পণে প্রভাবিত করেন। এ কাজে তার সুযোগ্য সহচর হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন সর্দার প্যাটেল। তাকে সমর্থন জানান জিন্না- এই প্রথম, এই শেষ। এমনি একাধিক ঘটনায় ভারতব্যাপী বিদ্রোহ ও সংগ্রামের পরিস্থিতি বিকল হয়ে পড়ে বিশেষ করে গান্ধি-রাজনীতির প্রভাবে।

আসলে গান্ধি তার অহিংস আন্দোলনের আপসবাদী নীতির সাহায্যে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ভারতের জন্য স্বরাজ, হোমরুল তথা স্বশাসনের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তার চরকা ও খদ্দর যে স্বাধীনতা অর্জনের সহায়ক হতে পারে না এ কথা তার মতো বুদ্ধিমান রাজনীতিক- আইনজীবীর না বোঝার কথা নয়। গান্ধির গ্রামোন্নয়নের অনুরাগী হয়েও রবীন্দ্রনাথ চরকা ও খাদির তীব্র সমালোচনা করে ছিলেন তার রচনায়। কবির মতে চরকা জড়ত্বের প্রতীক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রামে এ ধরনের আপসবাদী রাজনীতি যে অচল বিশ্বব্যাপী মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। তবু গান্ধি চলেছেন ভিন্নপথে, তার আপনপথে। সেপথ সমঝোতার ও আপসবাদিতার। সেক্ষেত্রে গান্ধির রাজনৈতিক কৌশল ছিল আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশরাজকে আলোচনার টেবিলে বসানো (যেমন লন্ডনে একাধিক গোলটেবিল বৈঠকের অনুষ্ঠান), সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর (যেমন গান্ধি-আরউইন প্যাক্ট), কখনোবা কমিশন বসানো– এসব কিছুর অবশেষ পরিণাম ক্ষমতার অংশিদারিত্ব অথবা মিলেমিশে দেশশাসন– নাম স্বরাজ।

এমনকি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পরও তিনি কংগ্রেসকে মুক্ত লড়াইয়ের পথে হাঁটতে দেননি। এসব পদক্ষেপে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অহিংসা সমর্থক বড়সড় গান্ধিবাদী গোষ্ঠী তৈরি হয়ে যায় যারা সংগ্রামের চেয়ে, আত্মউৎসর্গের বদলে আপসবাদী পথে ভারতে স্বরাজ আনার পক্ষপাতী। ওই গোষ্ঠীর প্রধান সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, মহাদেব দেশাই, আচার্য কৃপালনি এমনকি বাংলায় জেএম সেনগুপ্ত এবং হিন্দু মহাসভাপন্থী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, কে. এম. মুন্সী প্রমুখ। তারাই কংগ্রেস নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

নেহরু—পিতা-পুত্র দুজনই ছিলেন প্রকৃতিবিচারে মধ্যপন্থী– অবশেষ বিচারে গান্ধি সমর্থক। তাদের রাজনৈতিক দোদুল্যমানতায় কংগ্রেসের স্বদেশী লড়াই ব্যাহত হয়েছে। তাই মোতিলাল নেহরু গান্ধিমতের বিরোধিতায় চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে মিলে স্বরাজ্য দল গঠন করেও পরে গান্ধিবলয়ে ফিরে গেছেন। অন্যদিকে পুত্র জওহরলাল নেহরু মাঝে মধ্যে সমাজতন্ত্র ও লড়াইয়ের স্লোগান তুলেও ফিরে গেছেন গান্ধির অভয়াশ্রমে।

অথচ কনিষ্ঠ নেহরুর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় রুশ বিপ্লব ঘিরে যতটাই 'র‍্যাডিক্যাল' প্রবণতা ছিল তাতে করে পিতার ঐতিহ্যানুসারে বিপ্লববাদী সুভাষের সঙ্গে তার একাট্টা হওয়ার কথা। কিন্তু উত্তেজক স্লোগান সত্ত্বেও পিতা মোতিলাল যেটুকু এগিয়ে ছিলেন গান্ধিবাদ বিরোধিতায়, আধুনিক রাজনীতির অগ্রসর চিন্তার ধারক জওহরলাল তা পারেননি। তিনি পারেননি ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্যতম সংগঠক হতে। মূলত তার আপসবাদী চরিত্রের কারণে। আর দোদুল্যমানতা ছিল তার রাজনৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

এক্ষেত্রে একাধিক কারণ তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় প্রভাব রেখেছে বলে আমার মনে হয়। যেমন লেখক ও বক্তা জওহরলাল, আধুনিক ও রোমান্টিক চেতনার রাজনীতিক জওহরলাল এবং বাস্তব ক্ষেত্রের জওহরলালের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে চরিত্রগত পার্থক্য। তাছাড়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষপদটি ধরে রাখার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যা গান্ধির আশীর্বাদ বা সাহায্য ছাড়া সম্ভব ছিল না। নেহরু এক্ষেত্রে আপসবাদী। এখানেই নেহরু (জওহরলাল) ও সুভাষের পার্থক্য। এবং এ কারণেই মাঝে মধ্যে গান্ধির অসন্তোষ সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেসে মর্যাদাব্যঞ্জক অবস্থান ধরে রাখতে পারেন কিন্তু সুভাষ হন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত। মূলত গান্ধির বিরাগভাজন হয়ে।

কংগ্রেস-সভাপতির লোভনীয় পদ এবং এই বিন্দুটি কেন্দ্র করেই সুভাষ-জওহরলালের ব্যক্তিত্ব সংঘাত। ঠিক ওই পর্যায়ের নেতার সংখ্যা কংগ্রেসে কম। তাদের কেউ সমাজবাদী চিন্তার শরিক ছিলেন না, বিপ্লববাদের তো ননই। তারা মনেপ্রাণে গান্ধিবাদের সমর্থক। আরো একটি বিষয় নেহরু-সুভাষ প্রসঙ্গে ভেবে দেখা যেতে পারে। অবাঙালি শীর্ষ নেতাদের মধ্যে বাংলা-বাঙালি বিরূপতার প্রবণতা যা হয়তো জওহরলালের মধ্যেও উপস্থিত থাকতে পারে। এদিক থেকে গান্ধির সঙ্গে জিন্নার, কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগ সংগঠনের বিস্ময়কর মিল লক্ষ্য করার মতো।

কংগ্রেসের পরিণত পর্যায়ে বিশেষ করে ত্রিশ থেকে চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যেমন বাংলাভাষীবিরোধী প্রবণতা ছিল প্রবল তেমনি একই ঘটনা দেখা গেছে মুসলিম লীগে। সেখানে জিন্না তার দলের সর্বাধিনায়ক, অন্যদিকে কংগ্রেসে গান্ধি সর্বাধিনায়ক। দুজনেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে দলে ভিন্নমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রীতিমতো বিপজ্জনক। প্রমাণ সুভাষ এবং ফজলুল হক। দুজনেই বাঙালি, মনেপ্রাণে বাঙালি। দুজনেই একই কারণে রাজনৈতিক বিচারে 'ট্রাজিক হিরো' বিশদ বিচারে যা স্পষ্ট।

তবে একটি বিষয় সম্ভবত মানতে হয় যে দুই নেহরুই হিন্দুত্ববাদিতার ক্ষেত্রে ছিলেন সংস্কারমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক যদিও তাদের মধ্যে কখনো কখনো রাজনৈতিক কারণে এ বিষয়ে সাময়িক বিভ্রান্তি দেখা গেছে। কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বে সম্প্রদায়বাদীদেরই ছিল সংখ্যাধিক্য, অবশ্য হিন্দু মহাস-ভাপন্থীদের হিসেবে ধরে। সেখানেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক দুর্বলবিন্দু ('একিলিসের গোঁড়ালি')। যা শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ তথা জিন্নার কাছে পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য অখণ্ড, অসাম্প্রদায়িক ভারত যদি কংগ্রেসের অন্বিষ্ট হয়ে থাকে ওই দুর্বল বিন্দুর কারণে কংগ্রেসের স্বনামখ্যাত মুসলিম নেতাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি কংগ্রেসের চরিত্রবদল ঘটানো। সেকুলার দুই নেহরুর রাজনৈতিক দায় ছিল সেকুলার কংগ্রেসী মুসলিম নেতাদের পক্ষে অব্যাহত সমর্থন জোগানো। কিন্তু তারা তা পারেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কংগ্রেস ও হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গ পরে বিস্তারিত আলোচনায় স্থান পাবে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে এই সূত্রপথেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শনি' অর্থাৎ সাম্প্রায়িকতার ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ এবং ভারত বিভাগের সূচনা, বলা যায় বিভাজন রেখার প্রকাশ যা ক্রমশ বড় হতে হতে ফাটল, অবশেষে ভাঙন। আপাতত আলোচ্য বিষয় গান্ধিপ্রভাবিত কংগ্রেসনীতির আপসবাদিতা। আপস শাসকরাজের সঙ্গে। সংগ্রাম নয়, আপসবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমঝোতা স্মারকে সই করে ইংরেজবিদায় সমাপন। বাস্তবে তাই ঘটেছে। অবশ্য কারো কারো মতে, গান্ধি কখনো ইংরেজের বিদায় চাননি। মিলেমিশে ভারত শাসন, নাহলে 'কমনওয়েলথ'-এর গোয়ালে বরাবর সদস্য থাকা।

তাই বিপ্লবীদের পূর্ণ স্বাধীনতা বা নজরুলের পূর্ণস্বাধীনতা তো নয়ই কংগ্রেসী ভিন্ন ঘরানার পূর্ণ স্বরাজও গান্ধির খুব একটা মনঃপূত ছিল না। যেমন পছন্দ ছিল না আলী ভাইদের স্বাধীনতার দাবি– যদিও বিশেষ কারণে গান্ধি একসময় কংগ্রেস-খিলাফতি মৈত্রীবন্ধনের রূপকার হয়ে ওঠেন– যে বিষয় নিয়ে নীতিগত ভিন্নমতও কম নয়। কংগ্রেস খিলাফত ঐক্য দ্রুতই ভেঙে পড়েছিল। আধুনিক রাজনীতির বিচারে খিলাফত সমর্থনযোগ্য ছিল না। কিন্তু গান্ধি রাজনৈতিক স্বার্থে খিলাফতের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলেন।

অনেক টানাপড়েন পার হয়ে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় স্থায়ী প্রস্তাব হিসেবে ১৯২৯ সালের শেষ দিনটিতে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়। সে প্রসঙ্গেও বামঘরানার কারো কারো ধারণা ছিল এ প্রস্তাবে গান্ধির রাজী হওয়ার কারণ ব্রিটিশরাজের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বড় রকম সুবিধা আদায়। যেমন সুনীতিকুমার উল্লেখ করেছেন মাদ্রাজের কংগ্রেস নেতা সত্যমূর্তির মন্তব্য। আপাতদৃষ্টিতে আপতিক মনে হতে পারে যে এই লাহোরেই ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের প্রস্তাব, দেশবিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয় স্বাধীনতা তথা ক্ষমতা হস্তান্তরের সূত্র হিসেবে।

স্বাধীনতা প্রস্তাব নিয়ে নানামাত্রিক মন্তব্যের পেছনে বাস্তব কারণও ছিল। মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৯২৭) গৃহীত স্বাধীনতা প্রস্তাব কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯২৮) 'ডোমিনয়ন স্ট্যাটাসের' দাবিতে পরিণত হয় (ঘোষ, প্রাগুক্ত)। আসলে স্বাধীনতা প্রস্তাবের (১৯২৯) পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল 'ব্রিটিশরাজ'-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করা যেন সেটা হতে পারে গান্ধির হাতের তুরুপের তাস। সে উদ্দেশ্যে ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনে জনগণের প্রতি আহবান জানায় কংগ্রেস নেতৃত্ব (১৯৩০)। জনগণ এ আহ্বান লুফে নেয় নেপথ্যে নেতাদের উদ্দেশ্য যা-ই থাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তী ১৭ বছর কংগ্রেসকর্মী, সমর্থক ও স্বাধীনতায় আগ্রহী জনসাধারণ এদিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে রাজধানী থেকে শহরে গ্রামেগঞ্জে। প্রভাতফেরি, কংগ্রেসের তেরঙা পতাকা উত্তোলন, স্লোগান, গান– 'জাগো নব ভারতের জনতা এক জাতি এক প্রাণ একতা' ইত্যাদি কর্মসূচি নিয়ে। বিষয়টি মনে হয় আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছিল অন্তত নেতৃত্বের কাছে। তাই 'একপ্রাণ, একতা' অর্থাৎ সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক-সামাজিক সম্প্রীতির আন্তরিক চেষ্টা বড় একটা দেখা যায়নি। বিশেষ করে সময়ের একফোঁড়।

সংস্কারবাদীদের ধারণাই সত্যে পরিণত হয়। গান্ধি-আরউইন চুক্তি (১৯৩১) তার প্রমাণ। তার চেয়েও বড় কথা, গান্ধি ওই চুক্তির মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা বললেন তাতে প্রস্তাবিত স্বাধীনতার চরিত্রবদল ঘটে যায়। কমনওয়েলথে থেকে রাজসূত্র ছিন্ন না করে স্বাধীনতা অর্জন কীভাবে সম্ভব? কিন্তু গান্ধির বাকচাতুর্যে অসম্ভবই সম্ভব মনে হতে পারে।

এভাবে গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসের স্বাধীনতাতরী বাওয়া। আর সে স্বাধীনতা এল অখণ্ড ভারতে নয়। এল বিভাজিত ভারতবর্ষে বীভৎস সাম্প্রদায়িক রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে পেশোয়ার থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত অসহায় নর-নারী শিশুর হিংস্র হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। নেতাদের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় বা দাগ লাগেনি– হিন্দু-মুসলমান বা শিখ কোনো নেতারই। মরেছে মানুষ। ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে কথিত স্বাধীনতা অর্জন। গান্ধির ইচ্ছাপূরণ। কিন্তু অখণ্ড ভারত নিয়ে ইচ্ছাপূরণ নয়। ভারতবর্ষ ভেঙে দুই ডোমিনিয়নের জন্ম (ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস?)—জিন্নারও ইচ্ছা পূরণ—ভারত ভেঙে মুসলমানদের জন্য সম্প্রদায়বাদী রাজ্য পাকিস্তান অর্জন। অবশ্য 'পোকায় কাটা' পাকিস্তান নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক চরিত্রের বিচার ব্যাখ্যায় এটা স্পষ্ট যে, শ্বেতাঙ্গ ধাত্রীর হাতে জন্ম নিলেও প্রথমে শিক্ষিত এলিট ও পরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগ্রহে কংগ্রেস গণসংগঠনে পরিণত হয়। ক্রমে এর বিস্তার ঘটে শহর-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জের সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে। গান্ধিই এই চরিত্রবদলের রূপকার, কিন্তু তার নিজস্ব আদর্শে কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট গণআন্দোলগুলো সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করেছে। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস হিন্দু প্রধান সংগঠন হয়েই বেঁচে থাকে। সর্বজনীন ভারতবাসীর সংগঠন হিসাবে নয়।

কংগ্রেস তার রাজনৈতিক চারিত্র বৈশিষ্ট্যে সেকুল্যর গণসংগঠনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। কিংবা তা কতটা লালন করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন খুব একটা অযৌক্তিক নয়। তাছাড়া কংগ্রেস জনসমর্থিত সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক-সামাজিক শ্রেণি বিচারে ভূস্বামী, এলিট পেশাজীবী, কমপ্রেডর মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের (যেমন বিড়লা, গোয়েঙ্কা, ডালমিয়া ইত্যাদি) শ্রেণিস্বার্থরক্ষক প্রতিষ্ঠান। প্রসঙ্গত ঘনশ্যাম দাস বিড়লার সঙ্গে গান্ধির সখ্য ও তার ওপর নির্ভরতা স্মরণযোগ্য।

অন্যদিকে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চরিত্রের ধারক-বাহক। ভারত বহু ভাষা, বহু জাতিসত্তা এবং একাধিক ধর্মবিশ্বাসীর বাসভূমি বিধায় একক ভারতীয় জাতি বলে কিছু গড়ে ওঠেনি– ইংরেজ শাসনে ভারত ঐক্যবদ্ধ ভূখণ্ড। শাসক-সহযোগিতায় রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের মধ্য দিয়ে যা গড়ে ওঠে তা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা। সে বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত।

কংগ্রেস তাই সর্বজনীন জাতীয় আদর্শের প্রচারক হয়েও তার ধারক-বাহক হতে পারেনি। ধরে রাখতে পারেনি বিশাল মুসলমান সমাজকে যদিও শুরুতে তেমন সম্ভাবনা দেখা গেছে। ধরে রাখতে পারেনি তার শ্রেণি-চরিত্রের কারণে, তার ধর্মীয় চরিত্রের কারণে যে জন্য (বিশ শতকের) তিরিশের দশক অন্তে সম্প্রদায়বাদী (বা মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী) মুসলিম লীগের অস্বাভাবিক দ্রুততায় বিকাশ। বলতে গেলে মাত্র পাঁচ বছরে লীগ ভারত ভাগের শক্তি অর্জন করে ফেলে।

ভাইসরয় কার্জনের অদূরদর্শিতায় যে বঙ্গবিভাগ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আবেগের প্রকাশ তার ইতিবাচক দিক হলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতার বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবদুল হালিম গজনভি, ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবুল হুসেন প্রমুখ বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা।

এ উপলক্ষে স্বদেশিয়ানা ও যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব কংগ্রেস তা সেকুলার চেতনায় চিহ্নিত করে ধরে রাখতে পারেনি, তা লালন করেনি। জাতীয় প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা ইত্যাদির উপস্থিতি সত্ত্বেও এর সর্বজনীন চরিত্ররক্ষিত হয়নি। শহুরে শিক্ষিত শ্রেণির স্বার্থ-প্রাধান্যের কারণে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তার আবেগ সংবরণ করে ওই আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে গ্রামোন্নয়ন ও পল্লীপুনর্গঠনে সক্রিয় হন। তার মতো ভাববাদী কবিও বুঝে নেন যে কংগ্রেস দেশের অবহেলিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়নে আগ্রহী নয়। তার দৃষ্টি শহুরে শিক্ষিত শ্রেণির স্বার্থের দিকে। একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের।

কংগ্রেসের মূল চরিত্রে তাই ভূস্বামী, এলিট, পেশাজীবী এবং কমপ্রেডর ধনিক-বণিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার প্রাধান্য। সে জন্যই তার পক্ষে দেশপ্রেমী বুর্জোয়া বিপ্লবের সংগঠন হিসেবে সক্রিয় হওয়া সম্ভব হয়নি। আর তাতেই তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মলগ্ন থেকে বিভাগপূর্বকালের ৬২ বছর জীবনের ৪০ বছর পার হয়ে গেছে পরাধীন স্বদেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলতে, বিপ্লব তো দূরের কথা। আর সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক সমাধানও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পূর্বোক্ত সীমাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ আমার বিবেচনায় গান্ধিপ্রভাব, প্রভাব হিন্দুত্ববাদের ও হিন্দুমহাসভা জাতীয় সংগঠনের। তাসত্ত্বেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাসক-বিরোধী গণআন্দোলন কংগ্রেসের ছত্রছায়ায়ই ঘটেছে। স্বাধীনতার দাবিতে মানুষ মনেপ্রাণে সংগঠিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত থেকে সাধারণ মানুষ, কৃষক-কারিগর থেকে সিপাহি বা নৌসেনা কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করেছে। বিশেষভাবে দেশের ছাত্র-যুবশ্রেণি যুক্ত হয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে। কংগ্রেস কি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি? করেনি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে? স্বাধীনতা সংগ্রাম এভাবে মিশ্র ও আপসবাদী চরিত্র ধারণ করেছে। কংগ্রেস তাতে বাতাস দিয়েছে।

সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস সঠিক নেতৃত্ব, বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে, কিছু রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তির কারণে কংগ্রেস তার বহু-প্রচারিত অম্বিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। ভারতবর্ষীয় রাজনীতির জন্য এ পরিণাম দুর্ভাগ্যজনকই বলতে হয়। যদিও কাছাকাছি দেশে ভিন্ন পরিণাম। এ প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াত সেনের কথা স্মরণ করতে পারি। সর্বজনীন জাতীয়তাবাদী আদর্শের সে ভূমিকা কংগ্রেস প্রচার সত্ত্বেও পালন করতে পারেনি বলেই এত সহজে দেশবিভাগ। আদর্শে খাদ ছিল বলেই এত সহজে কংগ্রেসের দেশবিভাগ মেনে নেয়া। জিডি বিড়লা অবশ্য অনেক আগেই বলেছিলেন যে, দেশবিভাগের মাধ্যমেই তাদের একচেটিয়া স্বার্থ রক্ষিত হবে। সে স্বার্থের টানে কংগ্রেস ভারত-বিভাজন মেনে নিয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। বিশেষত বামচিন্তার কোনো কোনো লেখক। সেসব পরবর্তী পর্যায়ে বিবেচ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গ-ভারতীয় রাজনীতি ও মুসলমান সমাজ

ব্রিটিশ-ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন স্তরের আইনসভায় ও অন্যত্র অধিক সংখ্যায় ভারতীয় সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ও শাসন ব্যবস্থায় সহযোগিতার বিষয়গুলো প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা পায়। দাবি-দাওয়া পেশ করার সুযোগ-সুবিধাও তৈরি হয়। 'রাজ' প্রশাসনও সুযোগ-সুবিধার মুঠো একটু একটু করে খুলতে থাকে। ১৮৯২ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইনে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতাদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলে যোগ দেয়ার সুযোগ আসে। যেমন বোম্বাইয়ে গোখলে ও ফিরোজশাহ মেহ্‌তার মতো নেতৃবৃন্দ।

শীর্ষ প্রশাসনের উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল সব শাসকেরই দেশীয়দের সম্বন্ধে মূলনীতি ছিল 'বিভেদ ও শাসন' কৌশলের দক্ষ ব্যবহার। অবশ্য সুযোগ-সুবিধাদানের ক্ষেত্রে উদারপন্থী ভাইসরয়গণ (যেমন রিপন) ছিলেন কিছুটা খোলামেলা। কিন্তু রাজনীতির বিষয়টি সর্বদা নিয়মনীতি মেনে মসৃণভাবে চলেনি। বিশ শতকের শুরুতে কংগ্রেস অধিবেশনের মঞ্চ থেকে নানাবিধ সংস্কারের দাবি উঠতে থাকে কিংবা ওঠে বিশেষ বিশেষ সরকারি নীতির উদারনৈতিক সংস্কারের দাবি।

এসব ক্ষেত্রে সিংহভাগ সুবিধাই হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাগে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় : তারা ইংরেজের ইস্কুলে আগেভাগে অধিক মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হওয়ার কারণে নানামাত্রিক সুযোগ-সুবিধার অধিকাংশই তাদের হাতে চলে এসেছে। মুসলমান সমাজ এদিক থেকে পিছিয়ে থাকে। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের তুলনায় শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিক পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানের অবস্থা ছিল সত্যই করুণ।

শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ ওই ভেদনীতির বাস্তবায়নে ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ সুবিধাদানের কথা ভাবতে থাকেন। তাদের চিহ্নিত করা হয় 'পশ্চাৎপদ জাতি' হিসেবে। সম্ভবত সরকারি প্রেরণায়, কারো মতে ভাইসরয় মেয়োর নির্দেশে সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টার ওই নীতির সমর্থনে

মুসলমানদের পশ্চাদপদ অবস্থার বিশদ বর্ণনায় লেখেন 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান-স' গ্রন্থটি (১৮৭১)। ভাইসরয় ডাফরিনের ভাবনায়ও ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় হয়ে ওঠে পিছিয়ে পড়া একটি 'ভিন্ন জাতি' (১৮৮৮)। তাদের জন্য দরকার সংরক্ষণ নীতি এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে খুব দেরি হয়নি। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শুরু হয় হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব। ভারতীয় মুসলমান জনগোষ্ঠী যে বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়, এথনিক বিচারে একটি জাতিসত্তা নয় এ সহজ সত্য নিয়ে কে অভিজাত ভাইসরয়দের সঙ্গে তর্ক করতে যাবে? কার ঘাড়ে কটা মাথা? তবু লেখাজোখার প্রতিবাদ যে হয়নি তা নয়।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় বনাম বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে ছিল প্রথমোক্ত অঞ্চল শিল্পপুঁজির বিকাশে। বাংলা রাজনৈতিক চেতনায় এগিয়ে থাকলেও এদিকে এগিয়ে যেতে পারেনি। কারণ হিসেবে বলা হয় 'ভদ্রলোক' বাঙালির ব্যবসা ও শিল্পকারখানায় অনাসক্তি এবং জমিতে অর্থ বিনিয়োগে অভিজাত ভূস্বামী হয়ে ওঠার ঝোঁক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদিক থেকে তাদের সহায়তা করে। এ তত্ত্ব সম্বন্ধে নব্য ইতিহাস বিশ্লেষক কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন।

তবু গুজরাতি, মাড়োয়ারি, পার্সি বেনিয়াদের জমজমাট শিল্প ও ব্যবসার সাম্রাজ্য অস্বীকার করা যায় কীভাবে? সারি সারি নাম, তখন তো বটেই এখনো চেনা। এ পরিস্থিতিতে বঙ্গে গুটিকয় পুরনো ধারাবাহিকতার মুসলমান জমিদার এবং বিকশিত হওয়ার অপেক্ষায় তাদের মধ্যশ্রেণি ও বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্গীয় মুসলমান– কৃষক, তাঁতি-জোলা ও কারিগর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই তাদের নিত্যধর্ম। বাংলায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমশ বেড়েছে। অগ্রচারী শিক্ষিত শ্রেণি ও এলিটগোষ্ঠী, ভূস্বামী, পেশাজীবী এমনকি মহাজনদের নিয়ে হিন্দু বাঙালি তখন প্রতিবেশী মুসলমান থেকে অনেক এগিয়ে। বৈষম্য দ্বন্দ্বের কারণ।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোনো কোনো প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য লক্ষণীয় মাত্রায় উপস্থিত ছিল। তাতে কখনো যুক্ত হয়েছে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার বিভেদ। কৃষক বনাম জমিদার সমীকরণটা স্থূল বিচারে মুসলমান বনাম হিন্দু তথা ধর্মীয় সমীকরণে পরিণত হয়েছে। যেমন মালাবারে মোপলা কৃষক বিদ্রোহ যা রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে এর চরিত্র বিচারে দুই বিপরীত মতের উদ্ভব– শ্রেণিবিদ্রোহ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত হিসেবে। হিন্দু মহাসভানেতা মুঞ্জের রিপোর্টের ভিত্তিতে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। সুপ্রকাশ রায়ের মতে মোপলা অভ্যুত্থান অর্থনৈতিক স্বার্থের টানে বাস্তবিকই কৃষক বিদ্রোহ। সুমিত সরকার লিখেছেন– 'মোপলা অসন্তোষের বীজ স্পষ্টতই কৃষি সম্পর্কিত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় উদাহরণটি আমরা নেব বঙ্গদেশের পাবনা থেকে, যেমন ১৮৭৩-এ পাবনার কৃষক বিদ্রোহ। জমিদার তরফে ক্রমাগত কর বৃদ্ধি, নানা উপলক্ষে দৈহিক পীড়ন ইত্যাদি সব কিছুর বিরুদ্ধে 'মহারানীর রায়ত' হিসেবে সুবিচার চেয়ে দরিদ্র চাষিদের বিদ্রোহ। প্রজাদের অধিকাংশ মুসলমান, জমিদার হিন্দু। তা সত্ত্বেও এ বিদ্রোহকে শ্রেণিচরিত্র বিচারে কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ আন্দোলনের তিন প্রধান নেতার মধ্যে দুজনই হিন্দু– ঈশানচন্দ্র রায় ও শম্ভুপাল, তৃতীয়জন জোতদার খুদি মোল্লা (সুমিত সরকার)। এ আন্দোলনের বিরোধী ছিল ভূস্বামী-প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনগুলো, যেখানে আবার হিন্দুপ্রাধান্য। প্রচারের কল্যাণে বিষয়গুলো অবাঞ্ছিতরূপে সম্প্রদায় চেতনা স্পর্শ করেছে। লক্ষণীয় যে কংগ্রেস কখনো এ জাতীয় কৃষক আন্দোলনের প্রতি তাত্ত্বিক সমর্থনও জানায়নি।

দুই

উনিশ শতকে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক চেতনার যে উদ্ভব ও বিকাশ তার অন্যতম প্রধানকেন্দ্র বঙ্গদেশ। এ বিষয়ে দুই সম্প্রদায়েরই তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে যদিও চাবিকাঠি ধরা ছিল ব্রিটিশ শাসকদের হাতে। বিষয়টা সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের হওয়া সত্ত্বেও উনিশ শতকী বঙ্গীয় রেনেসাঁস তথা নবজাগরণ এর ভিত তৈরি করেছে, যেমন রাজনীতিতে, তেমনি সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে। শেষোক্তটি যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রে। পরবর্তী আলোচনায় তা স্পষ্ট হবে।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাব সত্ত্বেও বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের যে শক্তিমান ধারা তৈরি হয় তার সঙ্গে প্রবলভাবে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী রক্ষণশীলতাও প্রধান হয়ে ওঠে। এর নিশ্চিত ফল হলো রাষ্ট্রীয় সামাজিক জীবনে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। রামমোহন-বিদ্যাসাগর, মাইকেল-ইয়ংবেঙ্গল পর্ব পার হয়ে এসে স্বাদেশিকতার যে চরিত্র তাতে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষাক্ত প্রকাশ সর্বাধিক। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয়-বঙ্গীয় রাজনীতি সেই বিষ-প্রভাব ধারণ করেছে, লালন করেছে এবং এর বিস্তার ঘটিয়েছে।

উনিশ শতকে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তৎকালীন বাংলাকাব্য ও উপন্যাস পূর্বোক্ত সাম্প্রদায়িক চেতনার উৎস। যেমন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের টড রচনা প্রভাবিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' যা স্বাদেশিকতাকে মুসলমান বিরোধিতায় শক্তিমান করে তোলে। এর প্রেক্ষাপটে রাজপুত শৌর্যবীর্যের কাহিনী। এর ফলে স্বাদেশিকতা আর সর্বজনীন স্বাদেশিকতা থাকেনি। তাতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক রক্ষণশীলতা স্থান করে নেয়। একই ধারায় হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যরচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' সাম্প্রদায়িক চেতনায় দুষ্ট। রঙ্গলালের রচনা 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' পঙ্‌ক্তিতে উদ্দীপ্ত মুসলিম তরুণ 'যবনের দাস হে' চরণে পৌঁছে সে উদ্দীপনা আর ধরে রাখতে পারে না, বরং হোঁচট খায়।

তবে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) আনন্দমঠ, দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরানী ও সীতারাম-এর মতো উপন্যাসে। এর মধ্যে আনন্দমঠ উগ্র মুসলমান বিরোধিতায় স্বাদেশিকতাকে একমুখী সাম্প্রদায়িকতায় বিষাক্ত করে তোলে। 'বন্দেমাতরম' তাই সম্প্রদায় বিশেষের জাতীয় সংগীত হয়ে অপর সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হয়।

আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম মন্ত্র হিন্দুত্ববাদকে যেমন উজ্জীবিত করে, তেমনি জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মুসলমান সমাজ ও রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া ছিল পুরোপুরি নেতিবাচক এবং পাল্টা ধর্মীয় চেতনায় তিক্ত।

এ বিষয়ে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের বক্তব্য ভিন্ন নয়। তার নম্র ভাষায় 'দেশপ্রেমিক লেখকরা শুধু হিন্দু কাঠামোবিশিষ্ট প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকেই মহিমান্বিত করে তুলতেন না, সেই সঙ্গে স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতেন রাজপুত, মারাঠা, শিখদের সংগ্রামের কথা। প্রতিটি সংগ্রামেই প্রতিপক্ষ এক ও অভিন্ন– মুসলিমরা। এর ফলে জাতীয় চেতনায় আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল হিন্দুপ্রবণতা, তার ফল খুব সুখকর হয়নি' (বাংলার রেনেসাঁস)। ঘটনার প্রতিক্রিয়া কিন্তু নম্র থাকেনি, পরবর্তী ইতিহাস তাই বলে।

রাজনীতি ও সমাজে হিন্দুত্ববাদিতা, আচার-আচরণে সনাতনী প্রভাব, শুদ্ধি অভিযান ও সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার, শিবাজী উৎসব, ভবানী পূজা ইত্যাদির বিপরীতে মুসলমান সমাজে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন ও চেতনাশুদ্ধির অভিযান চলে মূলত ওয়াহাবি ও ফারায়েজি আন্দোলনের মধ্যে। এ প্রভাব বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে কম ছিল না। যেমন ছিল ফারায়েজি আন্দোলনের প্রথম পর্বে ধর্মীয় প্রভাব। ওয়াহাবি আন্দোলন শুধু সমাজভিত্তিক নয়, এর ছিল তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক চরিত্র। ভাইসরয় মেয়ো আন্দামান সফরে গিয়ে এক ওয়াহাবি সন্ত্রাসবাদীর হাতে নিহত হন। প্রসঙ্গত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর বাংলার জেলায় জেলায় ধর্মীয় প্রচার উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এভাবে উনিশ শতকে সাহিত্য ও ধর্মীয় প্রচারের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে যে প্রভাব প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে তার প্রতিফলন ঘটে হিন্দুত্ববাদিতায় ও পাল্টা মুসলিম ধর্মবাদিতায়। জাতীয় চেতনা এভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাজিত হয়ে দুই ভিন্ন বিন্দুতে স্থিত হয়। দুই ধারার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রতিফলিত হয় কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ প্রভৃতি সংগঠনের তৎপরতায়। দুই সমাজেই এর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। তবে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রসর হিন্দু সমাজে এর চর্চা হয়েছে অধিকতর মাত্রায়।

আমরা তাই লক্ষ্য করি সে সময় হিন্দু সমাজের বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও সমাজসেবীদের হাত দিয়ে সমাজ ও রাজনীতির তৎপরতায় সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্ববাদিতার প্রকাশ ঘটে। সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় রাজনারায়ণ বসুর মতো বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর তাই ঘোষণা যে 'হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বই হচ্ছে তার আন্দোলনের মূল সুর' (সুশোভন সরকার)। একই ধারায় রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র ও ঠাকুর ভ্রাতাদের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্মিলন পরিষদ 'জাতীয় মেলার' পরিবর্তে হয়ে ওঠে 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭)। স্বাদেশিকতায় এই মেলার প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু তা সঙ্কীর্ণ বিশেষ একটি ধর্ম-সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় আবদ্ধ থাকে। এ বিষয়ে উদাহরণ ও আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই।

তিন

AMARBOI.COM

ভারতীয় রাজনীতির বড় সমস্যা হলো যে তা কখনো অবিচ্ছিন্নধারায় ধর্মবিযুক্ত বা সম্প্রদায় প্রভাবমুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। এ অবাঞ্ছিত বাস্তবতা ইতিহাস পাঠকের কাছে যত দুঃখজনক হোক তা মেনে না নিয়ে উপায় নেই। তাই জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসাধারণ মেধাবী শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী আনন্দমোহন বসু ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মিলে ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে 'ভারত সভা' (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) নামে যে সংগঠন তৈরি করেন তাতে অসাম্প্রদায়িক নামী ব্যক্তিগণ (যেমন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বা রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) যোগ দিলেও এর প্রভাব জনমানসে পৌঁছতে পারেনি। সে চেষ্টাও তাদের ছিল না। নরমপন্থী ভাইসরয় রিপনের 'প্রজাস্বত্ব আইন' (১৮৮৫) পাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাদের রাজনৈতিক চেতনায় দাগ কাটেনি। কাটেনি তাদের শ্রেণিস্বার্থ ও শ্রেণি অবস্থানের কারণে। এখানেও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পাশাপাশি যে শ্রেণি বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাতেও বিরূপ প্রভাব বিপুলসংখ্যক মুসলমান কৃষক-কারিগর শ্রেণির ওপরে।

'ভারত সভা' বা জাতীয় কংগ্রেস তাদের সর্বজনীন জাতীয় চেতনার ঘোষণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্ত্বেও সফলভাবে ওই সর্বজনীন চেতনা লালন করতে বা বিস্তার ঘটাতে পারেনি। ক্রমে শেষোক্তটিতে প্রভাব রেখেছে ধর্মীয় সংস্কৃতি। লক্ষ করার বিষয় যে, কংগ্রেসের প্রথম দুই দশকের অধিবেশনে সাতবারই সভাপতিত্ব করেন পাঁচ বাঙালি– উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত ও লালমোহন ঘোষ। তারা এ সময়ে আসামের চা শ্রমিকদের নিয়ে কথা বলেছেন, নারী অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন, একাধিক রাজনৈতিক দাবি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কিন্তু বঙ্গের নিপীড়িত বিশাল কৃষক-কারিগর শ্রেণির দাবি নিয়ে কথা বলেননি। ঘটনাচক্রেই তো ইতিহাসের ধারায় এ মানুষগুলো মুসলমান সম্প্রদায়ের।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কল্যাণে স্বদেশচেতনার যত প্রকাশই ঘটুক তার বাস্তব চরিত্র সর্বজনীন, সর্বসম্প্রদায়বাদী হয়ে ওঠেনি। বরং থেকে থেকে স্বনামধন্য বাঙালি কৃতী পুরুষদের তৎপরতায় তাতে ধর্মীয় চেতনার প্রভাব পড়েছে। উনিশ শতকী সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও রাজনীতির কথা তো বলা হয়েছে, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সনাতন ধর্মীয় প্রচারের সামাজিক প্রভাব। যেমন রামকৃষ্ণ– শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬২-১৯০২) হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার। তার প্রচারে সর্বজনীনতার প্রকাশ সত্ত্বেও অধ্যাপক সুশোভন সরকার পর্যন্ত লিখেছেন যে, 'তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাই তার কর্মককাণ্ড হিন্দু পুনরুত্থানের মনোভাবকে আরো পুষ্ট করে তুলেছিল' (প্রাগুক্ত)।

বঙ্গীয় মনীষার হাত ধরে ধর্মীয় জাতীয়তার যে প্রকাশ তার রাজনৈতিক পরিণাম শুভ হয়নি। হয়নি জাতীয় রাজনীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতার জন্য। রাজনীতির অন্যতম দুর্বলতা হিসেবে অধ্যাপক সরকার চিহ্নিত করেছেন 'মুসলমান সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থনের অভাব' (প্রাগুক্ত)। বিষয়টি নিয়ে তিনি খোলামেলা আলোচনা করেছেন অনেকটা নির্মোহ দৃষ্টিতে। বলেছেন যে, 'কিছু বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুসলমান জনমত ধীরে ধীরে তাদের নিজস্ব, স্বতন্ত্র পথের দিকেই অগ্রসর হতে শুরু করেছিল।'

কারণ আর কিছু নয়। প্রথমত কংগ্রেসে ক্রমাগত হিন্দুত্ববাদের প্রভাব বৃদ্ধি, হিন্দু মহাসভার মতো ধর্মীয় সম্প্রদায়বাদী সংগঠনের নেতাদের উপস্থিতি ও প্রভাব। দ্বিতীয়ত মুসলমান-প্রধান কৃষকশ্রেণি ও মুসলমান জনস্বার্থের প্রতি কংগ্রেসের উদাসীনতা। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অসমবিকাশ ও বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেদিকে নজর দেয়া কিংবা পশ্চাৎপদদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার ভাবনা– কোনোকিছুই কংগ্রেস নেতৃত্ব রাজনৈতিক কর্তব্য বা কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা বাইরের মিল বা স্লোগানের মিলেই খুশি ছিলেন। অথচ বিষয়টা খুবই জরুরি ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবেননি 'জীবিকার মিলের' (রবীন্দ্রনাথ) কথা, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের কথা। অথচ কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ সেসব সমস্যা নিয়ে ভেবেছিলেন এবং যুক্তিসঙ্গত সমাধানের পরামর্শও দিয়েছেন তার একাধিক প্রবন্ধে। কিন্তু অদূরদর্শী কংগ্রেস নেতৃত্ব ওই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি। প্রথমদিকে কংগ্রেসে বেশ কয়েক জন প্রভাবশালী মুসলমান নেতার উপস্থিতি তাদের দূরদর্শিতা সীমিত করে রাখে। তাই মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কংগ্রেস।

কথাটা শ্রী সরকার বলেছেন ভিন্নভাবে এবং তা মুসলমানদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে। 'কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদীরা মুসলমানদের...দাবি দাওয়াগুলোকে একবাক্যে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে নিন্দা করতেন। কংগ্রেসের মধ্যেও মুসলমানরা রয়েছেন– এই ব্যাপারটাই তাদের ওই বিশ্বাসকে আরো জোরদার করে তুলেছিল। মুসলমানদের দাবিগুলোকে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দাবি হিসেবে খারিজ করে দেয়া হতো। কিন্তু একটা ব্যাপার তারা কিছুতেই বোঝার চেষ্টা করতেন না যে...কংগ্রেসের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হলেও মুসলমানদের স্লোগানগুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণির...সেই অংশটির স্বার্থকেই প্রতিফলিত করত যে অংশটি ছিল পশ্চাৎপদ এবং ঘটনাচক্রে তারা ছিল মুসলমান।'

'সামাগ্রিক জনসাধারণ সম্বন্ধে হিন্দুদের মূল যুক্তি ছিল যে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো রকম বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব নেই।' এ চিন্তাও সঠিক ছিল না। আসলে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমতার আকাঙ্ক্ষা তারা বুঝতে পারেননি। যেটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণিই তাদের স্বার্থের জন্য নিম্নবর্গীয়দের উৎসাহিত করে থাকে, তাদের কাছে টানে এবং সংঘবদ্ধ সমর্থন জোগানোর কাজে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সেই মুসলমান মধ্যশ্রেণির স্বার্থের বিষয়ও তাদের মাথায় ছিল না। এর কারণ অবশ্য শ্রেণিপ্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতাই মুসলমানদের স্বাধীনতার যৌথ লড়াই থেকে সরিয়ে নিয়েছে।

সুশোভন সরকারও বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসী নেতাদের এই ভুল যুক্তির জবাব দিয়েছিলেন তার লেখায়। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই ভাবিত ছিলেন এবং শিক্ষা, পদমান মর্যাদায় সমতার প্রয়োজনের কথা একাধিক লেখায় উল্লেখ করেছিলেন। এমনকি তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের কোনো কোনো শীর্ষনেতা তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা 'কবির ভাবনা' হিসেবে আখ্যায়িত করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে তৃণমূল স্তরে গ্রামীণ জনসংখ্যার দুঃখ-দুর্দশা ও অভাবের কথা নিয়ে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করেই ভিন্নভাষ্যে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন যে ('চাষা ব্যাটা ঠিকই বুঝিয়াছিল'-রবীন্দ্রনাথ)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সম্প্রদায়গতভাবে 'কালাপানির' ব্যবধান এবং গ্রাম-নগরের মধ্যে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মতো তফাৎ এই সত্য রবীন্দ্রনাথ বা দু-একজন রাজনীতিক বুঝলেও কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ নেতা বুঝতে চাননি। উঠতি মধ্যশ্রেণি বা তৃণমূল স্তরে দরিদ্র শ্রেণির মধ্যেও অন্তত সেসময় ধর্মীয় বিষয়টা প্রধান ছিল না, ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তা, সামাজিক পদমর্যাদার বিবেচনা। আর গ্রামীণ প্রজাদের মধ্যে ছিল জমিদার ভূস্বামীদের আর্থ-সামাজিক শোষণ, পীড়ন ও দৈহিক নির্যাতন থেকে মুক্তির ভাবনা। ক্রমে রাজনীতির কল্যাণে তা সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতার পথ ধরে।

সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের ভিন্ন দিক প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, উনিশ শতকের ওই প্রবল সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের যে বিপরীত ধারার প্রকাশ মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, কালিপ্রসন্ন সিংহ বা মীর মশার-রফ হোসেনের রচনার মাধ্যমে তা অনেকটা গৌণধারা। সে ধারার পক্ষে সম্ভব হয়নি হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের মতো শক্তিমান ধারাকে প্রতিহত করা। কারণ ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মের জোর হয়ে ওঠে বেশি, বিশেষ করে যখন তাতে অর্থনৈতিক বা অনুরূপ স্বার্থ যুক্ত হয়।

সাহিত্যের সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে, এর প্রভাব শিক্ষিত শ্রেণিতে এমনকি শিশুপাঠ্য বইতেও কতটা ব্যাপক হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন সুমিত সরকার। প্রসঙ্গত লালা লাজপত রায়ের আত্মজীবনীতে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক শিশুপাঠের অভিজ্ঞতা স্মরণযোগ্য। স্মরণযোগ্য রক্ষণশীল ও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্য : 'রাজনীতি অবহেলিত হয়েছে বিমূর্ত ধর্মের স্বার্থে। পরিণামে পুরনো জাতীয় সংগীতের স্থান নিয়েছে ধর্মীয় সংগীত' (১৯০৩ খ্রি.)। বন্দেমাতরমও তো মাতৃভূমিবন্দনা সূত্রে দেবীবন্দনা অথবা এর বিপরীতটি। স্বধর্মে বিশ্বাসী বাঙালি মুসলমান কীভাবে একে গ্রহণ করবে?

সাহিত্যের পাশাপাশি ইতিহাসেও একইরকম সম্প্রদায়বাদী চরিত্রের প্রকাশ সম্প্রদায় চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ যদি শ্বেতাঙ্গদের কথা বাদও দিই। মুঘল শাসন, বঙ্গের নবাবী শাসন এদের সাম্প্রদায়িকতায় জ্বালানি যোগ করেছে। এদের বিপরীত ধারায় ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ একাধিক ইতিহাস-লেখক। যেমন নিখিলনাথ রায়।

চার

সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অন্তত একটি বিষয়ে অধিকাংশ পশ্চিমা (শ্বেতাঙ্গ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসবিদ-লেখক রক্ষণশীল ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান ইতিহাস লেখকের সঙ্গে একমত যে ভারতে হিন্দু-মুসলমান শত শত বছর ধরে পাশাপাশি বাস করে এবং একই ঘটনাক্রমের সহযোগী হয়েও পরস্পর থেকে ভিন্ন। এ ভিন্নতার ভিতটাকে তারা জাতি-জাতীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করেছেন।

যেমন ভারত-বিভাগ বিষয়ক একটি মোটা বইয়ের লেখক এইচ.ভি হডসন লিখেছেন : 'হিন্দু-মুসলিম দুই জনগোষ্ঠী একই এথনিক উৎস থেকে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও শুধু ধর্ম বিশ্বাসেই ভিন্ন নয়, তারা ভিন্ন জীবনযাত্রা ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও। বলা যায়, এরা স্বতন্ত্র বংশগত জনগোষ্ঠী।' এ জাতীয় তত্ত্বের প্রচার রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি সব কিছুর বিচারে চলেছে। ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার থেকে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বা হিন্দু মহাসভানেতা সাভারকর এবং সৈয়দ আহমদ বা মোহাম্মদ আলী জিন্না থেকে নবাব সলিমুল্লাহ বা মৌলানা আকরম খাঁ সবাই এ জাতীয় তত্ত্বের প্রবক্তা।

জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা আমরা জানি। এ কথাও জানি, স্বধর্মের রীতিনীতি পালন করেন না যে জিন্না তিনিই রাজনৈতিক প্রয়োজনে দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব ঘটিয়ে ধর্মকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অথচ এই জিন্না এক সময় 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাজনীতির কথা বাদ দেই, কারণ রাজনীতিতে নীতি বলতে কিছু নেই। সেখানে সব রকম আচরণই সিদ্ধ।

একই কথা খাটে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদগণ সম্পর্কে। খাটে অরবিন্দ ঘোষ বা বিপিনচন্দ্র পাল থেকে সাভারকর, তিলক-লাজপত-মালব্য বা মুঞ্জে সম্পর্কে। ভিন্ন ভিন্ন কারণে, বিশ্বাস বা রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের এবংবিধ মত। কিন্তু বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ, শিক্ষাবিদ কেন সম্প্রদায়বাদিতার পথ ধরবেন? এর কারণ আমার মনে হয় স্থানীয়দের ক্ষেত্রে অন্ধ ধর্মীয় রক্ষণশীলতা আর পশ্চিমাদের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা। সেখানে যুক্তি, নিরপেক্ষ চিন্তা বা নির্মোহ মানসিকতা প্রাধান্য পায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ইতিহাস-অধ্যাপক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার উনিশ শতকের বঙ্গদেশ বিষয়ক তার বইতে বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, হিন্দু মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি। তার মতে, নান্দনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যবিচারেও তারা ভিন্ন যদিও ছশ বছর ধরে তারা পাশাপাশি বাস করে এসেছে ('Glimpses of Bengal in the Nineteenth century', 1960)।

অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসে, আচরণে, সংস্কারে হিন্দু-মুসলমানে মিল রয়েছে কিন্তু তা গৌণ। তাদের অবস্থান দুই স্বতন্ত্র কক্ষে। প্রায় হুবহু একই রকম কথা বলেছেন ১৯৪৪ সালে কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেনেসাঁ সোসাইটির সম্মেলনে মূল সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ তার ভাষণে। তার মতে, শুধু ধর্ম বিশ্বাসেই হিন্দু-মুসলমান ভিন্ন নয়, তাদের মধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় মিল যেমন আছে তেমনি গরমিলও অনেক এবং মিল নয়, গরমিলই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ (মোহাম্মদী ১৩৫১)। এরা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জাতিত্বের মর্যাদায় চিহ্নিত করেছেন যা বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনা নয়।

অধ্যাপক মজুমদার শুধু বঙ্গের কথা নয়, গোটা ভারতের প্রসঙ্গে ওই কথা বলেছেন। এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ বা ইতিহাসবিদ কেউ কেউ (ড. নীহাররঞ্জন রায়) বিপরীত কথা বলেন। বলেন, একেবারে আধুনিককালের একাধিক ইতিহাসবিদ, বাঙালি ও অবাঙালি। যেমন বরুণ দে, রোমিলা থাপার, অমলেশ ত্রিপাঠী, বিপানচন্দ্র, হরবংশ মুখিয়া প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ কথাই বলেছেন ভিন্ন ভাষায়। তার মতে হিন্দু-মুসলমান ধর্মে না মিলতে পারে কিন্তু জীবিকায়, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং আরো নানা ক্ষেত্রে তাদের মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র রয়েছে।

ভারত-বিভাগ সম্পর্কে আলোচনায় লেনার্ড গর্ডন তার দেশভাগ বিষয়ক রচনায় উল্লিখিত সূত্রগুলোর বিচারে যা লিখেছেন তার মর্মকথা হলো বিশ্বের একাধিক দেশে ধর্মীয় ভিন্নতা এবং তা নিয়ে বিভিন্ন এথনিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গুরুতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটলেও সেখানে ভূখণ্ড বিভাজন ঘটেনি। অবশ্য যেখানে এই ভিন্নতার সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণ ও ভূখণ্ড দূরত্ব যুক্ত হয়েছে সেখানে হয়তো বিভাজন ঘটতে পারে। স্বভাবত কেউ সিদ্ধান্তে আসতে পারেন, প্রচারে বা তত্ত্বে যাই বলা হোক দেশবিভাগের মূল কারণ ধর্মীয় নয়, তা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক যদিও উনিশ বা বিশ শতকে ধর্ম রাজনীতির নেপথ্য প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে।

প্রাসঙ্গিক একটি বক্তব্য এই বিভক্তি বিষয়ে। জিন্না তুখোড় আইনজীবী, একই সঙ্গে প্রতিভাবান রাজনীতিক। উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য, যুক্তি, তর্ক, বিতর্ক তার পেশাগত মূলধন। জিন্না যদি বিশ্বাসই করবেন যে হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠী দুই ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী হয়েই দুই ভিন্ন জাতি, তাহলে রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে কংগ্রেসে সংশ্লিষ্ট হয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রবক্তা হবেন কেন? বলবেন কেন যে দুই সম্প্রদায়ের অনৈক্য ভারতে বিদেশি রাজের স্থায়িত্বের কারণ। তাই দরকার ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। ঘটনা তো বলে, ঐক্যে ব্যর্থ হয়ে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন থেকে ব্যর্থতা নিয়ে হতাশ জিন্নার রাজনীতি থেকে আপাত বিদায়। পরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জিহাদি মনোভাব নিয়ে আবার তার প্রতিশোধের রাজনীতি শুরু। সেখানে সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র ধর্মের ব্যবহার। গোটা বিষয়টিই রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের, ঐতিহাসিক সত্যের নয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যবহার ব্যক্তিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে, লক্ষ্য অর্জনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

ভারতে-বঙ্গে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য খোঁজার প্রক্রিয়ায় কিছু ঘটনা যেন অমোঘ নিয়তির মতো মনে হয়, যেগুলোর ওপর সমকালীন কোনো পক্ষেরই নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু সত্য বা বাস্তবতা চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও সেদিকে কেউ নজর দেয়নি, সেসব সমস্যার সমাধান বা গ্রন্থির জট খোলায় কেউ মনোযোগী হয়নি। ভারতে শীর্ষ ইংরেজ আমলা বা রাজনীতিকের জানা ছিল– 'ভাগ করো, শাসন করো' কিংবা 'হিন্দুমুসলমান সমস্যা জিইয়ে রাখাই ভারতে ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখার শক্তিমান পূর্বশর্ত' (কুপল্যান্ড, উদ্ধৃতি সরকার)।

তেমনি কংগ্রেস-লীগ নেতাদেরও তা জানা ছিল। তাই বলা যায় ভারতের স্বরাজ, স্বশাসন বা স্বাধীনতার জন্য 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য' কথাটা ছিল জাদুকরী বাক্যবন্ধ। এ সম্পর্ক তৈরিতে সুযোগ এসেছে, সুযোগ গেছে, রাজনীতিকদের বিচক্ষণতা-বুদ্ধি-যুক্তি সেখান কাজ করেনি বা সুফল তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু ব্রিটিশরাজ সুবিধাগুলো কাজে লাগিয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সর্বশেষ সে 'চেরাগ' ধরা ছিল শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের হাতে। তিনি দ্রুতগতিতে ঐতিহ্যবাহী বেনিয়া চাতুর্যে সেটা ব্যবহার করে ভারত ভেঙে চিরশত্রু দুই ডোমিনিয়নের জন্ম দিয়ে একসময় স্বদেশে ফিরে যান।

ভারত-বিভাজনের গোটা সমস্যার পেছনে একটা অপ্রিয় সত্য হলো ভারতীয় উপমহাদেশ প্রধান দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের আবাসভূমি হলেও সেখানে বহু ভাষা-সংস্কৃতি-নির্ভর এথনিক জাতিগোষ্ঠীর বাস। 'ভারত মাতা' হিসেবে যত বন্দনা করা হোক ভারত কখনো এক জাতির এক ভাষাভাষীর দেশ নয়। এর একক জাতীয়তা বিজ্ঞানসম্মত (নৃতত্ত্বসম্মত) নয়, এর মূল জাতীয়তা ভূখণ্ডভিত্তিক; আধুনিক বিচারেও একাধিক ভূখণ্ডভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ভারত (অখণ্ড ভারত নয়)।

বহুভাষী বহু জাতিসত্তা-সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর একত্রবাসের কারণে জাতীয়তা বিষযক সঙ্কট তার নিয়তি। একক জাতিসত্তা-জাতীয়তা না থাকার কারণে ধর্মকে জাতীয়তা, ধর্মসম্প্রদায়কে জাতি হিসেবে দাবি ও গ্রহণ করা সহজ হয়ে উঠেছিল। এ সুযোগ জিন্না নিয়েছিলেন। অন্যদিকে বিপ্লবী দলগুলো এবং কংগ্রেস হিন্দুত্ববাদের প্রেক্ষাপটে অখণ্ড ভারত ও ভারতীয় জাতীয়তার রাজনৈতিক স্বপ্ন লালন করেছে।

এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব এতটাই নিশ্চিত ছিল যে, এ ক্ষেত্রে তারা কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ছাড় দেয়ার কথা ভাবতে পারত না। অথচ যে সনাতন ভারত বা 'রামরাজ্যে'র কথা গান্ধি ভাবতেন বা স্বপ্ন দেখতেন প্রাচীন যুগে তেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অখণ্ড ভারতীয় সত্তার অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না পরবর্তী পাঠান বা মুঘল যুগে। ইংরেজ আমলে যে ভারত ভূখণ্ড তৈরি (শাসনতান্ত্রিক এক ইউনিট) তাও দীর্ঘ সময় ধরে– একটা-দুটো করে দেশীয় শাসনাধীন রাজ্য গ্রাস করে। সর্বশেষ অবস্থানেও ব্রিটিশ ভারতের বাইরে ছিল নামকাওয়াস্তে হলেও অনেক স্বশাসিত দেশীয় রাজ্য, তাদের ভাষায় 'প্রিন্সলি স্টেট্‌স'।

বিভিন্ন সময়ে লীগ-কংগ্রেসের দেনদরবারে উভয়ের অনড় ভূমিকা, বিশেষ করে অখণ্ড ভারত ও শক্তিশালী কেন্দ্র বিষয়ক কংগ্রেসের অনড় ভূমিকা সমঝোতার পথ ব্যাহত করেছে। দাঙ্গা বা কোনো রাজনৈতিক কারণে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতির পরিপ্রেক্ষিতেও লীগ বা কংগ্রেস ভাবতে পারেনি ধর্মীয় উপাদানকে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিচরণের সুযোগ-সুবিধা দেয়া ক্ষতিকর হবে। কিন্তু ধর্মীয় চেতনা এমন এক মারাত্মক তীর যা অন্ধ উন্মাদনায় পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। তখন তাকে ঠেকানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

তাই 'বন্দেমাতরম' ভিত্তিক স্লোগানে হিন্দুত্ববাদী প্রতীক ও দেবদেবী নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তার রাজনৈতিক পদক্ষেপ যতটা শক্তসমর্থ হয়েছে পাল্টা মুসলমান প্রতিক্রিয়া 'আল্লাহু-আকবর' ধ্বনিতে তাদের শক্তি সংহত করতে চেয়েছে। ফলে স্বদেশী বা অসহযোগ আন্দোলনের স্বাদেশিকতা বা ত্যাগ মুসলমান মনে দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের চলা এভাবে ক্রমাগত পৃথক পথ ধরেছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, কংগ্রেসের জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত নেতৃবৃন্দ কেন ধর্মীয় রাজনীতির সমস্যা ও বিপদ অনুধাবন করতে পারেননি তাদের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাহায্যে। 'আনন্দমঠ' ও দেবীবন্দনাধৃত বন্দেমাতরমের বদলে কোনো সেক্যুলার স্লোগান সাম্প্রদায়িক চেতনা নমনীয় করতে পারত, সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতো।

ভারতীয় জাতীয়তার (ভূখণ্ডভিত্তিক) প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ভারতের ভাষা- সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিসত্তাগুলোকে বিবেচনায় আনেনি। কারণ তাতে ভারতের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ন হতে পারে বলে তাদের মনে হয়েছে। অথচ ভাষা-জাতিসত্তার স্বীকৃতি ছিল বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা। এ চিন্তা আমলে আনা হলে দেশভাগ হয়তো অনিবার্য হতো না। না আনার ফল যে ভালো হয়নি ১৯৪৭-আগস্ট তার প্রমাণ। আমলে না আনার কারণে ভাষিক জাতিসত্তার স্থান দখল করে ধর্ম এবং তা নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়। রাজনীতিতে জাতিত্বের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, পার্সি ধর্ম সম্প্রদায়। রাজনৈতিক বিকাশ ও দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে তিনটি সম্প্রদায় শক্তিমান হয়ে ওঠে– হিন্দু, মুসলমান, শিখ। এরাই ভারতের রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চে প্রধান খেলোয়াড়। খেলার মূল নেপথ্য নায়ক ব্রিটিশরাজ যাদের হাতে পুতুলনাচের সুতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের টানাপড়েনের মধ্যে যেসব ঘটনা ভবিষ্যৎ ভারত-বিভাগের রাজনৈতিক অশনিসঙ্কেতের মতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তার একটি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ তথা বঙ্গবিভাগ। এ সময় এবং চার দশক পরও বঙ্গই হয়ে ওঠে ভারত বিভাগের মুল নেপথ্য শক্তি। বঙ্গেই ইংরেজ শাসনের সূচনা এবং বঙ্গকে কেন্দ্র করেই এর সমাপ্তি। বঙ্গীয় রাজনীতির গুরুত্ব তাই ছোট করে দেখা চলে না যদিও দুই প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন লীগ-কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বঙ্গ তার চালিকাশক্তি সংহত করতে পারেনি। বঙ্গ সেখানে ব্রাত্য। আসলে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার গুরুত্ব বুঝে নিতে পারলে আমরা দেশবিভাগজনিত সত্যাসত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারব।

ভারতবর্ষের দুই গুরুত্বপূর্ণ মুসলমানপ্রধান প্রদেশ বঙ্গ ও পাঞ্জাব দেশবিভাগ-রাজনীতির দাবার ছকে মূল ঘুঁটি হিসেবে বিবেচনা করেছেন একাধিক ইতিহাসলেখক। আমার বিবেচনায় এ ক্ষেত্রে বঙ্গই প্রধান। ১৯৪৬ সালেও যে দুটো ঘটনা ভারত বিভাগের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে বিভাজন অনিবার্য করে তোলে তাহলো পাকিস্তান ইস্যুতে সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গে মুসলিম লীগের একচেটিয়া বিজয় এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের সূত্রে ১৬ আগস্টে সূচিত কলকাতা মহাহত্যাযজ্ঞ ও তার প্রতিক্রিয়া। তাই ভারতীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ বিচারে বঙ্গীয় রাজনীতির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর সূচনা অবশ্য বিশশতকের প্রথম দশকে। ঘটনা বঙ্গভঙ্গ। তাই বঙ্গ নিয়েই আলোচনা।

সে আলোচনায় সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা, যোগ্যতা, হীনমন্যতা, পরিচিতি সঙ্কট এবং সেইসব সূত্রে একই ভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ভেদচেতনা। কখন কীভাবে তার আত্মচেতনার সূত্রপাত তার বাঙালিত্ব ও মুসলমানত্ব ঘিরে অর্থাৎ তার জাতিসত্তা ও ধর্মীয় সত্তার সংঘাতে এবং পরিণামে স্থায়ী সিদ্ধান্তে উপস্থিতি, সেগুলোও বিচার্য বিষয়।

আত্মচেতনা শিক্ষিতশ্রেণি থেকেই গড়ে ওঠে, প্রকাশ পায় এবং ধীরগতিতে রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাবলীর টানে ছড়িয়ে যায়। এর পেছনে মূল কারণ অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণ, সুযোগ-সুবিধা অর্জন। এই সূত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার প্রকাশও ঘটতে পারে যা এক পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকতার চরিত্র অর্জন করে। এমনকি ঘটতে পারে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত। বঙ্গে তেমন একাধিক উদাহরণ রয়েছে যেমন রয়েছে ভারতে। দুটো উদাহরণই যথেষ্ট—বঙ্গভঙ্গ বিরোধ উপলক্ষে ১৯০৭ সালে এবং বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিলের পর ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটামুটি হিসেবে বিশশতক থেকে রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হয় এবং নানা ঘটনার জের ধরে এর দশকওয়ারি বিস্তার। তবে এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল পূর্বাপর ব্রিটিশ কূটনীতি ও উনিশ শতকে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে হিন্দুত্ববাদিতার রাজনীতিকরণের মধ্য দিয়ে। সেই সঙ্গে ইসলামের নামে ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মবাদী আত্মচেতনারও প্রকাশ। আবার এ কথাও ঠিক যে, উনিশশতক অবধি সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছে। পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও সহযোগিতা নিয়ে (শীলা সেন)।

কিন্তু হিন্দুভূস্বামী ও এলিটশ্রেণির ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব, রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদ এবং শিক্ষা ও পদমানমর্যাদায় উঠতি মুসলমান শিক্ষিতশ্রেণি ও স্বল্পসংখ্যক উর্দুভাষী বিত্তবান বা ভূস্বামী মুসলমানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার টানে পারস্পরিক সম্পর্কে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়। ১৯০৫ সালে ভাইরসয় কার্জনকৃত বঙ্গভঙ্গ এবং তা রদ করতে ব্যাপক গণআন্দোলন ওই পটভূমি তৈরি করে। ১৯০৬ সালের অক্টোবরে আগা খানের নেতৃত্বে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান প্রতিনিধি দল ভাইসরয় মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে তাদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক দাবি-দাওয়া পেশ করেন।

যদিও দাবি মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে কিন্তু সেসব ছিল ওইসব অভিজাত, ভূস্বামী ও কিছু সংখ্যক উচ্চমধ্যশ্রেণির আর্থ-সামাজিক স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে ব্রিটিশ কূটনীতি তৈরি ছিল দুই সম্প্রদায়ের চলার জন্য পৃথক পথ তৈরি করে দিতে। এই পথ ধরে পরবর্তী সময়ে উঠতি মুসলমান মধ্যবিত্ত তাদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে স্বাতন্ত্র্যবাদী পথ ধরে। স্বতন্ত্র পরিচিতি যে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে শাসকশ্রেণির আচরণে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাইসরয় মিন্টোর স্পষ্ট মনোভাব- '৬ কোটি জনসংখ্যাকে সরকারবিরোধী ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে' (ভিপি মেনন, ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া, ১৯৫৭)। এ মন্তব্য লেডি মিন্টোর ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত।

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কথা মাথায় রেখে সরকারি উদ্যোগে নবাব সলিমুল্লাহ, জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস গঠনের ২১ বছর পর একই হাতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা পাল্টা সংগঠন হিসেবে ১৯০৬ সালে। ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে, মুসলিম লীগের প্রথম সমাবেশ-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাকতালীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হলেও তাৎপর্যপূর্ণ যে, ওই বছরই হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা সাম্প্রদায়িক বিভেদের পথ প্রশস্ত করে তুলতে।

সাত

বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কার্জন সাহেব ও তার শীর্ষ আমলাগণ যুক্তি হিসেবে যাই বলুন না কেন এর মূল উদ্দেশ্য বঙ্গে শাসকবিরোধী আন্দোলন, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ও ক্রমবর্ধমান স্বদেশীচেতনার প্রকাশ বন্ধ করা। ওই আন্দোলন ছিল প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের। স্বল্পসংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলমান শাসকবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। বঙ্গভঙ্গের আরো লক্ষ্য ছিল ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের শক্তি হ্রাস করার পাশাপাশি মুসলমানপ্রধান প্রদেশ তৈরি করে তাদের সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটিয়ে বঙ্গীয় মুসলমানের সমর্থন নিশ্চিত করা। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা ১৯০৫ সালের ৭-ই জুলাই, সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে।

কিন্তু এ বিভাজনের প্রতিক্রিয়া হয় ব্যাপক যা অভাবিত শাসকশ্রেণির জন্য। ভূস্বামী, মধ্যবিত্ত, পেশাজীবী ও ছাত্রকুলের এ আন্দোলন প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের হলেও স্বনামখ্যাত অনেক মুসলমান নেতা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। যেমন আবদুল হালিম গজনভি, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, আবুল হুসেন, দীদার বক্স, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কাজেম আলী মাস্টার, আবুল কাসেম, সাংবাদিক মুজীবর রহমান, সৈয়দ আলী ইমাম ও হাসনান ইমাম, ব্যারিস্টার মজহারুল হক, মুজফফর আহমদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ নানা পেশার খ্যাতিমান ব্যক্তি। কিছুসংখ্যক মুসলিম সাময়িকী আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার হয়। এর কারণ মূলত জাতিগত আবেগ।

তবে নতুন প্রদেশগঠন উপলক্ষে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচার এবং রক্ষণশীল চেতনার কারণে উচ্চবর্গীয় মুসলমান অনেকে যেমন নবাব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ বঙ্গভঙ্গের পক্ষ সমর্থন করে প্রচারে নামেন। তাদের পক্ষে সুবিধা তৈরি হয় যখন স্বদেশী আন্দোলনে ক্রমে হিন্দুত্ববাদী প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে (শীলা সেন)। 'স্বদেশী জিনিস কিনুন' 'স্বদেশী শিল্প গড়ে তুলুন' স্লোগান জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও সে আবেদন পশ্চাদপদ মুসলমান মধ্যবিত্ত মানসে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেনি। আর প্রধানত উর্দুভাষী উচ্চবিত্ত বা ভূস্বামী মুসলমানের রক্ষণশীলতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেদন সাড়া না জাগানোরই কথা। তাছাড়া আন্দোলনে ছিল হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় চেতনার প্রভাব যা মুসলিম অনীহার কারণ হয়ে ওঠে।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন দমনে শাসকশ্রেণি সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের পথ গ্রহণ করে। এ কাজে সমর্থন জোগায় নবাব সলিমুল্লাহ প্রমুখ ভূস্বামী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষণশীল মুসলমান সমাজপতিগণ। প্রচারের কাজে লাগানো হয় মোল্লা-মৌলবীদের। কিছুকাল পরেই পূর্ববঙ্গে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত বাড়তে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের হিন্দুকর্মীদের কর্মসূচিগত বাড়াবাড়ি মুসলমান জনতার মনে অসন্তোষ তৈরি করে। বিষয়টা রবীন্দ্রনাথ তার একাধিক লেখায় উল্লেখ করেছেন। সমালোচনা করেছেন স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুয়ানির অনুপ্রবেশ নিয়ে, তাদের জবরদস্তি নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী

কথাটা আগেও বলা হয়েছে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ধর্মীয়চেতনা বা ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও প্রভাব জাতিসত্তার জন্য সুস্থ পরিণাম বয়ে আনে না বিশেষ করে যেখানে একাধিক ধর্মবিশ্বাসী মানুষের বাস। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতীয় রাজনীতিতে বঙ্গদেশে এই অবাঞ্ছিত ঘটনাই একাধিক সময়পর্বে ঘটেছে। বলাবহুল্য কোনো পর্বেই এর তাৎক্ষণিক বা স্থায়ী পরিণাম শুভ হয়নি, মঙ্গলজনক হয়নি। বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলন তার পরিচ্ছন্ন প্রমাণ। প্রমাণ বঙ্গীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ঘটনাবলীতে এবং কংগ্রেসের একাধিক আন্দোলনের নীতিগত ও কর্মসূচিগত বিভ্রান্তিতে ধরা রয়েছে।

কংগ্রেস যে তার কর্মসূচির মাধ্যমে মুসলমান জনশ্রেণীতে তার অবস্থান তৈরি করতে চেষ্টা চালায়নি, এ সমালোচনা বরাবর রবীন্দ্রনাথের। কথাটা অধ্যাপক সুশোভন সরকারও বলেছেন এভাবে : 'পূর্ববঙ্গের ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান চাষিদের জাগিয়ে তুলতে স্বদেশী আন্দোলন যে ব্যর্থ হয়েছিল তা অকপটে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পাবনার প্রাদেশিক সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮) সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির লোকেরাই; এই ভদ্রশ্রেণির লোকেরা কখনই নিজেদের দেশের মুসলমানদের সঙ্গে কিংবা সাধারণ হিন্দুদের সঙ্গেও এক হয়ে মেশার চেষ্টা করেনি' (প্রাগুক্ত)।

আসলে মুসলমান চাষিই নয়, মুসলমান মধ্যশ্রেণি বা নিম্নশ্রেণিকেও কংগ্রেস আন্তরিকভাবে কাছে টানার চেষ্টা করেনি। বরং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ভোট দিয়েছে প্রজাস্বার্থের বিলের বিরুদ্ধে, যে-প্রজাশ্রেণির অধিকাংশই মুসলমান। বঙ্গভঙ্গপূর্ব দুই দশকে কংগ্রেস হিন্দু নিম্নবর্গীয়দের সঙ্গেও সম্পর্ক তৈরি করেনি। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা কংগ্রেসের তৃণমূল সম্পর্ক নিশ্চিত করে। বঙ্গ ও বাঙালি জাতীয়তা নিয়ে তৈরি হয় আবেগ-আলোড়ন। মুসলিম একাংশ সাময়িক তাতে যোগ দেয়। তাতেই শঙ্কিত হয় শাসকশ্রেণি। বিশেষ করে শঙ্কিত হয় আন্দোলনের প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য লক্ষ্য করে।

এ ধারা শুরু হয় ১৯০৪ সাল থেকেই চট্টগ্রামে, বগুড়ায় মুসলমান-নেতাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল প্রতিবাদী জনসভায়। বিস্ময়কর ছিল কলকাতায় ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯০৫) হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের বিশাল শোভাযাত্রা যার তুলনা চলে ১৯৪৫, ১৯৪৬-এ নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি ও ত্রিদলীয় বিশালায়তন ছাত্র-জনতার শোভাযাত্রার সঙ্গে। এমনি একাধিক সমাবেশ, শোভাযাত্রা জাতীয়তার চেতনা প্রতিফলিত করেছিল। প্রসঙ্গত নাখোদা মসজিদে মুসল্লিদের হাতে রবীন্দ্রনাথের রাখি বাঁধা এবং 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানসহ বিখ্যাত ভাষণ ছিল ঐক্যের প্রতীক।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল অন্যরকম। আগেই বলা হয়েছে সরকারি প্রচার, সলিমুল্লাহ গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যবাদী প্রচার, 'নতুন প্রদেশ মানেই আরো বেশি চাকরি এবং সুযোগ-সুবিধা, উচ্চপদ' ইত্যাদি 'উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরিয়ে নিতে সফল হয়েছিল' (সুমিত সরকার)। প্রকৃতপক্ষে বিভাজনপন্থীগোষ্ঠীর অর্থ ব্যয়, চক্রান্ত ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পটভূমিতে মুসলমান জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ (পূর্ববঙ্গে) ক্রমে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। বৈরিতা তৈরি হয় স্বদেশীদের সঙ্গে। তাতে সুবিধা হয় শাসকশ্রেণির দুপক্ষকে লড়িয়ে দিতে। এতে স্বদেশিদের দায়ও কম ছিল না।

আসলে লড়িয়ে দেয়ার সুযোগ তৈরি হয় স্বদেশী রাজনীতিতে ধর্মীয় উপাদানের অনুপ্রবেশে যে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ছিল বাস্তবভিত্তিক। বিষয়টার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে বলে কিছুটা উদ্ধৃতি-ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে, যা পাঠককে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। ব্যাপক জাতীয়তাবাদভিত্তিক স্বাদেশিকতাকে ধর্মীয় সংস্কৃতির বৃত্তে আবদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। স্বদেশীরা ভেবে দেখেননি যে তাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপতা তৈরি হবে, তাদের সমর্থন মিলবে না।

সম্ভবত তারা ওই সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। ভাবেননি যে, শাসকশ্রেণি এর সুযোগ নিতে পারে। এদিক থেকে কংগ্রেসী নেতৃত্বের চিন্তায় বিচক্ষণতার অভাব ছিল। গণপ্রতিক্রিয়ার ব্যাপকতা তাদের দূরদর্শী হতে দেয়নি। 'তাই স্বদেশী মেজাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ ছিল রাজনীতি ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের মিলন প্রয়াসের। এটিকে বারবার ব্যবহার করা হয়েছিল কর্মীদের নৈতিক শক্তিবৃদ্ধি ও জনসংযোগের প্রধান উপকরণ হিসেবে। সুরেন্দ্রনাথ দাবি করেছিলেন মন্দিরে দাঁড়িয়ে স্বদেশীদের শপথ নেয়ার' (সুমিত সরকার)। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে, উপন্যাসে এসবের উদাহরণ মিলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য এখানেও ভিন্নমত ছিল। যেমন ছিল বিচক্ষণ রাজনীতিকদের মধ্যে, তেমনি বুদ্ধিজীবী বা সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে। এরা ভবানী পূজা, শিবাজী উৎসব ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছেন বা মতামত প্রকাশ করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ধীরস্থির শান্তপ্রকৃতির পণ্ডিত এসব 'অতীত অনুরাগ ব্যাধি বিশেষ' হিসেবে বিবেচনা করেছেন (প্রবাসী ১৯০৬ খ্রি.)। আর রবীন্দ্রনাথ এসব কারণে শেষ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন।

দুই

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন যেভাবে জাতীয়তাবাদী স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয় বয়কট, বিদেশি দ্রব্য বর্জনে (বিশেষ করে কাপড়) তেমনি ধর্মীয় সংস্কৃতির সংযোজনে তাতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজও রোপিত হয়েছিল একের পর এক ঘটনা তার কারণ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাথমিক আবেগশেষে দুটো নেতিবাচক উপকরণের বিবেচনা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এতে ছিল শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির স্বার্থের প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং দেশের বহু কোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান।' কিন্তু সেদিকে কংগ্রেসের নজর ছিল না।

দ্বিতীয়ত এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মীয় সংস্কৃতির আরোপ হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটায়, যা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক অবাঞ্ছিত ঘটনা বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ তৈরি করে। বিলেতি বর্জনের নামে সস্তা বিদেশি কাপড়ের বদলে চড়া দামে দেশি কাপড় কেনার জবরদস্তি গরিব মুসলমান মানতে চায়নি। আন্দোলনের সুযোগে দেশি মিলমালিকদের কাপড়ের দাম বাড়ানো মুনাফাবাজি এবং তা নিয়ে স্বদেশীকর্মীদের বাড়াবাড়ির ঘটনায় ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ আপত্তি জানান এবং স্বদেশী নেতাকর্মীদের সতর্ক করে দেন। এ উপলক্ষে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সংঘাত রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা সত্যে পরিণত করে। এসব বোঝার মতো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কংগ্রেস নেতাদের ছিল না। অথবা তারা বুঝতে চান নি।

তাছাড়া পেছনে সক্রিয় ছিল সাম্প্রদায়িক প্রচার। তাই সাম্প্রদায়িক ঐক্য নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয় দুবছরের মধ্যে সে আবেগে ভাটা পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বোক্ত ভ্রান্তি, উঠতি মুসলমান মধ্যশ্রেণীর নয়া প্রদেশে সুযোগ-সুবিধার প্রতি আকর্ষণ, শাসকশ্রেণির প্রচার পূর্ববাংলায় হাওয়া পাল্টে দিতে সাহায্য করে। সবকিছু মিলে এক কথায় স্বদেশী আন্দোলন তার ভবিষ্যৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভাবনার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। বরং বঙ্গভঙ্গ রদের সুফল ঘরে উঠেছে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির বিনিময়ে। দেখা গেছে 'মুসলিম বিচ্ছিন্নতার দ্রুতবৃদ্ধি' (সরকার)।

১৯০৫ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু ঘটনা যেন ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতি নির্ধারণে নিয়তির রূপ নিয়ে দেখা দেয়। পূর্বোক্ত ইঙ্গিত কিছুটা স্পষ্ট করে বলা দরকার। এ আন্দোলনের প্রেরণায় যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের জন্ম, সেখানেও জাতীয়তাবাদের মতোই ধর্মীয় সংস্কৃতি যথেষ্ট প্রভাব রাখে। একজন স্বনামখ্যাত বিপ্লবীর মতে ধর্মীয় চেতনাপ্রভাবিত এসব আন্দোলন 'মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখতে বা বৈরী হতে সাহায্য করেছিল। গীতা আনন্দমঠ ইত্যাদিসহ ধর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপের কারণে নেতিবাচক ফল দেখা দেয়' (হেমচন্দ্র কানুনগো)।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সরকারি উদ্যোগে অভিজাত ভূস্বামী ও উচ্চমধ্যবিত্ত মুসলমানদের নিয়ে স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনীতির বিকাশ ঘটাতে ঢাকায় ১৯০৬ সালে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠন। এর প্রধান কারিগর যেমন ঢাকাই নবাব সলিমুল্লাহ এবং আগা খানের মতো উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি, তেমনি এর নেপথ্য নায়ক ব্রিটিশরাজ। রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিছুসংখ্যক মধ্যবিত্তও এ সংগঠনে যোগ দেন। প্রসঙ্গটি পূর্বে উল্লেখিত।

'রাজ'পক্ষে এ পদক্ষেপের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের লাগাম টেনে ধরা, মূল উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে কংগ্রেস রাজনীতির বিরুদ্ধে স্থায়ী সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষ তৈরি করা। তাদের শেষোক্ত উদ্দেশ্য ভালোভাবেই সিদ্ধ হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিদ্বেষ ও তিক্ততায় পর্যবসিত হয়ে শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগ নিশ্চিত করে। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগ ১৯৪৭ সালে অবাঞ্ছিত পরিবেশে সম্পন্ন হয়– অবশ্য ভারত বিভাজনের পটভূমিতে।

এই সময়পর্বের তৃতীয় ঘটনাটি আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং তা শুধু বঙ্গের জন্যই নয়, সর্বভারতীয় রাজনীতির জন্য, তার গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য। তা হলো বহু আলোচিত মর্লি-মিন্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রস্তাব (১৯০৯)। মূলত হিন্দু-মুসলমান রাজনীতি ও তাদের ভবিষ্যৎ পৃথক করার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত এ প্রস্তাব বিভাজনের প্রাথমিক ভিত তৈরিতে সাহায্য করে। এই ধারায় এক দশক পর একই উদ্দেশ্য জোরদার করতে মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাব (১৯১৯) এবং পরবর্তী অনুরূপ প্রস্তাবাদি যা প্রসঙ্গক্রমে ইতঃপূর্বে উল্লেখিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে বড় বিভাজক অস্ত্রটি ছিল হিন্দু-মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন যা ওদের যাত্রাপথ ভিন্ন করে দেয়। শুধু সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেনি 'রাজ' সরকার। এ তিনটি ঘটনাই ভারতীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ রচনায় একসূত্রে গাঁথা। স্বভাবতই একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ভাবতেই পারেন যে এই বিভাজক-ভিত তৈরির প্রেক্ষাপটে এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলনের বিবেচনায় সুচতুর রাজসরকার ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে। উস্কে দেয় মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়ার আগুন বা দাহ। ইংরেজ রাজনীতির ধূর্ত খেলা! তাই রাজনীতির এ সময়পর্বটি সুসময়ের চেয়ে আসলে দুঃসময়েরই ছিল, বিশেষ করে এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায়। শীলা সেনের মতে, 'বঙ্গভঙ্গের কারণে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে টেনশন তৈরি হয়।' কিন্তু জাতীয়তাবাদী রাজনীতি আপাত-প্রাপ্তির আনন্দে এই খেলা বুঝতে পারেনি। বা তাতে গুরুত্ব আরোপ করে নি।

এ উপলক্ষে বঙ্গীয় রাজনীতিতে মুসলমান, মূলত পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজের চোখে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নভিত্তিক রাজনৈতিক চেতনার গুরুত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাদের চিন্তা ও তৎপরতা দুই-ই স্বতন্ত্র পথ ধরে চলায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতাবোধের পেছনে যুক্তি তৈরি হয় এবং তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতে, এ বিচ্ছিন্নতাবোধ অপ্রাপ্তি ও হতাশা থেকে তৈরি। তৈরি শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণির আচরণে যারা 'সুদিনে-দুর্দিনে মুসলমানদের ছায়া মাড়ানোর কথা ভাবেননি।' এবং তা যেমন সামাজিক তেমনি রাজনৈতিক পরিসরে। আগেই বলা হয়েছে কবির বক্তব্যে নিহিত বিচক্ষণতা জাতীয়তাবাদী বা বিপ্লববাদী রাজনীতিতে উপস্থিত ছিল না। প্রসঙ্গত ১৯০৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে (পাবনায়) সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তব্য স্মরণযোগ্য। উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি যে এ বিষয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা তার পরামর্শ মাথায় নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

একালের বহু পরিচিত শাহবাগে (তখন ঢাকাই নবাবদের অধীনস্থ এলাকা) নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়ে শিক্ষাবিষয়ক যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারা যায় রক্ষণশীলদের পাশাপাশি কিছুসংখ্যক ভিন্নচেতনার তরুণ ও বয়সী রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে। যেমন বরিশালের তরুণ রাজনীতিক একে ফজলুল হক কিংবা উদারপন্থী অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতা হাকিম আজমল খান এবং অনুরূপ আরো কয়েকজনের উপস্থিতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখযোগ্য। এরা ভবিষ্যতেও নিজ নিজ বলয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বা উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিকাশের পক্ষে কাজ করেছেন, সফলতা-ব্যর্থতা সেক্ষেত্রে যতটা বিবেচ্য তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাদের প্রচেষ্টা।

আবারো বলতে হয় বঙ্গভঙ্গবিরোধী ব্যাপক আন্দোলনের সাফল্যে মুগ্ধ কংগ্রেস বঙ্গ ও ভারতে মুসলিম রাজনীতির পটপরিবর্তনের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করেনি। এমনকি মুসলিম লীগের প্রাথমিক চরিত্র (কিছুটা প্রাথমিক পর্বের কংগ্রেসের মতোই) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বুঝে নিয়ে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের বিচক্ষণতা দেখাতে পারেনি জাতীয় কংগ্রেস। শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় অগ্রসর জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে বিচক্ষণতা প্রত্যাশিত বলেই সমালোচনামূলক এ মন্তব্য যা প্রকৃতপক্ষে অন্ধ বা একপেশে সমালোচনা নয়।

তিন

ডিসেম্বর ৩০, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ। স্থান ঢাকার শাহবাগ। মনে রাখতে হবে বিশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক আত্মচেতনার প্রকাশ যে বিশেষ স্তরে পৌঁছায় তা পরে দশকে দশকে বিকশিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্বের কিছুটা উদারনৈতিক ও আপসবাদী চরিত্র পরে ক্রমশ সম্প্রদায়বাদী তিক্ততা ও তীব্রতায় হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। শাহবাগে অনুষ্ঠিত ওই মুসলিম সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন নবাব সলিমুল্লাহ, তাতে সমর্থন জ্ঞাপন করেন স্বনামখ্যাত রাজনীতিক হাকিম আজমল খান (শীলা সেন : মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, ১৯৭৬)।

এ প্রস্তাবের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের বিশ্বস্ততার প্রকাশ, তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ এবং প্রয়োজন ও প্রত্যাশা সংরক্ষণ ও তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপতা-বিদ্বেষ উদ্ভবের প্রতিরোধ। শেষোক্ত সূত্রটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের হলেও তা শর্তহীন ছিল না। এবং পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ শেষোক্ত সূত্রটি থেকে সরে গিয়েছিল সম্প্রদায়বাদী চেতনার টানে।

এমনকি ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের ক্ষুব্ধ ও হতাশ নেতৃত্ব পূর্বোক্ত চেতনা ধরে রাখতে পারেনি। এমনকি পারেনি স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায়। মুসলমান– প্রধান পূর্ববঙ্গে ১৯০৭ সাল থেকে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তার প্রমাণ। আর বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তাদের ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটে নানাভাবে। ঘটে ১৯১২ সনের ফেব্রুয়ারিতে কার্জন সাহেবের কাছে সোহরাওয়ার্দীর লেখা চিঠিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রভাব পড়ে সর্বভারতীয় মুসলমানের চিন্তায়, বিশেষ করে রাজনীতিমনস্কদের ক্ষেত্রে। তাই ১৯২০ সালের নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নাগপুর অধিবেশনে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতিতে অধিকতর সংখ্যায় অংশগ্রহণ ও স্বনির্ভরতার আহ্বান জানানো হয়। মুসলিম রাজনীতির সূচনাসূত্র হয়ে ওঠে বঙ্গদেশ, পূর্ববাংলা। দুবছর পর মুসলিম লীগের কলকাতা অধিবেশনে পূর্বোক্ত ক্ষোভের প্রকাশ আরো স্পষ্ট। মুসলমান শিক্ষিতশ্রেণির নানান দাবি মূলত তরুণদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। এদের নেতৃত্ব দেন ফজলুল হক। জোর পায়ে হাঁটতে থাকে বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত-শ্রেণির আত্মসচেতনতার ধারা।

চার

বঙ্গীয় ও ভারতীয় মুসলমান মানসের সংক্ষুব্ধ চেতনার উপশম ঘটাতে হোক বা সেই সঙ্গে শাসকদের ভেদনীতির কৌশল বাস্তবায়নের প্রয়োজনে হোক বঙ্গসহ ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা উপহার দিতে মর্লি-মিন্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রস্তাবে ধর্মসম্প্রদায়ভিত্তিক স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন নিশ্চিত করা হয়। এ সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে। তবে বিষয়টি ভারতীয় রাজনীতির জন্য এতই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে এ সম্বন্ধে হডসন তার বিশাল গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তার মূল কথা হলো :

'ভালো বা মন্দ যা-ই হোক পাশার দান পড়ে গেছে। ভারতীয় সংবিধানে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হলো যা ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অধিকাংশ হিন্দু রাজনৈতিক নেতা ও লেখক এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান অনেকে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে সম্প্রদায়বাদী নির্বাচন পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করেন। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিভেদ রাজনীতিতে পাকাপোক্ত করা এবং মুসলমান সমাজে সমন্বিত জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদী সংগঠনের উদ্ভব ব্যাহত করা এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে ধর্মের প্রাধান্য বজায় থাকে।'

হডসন স্বীকার করেছেন যে, এই সমালোচনায় বাস্তবতা রয়েছে। কারণ স্বতন্ত্র নির্বাচনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরনির্ভরতার অবসান ঘটবে। রাজনীতিতে তাদের চলার পথ শুধু ভিন্নই হবে না, সম্প্রদায়বাদী চরিত্রের প্রতিযোগিতা প্রধান হয়ে উঠবে যা ক্রমে সহাবস্থানের পারস্পরিকতা ব্যাহত করবে। আর সেখানে যদি তুখোড় তৃতীয় শক্তির স্বার্থ ও ভূমিকা থাকে তাহলে কথাই নেই। এখন তারা কোনো না কোনো পক্ষকে দাবার ঘুঁটি বা কখনো তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশরাজ তেমন কাজই করেছে এবং কখনো কখনো রাজনীতির ময়দানটিকে কুরুক্ষেত্রে পরিণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। হিন্দু-মুসলমান যেন সেখানে কুরু-পান্ডবের প্রতীক, আর যুদ্ধের ভাগ্য নিয়ন্তা স্বয়ং কৃষ্ণঠাকুরের শ্বেতাঙ্গ অবতার ইংরেজ শাসক।

আমার বিবেচনায় পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জন্য যুক্তিসঙ্গত সংরক্ষণ ব্যবস্থাই যথেষ্ট ছিল। যেমনটা প্রায় দশক দুই পরে চেষ্টা করেছিলেন স্বরাজ্য দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ। একই কথা বলেছিলেন রাজনীতিমনস্ক রবীন্দ্রনাথ। যা-ই হোক পূর্বোক্ত বিষয়ে ইংরেজ আমলা হডসন 'রাজ' ভূমিকা পর্যালোচনায় নির্মোহ বা নিরপেক্ষ হতে পারেননি। 'ব্রিটিশরাজ' হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শাসকস্বার্থে কাজে লাগিয়ে থাকলেও তারা তা তৈরি করে নি, বলেছেন হডসন। কথাটা অর্ধেক সত্য। যেটুকু ভেদ স্বাভাবিক তা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে ক্রমাগত কাজ করেছে 'রাজ' সরকার। আর সব বাদ দিলেও পৃথক নির্বাচন তার বড় প্রমাণ। বিভাজনের হাতিয়ার কিছুতেই কখনই হাতছাড়া করেনি 'রাজ'।

হডসন তার লেখায় এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, ব্রিটিশরাজের পক্ষে সাম্রাজ্য চালনার প্রয়োজনে দরকার ছিল নিজস্ব গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান দাবি প্রতিহত করতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের মতো একাধিক সুবিধা দিয়ে তাদের সরকার পক্ষে আনার। 'রাজ' শাসন তাই করেছে। এতে 'মন্দ খেলার' কিছুই নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সামনে রেখে দুই সম্প্রদায়কে পরস্পর বিরোধিতায় নামিয়ে দেয়া 'ভালো খেলার' উদাহরণ হিসেবে মেনে নেয়া যায় না। অনৈতিক 'মন্দ খেলাটাই' তারা খেলেছে।

অবশ্য এ বিষয়ে তার শেষ কথায় থলের বিড়াল বেরিয়ে এসেছে। তিনি বলেছেন, ভারতে ইংরেজ শাসকগণ ছিলেন বাস্তববাদী। তারা যদি ভারতীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে কাজে লাগিয়ে থাকেন তাহলে সে কাজের পেছনে যুক্তি আছে, তাতে আপত্তির সুযোগ কোথায়। আসলে এটাই ভারতে ইংরেজ শাসন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু এ সত্য ভারতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব– কী হিন্দু কী মুসলমান বুঝেও বোঝেনি। বরং দ্বন্দ্বটিকে তারা বাড়িয়ে তুলেছেন এবং তা টেনে নিয়ে গেছেন বিভাজনের ঘটনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

মনে রখতে হবে বঙ্গভঙ্গ এবং এর বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্দোলনের দ্বিপাক্ষিক জটিলতা, শাসকশ্রেণির দান-প্রতিদান, বঙ্গে সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব ও বিশ্বপরিস্থিতি– এসব কিছু মিলে বঙ্গভঙ্গ-সংশ্লিষ্ট সময় বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ফলাফলের জন্ম দেয় যা ছিল বিচিত্র চরিত্রের। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই দিকই ছিল। তবে সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের অনিবার্য টানে কংগ্রেস-লীগ কিছুকালের জন্য পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে, আসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। পরবর্তীকালের ঘটনাবলীও একই চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছে– এক কথায় ঐক্য ও অনৈক্যের ধারাবাহিক প্রকাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গভঙ্গ রদ থেকে মন্টফোর্ড প্রস্তাব : রাজনীতির নৈরাজ্য

বঙ্গভঙ্গ তো রদ হলো। কিন্তু এর উত্তেজক প্রভাব তৈরি করে রকমারি চরিত্রের রাজনৈতিক ঢেউ। একদিকে ওই আন্দোলনের প্রভাবে জাতীয়তাবাদী ধারার পাশাপাশি স্বাধীনতা আদায়ের দৃঢ় পণ নিয়ে দেখা দেয় বিপ্লবী গোষ্ঠী ও তাদের তৎপরতা। তাদের আদর্শে ধর্মীয় সংস্কৃতির লেবেল আঁটা। অন্যদিকে উচ্চবর্গীয় ও মধ্যসারির মুসলমান শিক্ষিতশ্রেণিতে আর্থ-রাজনৈতিক আত্মসচেতনতা এবং কিছুটা স্বতন্ত্র আইডেনটিটিরও উদ্ভাস। কিছুটা স্ববিরোধিতার প্রকাশ জাতীয়তাবাদী নামে পরিচিত মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যেও। অর্থাৎ রাজনৈতিক অসাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনারও প্রকাশ।

এই প্রকাশ যেমন বাংলায় বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় বৃহত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় চেতনার রাজনীতি ঘিরে। এদিক থেকে হিন্দু র‍্যাডিক্যাল ও মুসলিম র‍্যাডিক্যাল মোটামুটি একই চরিত্রের, অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে। যেমন হাকিম আজমল খান ও হসরত মোহানীর মতো দুই জাতীয়তাবাদী (কংগ্রেসী) তেমনি আলী ভ্রাতা নামে বহু পরিচিত রাজনীতিক মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী। এদের সঙ্গে কিছুটা চারিত্র্য মিল রয়েছে বাংলার তৃণমূল প্রতিনিধি রাজনীতিক এ কে ফজলুল হকের। হকের রাজনীতিতে ধর্মীয় গোঁড়ামি কখনো ছিল না। ছিল পিছিয়ে পড়া বঙ্গীয় মুসলমানের উন্নয়ন চেষ্টা এবং তা বাঙালিত্বসহ।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে মুসলিম লীগের প্রবীণ নেতৃত্ব ১৯১২ সাল নাগাদ পিছু হটে। অপেক্ষাকৃত নবীনদের বাদে যারা মুসলিম রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, হসরত মোহানী প্রমুখ। এদের সঙ্গে বঙ্গের তরুণ নেতা ফজলুল হকের নামও লক্ষ্য করার মতো। শেষোক্তজন সম্পর্কে সুমিত সরকারের মন্তব্য : 'বাংলার ফজলুল হক এক উদীয়মান তরুণ আইনজীবী, ৫০ বছর ধরে যিনি পরিশীলিত রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে খাঁটি গ্রামীণ গণআবেদনকে মেলাবেন।...

আর বয়স্কদের প্রসঙ্গে তার মতে 'এদের সামাজিক বিন্যাস ছিল র‍্যাডিক্যাল হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মতো। 'সর্বইসলামী (প্যানইসলামী) ও ব্রিটিশ-বিরোধী সুরের জন্য মোহাম্মদ আলীর 'কমরেড' (কলকাতা), আবুল কালাম আজাদের 'আল হিলাল' (কলকাতা) বা জাফর আলী খানের 'জমিনদার' (লাহোর)-এর মতো পত্রিকা পুলিশের নজরে এলো।... বলকান যুদ্ধে তুর্কিকে সাহায্য করার জন্য ১৯১২-১৩-য় এক চিকিৎসকদল নিয়ে গেলেন ডা. আনসারি ও জাফর আলী খান।

'মুসলিম লীগের নতুন সচিব ওয়াজির হাসান মার্চ ১৯১৩-য় একটি প্রস্তাব পাস করান। তাতে বলা হয় লীগের লক্ষ্য হলো সাংবিধানিক উপায়ে ঔপনিবেশিক স্বশাসন। এভাবেই সেটি কংগ্রেসের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা হলো। খিলাফত আন্দোলন ও সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সহযোগিতার প্রস্তুতি চলেছিল এভাবে' (প্রাগুক্ত)। আমার মনে হয় এ পর্বে উভয় পক্ষে ধর্মীয় উপাদান প্রধান প্রেক্ষাপট হয়ে থাকার কারণে ঐক্য স্থায়ী হয়নি। ধর্মীয় চেতনা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সহায়ক নয়।

ধর্মকে আদর্শগত কেন্দ্রে রেখে বিদেশি শাসন-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ লড়াই যত আন্তরিকই হোক শেষ লক্ষ্যে সর্বদা সুফল দেয় না। তার পয়লা নম্বর উদাহরণ কংগ্রেস-খিলাফত ঐক্যে ভাঙন। অথচ কী আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়ে ব্রিটেন ও তুরস্কের বিবাদ উপলক্ষে গড়ে ওঠে "হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও সর্বইসলামবাদী জঙ্গী মুসলমানদের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা। দেখা দিলেন 'গদর'-এর বরকাতুল্লা এবং দেওবন্দ মোল্লা মাহমুদ হাসান ও ওবেইদুল্লা সিন্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান বিপ্লবী নেতা" (সরকার)।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু। ভারত ভূখণ্ড থেকে ইংরেজ সৈন্যের একটা বড় অংশ সরাতে হয় ব্রিটিশরাজকে। এ সুযোগে ভারতে বিপ্লবী তৎপরতা বেড়ে যায়। বঙ্গীয় ও পাঞ্জাবি বিপ্লবীদের উত্তেজনা বাড়ে। বিদেশভূমিতেও দেখা দেয় ভারতীয় বিপ্লবীদের তৎপরতা। জার্মান বৈদেশিক দফতরের সহযোগিতায় ভর করে তৈরি হয় ১৯১৫ সালে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতি'। ডিসেম্বর ১৯১৫ কাবুলে স্বাধীন ভারতের অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকাতুল্লা ও ওবেইদুল্লা সিন্ধি। তারা সমর্থন পেয়েছিলেন আফগান বাদশাজাদা আমানুল্লাহর।' এসব কর্মকাণ্ডের নায়ক বাংলা ও পাঞ্জাব ভূখণ্ড। এখানে দেখা গেল সাম্প্রদায়িক ঐক্য।

দুই

এ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতা ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে। ১৯১৫ সালে ফজলুল হক বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারি এবং লীগের উদারনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশের নেতা। এ সময় ফজলুল হক ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি যথাক্রমে লীগ ও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন যাতে উভয় সংগঠন মিলে যৌথ রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে দুই সংগঠনই তৎপর হয়ে ওঠে (১৯১৫)।

শেষ পর্যন্ত অনেক আলোচনার পর কংগ্রেস-লীগ যৌথভাবে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তা ওই দুই দলেরই লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে গৃহীত হয় (১৯১৬) যা লখনৌ চুক্তি নামে পরিচিত। মুসলিম লীগের ওই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আলী জিন্না। সেখানে বঙ্গীয় নেতা আবদুর রসুল ওই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা সমর্থন করেন আরেক বঙ্গীয় তৃণমূল নেতা ফজলুল হক। উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধ চলাকালে সরকার চরম দমননীতি চালায়। এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মাওলানা আজাদ ও হসরত মোহানীকে অন্তরীণ করে রাখা হয়।

তখন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে উদারপন্থীদের প্রাধান্য। লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের ভিত্তি রাজনৈতিক বিচারে নরমপন্থীদের ঐক্যবোধ। যুদ্ধে সরকারের প্রতি সহযোগিতা, বিনিময়ে যুদ্ধশেষে স্বরাজ। অন্যদিকে লীগ-কংগ্রেসের এই দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত মুসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশে (যেমন যুক্তপ্রদেশ) অধিক সংখ্যক মুসলমান আসনের প্রতিনিধিত্ব– পরিবর্তে মুসলমানপ্রধান প্রদেশে হিন্দুদের অধিক আসন (যেমন বঙ্গে মুসলমানদের জন্য মাত্র ৪০ শতাংশ আসন বরাদ্দ)। আসলে এটা করা হয় যুক্তপ্রদেশের মুসলিম স্বার্থে। বলি দেয়া হয় বঙ্গে মুসলিম স্বার্থ এবং তা মুসলিম লীগ নেতাদের উদ্যোগে।

এতে বঙ্গে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে মুসলমান নেতাদের একাংশে অসন্তোষ দেখা দেয়। ঢাকার নবাবের অনুসারী নেতৃবৃন্দ, ময়মনসিংহের জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। অন্যদিকে ফজলুল প্রমুখ নেতা চুক্তির পক্ষে, মূলত ঐক্যমঞ্চ গঠনের স্বার্থে। এবং সে সূত্রে স্বশাসনের স্বার্থে। তবে লক্ষ্ণৌ চুক্তিরও নেতিবাচক দিক ছিল স্বতন্ত্র নির্বাচন মেনে নেয়া। তারা তাৎক্ষণিক স্বার্থে স্বতন্ত্র নির্বাচনের সাম্প্রদায়িক দিকটা উপেক্ষা করেছেন যা আদৌ ঠিক ছিল না।

একইভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের স্বার্থে তারা খিলাফত আন্দোলনের নেতিবাচক তথা প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রও বিবেচনায় আনেননি। খলিফাতন্ত্র ও তুর্কি সুলতানাত উদ্ধার যে প্রগতিশীলতার ধারক-বাহক নয় এ সত্য মাওলানা আজাদ, ডা. আনসারি বা মোহাম্মদ আলীর মতো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতাদের উপলব্ধিতে আসেনি। ইসলাম ও ধর্মীয় সংস্কৃতির বিষয়টিই তাদের চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তেমনি বিষয়টি অন্য কংগ্রেস নেতারাও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে দেখেননি। এটা এক ধরনের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় রাজনীতিতে নানামাত্রিক উপাদান যোগ করে তাতে স্ববিরোধিতার চরিত্র আরোপ করেছিল। যেমনটা দেখা যাবে বেশি করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে। পূর্বোক্ত পর্বের বৈশিষ্ট্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার চেষ্টায় বিপ্লবী তৎপরতা বৃদ্ধি, জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারায় নরমপন্থা ও চরমপন্থার সক্রিয় রূপ ও গান্ধি রাজনীতির সূচনা, অন্যদিকে শাসকরাজ-এর চরম দমননীতি।

শেষোক্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভারত রক্ষা আইনের (১৯১৫) নির্মম প্রয়োগ যা আরো পরে দেখা যাবে কুখ্যাত রাওলাট আইনে। তবে যুদ্ধের উপলক্ষে নিরাপত্তার যুক্তি দেখিয়ে যে ধরনের ব্যাপক নির্যাতন, নিপীড়ন ও শাস্তির ব্যবস্থা চলে তাতে দেখা যায় খুব অল্প সময়েই বাংলা ও পাঞ্জাবে বহু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীর কঠিন সাজা হয় বিশেষ আদালতে। বিনাবিচারে আটকের সংখ্যা আগুনতি। শুধু গদর বিপ্লবীদের তালিকায় দেখা যায় '৪৬ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ৬৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' (সরকার, প্রাগুক্ত)। বিস্তারিত ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যাবে বিপুল সংখ্যকের শাস্তি– ফাঁসি, আন্দামান কারাদণ্ড, অন্তরীণ ইত্যাদি ঘটনা।

তবে ওই যে বলা হয়েছে নরমপন্থা-চরমপন্থার কথা তাতে নরমপন্থী নেতাদের দেখা যায় রাজপক্ষের সমর্থনে যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে, যুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বা যোদ্ধা সংগ্রহ করতে। এদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম নেতা এম.কে. গান্ধি। এদের প্রত্যাশা ছিল এ জাতীয় সেবার বদলে যুদ্ধশেষে রাজনৈতিক ইনাম পাওয়ার– তা হোমরুল বা স্বরাজ বা অধিকতর শাসনক্ষমতার অংশীদারিত্ব—যা-ই হোক না কেন। কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি– সেসব পরের কথা।

সম্ভবত সময় বিচার করেই পরিস্থিতি সুবিধাজনক ভেবে তিলক ও অ্যানি বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনের সূচনা (১৯১৬)। বেসান্তের কর্মকাণ্ডের পেছনে ছিল তার ব্যক্তিগত ভাববাদী চিন্তাধারা ও উপরতলীয় আবেগ যা কিছু সময় পরেই মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাবের টানে ভেসে যায়। রাজবিরোধী আন্দোলনের বিচিত্র ধারায় নানামাত্রিক নেতৃত্বের পারস্পরিক বিরোধিতায় এম.কে. গান্ধির ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব (১৯১৫)। গান্ধি গোটা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে ক্রমে একটি বিশেষ ধারায় (অহিংস প্রতিবাদে) সংহত করেন যা ভারতীয়, বঙ্গীয় রাজনীতির জন্য স্বাদেশিকতার বিচারে শুভ পরিণামদায়ক হয়নি। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার। তবে এটুকু বলা দরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে চরকা খাদি সত্যাগ্রহ ও অহিংসানীতি সাম্রাজ্যবাদী শাসক শক্তিকে উৎখাতের পন্থা ছিল না। সেজন্য দরকার ছিল শক্তির প্রয়োগে মুক্তি সংগ্রাম ও গণবিদ্রোহ। সমঝোতায় ক্ষমতাপ্রাপ্তি বা ক্ষমতা হস্তান্তরের নমুনা তো রক্তরঞ্জিত সাতচল্লিশের আগস্ট।

১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলন থেকে ১৯১৯-এর সংস্কারপূর্ব সময় পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতি বিচিত্র আন্দোলনে স্পন্দিত। 'ভদ্রলোক'শ্রেণির আন্দোলনের (জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী) বাইরে কৃষক আন্দোলন, জাতপাতের আন্দোলন, উপরিস্তরে সম্প্রদায়গত ঐক্য, আবার কখনো সাম্প্রদায়িক সংঘাত, ভূস্বামী-বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় নানা স্রোতের সৃষ্টি করেছে যা কখনো পরস্পরবিরোধী। স্বভাবত সবকিছু মিলে শাসক-বিরোধী সংহত চরিত্রের আন্দোলন বা লড়াই গড়ে ওঠেনি। কিছু ঘটনা জনস্তরে সাম্প্রদায়িক সংঘাতেরও জন্ম দিয়েছে। তেমনি দেখা গেছে পূর্ববঙ্গে গরিব মুসলমান চাষীদের (সঙ্গে নিম্নবর্গীয় হিন্দু) হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জমিদারবাড়ি আক্রমণ (মহাজনসহ) অন্যদিকে বিহারে হিন্দুজনতার মুসলমান নিবাস ধ্বংস করা, বিষয় অবশ্য গোরক্ষা (১৯১৭)। আবার ১৯১৮ সালে কলকাতায় মাড়োয়ারি ব্যবসাপত্রিতে দরিদ্র মুসলমান জনতার আক্রমণ শ্রেণীগত হয়েও সম্প্রদায়বাদী। ক্ষেত্রবিশেষে এসবের জন্য কেউ কেউ হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসের ভুলভ্রান্তিকে দায়ী করেছেন (সরকার)। দায় মুসলিম রক্ষণশীল মোল্লা মৌলভী বা রাজনীতিকেরও ছিল।

AMARBOI.COM

তিন

যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে অর্থনৈতিক পীড়ন, শাসন-শোষণ, রাজনৈতিক নির্যাতন, অন্যদিকে শিল্পপতিদের সীমাহীন মুনাফাবাজির প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় সমাজের নিম্নস্তরে অসন্তোষ, ক্ষোভ, কোনো কোনো স্তরে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ এক ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। এর মধ্যে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দেখা দেয় বিপ্লবী তৎপরতা বন্ধ করতে কুখ্যাত রাওলাট কমিটির প্রতিবেদন এবং পরে যা আইন হিসেবে গৃহীত হয় (মার্চ, ১৯১৯)।

এই বিচিত্র সময়পর্বে একাধিক ধর্মবিশ্বাসী এবং বহু ভাষা ও সংস্কৃতির ছোট ছোট ভূখণ্ড নানাভাবে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটায়। তাতে ঐক্য বা সংহতির চেয়ে অনৈক্য বা বিচ্ছিন্ন বৈচিত্র্যের প্রকাশ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলন ছিল মূলত ভূখণ্ডভিত্তিক। জাতীয়তার চেতনা সেখানে অগ্রচারীর ভূমিকা পালন করলেও তা পুরোপুরি ধর্মনিপেক্ষ ও শ্রেণী-নিরপেক্ষ ছিল না। অবশ্য সাহিত্য-সংস্কৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাব সেখানে ছিল, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী গানের উদ্দীপনায় সর্বজনীন জাতীয়তার চরিত্র নিয়ে।

বিপ্লববাদী আন্দোলনে যেমন অবাঞ্ছিত প্রভাব রেখেছিল হিন্দুত্বের ধর্মীয় সংস্কৃতি তেমনি তুরস্ককেন্দ্রিক খিলাফত আন্দোলনে ছিল সর্বইসলামিয়াতের (প্যান ইসলামিজম) ধর্মীয়-রাজনীতির প্রভাব। উভয়কেই রাজনৈতিক বিচারে প্রগতিবিরোধী ধারা হিসেবে গণ্য করতে হয়। এ দুটোই বঙ্গকেন্দ্রিক। কিন্তু এ পর্বের কৃষক আন্দোলনগুলোর বিস্তৃতি সর্বভারতীয়। বঙ্গ-বিহার হয়ে দক্ষিণ ভারতে নিম্নবর্গীয় বিদ্রোহ বা আন্দোলন বা উত্থান। এর প্রভাব নানাভাবে পড়েছে সমাজে।

বঙ্গে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অবহেলায় কৃষক বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ সম্প্রদায়গত বিন্যাসের কারণে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত তৈরি করে। দক্ষিণ ভারতে তা যেমন ছিল জাতপাতের তথা বর্ণবাদী তেমনি আবার মালাবারে সম্প্রদায়বাদী। তবে ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের কিছু দাবিও ওঠে দক্ষিণে– যতটা তামিল, তারচেয়ে বেশি তেলেগু ও মালায়লম ভাষা কেন্দ্র করে। যেমন 'সমাজসংস্কার ও দেশপ্রেমের শক্তিশালী বাহন হয়ে উঠেছিল মালায়লম।... ভাষাভিত্তিক রাজ্যের সুস্পষ্ট দাবি তখনো পর্যন্ত উঠেছিল একমাত্র অন্ধ্রেই' (সরকার, প্রাগুক্ত)।

বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গে বাংলাভাষার দাবি নিয়ে যে প্রতিবাদী ঝড় ওঠে ১৯৪৮ থেকে এর অসম্প্রদায়বাদী জাতীয় চেতনার পূর্বসূত্র দেখা যায় কখনো চিত্তরঞ্জন দাসের বা সুভাষ পরিবারের রাজনীতিতে, কখনো রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তব্যে উল্লেখিত সমন্বিত রাজনীতি ও সাহিত্য সাধনার আহ্বানে। কিন্তু লীগ-কংগ্রেস দুই পক্ষ থেকেই সম্প্রদায়বাদী রাজনীতি বঙ্গে ভাষাভিত্তিক রাজনীতির ভাবনা অর্থাৎ ভাষিক জাতিসত্তার রাষ্ট্রভাবনাকে চাপা দিয়েছিল। তবু বিরল সংখ্যক ভাষিক জাতিসত্তাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদের চিন্তায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালিত্বের চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল, সূচনা অবশ্য স্বদেশী আন্দোলন—সংগীতে, রাজপথের প্রতিবাদে। প্রসঙ্গত এস. ওয়াজেদ আলীর 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী' স্মর্তব্য।

সেই ধারায় ঐক্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পরস্পরবিরোধিতার মধ্যেই ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এক বক্তৃতায় বাঙালিত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাস বলেন, 'বাঙালি হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রিস্টান হতে পারেন, কিন্তু বরাবর বাঙালিই থেকে যান' (সরকার)। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানকে এক কাতারে দাঁড় করানোর চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও করেন তার লেখা বা বক্তৃতার মাধ্যমে। তবে ১৯১৫ সালে 'সবুজপত্র' সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলিত ভাষায় সহজ করে বলার যে ভাবনা তিনি প্রকাশ করেন তার মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ তাৎপর্য উপেক্ষা করার মতো নয়। আর চিত্তরঞ্জন ঐক্যের চেষ্টা চালান বিশেষভাবে রাজনীতিতে, ফজলুল হকও ওই পথে চলেন ভিন্নভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা বহুকথিত সূত্র যে সম্প্রদায়বাদী চেতনার প্রভাব ভারত ও বঙ্গের রাজনীতিতে একটি অবাঞ্ছিত বাস্তবতা। ভারতবর্ষ যেহেতু একটি বহুভাষী, বহু জাতি-ভূখণ্ডভিত্তিক একাধিক ধর্মবিশ্বাসী মানুষের বাসস্থান তাই এর সমাজ বিন্যাস ছিল খণ্ডিত, অর্থনীতি-রাজনীতিও ভিন্নচরিত্রের, তাই প্রতিক্রিয়াও ছিল নানাধর্মী। যেমন কৃষকপ্রধান বাঙালি মুসলমানের আর্থসামাজিক অবস্থান উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের থেকে ভিন্ন। তাই তাদের আর্থসামাজিক আকাঙ্ক্ষার চরিত্রও অনেকাংশে ভিন্ন ছিল।

কিন্তু ধর্মীয় পরিচিতি এক ছিল বলে ধর্মীয় রক্ষণশীলদের প্রচার ও রাজনীতিকদের প্রচার সম্প্রদায়বাদিতার একবিন্দুতে মিলে। তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার তুলনায় সাম্প্রদায়িকতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিমান উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। ওই পথেই আর্থ-সামাজিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ সহজ মনে হওয়ায় স্বাদেশিকতার বিষয়টি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থের তুলনায় গৌণ বিবেচিত হয়। স্বদেশ চেতনায় হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ধর্মীয় সংস্কৃতির লেবেলযুক্ত হওয়াও এর আরেকটি কারণ।

তবে মালাবারের মুসলমান মোপলা কৃষক এবং বঙ্গের মুসলমান কৃষকের শ্রেণীগত স্বার্থ ও বিদ্রোহের বা বিক্ষোভের কারণ ভিন্ন ছিল না। কিন্তু পক্ষ-প্রতিপক্ষ ভিন্নধর্মাবলম্বী হওয়া এবং অর্থনৈতিক পীড়নের অন্তত কিছু কারণ ধর্মীয় অনুষঙ্গের হওয়ায় শ্রেণীসংঘাত সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আপাত-রূপ নেয় যদিও সংঘাতের মূল কারণ শ্রেণীস্বার্থনির্ভর। রাজনীতির চরিত্র এভাবে জটিল ও মিশ্র ধরনের হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বজনীন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। স্বাধীনতার চেয়ে কখনো সম্প্রদায়গত উন্নয়ন ভাবনা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

AMARBOI.COM

চার

এই সময়পর্বে বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের রাজনৈতিক অসন্তোষ ইত্যাদি বিবেচনা করেই উপশমক ব্যবস্থা হিসেবে ভারতের জন্য কিছু রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাভিত্তিক সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব আনা হয় ব্রিটিশরাজের পক্ষ থেকে। এ প্রস্তাব 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড' সংক্ষেপে 'মন্টফোর্ড' সংস্কার হিসেবে পরিচিত যা এ সময়কার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এতে বলা হয় যে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভারতে একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠনের লক্ষ্যে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবিকাশ ঘটানোর চেষ্টা চলবে।' এক্ষেত্রে 'সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ' কথাটা মনে রাখা দরকার।

কমন্সসভায় ১৯১৭ সালে ভারতসচিব মন্টেগুর ঘোষণার পর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এ প্রস্তাব আইন হিসেবে গৃহীত হয়। দেশীয়দের জন্য কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধার প্রসার, ভারতীয় সুতিবস্ত্রের ওপর উৎপাদন শুল্ক ছাড়, কুলি রফতানি ব্যাপারে নমনীয়তা ইত্যাদি নানাদিক থেকে এ আইন নরমপন্থী রাজনীতিকদের জন্য আকর্ষণীয় মনে হয়। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল পৃথক নির্বাচন, সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো নিয়ে। কিন্তু এদিকে রাজনীতিকদের নজর ছিলনা।

এ নমনীয়তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন মজবুত করা। তারচেয়ে বড় একটি কারণ কারো কারো হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো বলশেভিক বিপ্লবের উত্তাপ থেকে ভারতীয় রাজনীতিকে দূরে রাখার চেষ্টা। তাছাড়া ভারতীয় রাজনীতি যেন তাদের ছককাটা বৃত্তের বাইরে যেতে না পারে। তা সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, এম. কে. গান্ধি, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ নেতা 'সুযোগ-সুবিধার যতটা সদ্ব্যবহার করা যায় তাই ভালো' এই চিন্তা থেকে মন্টফোর্ড ঘোষণা ও প্রণীত আইনের প্রতি সমর্থন জানান। চরমপন্থী কংগ্রেসীরা এটা বর্জন করেন।

ঠিক একই সময়ে বিপরীতধর্মী দুটো ঘটনায় শাসকশ্রেণীর সদিচ্ছার অভাব স্পষ্টই প্রকাশ পায়। যেমন সব রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও আপত্তি উপেক্ষা করে বিপ্লবী তৎপরতা ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে রাওলাট আইন পাস করে ভারত সরকার। ফলে দেশব্যাপী প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। সে উত্তেজনার প্রকাশ স্তব্ধ করতে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ঘটানো হয় বর্বর হত্যাকাণ্ড। সেখানে কয়েকশ নিরস্ত্র মানুষের মৃত্যু, হাজারেরও বেশি আহত। এ সংখ্যা থেকে অনুমান করা যায় উপস্থিত মানুষের সংখ্যা। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে এটাই ছিল বোধহয় সবচেয়ে বড় ধরনের কলঙ্ক যা ভারতবাসীর জন্য সর্বাধিক মর্মবেদনার। অথচ ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা অন্যায় ভাবে ডায়ারকে সমর্থন করে গেছে। কমন্সসভায় সে দৃশ্য দেখে অ্যান্ড্রুজকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের তীব্র ক্ষোভ স্মরণযোগ্য। স্মরণযোগ্য ওই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি ত্যাগ। সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরুন ভারত সফরে এসে এ বিষয়টি উল্লেখ করলেও ডায়ারি বর্বরতার জন্যে ক্ষমা চাওয়ার রাজনৈতিক ঔদার্য দেখাননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতিতে ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত

ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা বা বিশেষ কিছু সুবিধার জন্য রাজনীতির সঙ্গে ধর্মচেতনার মিশ্রণ ঘটানো গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে এক মহা ভুল। এ ভুল ভারতীয় রাজনীতিতে নানাভাবে নানা সময়ে দেখা গেছে। এর পরিণাম শেষ পর্যন্ত এমনই অমানবিক হয়ে দাঁড়ায় যে একে 'পাপ' বলাই বোধহয় সঙ্গত। এর ফলে রাজনীতিতে সুস্থ মানবিক চেতনার বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রাজনীতিতে মজবুত ভিত তৈরি করতে পারেনি। সাম্প্রদায়িকতার 'পাপ' মানবিক চেতনাকে পরাজিত করেছে। আর এটা হয়ে দাঁড়ায় ভারত বিভাগের প্রধান কারণ।

এই রাজনৈতিক বিচ্যুতি, বলা যায় আদর্শগত বিচ্যুতির দায় লীগ-কংগ্রেস বা জিন্না-গান্ধি কারো কম নয়। সম্প্রদায়বাদী রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো তো ঘৃণা-বিদ্বেষের তরবারি হাতে নিয়েই মাঠে নেমেছিল। হিন্দুমহাসভা বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস), পরবর্তীকালের শিবসেনা ও বিজেপি, অন্যদিকে মাদ্রাসা ও আঞ্জুমানে উলেমা ও ধর্মীয় সংগঠনগুলো এবং পরবর্তী মুসলিম লীগ রাজনীতি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এ অবস্থার কারণে মাঝে মধ্যে বয়ে যাওয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সুবাতাস তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারেনি। বিশেষ করে পারেনি শাসকশ্রেণীর চতুর ভেদনীতির কারণে যে কথা বর্তমান আলোচনায় নানা প্রসঙ্গে একাধিকবার বলা হয়েছে। বলেছেন নিরপেক্ষ চেতনার একাধিক লেখক। সেখানে মূল কথা 'সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটিশের দায়িত্ব এক অনস্বীকার্য তথ্য' (সুমিত সরকার, প্রাগুক্ত)। অবশ্য এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমাজ ও রাজনীতিকে অধিক দায়ী বিবেচনা করেছিলেন। চেয়েছিলেন, নিজেদের 'পাপ' যাতে নিজেরা খণ্ডন করি। কিন্তু তা হয়নি।

ধর্মীয় রাজনীতি প্রসঙ্গে কংগ্রেস-খিলাফত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন একাধিক সূত্রে সমালোচনার অবকাশ তৈরি করে ছিল। গান্ধির প্রতি অভিযোগের আঙুল তোলা হয়। অবশ্য সেটা ছিল প্রত্যেকের নিজ নিজ চিন্তা ও সংগঠনগত স্বার্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিপ্রেক্ষিতে। যেমন হিন্দুত্ববাদী নেতা কেএম মুন্সীর সমালোচনার উদ্দেশ্য বুঝতে কষ্ট হয় না। এ ব্যাপারে জিন্নার বিরোধিতার কারণও স্পষ্ট। জিন্না চাননি মুসলিম-রাজনীতিতে কংগ্রেস বা গান্ধি হস্তক্ষেপ করুন। আবার 'হোমরুল' বা স্বরাজ আন্দোলনেরও তিনি সমর্থক ছিলেন না। নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদের বাইরে স্বাধীনতা সংগ্রামেও তার কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি। অবশ্য মুসলিম অধিকার আন্দোলনের কথা আলাদা।

কিন্তু প্রাক-চল্লিশের রাজনৈতিক নেতা জিন্না মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পক্ষে কথা বলে চমক সৃষ্টি করেছেন। তাতে হয়তো সদিচ্ছার অভাব থাকে নি। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে ওইসব ঐক্য প্রচেষ্টার মধ্যেও মুসলিম সম্প্রদায়-স্বার্থের বিষয়টি তার কাছে বড় হয়ে থেকেছে। তার ঐক্য প্রস্তাবগুলোর আগাপাছতলা বিচার করে দেখলে তাই মনে হয়। তিনি যখন সরোজিনী নাইডু কথিত 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত' তখনো তিনি মুসলিম রাজনৈতিক স্বার্থের 'একমাত্র মুখপাত্র' (সোল স্পোক্সম্যান) হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ওটাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। এখানে জিন্নাচেতনার স্ববিরোধিতা স্পষ্ট।

তাতে সৃষ্টি হয়েছে ঐক্যের পথে সমস্যা। কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জিন্না কংগ্রেসের ভেতরে থেকেই ঐক্যের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারতেন। তাতে ওই কাজে তাকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র পথ খোঁজ করতে হতো না। কিন্তু তিনি ওই পথের নিশানা ধরেননি। সম্ভবত কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বে হিন্দু নেতাদের প্রাধান্য তার জন্য বিপরীত বার্তা নিয়ে এসেছিল। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে এ পরিবেশে তার কর্তৃত্ব গুরুত্ব পাবে না। তাই স্বতন্ত্র সংগঠনই বরণীয় মনে হয়েছে, হোক তা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী। তাই কংগ্রেস হয়ে ওঠে তার প্রতিপক্ষ এবং সে হিসেবে রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদী দল।

তাছাড়া নীতিগতভাবেও গান্ধি-কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি অনেক ক্ষেত্রে একমত হতে পারেননি। তাই সব কিছু মিলিয়ে জিন্নার রাজনীতিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সহমর্মিতা বা সহযোগিতার পথ ধরে চলতে পারেনি। তাদের চলার পথ হয়ে ওঠে বিপরীত ধারার। শুধু বৈপরীত্য নয়, সেটা ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ে পরিণত হয়। দুঃখজনক যে, জিন্নার সে লড়াইয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কোনো স্থান ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জিন্না বরাবরই একজন নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারের পক্ষপাতী রাজনীতিক যিনি পরে হয়ে ওঠেন স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলিম রাজনীতির একজন কট্টর প্রবক্তা। অথচ তার নেতৃত্বে লীগ হতে পারতো মুসলিম স্বার্থ নিয়েই অসাম্প্রদায়িক দল। কিন্তু সে চেষ্টা বা চিন্তা তার ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতিক হিসেবে জিন্নার মধ্যে ছিল এক ধরনের প্রচণ্ড স্ববিরোধিতা। যে জিন্না ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তির রূপকার, তিনিই আবার ১৯২০ সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গান্ধির এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনার নীতির সরাসরি বিরোধিতা করেন। অবশ্য গান্ধির এ ঘোষণাও ছিল অবাস্তব। গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের ডাকও তার সমর্থন পায়নি। অন্যদিকে তিনি মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাবেরও সমর্থক ছিলেন না। এমনকি ছিলেন না খিলাফত আন্দোলনের পক্ষে। গান্ধি ওই আন্দোলনে যোগ দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের যে সূচনা ঘটান নীতিগতভাবে জিন্না ছিলেন এর বিরোধী।

আসলে গান্ধি-রাজনীতি কোনোভাবেই জিন্নার পছন্দসই ছিল না। ছিল না যেমন নীতিগত দিক থেকে, তেমনি ব্যক্তিগত অবস্থানের দিক থেকে। গান্ধি-জিন্না দুই গুজরাতি বা কাথিওয়াড়ির মধ্যে পরস্পর বিরোধিতাই যেন তাদের রাজনীতির ভবিতব্য হয়ে ওঠে। তবে ওই যে বলেছি যেমন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তেমনি গান্ধি-বিরোধিতায় কখনো চমক সৃষ্টি করেছেন জিন্না তাতে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সঙ্গে স্ববিরোধিতার প্রকাশও দেখা গেছে।

যেমন কংগ্রেস-খিলাফত ঐক্য সম্বন্ধে জিন্নার গান্ধি বিষয়ক মন্তব্য ছিল রীতিমতো বোমা ফাটানোর মতো চমকপ্রদ। তার ভাষায় 'গান্ধি ভারতীয় জীবনযাত্রা থেকে আপত্তিকর অনেক কিছু এনে রাজনীতিতে প্রধান করে তুলে রাজনীতিকে নষ্ট করেছেন। ধর্ম ও রাজনীতিকে একাকার করা রীতিমতো পাপ যে পাপ গান্ধি করেছেন' (যশবন্ত সিংয়ের উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫)। জিন্নার দুটো মন্তব্যই সঠিক। তবে বিস্ময়কর যে ১৯৪০-এ পৌঁছে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে ওই 'পাপ' জিন্না আরো গভীরভাবে করেছেন। যে পাপের প্রকাশ ঘটে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক রক্তস্নানে।

AMARBOI.COM

ভারতীয় রাজনীতির এ জাতীয় পাপের ব্যাপক প্রভাব হিন্দু-মুসলমান সমাজে গভীরভাবে দাগ কেটেছে, হয়ে উঠেছে ভারতীয় রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ তথা বিচ্ছিন্নতার ভবিতব্য– যে বিচ্ছিন্নতাবোধ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। এর পেছনে আরো ভূমিকা ছিল 'আর্যসমাজী' বা 'গো-রক্ষা সমিতি'র মতো সামাজিক সংগঠনগুলোর। ছিল আঞ্জুমানসহ বিভিন্ন মুসলিম ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনগুলোর অনুরূপ ভূমিকা। এতে বিচ্ছিন্নতাই শুধু বড় হয়ে ওঠেনি, সাম্প্রদায়িক সহিংসতাও বড় হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্মাচরণ থেকে শুরু করে রাজনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্ররোচনায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ইতিহাস থেকে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে হাঙ্গামা, বিহার দাঙ্গা (১৯১৭), অনেকটা এর প্রতিক্রিয়ায় কলকাতা দাঙ্গা (১৯১৮), বেঙ্গল প্যাক্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৬ সালে বঙ্গের একাধিক স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোর ইতিহাস এমন ধারণাই দেয়।

কিন্তু এ বিষয়ে কোনো পক্ষেরই জননেতা বা সমাজ বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতার পরিচয় রাখেনি। রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ঐক্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে চায়নি। তাদের কাছে রাজনৈতিক প্রাপ্তির হিসাবটাই ছিল বড়। সে প্রাপ্তি অনৈক্যের মাধ্যমে হলেও ক্ষতি নেই। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক-বিষয়ক এ ধরনের নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর তৎপরতা স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনাশের পক্ষেই কাজ করেছে। এর অবশেষ পরিণতি দেশবিভাগে।

দুই

বঙ্গদেশসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গার ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মসজিদের সামনে গান-বাজনা এবং ঈদ উপলক্ষে গো-জবাই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অন্যতম কারণ। এছাড়াও রক্ষণশীল হিন্দু সংগঠনগুলোর শুদ্ধি অভিযান এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনা সংঘাতের কারণ। অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জিন্না-হক প্রমুখের লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট বঙ্গীয় মুসলমান নেতৃত্বের একাংশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার পরিণামেও ঘটানো হয় সংঘাত।

জিন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯১৬) বাংলার উদারপন্থী দুই মুসলমান নেতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে মুসলমান-প্রধান দুই প্রদেশ বাংলা ও পাঞ্জাবে সংখ্যালঘুর পক্ষে কিছুটা ছাড় দিয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন (আবদুর রসুল) ও তা সমর্থন (ফজলুল হক) করেন তাতে বঙ্গীয় উচ্চশ্রেণীর মুসলমান নেতৃত্বে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নওয়াব সলিমুল্লাহর উত্তরসূরিগণ এবং ময়মনসিংহের স্বনামখ্যাত জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ ভূস্বামী-রাজনীতিক লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

শেষোক্তদের বক্তব্য– বঙ্গের ৫২.৬ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যার জন্য ৪০ শতাংশ সংসদীয় আসন নির্ধারণ অন্যায় ও অসঙ্গত। যুক্তিসঙ্গত কথা। অন্যদিকে জিন্না-হক-রসুল ও অনান্য উদার বা মধ্যপন্থীর বক্তব্য– সর্বভারতীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে বাংলা ও পাঞ্জাবের এটুকু ত্যাগ গুরুতর কিছু নয়। বিষয়টা সরাসরি জনস্বার্থের ছিল না। ছিল ভূস্বামী, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থের বিষয়। অন্যদিকে এ চুক্তিতে জিন্নার লক্ষ্য ছিল তার নিজপ্রদেশ বোম্বাই ও গুরুত্বপূর্ণ উত্তরপ্রদেশের জন্য কিছু বাড়তি সুবিধা আদায়। আর হক-রসুলদের লক্ষ্য কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও সর্বভারতীয় ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অর্জন ও রক্ষা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কথাটা জন ব্রুমফিল্ডের লেখায় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে ('এলিট কনফ্লিক্ট ইন অ্যা প্লুরাল সোসাইটি : টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল', ১৯৬৮)। বাস্তবিক এ ঘটনা 'এলিট কনফ্লিক্ট' অর্থাৎ 'উচ্চবর্গীয় সংঘাত'ই বটে। কারণ, আগেই বলেছি এ ব্যবস্থার সঙ্গে নিম্নবর্গীয়দের প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত ছিল না। কিন্তু সম্প্রদায়-স্বার্থের প্রসঙ্গ টেনে এনে বিদ্বেষ বিরূপতা তৈরি রাজনীতিকদের চিরাচরিত স্বভাব। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি হিসেবে (১৯১৮) অন্যান্য সমমনা ব্যক্তি ও সংগঠন নিয়ে নওয়াব আলী চৌধুরী বঙ্গীয় মুসলিম স্বার্থের নামে যে-প্রচার শুরু করেন তা বাংলায় সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া নতুন করে তৈরিতে অর্থাৎ পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

জন ব্রুমফিল্ড বঙ্গে সাধারণভাবে, বিশেষ করে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতা দাঙ্গার মূল কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে 'ফরগট্ন মেজরিটি'র ('বিস্মৃত সংখ্যাগুরু') যে তত্ত্ব হাজির করেছেন ('মোস্টলি অ্যাবাউট বেঙ্গল', ১৯৮২) তা সাম্প্রদায়িকতার সাধারণ প্রেক্ষাপট হিসাবে সঠিক মনে করা গেলেও তা উল্লিখিত কলকাতা-দাঙ্গার মূল কারণ নয়। একাধিক গবেষক লেখকের উপস্থাপিত তথ্য থেকে তা স্পষ্ট। এমনকি ব্রুমফিল্ডের পরিবেশিত কিছু ঘটনার মর্মার্থ থেকেও তা বুঝতে পারা যায়। তবে এক্ষেত্রে বস্তিবাসী নিম্নবর্গীয়দের ধনাঢ্য মাড়োয়ারিদের সম্পদ লুট তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। সাম্প্রদায়িক সংঘাতে এমনটাই ঘটে থাকে।

নিঃসন্দেহে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট (১৯১৬) বঙ্গের উচ্চবর্গীয় উচ্চাভিলাষী কিছুসংখ্যক মুসলমান রাজনৈতিক নেতাকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ করে এবং তাদের প্রচারে রাজনৈতিক আবহে ভিন্নমাত্রার সংযোজন বিশেষ করে রাজধানী কলকাতায়, যেখানে এর প্রকাশ সর্বাধিক। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার কলকাতার মুসলমান জনসংখ্যার ওপর ও নিচ উভয়স্তরে অবাঙালি প্রাধান্য সমাজ ও রাজনীতিকে অনেক সময় অবাঞ্ছিত পথে চালিত করেছে। বিষয়টা সুরঞ্জন দাসের গবেষণায়ও বিশেষভাবে স্পষ্ট।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে বিহারে কোরবানি উপলক্ষে মুসলমানদের ওপর হিন্দু সন্ত্রাসীদের আক্রমণ এক বছর পর প্রায় একই সময়ে কলকাতায় একই উপলক্ষে সংঘটিত হাঙ্গামার পক্ষে আংশিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে। সামাজিক আবহাওয়া দূষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে কলকাতার কয়েকটি উর্দু পত্রিকা (শীলা সেন) এবং কয়েকজন রক্ষণশীল অবাঙালি মুসলিম নেতা যেমন পাঞ্জাবি হাবীব শাহ, মাদ্রাজি কালামি ও বিহারি ফজলুল রহমান (ব্রুমফিল্ড)। নিম্নবর্গীয় অবাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে এদের ভালো যোগাযোগ ছিল। তাই হাঙ্গামা ঘটানো সহজ হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সেপ্টেম্বর ১৯১৮ দিনটি সম্প্রীতি নষ্ট করার সময়ক্ষণ হিসেবে স্থির করে। ঘটনা তাদের পক্ষে ছিল। সেবার কোরবানি-ঈদ ও দুর্গাপূজা একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কাজেই দুষ্টের উপলক্ষের অভাব ঘটেনি। পূর্বোক্ত পত্রিকাগুলো সাম্প্রদায়িক প্রচারের মাধ্যমে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তোলে বিশেষ করে 'কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে'। এ ছাড়াও পরিস্থিতির অভ্যন্তরে ছিল অবাঙালি মুসলমান বনাম বড়বাজারের বিত্তবান মাড়োয়ারিদের দ্বন্দ্ব। 'ইসলাম বিপন্ন' জাতীয় স্লোগান উত্তেজনা ছড়াতে কাজে লাগে। কিন্তু কুখ্যাত ওই দাঙ্গার (১৯১৮) প্রত্যক্ষ উপলক্ষ কোরবানি। সেপ্টেম্বর ৯ থেকে তিন দিন ধরে সংঘটিত দাঙ্গার ব্যাপকতা বড়বাজার, হাওড়া, মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে। পেছনে ভোজপুর থেকে আগত অবাঙালি মুসলমান শ্রমিক মূলত বদলা নেয়ার উদ্দেশ্যে (শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস' ১৯৯২)। তবে বিহার ও অন্যান্য অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মুসলমানও হাঙ্গামার প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে।

তিন

উপলক্ষ ধর্মীয় হলেও ১৯১৮-এর কলকাতা দাঙ্গার রাজনৈতিক তাৎপর্য সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা বোধের বিন্দুগুলো ছুঁয়ে গেছে। বোঝা যায় যে, ধর্মকে ব্যবহার করে জনচেতনা উত্তেজিত করে সামাজিক সহিংসতার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এমন এক সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে ওই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। হাবীব শার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে এমন অনুমান জন ব্রুমফিল্ডের। পূর্ববর্তী দাঙ্গাগুলোর চরিত্র বিচারে দেখা যায় প্রায় সবই ধর্মীয় কারণ-সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এ দাঙ্গায় ভিন্নমাত্রার প্রকাশ।

এ সময়কার অনুরূপ ঘটনাবলীতে বঙ্গীয় রাজনীতির একাংশে লক্ষ্ণৌ চুক্তিবিরোধী অসন্তোষেরও প্রকাশ ঘটতে পারে তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়। ডিসেম্বর ১৯১৭-তে মন্টেগু ও চেমসফোর্ড দুজনেই কলকাতায় এলে চুক্তিবিরোধী তিনটি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে লক্ষ্ণৌ চুক্তির বিপরীতে বঙ্গীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক যুক্তিসঙ্গত রাজনীতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি (আসন বৃদ্ধির) আবেদন জানায়। এ মঞ্চে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তাদের লক্ষ্য ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্যক মুসলিম আসন অর্জন। সেজন্য শাসকশ্রেণীর ওপর নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির চাপই যথেষ্ট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানোর প্রয়োজন পড়ে না। তবে কলকাতা দাঙ্গায় চৌধুরী সাহেবের কোনো ভূমিকা ছিল না বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে হক-রসুল গ্রুপ বা অনুরূপ চিন্তার মুসলিম লীগপন্থীরা তো তখন লক্ষ্ণৌ চুক্তির বাতাবরণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুসারী। স্বভাবতই এই দাঙ্গার সামাজিক-রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবতা বিচারে রাজধানীর উচ্চবর্গীয় অবাঙালিদের। সুরঞ্জন দাসের বিচার-ব্যাখ্যায় তারা 'ধনী আশরাফ' হিসেবে চিহ্নিত। তারাই কলকাতার মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে। এদের মধ্যে রয়েছে অভিজাত, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ('কমিউনাল রায়ট্স ইন বেঙ্গল'-১৯০৫-১৯৪৭', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯১)। এরা উর্দুভাষী এবং ফার্সি-আরবি সংস্কৃতির ধারক-বাহক, বাংলাভাষা সাহিত্য বা বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে এদের কোনো নাড়ির যোগ নেই, থাকার কথাও নয়। এরা বঙ্গদেশবাসী কিন্তু বাঙালি নয়।

এখানেই ফজলুল হকদের সঙ্গে এদের রাজনৈতিক প্রভেদ। হক গ্রুপ একদিকে গ্রামীণ মুসলমান (কৃষক-কারিগর) অন্যদিকে উঠতি-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি। সেই শক্তিতে রাজধানীতে তাদের অবস্থান। কিন্তু প্রথমোক্ত গ্রুপ রাজধানী-ভিত্তিক রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অধিকতর শক্তিমান। তাই উর্দুভাষী উচ্চশ্রেণী থেকে একই ভাষাভাষী বস্তিবাসী শ্রমজীবীশ্রেণী তাদের নিয়ন্ত্রণে। কলকাতার এ মুসলিম বৈশিষ্ট্য পরবর্তী কয়েক দশকেও একই রকম দেখা গেছে। তখনো কলকাতার স্থানীয় মুসলিম নেতৃত্ব বাঙালি চেতনার ফজলুল হক, রসুল, গজনভীদের হাতে নয়, ছিল উর্দুভাষী সোহরাওয়ার্দী ও নাজিম গ্রুপের হাতে। সেখানে আবার স্থানীয় শক্তিবিচারে সোহরাওয়ার্দী ইস্পাহানিদের প্রাধান্য। ভারতবিভাগের প্রবক্তা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বঙ্গবিভাগের আপত্তির কারণ বুঝতে তাই কষ্ট হয় না। নিজের শক্তিকেন্দ্র কে হারাতে চায়? চাননি সোহরাওয়ার্দী কলকাতা হারাতে। এটাই ১৯৪৭-এ তার যুক্তবঙ্গের পক্ষ নেয়ার মূল কারণ। এ অপ্রিয় সত্য অনেকে হয়তো মানতে চাইবেন না।

পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্রমশ প্রসার ঘটিয়েছে বিশেষ করে কলকাতায় তার শক্তিবৃদ্ধি করেছে। চল্লিশের দশকের কলকাতায় মুসলিম রাজনীতির চরিত্র বিশ্লেষণেও এ সত্যটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দেখা যাবে আধুনিক চেতনার সঙ্গে মাওলানা-নির্ভর ধর্মীয় রাজনীতির সহাবস্থান। সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আকরম খাঁ বোধহয় এদিক থেকে সঠিক উদাহরণ। ফজলুল হক সেক্ষেত্রে চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে যেমন ব্রাত্য তেমনি ১৯১৮ সালের বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে ব্রাত্য না হলেও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে যথেষ্ট সক্ষম নন। তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

ব্রুমফিল্ড তার পর্যালোচনায় হককে নিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু সেটা গোটা বঙ্গের বিচারে নয়, কলকাতাই মুসলমান সম্প্রদায়ের বিচারে সত্য। লক্ষ্ণৌ চুক্তির নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন বাদেও মূলত সব সম্প্রদায়ের সমর্থনকামী বাঙালি হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে

দেশবিভাগ-১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হকের বিরুদ্ধে চলেছে রক্ষণশীল ও সম্প্রদায়বাদী শিক্ষিত মুসলমানদের নিন্দাবাদ, কখনো কটূক্তি। 'মোসলেম হিতৈষী' তাই লিখতেই পারে যে 'হক মুসলমানদের একাংশের প্রীতিভাজন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হিন্দু সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভে আগ্রহী' (ব্রুমফিল্ড)। এ অভিযোগ সঠিক ছিল না। হক মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে আগ্রহী ছিলেন। বহু ঘটনা তার প্রমাণ।

কুখ্যাত ওই কলকাতা দাঙ্গার চরিত্র বিচার ও তার উত্তর-প্রভাব জন ব্রুমফিল্ড যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু একটি বিষয় একাধিক গবেষণার তথ্যমতে স্পষ্ট যে দাঙ্গার পরিকল্পনায় যেমন কলকাতার উচ্চবর্গীয় অবাঙালিগোষ্ঠী তেমনি এতে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই বহিরাগত বিভিন্ন অবাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষ– প্রধানত যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা অঞ্চলের। তারা শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া বাঙালি নন।

আর সমাজে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী থেকে দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা গেছে অবাঙালি ধর্মপ্রচারক, সাংবাদিক ও অনুরূপ রক্ষণশীল শ্রেণীর ব্যক্তিদের যারা বাংলার বাইরে থেকে এসে কলকাতায় থিতু, মূলত জীবিকার প্রয়োজনে (সুরঞ্জন দাস, প্রাগুক্ত)। ছিল আঞ্জুমান, ওলেমা ও সাম্প্রদায়িক সাংবাদিক গোষ্ঠীর মতো একাধিক সংগঠন এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এবং লুটপাট ও সামাজিক অপরাধে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় দুর্বৃত্তশ্রেণীর লোক। এর পেছনে মাড়োয়ারি বিদ্বেষ যেমন সক্রিয় ছিল তেমনি ছিল মাড়োয়ারিদের ভূমিকা যা ১৯২৬-এর অনুরূপ সাম্প্রদায়িক সহিংসতায়ও দেখা গেছে। ১৯১৮-এর সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিভেদের ধারাবাহিকতা প্রকাশ পেয়েছে গোটা বিশের দশকে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। আর এ সত্যটাও বরাবরের যে শাসন-কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় মাত্রায় সজাগ, সতর্ক ও সক্রিয় ছিল না। থাকলে তিনদিন ধরে কলকাতায় হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ড চলতে পারত না। প্রশাসনিক এ ঐতিহ্য ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত একইভাবে দেখা গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িক ঐক্য-অনৈক্য ও রাজকীয় দমননীতি

বস্তুত ১৯১৮-র সহিংসতা সাম্প্রদায়িক বিরূপতার যে সূচনা ঘটায় তা সমাজে অবাঞ্ছিত স্থায়ী উপাদানেরও সংযোজন ঘটায়। সমাজ ও রাজনীতি থেকে এর স্থায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, তাৎক্ষণিক উপশমক ব্যবস্থা ছাড়া। অথবা যা নেয়া হয় তা সমাজে স্থায়ী প্রভাব রাখতে যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া মসজিদের সামনে বাদ্য-বাজনা ও কোরবানি নিয়ে দেশব্যাপী কত যে হাঙ্গামা– ছোট বা বড়, বছরের পর বছর– সমাজপতি বা রাজনীতিবিদগণ এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাননি। অথচ কবি রবীন্দ্রনাথ এ দুটো বিষয় নিয়েই সহিষ্ণুতা ও মানবিক উদারতার পক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশেই কিছু পরামর্শ রেখেছিলেন। কেউ তাতে কান দেয়নি। দিলে কাজ হতো।

এ অবহেলার কারণে বিশের দশকে ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক সংঘাত যা পরে রাজনৈতিক স্বার্থের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। আর্থ-সামাজিক ভেদ-বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ নেয়নি অগ্রসর সমাজের অগ্রসর অংশ বা রাজনীতির কর্তাব্যক্তিগণ। পুনরুল্লেখ সত্ত্বেও বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়টি সংশোধনের জন্য বারবার শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের, বিশেষত কংগ্রেসের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এ দিকটায় তারা গুরুত্ব আরোপ করেননি– ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস তেমন কথাই বলে। এর পরিণাম তাদের পক্ষে যায়নি।

একালে সংগৃহীত ইতিহাস তথা ঘটনা ও তথ্যাদি ব্যবচ্ছেদ এমন ইঙ্গিতই দেয় যে, প্রতিকারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেখানে অবহেলা যথেষ্টই ছিল। স্বভাবত এর ফল শুভ হয়নি। ওইসব তথ্যে দেখা যায় যে ছোটখাটো আপত্তিকর ঘটনার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অন্যদিকে তখনকার সরকারি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবাদি নিয়েও অসন্তোষ ছিল শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণির মধ্যে। সব কিছু মিলেই বিপত্তি। ঘটনা নিম্নস্তর থেকে শুরু যাতে কিছুটা শ্রেণিগুরুত্ব রয়েছে, এবং তা পুরোপরি সাম্প্রদায়িক চরিত্রের ছিল না বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হয় না।

নিম্নস্তরের মানুষ সংহিসতায় লিপ্ত হলেই তা শ্রেণিসংঘাত হয় না। তাতে দাঙ্গায় শ্রেণিগুরুত্বকে যুক্তিহীন প্রাধান্য দেয়া হয়। তবে দাঙ্গায় কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী উপকরণ থাকে। ধর্মীয় কারণের পাশাপাশি শাসক বিরোধিতা– বিশেষ করে পুলিশ, মুনাফাবাজ মাড়োয়ারি ও কারখানা ওভারসিয়ারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দরিদ্র শ্রমজীবীদের উত্তেজিত করে তোলে। সেটাই কাজে লাগায় শিক্ষিত কায়েমি স্বার্থবাজ কিছুসংখ্যক মানুষ। এসব নিয়ে ছোটখাটো দু-একটি উদাহরণ উদ্ধার করেছেন সুরঞ্জন দাস, যা ছোট ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও তাৎপর্যপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই।

যেমন মসজিদে পুলিশ হামলায় আহতদের চিকিৎসার জন্য হিন্দু চিকিৎসকদের ডেকে আনা হয়, শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসককে ঢুকতে দেয়া হয়নি (বেসরকারি তদন্ত কমিশনে মৌলভী নিজামুদ্দিনের সাক্ষ্য)। শ্রমজীবী শ্রেণির এ হাঙ্গামার শ্রেণিচরিত্র উল্লেখ করে দৈনিক বসুমতী তাদের ক্ষোভ নিয়ে যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য ছাপে এবং একজন খ্যাতনামা হিন্দু বিপ্লবী এ সম্বন্ধে ইতিবাচক চিঠি লেখেন (দাস, প্রাগুক্ত)। কিন্তু এসব প্রক্ষিপ্ত ঘটনা যা তৎকালীন রাজনীতি বা দাঙ্গায় কোনো প্রভাব রাখেনি।

AMARBOI.COM

দুই

তবে একটি বিষয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ– সংবাদপত্রের দায়িত্বহীন ভূমিকা, অতিরঞ্জন ও মিথ্যাপ্রচার যা উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এবং যা নিরপরাধ মানুষের প্রাণনাশের কারণ হয়েছে। যেমন ১৯১৮-তে তেমনি ১৯২৬-এ তেমনি বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে যা দেখেছি ১৯৪৬-এ। নির্বিকারচিত্তে সাংবাদিক নামের বিবেকহীন ও মানবিক চেতনাহীন শিক্ষিত মানুষগুলোর মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনে বা ঘটনার বিকৃতি বা অতিরঞ্জনে বিবেকে বাধেনি। একদিকে হিন্দু পত্রিকার সনাতনী হুঙ্কার অন্যদিকে মুসলমান পত্রিকার জিহাদি আহ্বান। কেউ কারো থেকে কম যায়নি। শান্তি ও সম্প্রীতির কথা তারা একবারও ভাবেনি। প্রসঙ্গত দাস উল্লেখ করেছেন এ সময়কার পাবনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তব্য যাতে সংবাপত্রের 'দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখা ও মিথ্যা রিপোর্ট' সম্বন্ধে সমালোচনা রয়েছে।

আর ১৯২৬-এর কলকাতা দাঙ্গার পেছনে দেখা গেছে স্থানীয় মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান মাড়োয়ারি বিরূপতা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মোল্লা-মৌলভী ও আঞ্জুমান জাতীয় সংগঠনের ধর্ম-সাম্প্রদায়িক প্রচার ইত্যাদির সামাজিক প্রভাব। পাশাপাশি 'আর্য সমাজী' ও অন্যান্য সম্প্রদায়বাদী হিন্দু সংগঠনগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৎপরতা, শুদ্ধি অভিযান ও সংবাদপত্রগুলোর সাম্প্রদায়িকতায় জ্বালানি যোগ করার পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাত। কলকাতা, ঢাকা, পাবনা এবং আরো কোনো কোনো স্থানে।

কলকাতা দাঙ্গা (১৯২৬) চরিত্র বিচারে মাড়োয়ারি-বিরোধী হয়েও হিন্দু-মুসলমানভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তো বটেই। অন্য অনেক কারণের মধ্যে এর প্রধান কারণ মূলত রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক, বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল হওয়ার ক্ষোভ। রাজনৈতিক বিচারে এর দায় মূলত ডানপন্থী কংগ্রেসের। আমার মনে হয় এখানে 'মাড়োয়ারি– সিন্ধি (ভাটিয়া)' মূল কারণ নয়, উপলক্ষ মাত্র। সুরঞ্জন দাস একজন মুসলমান নেতার মন্তব্য উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে, তাদের লড়াই বাঙালি হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, তা মাড়োয়ারিদের বিরুদ্ধে। দাঙ্গায় লুটপাট, হত্যা, অগ্নিসংযোগে মাড়োয়ারিরাই প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত, তবু এর অন্য একটি দিকও আছে, যা ১৯১৮ দাঙ্গা থেকে ভিন্ন।

কলকাতার এই (১৯২৬) দাঙ্গায় **বহিরাগত অবাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমানভাবে অংশ নিয়েছে**। শিখ ও আর্য সমাজীদেরও অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যেমন সমাজের ওপরতলার তেমনি নিম্নস্তরের হিন্দু-মুসলমানের অংশগ্রহণ ছিল অবাঞ্ছিত বাস্তবতা। নির্বিবাদে হিন্দু-মুসলমান গুণ্ডাদের অংশগ্রহণও যেন এক ভবিষ্যৎ অশনি সংকেত। পেশাদার সমাজ-বিরোধীদের অবশ্য সব সামাজিক রাজনৈতিক উপদ্রবেই দেখা যায়। তবে রাজনৈতিক উপদ্রবে সমাজ-বিরোধীদের ব্যাপক ব্যবহার বোধহয় এভাবে শুরু মূলত রাজনৈতিক নেতাদের কল্যাণে। সেক্ষেত্রে কী লীগ, কী হিন্দুমহাসভা বা কংগ্রেস একই চরিত্রের।

তিন

সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিকরণের পেছনে এ ক্ষেত্রে বড় কারণ উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির লোকদের পাওনাগণ্ডার জন্য ক্ষোভ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পিছাইয়া পড়া মুসলমানের পদমানমর্যাদায় সমান হওয়ার দাবি'। তা না হলে চিত্তরঞ্জন দাসের সমন্বয়বাদী রাজনীতির (বেঙ্গল প্যাক্ট-এর) কল্যাণে নির্বাচিত ডেপুটি মেয়র শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমাজ-বিরোধী মিনা পেশোয়ারি ও আল্লাবকশ পেশোয়ারির মতো কুখ্যাত গুণ্ডাদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় দুর্বৃত্তদের মদত জোগাবেন কেন? সঙ্গত দাবি আদায়ের এটা ছিল অসঙ্গতপন্থা, বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দীদের মতো স্বনামখ্যাত আধুনিক মানসিকতার নেতাদের পক্ষে। মুসলমান সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের পক্ষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়কর হলেও দুঃখজনক সত্য যে, মাড়োয়ারি দোকানপাট লুটের সময় জনাব সোহরাওয়ার্দীকে অকুস্থলে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে (ন্যাশনাল আর্কাইভস, হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ২০৯/২৬, ভারতীয় হোম সেক্রেটারির কাছে বঙ্গীয় চিফ সেক্রেটারির চিঠি, ৫ মে, ১৯২৬, উদ্ধৃতি দাস)। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে ১৯৪৬ আগস্টে সংঘটিত কলকাতা মহাহত্যাযজ্ঞে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা নিয়ে একই রকম বহু কথিত অভিযোগ সবারই জানা। দাঙ্গায় তার দায় নিয়ে তদন্ত কমিশনও গঠিত হয়। কিন্তু বিশেষ কারণে তা শেষ পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে সৈয়দ নওশের আলীকে পরাস্ত করতে নড়াইল শহরে রাজাবাজারের গুণ্ডাবাহিনী পাঠানোও ছিল গণতন্ত্রের মানসপুত্র সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে অসঙ্গত কাজ। বস্তুত সোহরাওয়ার্দীর মতো অবাঙালি উর্দুভাষী রাজনীতিকরাই বরাবর কলকাতায় মুসলমান সমাজ ও রাজনীতির প্রধান ব্যক্তি ছিলেন যে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

তবে ছাব্বিশের কলকাতা দাঙ্গায় নগরীর হিন্দু-সমাজের বিশিষ্টজনেরাও সমান সক্রিয় ছিলেন। বিশেষ করে ডানপন্থী রাজনৈতিক নেতা, 'শুদ্ধি', 'সংগঠন' ও 'আর্য সমাজী'দের মতো ধর্মীয়-সামাজিক সংস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বালানি যোগ করেছেন ও বাতাস দিয়েছেন। লক্ষ্য ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে, বোর্ডে বা সমিতিতে নিজ সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়। ঢাকা বা পাবনায় উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশের তৎপরতা ছিল একই ধরনের।

অবশ্য ছবিটা পুরোপুরি একতরফা ও একই রকম ছিল না। ইতিপূর্বে ১৯১৮ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত উপদ্রবের বিপরীত চরিত্রের দু-একটি ঘটনা দাসের বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি এপ্রিল, ১৯২৬-এ আঞ্জুমান সংগঠন থেকেও ইশতেহার বিলি করে জানানো হয়, যাতে বাঙালি হিন্দুর জানমালের ওপর আঘাত না পড়ে (দাস, প্রাগুক্ত)। আর ১৯১৮-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে বঙ্গীয় সদস্য আবদুল হামিদ খাঁ এবং প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বক্তব্য সমর্থন করেন এই বলে যে ওই দাঙ্গা মূলত বহিরাগত পশ্চিমা হিন্দু মুসলমানরাই ঘটায় (দাঙ্গার ইতিহাস, প্রাগুক্ত)।

দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে কুখ্যাত রাওলাট দমননীতি আইনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অংশগ্রহণ উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশেষ করে কলকাতার রাজপথে হিন্দু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানের সম্মিলিত প্রতিবাদী মিছিল (এপ্রিল, ১৯১৯)। ছাব্বিশের দাঙ্গার সময়ও দেখা গেছে, প্রভাবশালী হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা এবং উভয় সম্প্রদায়ের দুর্গতদের আশ্রয় দান। এর মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের নামও রয়েছে যারা অনেক অসহায় মুসলমান পরিবারকে উদ্ধার করে তাদের বাড়িতে রেখেছেন। যে জন্য তাদের বসতবাড়ি আক্রান্ত হয় (দাস, প্রাগুক্ত)। কিন্তু আক্রমণকারীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে উদারপন্থী ছাড়াও বিশিষ্ট রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতা ফজলুল হক, মুজিবর রহমান, কিংবা রসুল ও গজনভিদের চেষ্টা ছিল সম্প্রীতি রক্ষার।

শুধু বঙ্গেই নয়, ভারতের দ্বিতীয় প্রধান প্রদেশ পাঞ্জাবেও অনুরূপ অবস্থা দেখা গেছে। কলকাতা দাঙ্গার (১৯১৯) কয়েক মাস পর পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান-শিখের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তা সাম্রাজ্যবাদী শাসককে চিন্তিত করে তোলে। হান্টার কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, অমৃতসরে রামনবমীর মিছিলে (১৯১৯) পাঞ্জাবি মুসলমান বিপুল সংখ্যায় যোগ দেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ রাস্তায় এক পাত্র থেকে জল পান করছে। সে এক আশ্চর্য মানবিক সৌহার্দের দৃশ্য! ইংরেজ শাসকের স্বভাবতই আতঙ্কিত হওয়ার কথা। তারা ঠিকই আতঙ্কিত হয়ে চরম দমননীতির আশ্রয় নেয়।

এপ্রিলের ৯ তারিখেই (১৯১৯) রাজনৈতিক নেতা কিচলু ও সত্যপালকে অমৃতসর থেকে বহিষ্কার করা হয়। প্রতিবাদে পরদিন উত্তেজিত জনতা একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ চালায়। পরদিন জারি হয় সামরিক আইন। দু-দিন পর ১৩ এপ্রিল মেলা উপলক্ষে নিরস্ত্র, দেহাতি জনতা জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘেরা ময়দানে জমায়েত হয়। অশিক্ষিত মানুষের নিষেধাজ্ঞার কথা জানা ছিল না। কেউ তাদের সতর্ক করে দেয়নি। আর সেই শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র জনতার ওপর নিয়ম ভাঙার অপরাধে ডায়ারবাহিনী নির্বিবাদে গুলি চালিয়ে কয়েকশ গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এত বড় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অপরাধে ডায়ারদের বিচার হয়নি। পাল্টা 'নেটিভদের' ওপর চলে অত্যাচার, নির্যাতন, গ্রেফতার।

প্রতিবাদে লাহোরে আবারো হরতাল-মিছিল অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে। এ সব ক্ষেত্রে যা হয় পুলিশের সঙ্গে জনতার রক্তাক্ত সংঘর্ষ। শাহি মসজিদের বিশাল জমায়েতে গণকমিটি গঠিত হয়। এদের হাতে দিন কয় ছিল শহরের নিয়ন্ত্রণ, ঠিক যেন ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি পর ঢাকায় কয়েকটি দিন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ঘটনা অনেক ভয়াবহ—মৃত্যু রক্ত ও পীড়নে। ডায়ারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসন সত্ত্বেও অবস্থা বিপ্লবমুখী ছিল মুসলমান-হিন্দু-শিখ জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী শক্তির কারণে। কিন্তু আপসবাদী শিক্ষিত শ্রেণির নেতৃত্ব সেই সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। বিস্ফোরক জনশক্তিকে তারা কাজে লাগায়নি। সম্ভবত তাদের শ্রেণিচরিত্রের কারণে।

রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে কলকাতাও ছিল উত্তাল। রবীন্দ্রনাথের মতো শান্তিবাদী কবিও ক্ষুব্ধ চৈতন্য শান্ত করতে প্রতিবাদ সভা আয়োজনের জন্য রাজনীতিকদের কাছে ধরনা দেন, নিজে সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু রাওলাট আইন ও সরকারি দমননীতির ভয়ে গান্ধি, চিত্তরঞ্জন কেউ এগিয়ে আসেননি। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়কে চিঠি লিখে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'রাজ' প্রদত্ত 'নাইটহুড' উপাধি ত্যাগ করেন। কিন্তু শাসক তা মেনে নেয়নি। আর কংগ্রেস? প্রায় দুমাস পর তারা পাঞ্জাব বিভীষিকার বিরুদ্ধে একটি জরাজীর্ণ আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গ্রহণ করে ভয়ঙ্কর একটি ঘটনার বিপক্ষে নম্র কণ্ঠে জাতীয় কর্তব্য শেষ করে। রবীন্দ্রনাথের 'নাইটহুড' ত্যাগের প্রতিবাদও সেখানে স্বীকৃতি পায় নি। গান্ধি রাজনীতির এ বৈশিষ্ট্য দেশবিভাগের পূর্বপর্যন্ত একইভাবে দেখা গেছে।

এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে গান্ধি নেতৃত্ব। কংগ্রেস ঐতিহ্যবাহী আপস-আবেদন পন্থার রাজনীতি থেকে ভারতীয় রাজনীতির মূলধারাটিকে পুরোপুরি সরিয়ে আনতে পারেনি। শাসকশ্রেণির ওপর চাপ হিসেবে সূচিত সরকার-বিরোধী আন্দোলন (যেমন অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলন) কখনো চরম পর্যায়ে বা শেষ গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। পারেনি গান্ধির অহিংসনীতির কারণে। গান্ধির জন্য বিষয়টা ছিল ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত নীতি ও কার্যক্রম। তার ভালোভাবেই জানা ছিল যে, রাজবিরোধী আন্দোলন কখনো শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকতে পারে না। এর কারণ সরকারি দমননীতি ও এর গণপ্রতিক্রিয়া। গান্ধিসূচিত একাধিক গণআন্দোলনে তেমন প্রমাণই মিলেছে।

গান্ধীর আপসবাদী রাজনীতি তথা কংগ্রেসের ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে ভারতের ভূস্বামী সম্প্রদায়, বৃহৎ বণিক ও শিল্পপতিশ্রেণির স্বার্থ জড়িত ছিল। গান্ধি-রাজনীতি, গান্ধিআশ্রম সবই চলেছে এদের অর্থ সাহায্যে, চলেছে কংগ্রেসের কার্যক্রমের অর্থ সঙ্কুলান। শুধু বিড়লা বলে কথা নয়, 'আহমেদাবাদের মিলমালিক অম্বালাল সারাভাই-এর কাছ থেকেও সাবরমতী আশ্রম (১৯১৫) মোটা আর্থিক সমর্থন পায়।' স্বরাজ তহবিলের কোটি টাকার মোটা অংশ আসে বোম্বাই, আহমেদাবাদের মিলমালিক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে (সরকার)। ভারতে গান্ধিরাজনীতির সূচনা ও বিস্তার এভাবে। বণিক ভূ-স্বামী নির্ভরতায়। এ ধারাই বরাবর চলেছে। এখনো চলছে উপমহাদেশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরা আবার একই সঙ্গে রাজভক্তও। সরকারের সঙ্গে তারা সংঘাতে যেতে নারাজ। গান্ধি-বিড়লা, বিড়লা-ভাইসরয় সংলাপ ও চিঠিযোগাযোগে এসব সত্য প্রতিষ্ঠিত। যেমন দেখা গেছে মুসলমান পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীকুলের জিন্না ও মুসলিম লীগ তহবিলে অকাতর দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে সম্প্রদায়গত সংঘাত বা ভিন্ন যাত্রার অবকাশ ছিল না। শ্রেণিচরিত্রের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি হিন্দু-মুসলমান বণিকদের ক্ষেত্রে। তারা একই সঙ্গে রাজভক্ত ও রাজনীতিতে সম্প্রদায়ভক্ত।

বিশের দশকের শুরুতে বাংলার চটকলসহ সারা ভারতের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘটের যে জোয়ার তৈরি হয় তা ছিল অভাবিত। বলা চলে, এক ধরনের গণজাগরণের প্রকাশ। তবে তার চেয়েও সম্ভবত ব্যাপক হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্নভাবে ভারতজুড়ে কৃষক আন্দোলন বা কৃষক বিদ্রোহ। বাংলারও এ ক্ষেত্রে ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। কিন্তু অসহযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দেশময় আন্দোলনের যে সুবাতাস বয়ে যায় তার 'আইকন' হয়ে ওঠেন গান্ধি। গান্ধির সুবাদে কংগ্রেসের ব্যাপক জনপ্রিয়তা।

তাই 'গান্ধীরাজ এসে গেছে' এই ঘোষণা করে ২৪ মার্চ (১৯২১) অনেক কয়েদি, অন্তত ৬৬৯ জন রাজশাহী জেল থেকে বেরিয়ে আসে (সরকার)। সরকারি গোপন প্রতিবেদনে বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। 'মনে হয় আন্দোলন নেতাদের হাতের বাইরে চলে গেছে'– এমনটাই ছিল গোপন প্রতিবেদনের মূল কথা। বাংলায় মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম ও সাঁওতাল পরগনাও হয়ে ওঠে নিম্নবর্গীয় মানুষের স্বরাজী মনোভাবের কেন্দ্রবিন্দু।

গান্ধীর নামে এসব হলেও মজার ঘটনা হচ্ছে গান্ধি এ জাতীয় আন্দোলনের সমর্থন বা দায়গ্রহণ কোনোটাই করেননি। যেমন দরিদ্র কৃষককুলের তেমনি বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণির ক্ষেত্রে। সমর্থন দূরে থাক গান্ধি বরং এসব তৎপরতার রাশ টেনে ধরেন। তা সত্ত্বেও বিশের দশকের প্রথম তিন-চার বছরের উত্তাল সরকারবিরোধী ক্ষোভের ঘটনাপ্রবাহ রাজশক্তিকে 'প্রায় নতজানু করে দিয়েছিল' (সুমিত সরকার)।

প্রসঙ্গত ১৯২১ সালে হসরত মোহানির পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি (যা গান্ধি খারিজ করে দেন)– এবং সেই সঙ্গে অহিংসা বর্জনের দাবি তৎকালীন অবস্থার সঙ্গে সময়োপযোগী আহ্বান ছিল। কিন্তু গান্ধিকংগ্রেস সে সুযোগ নেয়া দূরে থাক, স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক বিপরীত পথ ধরে হেঁটেছে। কারণ গান্ধি তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কখনো চাননি ভূস্বামী, বৃহৎ বণিক ও শিল্পপতিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হোক। সেই সঙ্গে চাননি 'রাজ' সরকার বিপর্যয়ের মুখে পড়ুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার এই রাশ টানা ও পিছটান শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির একাংশসহ জনস্তরে যে হতাশা সৃষ্টি করে তার প্রতিক্রিয়া নানাভাবে দেখা দেয়। তাতে দেশের, দশের স্বার্থই ক্ষুণ্ন হয়েছে। একাধিক কারণে সমাজে দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান– বেড়েছে মালব্য প্রমুখ হিন্দু মহাসভাপন্থীদের তৎপরতা। অন্যদিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ। একই সঙ্গে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় (কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পর্কে মোহভঙ্গের কারণে) বাংলা, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে শিক্ষিত যুবকদের একাংশ বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু সমস্যা এ ক্ষেত্রেও ছিল, ছিল ধর্মীয় চেতনা তথা হিন্দুত্ববাদের প্রভাব। এক কথায় কয়েক বছরে তৈরি সাম্প্রদায়িক ঐক্য, শাসক-বিরোধী ঐক্যের গোটা চালচিত্রটাই পাল্টে যায়। এর চরিত্র হয়ে ওঠে বিপরীতমুখী। ফলে রাজকীয় চাতুর্য ও দমননীতি দুই-ই ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সারে জাঁহাসে আচ্ছা'র ঐক্যবোধ টেকেনি

বিশের দশকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা যেমন সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সৌহার্দ্যের সুতো জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে ফেলতে তৎপর হয়ে ওঠে তেমনি এ দশকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 'রাজ'-বিরোধী প্রতিবাদের ঐক্যও গড়ে উঠছিল এবং তা ভারতভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে। এর কিছুটা পরিচয় পূর্বেকার আলোচনায় উঠে এসেছে। জিন্না যতই রাজনৈতিক নিয়মতান্ত্রিকতার কক্ষে বন্দি হয়ে থাকুন না কেন, অন্যান্য মুসলমান নেতা কারো কারো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ দেখা গেছে।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব ঘিরে যে বিরোধিতার প্রকাশ তার মধ্যে শুধু র‍্যাডিক্যাল হিন্দু রাজনীতিকই নন, বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান নেতাও ওই র‍্যাডিক্যাল চেতনার অংশীদার– বরং একটু বেশি করেই। ডা. এমএ আনসারী, হাকিম আজমল খান, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কিংবা জাতীয়তাবাদী উলেমা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি আবদুল বারি প্রমুখ এক পর্যায়ে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধেও যৌথ আন্দোলনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব এদিক থেকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসে। ইতিহাসবিদ কারো কারো মতে, এসব রাজনৈতিক ঘটনা মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণে সাহায্য করে। বাংলায় আজাদ ও ফজলুল হকদের চেয়েও জাতীয়তাবাদী চেতনায় সেই পর্বে এক পা এগিয়ে পাঞ্জাব। সাংবাদিক জাফর আলী খান এ ব্যাপারে খুব তৎপর একজন ব্যক্তি। এসবে জ্বালানি যোগ করে কবি ইকবালের জাতীয়চেতনাবাহী স্বাদেশিকতার বয়ান পরবর্তীকালের জন্য যা কিংবদন্তি হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক বাঙালি কবির কাব্যপঙ্‌ক্তিতে স্থান পায় এ স্বদেশিয়ানা।

কবি ইকবালের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' যেন স্বাদেশিকতার জপমন্ত্রে পরিণত হয়। সাদামাটা ভাষায় তিনি আরো লেখেন :

'বিরক্ত হয়ে ছেড়েছি আজিকে মন্দির ভজনালয়,
মোল্লার কথা শুনি না, ছেড়েছি উপদেশ তব কাহিনীময়...
আমার কাছে তো স্বদেশের এই ধূলিকণাগুলি দেবতাময়'।

গুরুত্ব বিচারেই ইকবালের উল্লিখিত কাব্যপঙ্ক্তির তর্জমা ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো রাজনৈতিক নেতাদের স্বদেশ-চেতনা ওই কাব্য-আবেগের সমধর্মী ছিল না। তাদের কাছে ব্যক্তিগত উচ্চাশা বা দলগত স্বার্থসিদ্ধিই ছিল বড় কথা। ভাবতে অবাক লাগে যে 'হিন্দুস্তান হামারা'র কবি এই আল্লামা ইকবালই কি না ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি জানান তার সভাপতির ভাষণে। তবে ওই পর্যায়ে তিনি ভারত বিভাজনের কথা বলেননি।

দুই

যাহোক পূর্বোক্ত সমন্বয়বাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমননীতির বর্বরতায় ক্ষতিগ্রস্ত পাঞ্জাবের চেহারা এক-আধটি পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গোটা পাঞ্জাবে এ আন্দোলনে 'নিহত শ্বেতাঙ্গ মাত্র চারজন, আর ভারতীয় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ : অন্ততপক্ষে ১২শ নিহত ও ৩ হাজার ৬শ জন আহত' (সুমিত সরকার, প্রাগুক্ত)। নির্যাতন, বেত্রাঘাত ও বিভিন্ন ধরনের দৈহিক শাস্তি বাদেই এ হিসাব নির্মমতার দিকটা স্পষ্ট করে তোলে।

এই নির্মমতাজনিত মানসিক যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে ৩০ মে (১৯১৯) ভাইসরয় চেমসফোর্ডের কাছে নাইটহুড বর্জন উপলক্ষে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে। তার মতে, হতভাগ্য পাঞ্জাবিদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে তার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ড প্রয়োগ বিধির বিশেষত্ব আমাদের মতে কয়েকটি আধুনিক ও পূর্ব দৃষ্টান্ত বাদে সব সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনারহিত।

এ বিষয়ে কবি আরো বলেছিলেন যে, বহু কোটি আতঙ্কিত ভারতবাসীর আপত্তি প্রকাশ করতে এই চিঠি। মানুষের অযোগ্য যে অসম্মানে দেশবাসীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে তার প্রতিকারে নিজের সম্মানচিহ্ন বর্জন করে তাদের পাশে নেমে আসতে তিনি ইচ্ছুক। অবশ্য রবীন্দ্র-বিদূষক অনেকে দেরিতে চিঠি লেখার জন্য রবীন্দ্রনাতের সমালোচনা করেন যেমন সমকালে তেমনি পরে। বাংলাদেশের প্রবীণ অধ্যাপক আহমদ শরীফও এদের তালিকায় পড়েন।

কিন্তু পরিস্থিতির সঠিক বিবরণ জানার জন্যই ছিল কবির অপেক্ষা। কারণ সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রকৃত ঘটনা জানার উপায় ছিল না। যে জন্য রবীন্দ্রনাথ বন্ধু সিএফ অ্যান্ড্রুজকে অমৃতসর পাঠান। অবস্থা এমনই ছিল যে শ্বেতাঙ্গ পাদরি অ্যান্ড্রুজও শহরে ঢুকতে পারেননি। অমৃতসরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে তাকে দিল্লিতে ফেরত পাঠানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। সেখানে কিছু সময় সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে হতাশ অ্যান্ড্রুজ অবশেষে মে মাসের শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এরপরই রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড বর্জনের সিদ্ধান্ত, যা নিয়ে তিনি ভাইসরয়কে চিঠি লেখেন।

রাজশাসনের নিষ্ঠুরতা শুধু জালিয়ানওয়ালাবাগেই রক্তস্রোত বহায়নি, পরবর্তী দুদিন অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ এপ্রিল গুজরানওয়ালায় বিক্ষোভরত জনতার ওপর আকাশযান থেকে বোমাবর্ষণ ও মেশিনগানের গুলি চালনা শাসকদের বর্বরতার প্রকাশ ঘটায়। গোটা পাঞ্জাবকে অবশিষ্ট ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। গণহত্যার খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ করার ফলে হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি, যাবেও না কোনোদিন।

বিশেষ বিশেষ এ জাতীয় ঘটনা উপলক্ষে শাসকবিরোধী ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ বা লড়াই বরাবরই প্রশাসনকে আতঙ্কিত করেছে এবং আতঙ্কের কারণে চলেছে দমননীতির তাণ্ডব, যেমন দেখা গেছে দুদশক পরে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে। তবে পাঞ্জাবে সম্প্রদায় নির্বিশেষ আন্দোলন দমন করতে ডায়ার প্রশাসন যে বর্বরতার প্রকাশ ঘটায় তার তুলনা বিরল। কোনো কোনো লেখকের মতে তখনকার পাঞ্জাবের প্রতিরোধ আন্দোলন এক ধরনের গণবিদ্রোহ।

এর প্রভাব পড়ে গোটা ভারতে। কিন্তু ব্যাপক গণআন্দোলনের প্রকাশ ঘটাতে না পারার কারণ যেমন প্রচণ্ড সরকারি দমননীতি তেমনি গান্ধি কংগ্রেসের নিরাসক্তি। রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ববিহীন গণআন্দোলন হালবিহীন নৌকোর মতো গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। তাই এমন সমালোচনা অস্বীকার করা কঠিন যে 'গণবিদ্রোহের ফলে প্রচলিত ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় গান্ধিজী এমন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে, তিনি সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের কার্যক্রম শুধু যে প্রত্যাহার করেন তা নয়, অমৃতসর কংগ্রেস (ডিসেম্বর, ১৯১৯) অধিবেশনে তিনি জনগণের আচরণের নিন্দা করে একটি প্রস্তাবও উত্থাপন করেন' (অরবিন্দ পোদ্দার– রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ১৯৮২)।

গান্ধি রাজনীতির এ বৈশিষ্ট্য আমরা বরাবর দেখেছি যে আন্দোলন অহিংস না হলে তার কাছে তা জায়েজ হয় না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন কখনো কি অহিংস থাকতে পারে? শাসকের এক আঘাতেই তা ভেঙেচুরে যায়। তেমন উদাহরণ ভারতে অনেক রয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ জমায়েত তো নিছক মেলার গণউপস্থিতিই ছিল। সেখানে নির্বিচারে গুলি চালানো কোন্ অহিংসনীতির প্রকাশ? সহিংসতাকে তো নিরামিষ অহিংসা দিয়ে জয় করা যায় না, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী স্বার্থ যেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিমান পক্ষ। বৃথাই গান্ধি অহিংস আন্দোলনের এক অসম্ভব সাধনায় ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। নেতৃত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। বরং তার নিরীহ স্বদেশবাসীর রক্তস্রোতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছিল।

এখানেই থেমে থাকেননি অধিবেশনের উপস্থিত গান্ধিবাদী শীর্ষনেতারা। অমৃতসর বর্বরতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড বর্জনের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পর্যন্ত করেননি ওই নেতৃবৃন্দ। অমল হোমের বিবরণমতে কংগ্রেস-মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের খেতাব বর্জন বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বাংলার প্রতিনিধিরাও নীরব। এমনকি এ বিষয়ে বাঙালি সৈয়দ হোসেনের একটি প্রস্তাব অধিবেশনের সভাপতি মোতিলাল নেহরুর কারণে উত্থাপন করা যায়নি (পোদ্দার, প্রাগুক্ত)।

গান্ধীকংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যত আপসবাদী চালে চলুক না কেন পাঞ্জাব বর্বরতা ও রাওলাট দমননীতির প্রতিক্রিয়ায় রাজনীতি-সচেতন ভারতীয় জনসাধারণ হিন্দু-মুসলমান-শিখ নির্বিশেষে আবারো প্রতিবাদী ঐক্যের প্রকাশ ঘটায়। যেমন দেখা গিয়েছিল ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে। যেমন কুখ্যাত রাওলাট আইনের প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয় অমৃতসর ঘটনার দিন কয়েক আগে।

অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে যে ১৯১৮ সালের দাঙ্গার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার ৬-৭ মাস পরই শুরু হয় হিন্দু-মুসলমানের শাসকবিরোধী ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী তৎপরতা। সবচেয়ে অবিশ্বাস্য নাখোদা মসজিদে ১১ এপ্রিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমাবেশ– তাতে মসজিদ অপবিত্র হয়নি। পরদিন নানা ধর্মের, নানা শ্রেণির মানুষের বিশাল প্রতিবাদী মিছিল ও সেনাসদস্যদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ। ফলে কিছুসংখ্যক মৃত্যু। তাতে দমেনি মানুষ।

কিন্তু দিল্লিতে এর চেয়েও বড় চমক– উপলক্ষ সেই রাওলাট আইন এবং তাও অমৃতসর বর্বরতার সপ্তাহখানেক আগে। সেখানেও চলেছে সরকারবিরোধী সমাবেশ, মিছিল ও পুলিশের গুলি। প্রতিক্রিয়ায় দিল্লির বিখ্যাত জামে মসজিদে হিন্দু-মুসলমানের এক জমায়েতে (৪ এপ্রিল) স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে সম্মাননা জানানো হয় (সুমিত সরকার, প্রাগুক্ত)। তবে লক্ষণীয় যে, প্রতিটি স্থানে জঙ্গি নিম্নবর্গীয়দের সঙ্গে মধ্যশ্রেণির অলিখিত সমঝোতায় কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শগত বন্ধন ছিল না। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সত্ত্বেও এটাই ছিল লক্ষ্য অর্জনের দুর্বল বিন্দু অর্থাৎ অ্যাকিলিসের গোঁড়ালি যা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুদিক থেকে তীরবিদ্ধ, মানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রান্ত হওয়ার কথা। বাস্তবে হয়েছেও তাই এবং এর পেছনে শাসকশ্রেণির উগ্র দমননীতি ও কূটচাতুর্য। দুই. সাম্প্রদায়িক অনৈক্য।

এ সময়কার ঘটনাবলীর দুই ভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়ার চরিত্র বিচার গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, সমকালীন রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় তাতে করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যা পরবর্তী রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। করেছে দেশ বিভাগের পরিণাম রচনায়। শাসকশ্রেণির বর্বরতা তথা নির্মম দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধি প্রভাবিত কংগ্রেসের তাৎক্ষণিক নমনীয়তা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য। যে কংগ্রেস তাদের দিল্লি অধিবেশনে মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাবের সমালোচক সেই কংগ্রেসের গান্ধিবাদী নেতারাই অমৃতসর কংগ্রেসে (১৯১৯) মন্টেগুকে ধন্যবাদ জানিয়ে সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ওই পার্শ্ব পরিবর্তনের মূল নায়ক এম কে গান্ধি। তবে চুপ করে থাকেননি ভিন্নমতের নেতৃবৃন্দ। গান্ধির বিরোধিতা উপেক্ষা করে সংস্কার প্রস্তাবকে হতাশাজনক বলে মন্তব্যসূচক একটি ধারা যোগ করা হয় পূর্বোক্ত ধারার সঙ্গে। এ উদ্যোগ মূলত চিত্তরঞ্জন দাস, হসরত মোহানি, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ কংগ্রেস নেতার। উল্লেখ্য জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্র্যাজেডির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে (১৩ এপ্রিল, ১৯২০) শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত শোকসভার অন্যতম উদ্যোক্তা জিন্নার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী পাঠান তা ছিল রীতিমতো প্রতিবাদী।

বিস্ফোরক শব্দচয়নে রচিত ওই বাণীতে বলা হয়: 'জালিয়ানওয়ালাবাগে যে অশুভ শক্তির ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে তা আসলে এক দানবীয় যুদ্ধের দানবিক সন্তান, ...সভ্যতার মৌল ভিত্তি উৎপাটিত হওয়ায় একের পর এক নৈতিক ভূকম্প সৃষ্টি হবে, মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে অধিকতর দুঃখভোগের জন্য' ইত্যাদি। এর পর অবশ্য তার স্বভাবসুলভ বক্তব্যে তিনি 'আত্মার অজেয় শক্তিতে পশুশক্তি'কে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হতে সবাইকে আহ্বান জানান।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আরো দুয়েকটি ঘটনার উল্লেখ বোধহয় প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে ডায়ারীয় বর্বরতা ও হান্টার কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে ব্রিটিশ কমন্সসভায় অবাঞ্ছিত আলোচনা প্রসঙ্গে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে (১৯২০) বন্ধু অ্যান্ড্রুজকে লেখেন, 'তাদের বক্তৃতায় পাশবিকতা যে রকম নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের খবরের কাগজগুলোতে তারই প্রতিবেদন যেভাবে কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তা অতি ভয়াবহরূপেই কুৎসিত। আমাদের সত্যিকার মুক্তি রয়েছে আমাদের আপন হাতে, ...শুধু আত্মত্যাগ ও নিরতিশয় দুঃখবরণের দ্বারাই আমরা পাব সাফল্যের সন্ধান' (তর্জমা ও উদ্ধৃতি অমল হোমের)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

এর পরপরই খিলাফত উপলক্ষে গান্ধি ও আলী ভ্রাতাদের চেষ্টায় কংগ্রেস-খিলাফত সমঝোতা ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রকাশ। গান্ধির অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফতের সংশ্লিষ্টতা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ তৈরি করেছিল। কলকাতা ও লাহোরে বিশাল ছাত্রধর্মঘট, সর্বভারতীয় শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদি মিলে জমজমাট সরকারবিরোধী পরিবেশ তৈরি হয়।

'বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের গোটা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি শক্তি ও ঐক্যের প্রকাশ সম্ভবত ১৯২১-২২-এ গড়ে ওঠা অসহযোগ খিলাফত সমঝোতা। ...বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন চিত্তরঞ্জন দাস ও তার তিন তরুণ সহকর্মী নেতা– মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতা বীরেন্দ্র শাসমল, চট্টগ্রামের মধ্যপন্থী নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও কলকাতার বিপ্লববাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু।' সবচেয়ে বড় কথা বাংলার শহর গ্রামে ঐক্যবদ্ধ জনজাগরণ। অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ে গোটা পূর্ববঙ্গ আলোড়িত হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। কলকাতাস্থ কারখানা শ্রমিকও (অধিকাংশই মুসলমান) একই কাতারে। প্রসঙ্গত এ ক্ষেত্রে কমরেড মুজাফফর আহমদের নেতৃত্বও স্মরণযোগ্য ঘটনা (সুমিত সরকার)।

বাংলার বাইরে আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশ। শুধু মধ্যশ্রেণি নয়, কৃষক ও শ্রমিক এই উভয় শ্রেণিকে গভীরভাবে স্পর্শ করে অসহযোগ আন্দোলন। পাশে খিলাফতিরা। কিন্তু পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ জনতা গোরখপুরের চৌরিচৌরায় থানা পুড়িয়ে দেয়। মারা যায় কয়েকজন পুলিশ। এ ঘটনায় গান্ধি আন্দোলন বন্ধ করে একটি বিপুল সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটান। অন্যদিকে প্রশাসনিক নির্মমতায় আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ১শ ৭২ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, তাদের মধ্যে অনেক টানাটানির পর ১৯ জনের ফাঁসি, বাকি সবার দ্বীপান্তর।

এ ঘটনা থেকে ব্রিটিশরাজের আতঙ্ক সৃষ্টি ও দমননীতির নির্মমতা পরিমাপ করা যায়। অন্যদিকে বড় বিষয় গান্ধির চরম আপসবাদিতা। জওহরলাল তার আত্মজীবনীতে লেখেন যে চৌরিচৌরার ঘটনায় আন্দোলন স্থগিত করা সম্বন্ধে গান্ধির একতরফা সিদ্ধান্তে অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতা গভীরভাবে অসন্তুষ্ট হন, আর তরুণরা ক্ষুব্ধ। কিন্তু গান্ধি তার সিদ্ধান্তে অনড়। অহিংসার নামে এমনি ধারার আপসবাদ ছিল গান্ধি রাজনীতির চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। কংগ্রেস অধিকাংশ সময় এই আপসবাদী রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পূর্বোক্ত কংগ্রেসী প্রস্তাবের একটি বড় আপত্তিকর দিক ছিল ভূস্বামীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি সমর্থন। গান্ধি রাজনীতি একদিকে জমিদারদের, অন্যদিকে কমপ্রেডর মুৎসুদ্দি ধনপতিদের (যেমন বিড়লা) বরাবর সমর্থন জানিয়েছে।

চার

১৯১৯ থেকে ১৯২২। বঙ্গদেশসহ ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এক শুভ সময়পর্ব। এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গান্ধির সঙ্গে রাজনৈতিক ভিন্নমতের টানে ১৯২৩ সালের মার্চে চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল নেহরুর স্বরাজ্য দল গঠন এবং তাদের অভাবিত নির্বাচনী বিজয় ২১টি মুসলমান কেন্দ্রে। সে বছরের শেষ দিকে চিত্তরঞ্জনের বহুখ্যাত 'বেঙ্গল প্যাক্ট' যাতে বঙ্গে প্রশাসনিক পদে মুসলমানদের জন্য ৫৫ শতাংশ সংরক্ষণ, মসজিদের সামনে গান-বাজনা বন্ধ ইত্যাদি শর্ত নিশ্চিত করা হয়।

দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জোয়ার বয়ে যায়। স্বরাজীরা শুধু আইনসভাতেই নয়, আঞ্চলিক ও পৌরসভাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কলকাতায় চিত্তরঞ্জনের সাফল্যে প্রধান ভূমিকা তরুণ সুভাষচন্দ্র বসুর। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশে স্বরাজ্য দলের 'বঙ্গ বিজয়ে'র ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি জুন ১৯২৫-এ চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুর পর। সুভাষ-বীরেন্দ্র শাসমল প্রমুখের চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভিন্নপন্থীদের হাতে ঐতিহাসিক বেঙ্গল প্যাক্টের মৃত্যু এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মূলে কুঠারাঘাত (১৯২৬)।

শুধু বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিলই নয়, প্রজাস্বত্ব আইনের বিরোধিতার মতো একাধিক ঘটনায় কংগ্রেসের ভূমিকা হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা ঘটানোর সহায়ক হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সংঘাত রাজনীতিকে দূষিত করে। আর সাম্প্রদায়িক বিরূপতার প্রেক্ষাপট রচনা করে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠনের কর্মকাণ্ড। যেমন ১৯২৩ থেকে 'তবলিগ' ও 'তানজিম'-এর প্রচার, অন্য পক্ষে হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ব্যাপক ধর্মীয় প্রচার, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি অভিযান ইত্যাদি ঘটনা সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হত্যার ঘটনা তাতে জ্বালানি যোগ করে।

মদনমোহন মালব্য, মুঞ্জে প্রমুখ সম্প্রদায়বাদী রাজনৈতিক নেতার প্রচারাভিযান ও মুসলিম লীগের রক্ষণশীলতার পুনরুত্থান সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতা, ঢাকা, পাবনা, বিহার, দিল্লি, যুক্তপ্রদেশ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার শিকার। এতসব সত্ত্বেও গান্ধি হিন্দুত্ববাদী রক্ষণশীল নেতাদের (যেমন মালব্য) সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহম্মদ আলী ১৯২৩ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনিই গান্ধির আচরণে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়ে গান্ধির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন (সুমিত সরকার)।

সাম্প্রদায়িক সমঝোতায় প্রকৃতপক্ষে কোনোপক্ষেরই সদিচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না। মদনমোহন মালব্য ও মোতিলাল নেহরুর দ্বন্দ্ব এতটা তীব্র হয় যে, হিন্দুমহলে মোতিলাল মুসলমানঘেঁষা রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন। 'হিন্দ্-হিন্দি-হিন্দু' স্লোগানের টানে ও পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ১৯২৬ সাল থেকে যেমন বঙ্গে তেমন গোটা ভারতে সাম্প্রদায়িক চেতনা তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। এর মধ্যে মসজিদের সামনে বাজনা ও অন্য পক্ষে গো-জবাই এবং অনুরূপ কারণগুলো চরম স্বেচ্ছাচারিতায় সম্প্রীতির সুতোগুলো ছিঁড়তে থাকে। এই দ্বন্দ্বে জয় তৃতীয় শক্তি ব্রিটিশ 'রাজ'-এর। গান্ধির কাছেও গো-রক্ষা প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা তার কাছে অবস্থাদৃষ্টে সমাধানযোগ্য বলে মনে হয় না।

এ অবস্থায় গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো হয়ে ওঠে সাইমন কমিশনের (১৯২৭) ভারত শাসন বিষয়ক নয়া প্রস্তাব। সম্প্রদায়-সম্প্রীতির চেষ্টা হিসেবে জিন্নাসহ মুসলিম সংগঠনগুলো রাজনৈতিক মতৈক্যের চেষ্টা চালায়। তাদের অধিকাংশ সাইমন কমিশন বর্জন করে। মার্চ ১৯২৭-এ জিন্নার উদ্যোগে দিল্লিতে অনষ্ঠিত মুসলিম সম্মেলনে যে সমাধান প্রস্তাব তৈরি করা হয় তাতে পৃথক নির্বাচনের দাবি বাতিল করা হয় বিশেষ কয়েকটি শর্তে। যেমন সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসনসমেত যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী, কেন্দ্রে-এক তৃতীয়াংশ মুসলিম প্রতিনিধিত্ব, পাঞ্জাব ও বঙ্গে জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব এবং সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ভূখণ্ডের স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা।

কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭) এ প্রস্তাব মেনে নেয়ার পর পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের হিন্দু সম্প্রদায়বাদীদের চাপে কংগ্রেস পিছু হটে। এরপরও চেষ্টা চলে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে (১৯২৮) জিন্না ঐক্যের আহ্বান জানান এই বলে যে, 'আমরা সবাই একই ভূমির সন্তান। আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে।... বিশ্বাস করুন, যতদিন হিন্দু ও মুসলমান ঐক্যবদ্ধ না হয় ততদিন ভারতের কোনো অগ্রগতি হবে না' (উমা কাউর, 'মুসলিমস অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম', ১৯৭৭)।

জিন্নার এ আহ্বানে কংগ্রেস সাড়া দেয়নি মূলত হিন্দু মহাসভা নেতাদের বিরোধিতার কারণে। মালব্য, মুঞ্জে প্রমুখ নেতাদের তখন কংগ্রেসের ওপর যথেষ্ট প্রভাব। প্রভাব হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসনের দাবি প্রকৃতপক্ষে যুক্তিহীন ছিল না। বিনিময়ে যৌথ নির্বাচন। কংগ্রেস এসব দাবি মেনে নিলে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ তৈরি হতো। কিন্তু তা না হওয়ায় অন্য কোনো পথেই সমাধান মেলেনি, ঐক্যের দরজা খোলেনি।

এভাবে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ বন্ধ হয়ে গেলে হতাশ জিন্না লনডনে ফিরে যান। পরে ফিরে আসেন অন্য এক জিন্নার রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে। একদিক থেকে বিচার করলে বিশের দশক ভারতীয় রাজনীতিতে ইতি ও নেতির সময়পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হওয়া উচিত। নানা ঘটনার টানে কংগ্রেস ও জিন্নার পথ ভিন্ন হয়ে যায়। কবি-রাজনীতিক ইকবালের ভারতীয় ভূখণ্ডভিত্তিক আবেগ 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' হাওয়ায় ভেসে যায় এবং তিরিশের দশকে গোটা বিষয়টা ভিন্ন চরিত্র নিয়ে দেখা দেয়। মুসলিম রাজনীতির নায়কদেরও অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটে যা যুক্তিবাদী, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিমনস্ক মানুষের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঘটনার অনাকাঙ্ক্ষিত গতি রোধ করার মতো ছিল না, মূলত কিছুসংখ্যক শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অদূরদর্শিতার কারণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বের রাজনীতি

ভারতে মুসলিম লীগ রাজনীতির লক্ষ্য ছিল প্রতিযোগিতাহীন পরিবেশে আত্মোন্নয়নের নিশ্চয়তা, যা ক্রমে স্বতন্ত্র ভুবনের দাবিতে পৌঁছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে শক্তিশালী সামাজিক উপাদান ধর্মীয় জাতীয়তার নীতি গ্রহণ এবং এর প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার ব্যবহার নেতাদের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সে নেতৃত্বে বরাবর উচ্চবর্গীয় ভূস্বামীপ্রধান এবং শিক্ষিত এলিটশ্রেণি। স্বভাবত শেষোক্ত ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান অনেকটা পিছিয়ে ছিল। এই শ্রেণিস্বার্থ পুঁজি করে মুসলিম রাজনীতির যাত্রা। যেমন কংগ্রেসের একটু ভিন্নভাবে।

গান্ধি বনাম জিন্না তথা কংগ্রেস বনাম মুসলিম লীগ যদি ভারতীয় রাজনীতির দ্বান্দ্বিক চরিত্রের মূল হয়ে থাকে (যা দেশ বিভাগভিত্তিক রাজনৈতিক ইতিহাসে বরাবর বিধৃত) তাহলে এর তত্ত্বগত দিক ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বনাম প্রাদেশিক স্বাধিকারভিত্তিক দুর্বল কেন্দ্রের ফেডারেল ব্যবস্থা। খুঁটিয়ে দেখলে এতে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তত্ত্ব নিহিত। ধর্মীয় জাতীয়তাভিত্তিক স্বতন্ত্র ভুবনের রাজনীতি এর ব্যবহারিক দিক। উল্লিখিত প্রতিযোগিতার রাজনীতি নিয়ে রাজশক্তির শিখণ্ডিকে সামনে রেখে লীগ-কংগ্রেসের লড়াই।

এ লড়াইয়ের বাস্তবতা বুঝতে প্রধান দুই ব্যক্তিত্ব গান্ধি-জিন্নার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসের দিকগুলোও বিচার করে দেখতে হয়। সেই সঙ্গে তাদের সহযাত্রী কুশীলবদের। এ বিষয়টা কংগ্রেসের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মুসলিম লীগের ক্ষেত্রে সেটা খাটে না। কারণ সেখানে মোহাম্মদ আলী জিন্নার কথা বা ভাবনা বা সিদ্ধান্তই শেষ কথা। বাকি সবাই 'জি হ্যাঁ' বলে খালাস– তা যত বড় ভূস্বামী তিনি হোন না কেন।এক্ষেত্রে ভূস্বামী লিয়াকত আলী বা মননশীল রাজনীতিক খালিকুজ্জামান একই কাতারে। বিপরীত দিকে কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধি যথেষ্ট শক্তিমান ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও গান্ধিকে নানা চালে নেহরু-প্যাটেল-রাজাগোপালাচারি বা মাওলানা আজাদ প্রমুখকে শান্ত রাখতে হয়েছে। কিন্তু মুসলিম লীগে জিন্না একেশ্বর।

AMARBOI.COM

দুই

বলা হয়ে থাকে গান্ধি কংগ্রেস রাজনীতিকে জনগণের আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। এর পেছনে ছিল মূলত তার রাজনৈতিক আদর্শ– অহিংসা তথা শান্তিবাদ। কারো মতে, সবার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সেইসঙ্গে শহর-গ্রামের তাত্ত্বিক ঐক্যে ছিল চরকা খাদিখদ্দর, যা ভারতীয় হিন্দুমানসে ব্যাপক প্রভাব তৈরি করে।এভাবে তিন দশক সময় গান্ধি কংগ্রেসে, কখনো কখনো বিতর্কিতও হয়েও অবিসংবাদী নেতা। কংগ্রেসি রাজনীতি তথা ভারতীয় রাজনীতির দুর্ভাগ্য যে কংগ্রেস সংগঠন তার বিকল্প বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্ম দিতে পারেনি বা পারলেও তা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

গান্ধির ব্যক্তিত্ব হডসনের মতে নম্র, বিনয়ী, সদালাপী ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের হয়ে অন্তর্নিহিত শক্তিতে বলীয়ান। মূলত তার অহিংসানীতি, অনশনব্রত ইত্যাদির জোরে গান্ধি দ্রুতই কংগ্রেস নেতৃত্ব জয় করে নেন, নিজেকে সবার ওপরে বসাতে সক্ষম হন। তার সনাতন ভারতীয় চরিত্র ভারতীয় হিন্দুমানসকে ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করার প্রধান কারণ, অথচ তিনি একজন শিক্ষিত পরিবারের সদস্য এবং বিলেতি শিক্ষায় একজন ব্যরিস্টার। কিন্তু রাজনীতিতে সেসব ছাপিয়ে তার 'সন্ত' প্রকৃতিই প্রধান হয়ে ওঠে। পশ্চিমাদের কাছে বহুকথিত 'অর্ধনগ্ন ফকির'। আবার কারো কারো বিবেচনায় রাজনীতিতে ছলাকলা ও কূটনীতিতে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব।

গান্ধি চরিত্রের দুই পার্শ্বমুখ সত্ত্বেও ভারতীয় রাজনীতি তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এমনকি সুভাষ-প্রভাবিত বাংলা বা বঙ্গীয় কংগ্রেসও। কারো কারো মতে ভারতীয় চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের কারণে গান্ধি তার অহিংসা ও সত্যাগ্রহ নীতি নিয়ে রাজনৈতিক ভুবন দখল করেছিলেন– অবশ্য ভারতীয় হিন্দুদের। যদিও স্বাধীনতা ও স্বাদেশিকতার টানে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান রাজনৈতিক নেতা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তবু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনতা বরাবর গান্ধির প্রভাব-বলয়ের বাইরে।

এর প্রধান কারণ আদর্শবাদী আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও তার হিন্দুত্ববাদী বিশ্বাস ও আচরণ। যেখানে ব্যতিক্রম সেখানে সমর্থন দেখা গেছে। যেমন গান্ধি-খিলাফত ঐক্য আন্দোলন। এটা কারো বিচারে সঙ্গতকারণেই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, যা অবশেষ বিচারে ফলপ্রসূ হয়নি। তার বহু-উচ্চারিত রামধুনের সর্ববাদী পঙ্ক্তি 'ঈশ্বর-আল্লাহ তেরে নাম সবকো সম্মতি দে ভগওয়ান' মুসলিম-মানসে প্রভাব রাখেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর একটা প্রধান কারণ হতে পারে নিম্নবর্গীয় মুসলমান বিশেষ করে দরিদ্র বঙ্গীয় কৃষক কারিগর শ্রেণি গান্ধিরাজনীতি থেকে কোনো সুবিধা পায়নি। বরং গান্ধিরাজনীতি আদর্শগত দিক থেকে জমিদার ভূস্বামী ও বৃহৎ বণিক মুৎসুদ্দি শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা তৃণমূলস্তরের বিত্তহীনদের স্বার্থের বিপরীত চরিত্রের। তাই শুকনো রামধুন সংগীতে মুসলমান স্বার্থের চিড়ে ভেজেনি। এসবের সুযোগ-সুবিধা নিয়েছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না এবং তা মুসলিম লীগ রাজনীতির ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিলেন। ব্যবহার করেছিলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতেও।

এ ক্ষেত্রে মোহাম্মদ আলী জিন্নার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য তাকে খুবই সাহায্য করেছিল। সাহায্য করেছিল রাজনৈতিক পরিবেশ, কিছু ঘটনা, সর্বোপরি ভারতীয় রাজের কম-বেশি নানামাত্রিক সমর্থন। অবশ্য সেটা তাদের প্রয়োজনে। কংগ্রেস-লীগ দুটো সংগঠনই রাজশক্তির সহায়তায় গঠিত। তা সত্ত্বেও এই দুয়ের রাজনেতিক যাত্রা ছিল সম্পূর্ণ বিপরতি দিকে। যেমন এক পর্যায় থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে অহিংসার প্রবক্তা গান্ধি নেতৃত্বেই 'রাজ'বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, সবশেষে 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন শাসকদের রীতিমতো বেকায়দায় ফেলে দেয়। আর চরমপন্থী সুভাষ বসুর ভূমিকা তো বরাবরই প্রচণ্ড রকম রাজবিরোধী।

কিন্তু মুসলিম লীগ? প্রাক জিন্না-পর্বে বা জিন্নার নেতৃত্বে কখনো শাসকবিরোধী গণআন্দোলনের জন্ম দেয়নি মুসলিম লীগ। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের দাবিতেও জিন্না বা লীগ কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেনি। জিন্নাসহ শীর্ষলীগ নেতাদের কাউকে দেশের স্বার্থে কারাবাস করতে হয়নি।শাসকদের সঙ্গে সমঝোতার রাজনীতি, কখনো মুসলমানদের রাজনেতিক-অর্থনৈতিক অধিকারের দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর কংগ্রেসের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যদিয়ে চলেছে জিন্না-লীগের রাজনীতি। মোটামুটি হিসেবে ত্রিশের দশক থেকে। অবশ্য এর জন্য কংগ্রেসের ভুলভ্রান্তির দায়ও রয়েছে।

তাই বলে একজন রাজনীতিক আইনজীবী হয়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হবেন না বা নিজের মতো করে সেদিকে পথ তৈরি করবেন না জিন্না– এটা ভাবতে বড় অদ্ভুতই লাগে। তবু এটাই সত্য,এটাই বাস্তবতা। তবে এর পেছনে কারণও রয়েছে। আর তা হলো তার চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার ব্যক্তিগত জীবন (পারিবারিক) ও রাজনৈতিক জীবনের (সাময়িক) হতাশাজনিত প্রতিক্রিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারিবারিক ক্ষতিটা মেরামত করা যাবে না ধরে নিয়েই জীবিকা (আইন ব্যবসা) ও রাজনীতি পুরোপুরি জীবনের সঙ্গী করে নেন জিন্না। তাতে তার ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যের অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটে। তার স্বভাব-শীতল প্রকৃতি ও উপভোগ্য একাকিত্ব লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সহায়তা করে। পশ্চিমা ধাচের পোশাক ও মানসিকতা দুই-ই তাকে স্বদেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। রাজনীতির সঙ্গে জনগোষ্ঠীর একটা অবিচ্ছেদ্যসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও জিন্না রাজনীতিক হয়েও সত্যিকার অর্থে জননেতা ছিলেন না। তিনি তা হতেও চাননি।

এদিক থেকে তিনি গান্ধির একেবার বিপরীত মেরুতে। তিনি এলিট শ্রেণির রাজনীতিক। জনতার আবেগ ও সমর্থন তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন। তার রাজনৈতিক লক্ষ্য যদি সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থের অনুকূল হয়ে থাকে তো ভালো। কিন্তু মূল রাজনীতিটা তার অহমবোধ, তার লক্ষ্য অর্জনে সমর্পিত। তাই রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রবক্তা হয়েও নিছক ব্যক্তিগত কারণে তার পক্ষে বিপরীত পথে চলা সম্ভব হয়েছিল। বিষয়টা আদর্শগত হলে এমন পরিবর্তন সহজ হতো না। ব্যক্তিক কারণ স্বাদেশিকতার ঊর্ধ্বে প্রাধান্য পেত না।

AMARBOI.COM

কিন্তু জিন্নার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। একজন অভিজাত রাজনীতিবিদ জনস্বার্থের টানে নয়, ব্যক্তিক প্রতিশোধের বোধ থেকে তার পূর্বধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অসাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিকে তার লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তাই যে ১৯২৪ সালে যে জিন্না ঐক্যের কথা বলেন সেই জিন্না একযুগ পর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে এর ঠিক বিপরীত কথা বলেন। বলেন যে, হিন্দু-মুসলমানকে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধারায় সংগঠিত হতে হবে (হডসন)।

বছর দেড়েক পর তিনি এক বক্তৃতায় মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে দ্বিজাতিতত্ত্বের আভাস দেন। 'হিন্দুস্তান শুধু হিন্দুদের জন্য' যার অর্থ মুসলমানদের জন্য দরকার স্বতন্ত্র বাসস্থান। গান্ধির মতে এটা তার এক ধরনের 'যুদ্ধ ঘোষণা'। এরপরই তার রাজনৈতিক আত্মোন্মোচন, ১৯৪০ মার্চে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' যার অর্থ স্বতন্ত্র ভুবনের দাবি (পাকিস্তান)। এরপর আর তিনি পেছন ফিরে তাকাননি। ইতিপূর্বে প্রবর্তিত ব্রিটিশরাজের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (১৯৩৫) অর্থাৎ কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড তার রাজনীতির ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই স্বতন্ত্র নির্বাচন ও যে কোনো মূল্যে ভারতীয় মুসলিম স্বার্থরক্ষার রাজনীতি তার একমাত্র রাজনীতি হয়ে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্না-রাজনীতির সাম্প্রদায়িক চরিত্র বদলের কারণ ভিন্ন ভাষায় হলেও ভারতবিভাগ বিষয়ক ইতিহাস লেখকরা প্রায় একই সুরে কথা বলেছেন। কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে চলতে গিয়ে তার আহত অহমবোধ উদ্ধার জিন্নার রাজনৈতিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেটা হয়ে ওঠে তার রাজনৈতিক আদর্শ। হডসন দুটো কারণেই সমান গুরুত্বারোপ করেছেন, যা আগে বলা হয়েছে ('ব্যক্তিক কারণ ও রাজনৈতিক বিশ্বাস')।

দুটো কারণই তাকে তিরিশের দশকের শেষদিক থেকে চল্লিশের দশকে পৌঁছে 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা' করে তোলে। 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছাপিয়ে তার কাছে চরম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।' তার গর্ব, তার অহঙ্কারের জায়গাটিকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় তুলে ধরা তার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সেজন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে তৈরি ছিলেন জিন্না। এজন্য তাকে মাত্র দুই দশক সময় নানা তৎপরতায় ব্যয় করতে হয়েছে (হডসন)। আর যশবন্ত সিং বলেছেন: 'কংগ্রেসের সমগ্রতাবাদ (টোটালিটারিয়ানিজম) অবশেষে জিন্নাকে সম্প্রদায়বাদীতে পরিণত করে'। (পৃ. ২০৬)।

বাঙালি মুসলিম লীগ রাজনীতিক কামরুদ্দীন আহমদও মোটামুটিভাবে জিন্নার রাজনৈতিক পালাবদলের পেছনে ব্যক্তিগত কারণটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। খুব কাছ থেকে দেখা ও জানার অভিজ্ঞতা থেকে জনাব কামরুদ্দীন তাকে 'মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তার ভাষায়, 'নইলে চল্লিশ বছর বয়সে আঠার বছরের মেয়ে রতন বাঈকে কেন বিয়ে করেছিলেন।... এটা ভালবাসা না একটা ধনী নাইট পার্সীকে অপদস্থ করার মানসিক আকাঙ্ক্ষা' (বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪)। এমনকি সাংবাদিক গান্থারের মতামত উদ্ধার করে তিনি জিন্নাকে 'অস্বাভাবিক লোক' ও 'একনায়ক' হিসেবে ভাবতে চেয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন তার 'গভর্নর জেনারেল' হওয়া নিয়ে। শেষোক্ত বিষয় নিয়ে আরো কেউকেউ একই প্রশ্ন তুলেছেন গান্ধির সঙ্গে তুলনা করে। আর মাউন্টব্যাটেনের মতে, 'জিন্না এক সাইকোপ্যাথিক কেস' (TOP, Vol.X P190)।

আরো একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, জিন্না তার রাজনেতিক জীবনের প্রথম দিকে যতই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বলুন না কেন তিনি রাজনীতি শুরু করেন 'আঞ্জুমানে ইসলামে' যোগ দিয়ে (১৮৮৭)। এরপর মুসলিম লীগ, মাঝখানে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেয়া এবং সম্পর্ক রেখে চলা। কিন্তু নওরোজির ভাবশিষ্য হয়েও কখনো কংগ্রেসে যোগ দেননি। তার 'একমুখী চিন্তা ও চলা'র কথা অনেকে বলেছেন। সে ক্ষেত্রেও অন্যদের সঙ্গে ঐকমত্যে হেক্টর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিথো জিন্নাকে ব্যবহারের দিক থেকেও 'অতীব শীতল ও দূরপ্রান্তের' মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ('ইন কোয়েস্ট অব জিন্না')। টুপি শেরোয়ানি ভূষণ হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত জিন্না পোশাকে এবং পরেও অর্থাৎ বরাবরই বিলেতি সাহেবী কেতার মানুষ।

তাই ধর্মের জন্য রাজনীতি নয়, তার রাজনীতির জন্য তিনি ধর্মকে (ইসলাম) হাতিয়ার হিসেবে তুলে নেন। অন্যদিকে গান্ধির হিন্দুত্ববাদিতা, গোরক্ষা তার বিশ্বাসের অংশ আর অহিংসা তার রাজনৈতিক হাতিয়ার। সর্বোপরি মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনি সনাতন ভারতীয় এবং প্রাচীন ভারতীয় চেতনার প্রতীক। এমন দুজন নেতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ চলে, কিন্তু দুজনের একপথে যাত্রা কখনো সম্ভব নয়। স্বভাবে, বিশ্বাসে, কর্মে দুজন সম্পূর্ণ দুই মেরুর বাসিন্দা। যশবন্ত সিংয়ের উদ্ধৃতিতে জিন্না গান্ধিকে শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন না, ভাবতেন 'একজন ভঙ্গীসর্বস্বক, কপট ও আত্মম্ভরী' রাজনীতিক হিসেবে। এমন বিপরীতপন্থার দুই রাজনীতিকের এক গালিচা দূরে থাক, এক কাতারে চলাও সম্ভব ছিল না। এ সত্য জিন্না বুঝলেও গান্ধি বুঝতে চাননি। তাই দুজনের যাত্রা দুই বিপরীত দিকে। বিশেষত স্বদেশী রাজনীতির ক্ষেত্রে। অশেষ তিক্ততায়।

AMARBOI.COM

তিন

বিষয়টা মনোযোগী বিচারেও এমনই দাঁড়ায়– দুই বিপরীত রাজনৈতিক তত্ত্ব ও লক্ষ্য নিয়ে বিপরীত চরিত্রের দুই রাজনেতিক নেতার পথ চলা দ্বান্দ্বিক না হয়ে পারে না। বাস্তবে হয়েছেও তাই। স্বভাবতই ভারত বিভাগকে রাজনেতিক নিয়তি নির্ধারিত বলে ভাবা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন তা অনিবার্য ছিল না। কিন্তু ঘটনা তা অনিবার্য করে তোলে। আর সেসব ঘটনার অধিকাংশই রাজনীতির উল্লিখিত দুই নায়কের তৎপরতায় এবং তাদের হাত ধরে।

রাজনেতিক পরিবেশও তাদের সহায়তা করেছে। অথবা বলা চলে তারা সে পরিবেশ তাদের জন্য সহায়ক করে তুলেছেন। তবে সে ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলিম নেতা সবাই একটি বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন এবং তা হলো ভারত শাসনের ফেডারেল ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যা সংখ্যালঘু মুসলিম স্বার্থরক্ষায় সাহায্য করবে।

খিলাফত নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী মৃত্যুর আগে তার শেষ ইচ্ছা জানাতে গিয়ে (জানুয়ারি, ১৯৩১) বলেছিলেন যে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ছোটখাটো বেনিয়া গোষ্ঠী তৎপর। এদের তিনি চান না। তার চেয়েও বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাকাঙ্ক্ষিত বিদেশি বেনিয়ারা (তার ভাষায় 'দোকানদার জাতি') এদেশ শাসন করুক। অন্যদিকে স্বতন্ত্রনির্বাচন বাদ দিয়েই ১৪ দফার মর্মবস্তু নিয়ে ফেডারেশন গঠিত হোক যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘুর স্বার্থ ক্ষুণ্ন করবে না। তিনি প্রাদেশিক কর্তৃত্বের দাবি উল্লেখ করে বলেন যে, 'সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান না হলে ভারতে গৃহযুদ্ধ বাধবে।'

কংগ্রেস সভাপতি হয়েও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রায় একই সুরে কথা বলেছেন তার 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' বইতে। তার মতে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়েই বহু জাতি, বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ ভারতে ফেডারেল শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভয়ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব দূর করা সম্ভব। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতি, এমনকি কংগ্রেস রাজনীতিও ওই পথ ধরে হাঁটেনি। উল্লিখিত সংখ্যালঘুতত্ত্ব শিখদের বেলায় প্রযোজ্য হওয়ার কথা ওই তাত্ত্বিকদের মনে আসেনি।

বরং শাসকরাজ মুসলমানদের রাজনৈতিক খেলায় দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিশ শতকের শুরু থেকেই **সংখ্যালঘুতত্ত্বের আলোকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করে এসেছে, যার সর্বশেষ কার্যকর ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ** (কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড)। স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রাদেশিক ক্ষমতা এর মুখ্য বিষয়। এতে ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে (যদি জাতি কথাটা ব্যবহার না করাও হয়) বিভক্ত করার অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ লেখায় ও বক্তব্যে প্রতিবাদ করেছেন, যদিও জিন্না ও মুসলিম লীগ এর পক্ষে তাদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছে। জিন্নার ভাষা তখন বেশ তীব্র। তার মতে, 'হিন্দু দাসত্ব থেকে মুক্তি' তাদের লক্ষ্য (স্ট্যানলি উলপার্ট)। উলপার্টও জিন্নাকে 'শীতল রক্তের অসীম ধৈর্যের ব্যক্তি' হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আলীর দাবি ও বক্তব্য সঠিক হলেও কিছু প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ায়। যেমন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম শাসনের প্রাধান্য চাইলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও একই নীতি মানতে হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে জিন্না ও লীগের অভিযোগের অন্ত ছিল না। এ ধরনের স্ববিরোধিতা উভয়দিক থেকে ভারতীয় রাজনীতিকে ক্রমে সংঘাতের পথে নিয়ে গেছে। অথচ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সত্ত্বেও কেউ গণতান্ত্রিক বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলেন নি। বলেন নি সম্প্রদায়বাদী রাজনীতির বদলে জাতি ও ভাষাভিত্তিক ফেডারেশন গঠনের কথা। যেমন বাঙালি, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, মারাঠি, গুজরাটি ভাষিক জাতিগোষ্ঠীর কথা। এতে সাম্প্রদায়িক সংঘাত এড়ানো সম্ভব হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি সমাজবাদী হিসেবে পরিচিত জওহরলাল এমন প্রস্তাব তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনিও তা করেননি। বরং শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে ওকালতি করে তিনি ড. মাহমুদকে বলতে পেরেছেন: 'প্রদেশের ক্ষমতায়নের আমি বিরোধী। তাতে প্রাদেশিকতার প্রবণতা বাড়বে।' হুবহু একই কথা বলে ছিলেন জিন্না ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকা সফরে এসে তার বক্তৃতায়, এবং তা আরো কঠোর ভাষায়। জিন্না না বুঝতে চাইলেও সমাজবাদী ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত জওহরলালেরতো 'জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিষয়ক' লেনিনীয় ধারণার বিষয়টি না জানার কথা নয়।

যে গান্ধি বিচক্ষণ ও সহিষ্ণু রাজনীতিক হিসেবে বহুর চোখে শ্রদ্ধেয়, তিনিইবা বিলেতে গোলটেবিল বৈঠকে কীভাবে বলেন, কংগ্রেস ভারতীয় জনতার একমাত্র প্রতিনিধি এবং তা ধর্মবর্ণ ও সংগঠন নির্বিশেষে (১৯৩১)। হয়তো তাই প্রায় এক দশক পর জিন্নার দাবি তিনি 'ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র' ('সোল স্পোকসম্যান'- আয়েশা জালাল)। গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা ও দলগুলোর বা প্রতিনিধিদের চরম অনৈক্যই সম্ভবত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড প্রণয়নে (১৯৩২) উৎসাহী করে তোলে।

ওই একই বিষয়ে একাধিকবার জওহরলাল নেহরুর অদূরদর্শী উক্তিও বিস্ময়কর। তার মতে, রাজনৈতিক সংলাপের পক্ষে ভারতে শুধু দুটো শক্তি রয়েছে– এক কংগ্রেস, দ্বিতীয় শাসকরাজ। স্বভাবতই জিন্না এর প্রতিবাদে বলবেন, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে দুটোই দল কংগ্রেস ও লীগ, সেখানে তৃতীয় শক্তি শাসকরাজ। কাজেই কোনো সংলাপই লীগ বা জিন্নাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। 'সোল স্পোকসম্যান'-এর পক্ষে পুরো যুক্তি না থাকলেও তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের রাজনৈতিক প্রতিনিধি তো মুসলিম লীগ এবং তার একচ্ছত্র সভাপতি জিন্না। সেক্ষেত্রে লীগ ও জিন্নাকে পাশ কাটানো কংগ্রেস নেতাদের জন্য সঠিক পদক্ষেপ ছিল না। অবশ্য অনুরূপ মত প্রকাশ করেন মাওলানা আজাদ। এভাবে লীগ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব এবং শাসক ইংরেজের চাতুর্য পর্যায়ক্রমে ভারত বিভাগের পথ তৈরি করতে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে ১৯৩৫-এর প্রস্তাব ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িক যাত্রার পাকা সড়ক তৈরি করে দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্না : 'ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র'

রাজনীতিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নার প্রবেশ ভারতীয় মুসলমানদের অধিকারের দাবি নিয়ে, যদিও শুরুতে তিনি কংগ্রেস, লীগ উভয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। মুসলিম লীগের একজন কর্তাব্যক্তি হিসেবে তিনি সে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত, আর কংগ্রেসের সঙ্গে একজন সহযাত্রী হিসেবে। সে সময় ভারতের মুসলিম রাজনীতির বৈশিষ্ট্যই ছিল দুই নৌকায় পা রেখে চলা– এ অপ্রিয় সত্য অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, ডা. এম. এ আনসারি, হাকিম আজমল খান, এমনকি হসরত মোহানীর মতো শুদ্ধ দেশপ্রেমীদের আচরণ তেমন প্রমাণ দেয়।

আবার কেউ কেউ অসাম্প্রদায়িক আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী হয়েও সম্প্রদায়বাদী মুসলিম লীগ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেক সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটিয়েছেন। যেমন বাংলায় কৃষক প্রজাপার্টির প্রধান একে ফজলুল হক এবং পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা সিকান্দার হায়াত খান। প্রসঙ্গত, সিন্ধুর 'জিয়ে সিন্ধু' নেতা জিএম সৈয়দের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। এমন ধারণা ভিত্তিহীন নয় যে এরা ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গত দাবি-দাওয়ার কর্মসূচি নিয়েও দেশপ্রেমী গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদীর ভূমিকা পালন করতে পারতেন, সেক্যুলার রাজনীতির আদর্শ ধারণ করেই পারতেন। তাতে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল লীগ-কংগ্রেসের বাইরে নয়া সংগঠনে তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটতে পারত। সম্ভাবনা ছিল ভারতীয় রাজনীতির সুস্থ ভিন্ন পথ ধরার। বামপন্থীদের জন্য সুযোগ তৈরি হতো এদের প্রতি সমর্থন দানের।

কিন্তু এরা সে পথে পা বাড়াননি। বামগণতন্ত্রীরাও এমন ধারা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে পারতেন, সেটা দেশের জন্য মঙ্গলকর হতো। তা না করে তারা সুবিধাবাদী ও অংশত হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেসের মধ্যে আত্মনাশের পথ খুঁজে বেড়ালেন। কখনো কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি করে, কখনো সরাসরি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। ভেবে দেখেননি কংগ্রেসে হিন্দুমহাসভার প্রভাবের দিকটি। ভাবেননি প্রচ্ছন্নভাবে প্যাটেল থেকে নগ্নভাবে হিন্দুমহাসভা মতাদর্শের মদনমোহন মালব্য, মুঞ্জে প্রমুখের কথা যারা নানাভাবে কংগ্রেস-রাজনীতি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো গান্ধিরাজনীতিকে প্রভাবিত করে দেশটিকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। অবশ্য অন্যদিকে বিপরীত ময়দানে ছিল রক্ষণশীল মুসলিম লীগ রাজনীতির ভূমিকা। তারাও ওই একই ধারায় কাজ করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটেই মোহাম্মদ আলী জিন্নার রাজনীতি নিয়ে, বিশেষ করে মুসলমান রাজনীতিতে তার একাধিপত্য নিয়ে, তার 'অবসেশনের' বিষয়টা নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ব্যক্তি হিসেবে, আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে যথাক্রমে তার প্রবল উচ্চাভিলাষ, প্রচণ্ড অহমবোধ এবং স্বভাবের ধাতব কাঠিন্য তার রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। সর্বোচ্চ বিন্দুতে অবস্থানের বাসনা শুরু থেকেই তার মধ্যে ছিল এবং তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য পথ ছিল মুসলিম রাজনীতি। সে রাজনীতির হাল ধরেই তিনি প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজেছেন। শেষ পর্যন্ত প্রবল সম্প্রদায়বাদিতার মাধ্যমে সাফল্যও পেয়েছেন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নার একটি বড় গুণ ছিল লক্ষ্য একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে তার পেছনে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠায় লেগে থাকা যতদিন না পর্যন্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়– দেহাতি বাংলায় বলা যায় কামড় খেয়ে লেগে থাকা। এ কাজটি ছিল তার স্বভাবজাত এবং ভারতীয় রাজনীতিতে এ পথ ধরেই তিনি এগিয়েছেন। ঐক্যের নিশানায় যখন কাজ হয়নি তখন অনৈক্যের পথটা তিনি সবলে আঁকড়ে ধরেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে কংগ্রেস-রাজনীতির দায়ও অস্বীকার করা চলেনা। বিশেষ করে তাদের দোলাচলবৃত্তি নিয়ে।

AMARBOI.COM

দুই

জিন্না বিষয়ক অভিসন্দর্ভ গ্রন্থ 'দ্য সোল স্পোকসম্যান'-এর রচয়িতা আয়েশা জালাল লিখেছেন : '১৯৪০ সাল থেকে জিন্না (অর্থাৎ জিন্না রাজনীতির) পক্ষে এমন দাবি অগ্রাধিকার পেয়ে যায় যে মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে তাকেই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র (সোল স্পোকসম্যান)হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এটার ওপর তিনি বরাবর জোর দিয়ে চলেছেন' (পৃষ্ঠা ৬০)। এ দাবি আদায়ের 'দ্বান্দ্বিক লক্ষ ছিল কংগ্রেস ও রাজ সরকার। কংগ্রেসের সঙ্গে এ বিষয়ে ছিল দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা এবং শাসকের কাছে আবেদন।'

একমাত্র প্রতিনিধি বা মুখপাত্র হিসেবে কাজ করার চিন্তা প্রথম থেকেই জিন্নার মাথায় এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে রাজনীতির ক্ষেত্রে এর বাইরে অন্যকোনো ভাবনা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ জন্য শাসকদের সঙ্গে দেন-দরবারেও তার আপত্তি ছিলনা। চল্লিশের অনেক আগে থেকেই জিন্না এ লক্ষ্য সামনে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। কংগ্রেসের মঞ্চে এবং সর্বদলীয় সম্মেলনে তার দাবি নাকচ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ জিন্না দেশ ছেড়ে গিয়ে লন্ডনে বসবাস শুরু করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫-এ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড থেকে ভারতে লিনলিথগো শাসনের আমলে ব্রিটিশরাজ সুপরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ব্যবস্থা পাকা করেন ১৯৩৫ সনে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ('কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড') প্রবর্তনের মাধ্যমে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিভাজক সহিংসতা সচল করে কংগ্রেসের 'রাজ'-বিরোধী আন্দোলন দমন করা। এই ব্যবস্থার মূল উপাদান ছিল 'ভাগ কর' নীতির প্রয়োগে হিন্দু-মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং মুসলমান, শিখ, ইউরোপীয়, খ্রিস্টান ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য আসন সংরক্ষণ।

প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণই তাদের সম্প্রদায়-স্বার্থরক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যোগ করা হয় হিন্দু-মুসলমানকে রাজনীতি ক্ষেত্রে আলাদা করতে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা, যা শিখদের জন্য করা হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত আসন তাদের জনসংখ্যা অনুপাতের তুলনায় অনেক অনেক বেশি ছিল, যাতে প্রদেশে ও কেন্দ্রে শাসনক্ষমতার দড়িটা হাতে রাখা যায়। এ রোয়েদাদে প্রাদেশিক শাসনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ভারতীয় রাজনীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন জিন্না। অথবা বলা যায় সুবিধা-সুযোগের পরিস্থিতি তাকে আবার রাজনীতির অঙ্গনে টেনে নিয়ে আসে। মুসলিম লীগের ভাঙাচোরা ও জরাজীর্ণ সাংগঠনিক অবস্থা মেরামত করতে জোরালো ডাক পড়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নার। যুক্ত-প্রদেশের দুই লীগ-নেতা লিয়াকত আলী খান ও চৌধুরী খালিকুজ্জামান জিন্নাকে টেনে নিয়ে আসেন লন্ডন থেকে ভারতে।

আর এটাও হয়তো ঠিক (যা বলেছেন হডসন বা যশবন্ত সিং) যে ভারতীয় মুসলমানদের (অবশ্য উচ্চবর্গীয় ও শিক্ষিত শ্রেণির) আকাঙ্ক্ষা ছিল তাদের হয়ে কথা বলার মতো একজন শক্তিমান যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিনিধি বা নেতার। সে যোগ্যতা জিন্নার ছিল। ছিল আরো কারো কারোর যারা সম্প্রদায়বাদী পথে পা বাড়াতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাজেই মুসলিম লীগের জন্য একমাত্র যোগ্য নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্না। সে মুহূর্তে এর কোনো বিকল্প ছিল না। ভারতে এসেই জিন্না সংগঠন মেরামতের কাজে লেগে গেলেন। হতাশাগ্রস্ত জিন্নার বদলে লন্ডন থেকে ফিরে এলেন নতুন জিন্না। কণ্ঠে তার চড়া সুর ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে এবং সম্প্রদায়বাদী হাতিয়ার নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোরালো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। তিনি তখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি ও অবিসংবাদী নেতা। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তার জন্য যে সুযোগ এনে দেয় সে পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানপ্রধান দুই প্রদেশ বাংলা ও পাঞ্জাব এবং মুসলমান ভূস্বামী ও শিক্ষিত প্রাধান্যের হিন্দুসংখ্যাগুরু যুক্তপ্রদেশ কজায় আনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের যে শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব ভারতবর্ষে আইনে পরিণত হয় (১৯৩৫) তার যথাযথ সদ্ব্যবহারের অপেক্ষায় ছিলেন ভাইসরয় লিনলিথগো। সে প্রয়োজন মেটাতে তিনি মুসলিম লীগকে সমর্থন বা সহায়তা দেবেন এটাই যুক্তিসঙ্গত। তবু সংশয় ছিল ভাইসরয়ের মনে যে জিন্না লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবেন কি না বিশেষ করে যখন নির্বাচনের জন্য সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাদি নেয়া হয়ে গেছে। জিন্নাও বেশ কড়া ভাষায় কংগ্রেস-বিরোধী (হিন্দুবিরোধী) বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। তার কথা হলো ভারতীয় মুসলমান কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনো প্রকার রাজনৈতিক সদাচার আশা করতে পারে না। কংগ্রেস ও হিন্দুত্ববাদ তিনি একাকার করে নেন। তাই মুসলমানদের দাবি-দাওয়া তাকে এবং মুসলিম লীগকেই তুলে ধরতে হবে।

দায়টা তাদের, অধিকারও তাদের। আর কারো নয়। এমন কথা জিন্না বুঝিয়ে দেন সবাইকে, যেমন কংগ্রেসকে তেমনি শাসকদের। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কংগ্রেসকে পুরোপুরি হিন্দু সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করতে তার বাধেনি। অভিযোগ পুরোপুরি সঠিক ছিল না।

আমরা তাই দেখি পৃথক নির্বাচনের সুযোগ-সুবিধায় উদ্দীপ্ত জিন্না তার অযৌক্তিক উদ্ধত ভাষায় দাবি রাখেন যে '৯৯ শতাংশ ভারতীয় মুসলমান তার সঙ্গে রয়েছে– অবশ্য কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতক, বাতিকগ্রস্ত, পাগল বা অতিমানব বাদে' (উদ্ধৃতি যশবন্ত সিং)। তার মতে, গোটা মুসলমান সমাজের পক্ষে কথা বলার অধিকার একমাত্র তারই রয়েছে। এ সময় থেকে বেশ উগ্র ভাষায় বিবৃতি দিতে থাকেন জিন্না। জিন্নার এই উক্তি মনে করিয়ে দেবে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় এসে তার অনুরূপ বক্তৃতা যেখানে তিনি ভাষাআন্দোলনে যুক্ত বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের চিহ্নিত করেন বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী ও ভারতীয় চর হিসেবে যারা পাকিস্তান ভাঙতে বদ্ধপরিকর।

এ রকম একাধিক ঘটনা থেকে জিন্না চরিত্রের দম্ভ, অহমিকা, কাঠিন্য ও একনায়কসুলভ মনোভঙ্গি বুঝতে পারা যায়। কিন্তু যখন তিনি দাবি করছেন ৯৯ শতাংশ ভারতীয় মুসলমান তার ও মুসলিম লীগের পক্ষে, তখনো দেখা যাচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানও তার পক্ষে নেই। তাদের সমর্থন বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী অসাম্প্রদায়িক মুসলিম-প্রধান সংগঠনের পেছনে। বাংলা থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এমনকি পাঞ্জাব পর্যন্ত ১৯৩৭-এর নির্বাচন তা প্রমাণ করে দেয়।

বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রজাপার্টির পক্ষে ভোটসংখ্যা, পাঞ্জাবে সিকান্দার হায়াত খানের সমন্বয়বাদী ইউনিয়নিস্ট পার্টির একাট্টা বিজয়, সিন্ধুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাবকশ প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-বিরোধীদের প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক ভোট প্রমাণ করে যে জিন্না বা মুসলিম লীগ তখনো সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি। এজন্য তাকে প্রায় এক দশক সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে, তখনো পুরো হিসেবে নয়। রাজ-এর প্রস্থান ও দেশভাগের পেছনে রয়েছে আরো কারণ। আবারো বলতে হয় এ অর্জনে কংগ্রেসের ভুলভ্রান্তি কম অবদান রাখেনি।

মুসলমান জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ বা তার কাছাকাছি সমর্থন পাওয়ার যে সম্ভাবনা কংগ্রেসসহ জাতীয়তাবাদী মঞ্চের পক্ষে তিরিশের দশকের শেষ দিকেও দেখা দিয়েছিল তা হিন্দু মহাসভাপন্থীদের উগ্র কর্মসূচিতে এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে হিন্দু-মহাসভা সমর্থক ও রক্ষণশীল কিছু সংখ্যক নেতার ভূমিকায় নস্যাৎ হয়ে যায়। মুসলমান জনসমর্থনের গুরুত্ব কংগ্রেস বুঝতে পারেনি।

একটু পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, বিশ শতকের প্রথম দিকে পরিস্থিতি সেক্যুলার রাজনীতির অনুকূল ছিল। জিন্নার নিজ প্রদেশ তৎকালীন বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই)-এর মুসলিম জনতার রাজনৈতিক মানসিকতার হিসাব নিলে তা বোঝা যায়। মুসলমান জনতা এবং মুসলমান রাজনৈতিক নেতাকর্মী বিশের দশকের উত্তপ্ত সময়েও পুরোপুরি মুসলিম লীগের পেছনে ছিল না। একটি ছোট্ট পরিসংখ্যানে দেখা যায় মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ বোম্বাই শাখার সাধারণ সদস্য সংখ্যা ১৯২২ সালে মাত্র ১০৯৩, ১৯২৩ সালে ১০৯৭, ১৯২৫ সালে ১১৮৪ জন (মুসলিম লীগের বার্ষিক রিপোর্ট, উদ্ধৃতি মুশিরুল হাসানের)।

এর চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো 'কোরামের অভাবে ১৯২৯ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশন স্থগিত করা হয়। এমনকি ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের বহুখ্যাত এলাহাবাদ অধিবেশনে স্যার মোহাম্মদ ইকবালের ঐতিহাসিক ভাষণের সময় (যে সময় ইকবাল ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র অঞ্চলের দাবি তোলেন) ৭৫ জন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন না, যা সভার কোরামের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল (হাসান, প্রাগুক্ত)। এ অবস্থা চলেছে তিরিশের দশক অবধি।

তিন

তবে একথাও ঠিক যে, ১৯৩৫-এর পৃথক নির্বাচন সংবলিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ নির্বাচনের সম্ভাবনা সামনে রেখে মুসলিম লীগের পালে বাতাস লাগায়। এর পেছনে ছিল জিন্নার সাংগঠনিক তৎপরতা। আর বড় বিষয় ছিল মুসলমান ভূস্বামী, উঠতি শিক্ষিত শ্রেণির উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছাত্র-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবসমাজের স্বপ্ন যা মুসলিম লীগের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির পায়ের নিচে কিছুটা ভিত তৈরি করে। তখনো ভারতের দুই মুসলমান-প্রধান প্রদেশ বঙ্গ ও পাঞ্জাবে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রাধান্য। কিন্তু বঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠনগত কাঠামো দুর্বল। তার প্রমাণ মেলে নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যায় এবং লীগ বা প্রজাপার্টি কারো পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায়। পরে হক সাহেবের রাজনৈতিক ভুলের কারণে মুসলিম লীগ ওই স্বতন্ত্র আসনগুলো দখল করে নেয়।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা রক্ষায় শাসনচক্রের সহানুভূতি বরাবরই ছিল মুসলিম লীগের দিকে। কারণ লীগ কখনো ভারতে শাসক-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ঘটায়নি। তাই লীগ-'রাজ'-এর সুসম্পর্ক বরাবরের ঘটনা- কখনো গভীর আঁতাত। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পর আঁতাত আরো বেড়েছে। ভারত সচিব জেটল্যান্ড থেকে ভাইসরয় লিনলিথগো সবাই যথাক্রমে তাদের নীতিতে ও শাসনে এ ধারাই রক্ষা করে চলেছেন।

আগস্ট ১৯৩৮-এ জিন্না সরাসরি ভাইসরয়কে প্রস্তাব দেন যে, মুসলিম লীগ ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে সহযোগিতায় প্রস্তুত। এমনকি এরকম প্রস্তাবও রাখেন যে, কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলিম স্বার্থরক্ষায় 'রাজ' বন্ধু হিসেবে ভূমিকা নিলে মুসলিম লীগ কেন্দ্রে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সমর্থন জোগাতে পারে (লিনলিথগো পেপারস, উদ্ধৃতি যশবন্ত সিং)। সম্প্রদায়স্বার্থে দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থ বিসর্জনের ভাবনাও জিন্নার হাত ধরে মুসলিম লীগের রাজনীতি হয়ে দাঁড়ায়।

AMARBOI.COM

এর মধ্যে ১৯৩৯ সেপ্টেম্বরে সূচিত বিশ্বযুদ্ধ লীগ রাজনীতির জন্য শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এ পরিস্থিতিতে দলীয় মতবিরোধের মধ্যেই রাজ-বিরোধী অবস্থান নেয়। নেয় দেশের সাধারণ মানুষও। এমনকি ১৯৪১-এ যুদ্ধের চরিত্রবদল ও কমিউনিস্টদের এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধ ঘোষণা করার পরও সাধারণ মানুষের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। স্বভাবতই শাসকচক্র সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায় মুসলিম লীগের দিকে এবং জিন্নাও শাসকদের দিকে তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

জিন্নার ব্রিটিশ সহযোগিতার ধারা দেশবিভাগের সময় অবধি অক্ষুণ্ন থাকে, সেজন্য ১৯৪২-এ কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে জিন্না-লীগ দূরত্ব বজায় রেখে চলে যা ইতিপূর্বে আলোচিত। ভারতসচিব জেটল্যান্ডকে পরিস্থিতি অবহিত করতে গিয়ে ভাইসরয় লিনলিথগো স্বীকার করেন যে, জিন্না কংগ্রেসি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারকে মূল্যবান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্য দিয়েছেন যে জন্য তিনি তার কাছে কৃতজ্ঞ। **জিন্না সরকারবিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসকে সমর্থন জানালে 'রাজ' সরকারের জন্য তা খুব অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াত' (লিনলিথগো ও ভারতবর্ষ, গওহর রিজভী)।**

এ বিষয়ে একাধিক ইতিহাস লেখকের বিবরণ একই রকম। সুমিত সরকারও তার 'আধুনিক ভারত' গ্রন্থে তথ্যাদিযোগে মন্তব্য করেছেন যে 'জিন্নাকে ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে টেনে তুলতে রাজশক্তির ভূমিকা ছিল খুবই বড়'। স্বভাবতই জিন্না সে সুযোগ নিয়েছেন তার রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য। তবে সে শক্তিবৃদ্ধি স্বাভাবিক পথ ধরে চলেনি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রকাশ ঘটিয়ে মুসলিম লীগ প্রচারে ও কর্মকাণ্ডে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে সাহায্য করেছে, পরিণামে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা।

ফলে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের যত অবনতি ঘটেছে মুসলমান জনমত ততই মুসলিম লীগের দিকে ঝুঁকেছে। সমঝোতার কোনো অবকাশ রাখেনি জিন্নার রাজনীতি। গান্ধি-নেহরুর কথা বাদ দিলেও কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষ বসু জিন্নার সঙ্গে সংলাপ, সমঝোতা ও মতৈক্যের যে চেষ্টা চালান তাতে জিন্না সাড়া দেননি। ব্যক্তিগতভাবে জিন্না গান্ধি-নেহরুকে পছন্দ করতেন না, বিশেষ করে নেহরুকে। কিন্তু সুভাষ সম্পর্কে তেমন বিরূপতা তার ছিল না। তবু সমঝোতা হয়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি সুভাষ নন, কংগ্রেস সভাপতি তথা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো প্রকার আপসে যেতে রাজি ছিলেন না লীগ সভাপতি জিন্না।

ব্যক্তিসম্পর্কও যে তার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতো তা দেখা গেছে গান্ধি-নেহরুর সঙ্গে তার সম্পর্কের বিরূপতায়। আবার ভিন্ন কারণে কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদকে সহ্য করতে পারতেন না জিন্না। অথচ আজাদ নেহরুর মতো অসহিষ্ণু, আবেগতাড়িত ছিলেন না। ছিলেন না বক্তৃতা-বিবৃতি বা সংলাপে বেসামাল। তবু ধীরস্থির, বিনয়ী, নম্রবাক রাজনীতিক আজাদের সঙ্গে করমর্দন না করার অসৌজন্য দেখাতে পেরেছিলেন জিন্না সিমলা সম্মেলনে। তার বিলেতিকেতায় ও সংস্কৃতিতে এ জাতীয় আচরণ আপত্তিকর হিসেবে বিবেচিত। তবু তিনি ঐ আপত্তিকর কাজ নির্দ্বিধায় করেছিলেন।

এমন এক অস্বাভাবিক মানসিকতা ও তেমনই রাজনীতির পথ ধরে বিভাজিত মুসলমান সমাজের একাংশের রাজনৈতিক প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী জিন্না ওই সমাজের একমাত্র প্রতিনিধিত্বের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তবে এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত জিন্নার সামনে শিখরে ওঠার সিঁড়ি এগিয়ে দেন দুই আঞ্চলিক নায়ক– বাংলার ফজলুল হক ও পাঞ্জাবের সিকান্দার হায়াত খান। জিন্নার 'একমাত্র মুখপাত্র' হয়ে ওঠার পেছনে এরাই প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে দুই প্রদেশ নিয়ে জিন্না সর্বদা শঙ্কিত, চিন্তিত সেই দুই প্রদেশের অবিসংবাদী দুই নেতা নিজেদের দল ভেঙে দিয়ে জিন্নার হাতে সব সমর্পণে যেন দায়মুক্ত হলেন। বিষয়টা ইতিপূর্বে আলোচিত। এই দুই প্রদেশের মুসলিম জনসমর্থন পেয়ে মুসলিম লীগের মরাগাঙে ভরাজোয়ার। এর সূচনা অবশ্য ১৯৪০-এ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ভুবনের স্বাপ্নিক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকে।

কিন্তু ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে জিন্নার একাধিপত্যের প্রকৃত প্রেক্ষাপট রচিত হয় মুসলিম লীগ থেকে ফজলুল হকের বহিষ্কার ও বঙ্গে লীগ বিরোধী হক মন্ত্রিসভার পতনে এবং সিকান্দার হায়াত খানের অকালমৃত্যুতে। হক মন্ত্রিসভা পতনে অবশ্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা, অন্যায় জবরদস্তির ভূমিকা পালন করেছিলেন বাংলার গভর্নর। যেখানে লীগের সঙ্কট সেখানেই দেখা গেছে অযাচিতভাবে 'রাজ'-শাসনযন্ত্রের পরিত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভাব। সিন্ধুতেও দেখা গেছে সেখানকার গভর্নরের লীগের পক্ষে অনৈতিক পদক্ষেপ।

এ আলোচনা দীর্ঘ হতে পারত একের পর এক ঘটনার বিচারে ১৯৪৭ আগস্ট পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই যখন জিন্না-প্রশস্তি সত্ত্বেও আয়েশা জালাল লিখতে পারেন যে শক্তিশালী কেন্দ্র সম্পর্কে প্রদেশগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে লিনলিথগো জিন্নাকে মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলোর একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করেন (পৃ. ৭৪)। জিন্নাকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র করে তোলার জন্য ভারতে ব্রিটিশরাজ কতটা ব্যস্ত ছিল তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে তা বুঝতে পারা যায়।

ভাইসরয়দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে জিন্নার দাবি নানামাত্রায় প্রকাশ পেতে থাকে। এক সময় তিনি সরকারকে বলেন যে, মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সমমর্যাদা দিতে হবে। অথচ মুসলমান জনসংখ্যা সমগ্র ভারতের এক-তৃতীয়াংশেরও কম। কিন্তু জিন্না গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পক্ষে নন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলেন যে, ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার চলবে না, গণতন্ত্রে তার বিশ্বাস নেই। তিনি ভাইসরয়কে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, সমস্যার একমাত্র সমাধান ভারত বিভাগ। বিষয়টা পরে বিস্তারিত আলোচনায় বিবেচ্য এ কারণে যে, আয়েশা জালালসহ একাধিক ইতিহাস লেখক মনে করেন, জিন্না পাকিস্তান চাননি। ওটা ছিল তার দরকষাকষির হাতিয়ার।

সবকিছু মিলে অতি সংক্ষিপ্ত বিবেচনায় এটা স্পষ্ট যে, জিন্নার ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে ওঠার চেষ্টায় যেমন স্থানীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ভুলভ্রান্তি অবদান রেখেছে, তেমনি তাতে অনেক বেশি শক্তিমান ভূমিকা রাজশক্তির। তাদের ইচ্ছায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে জবরদস্তিতে

দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান। তাও আবার হিন্দু-মুসলমান শিখদের রক্তস্রোতের মাধ্যমে।

আগেই বলেছি স্থানীয় রাজনীতির তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি জিন্নাকে সাহায্য করেছে, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক প্রাদেশিকতা। এক কথায় আঞ্চলিক রাজনীতি ও ভূখণ্ডপ্রেমের প্রভাব। যার ফলে এমন মনোভাব রাজনীতিতে প্রাধান্য পায় যে, 'পাঞ্জাব পাঞ্জাবিদের জন্য' 'সিন্ধু সিন্ধিদের জন্য', 'সীমান্ত অর্থাৎ পাখতুনিস্তান পাখতুনদের জন্য'। একই ধারায় ফজলুল হকও বাংলা-বাঙালি নিয়ে উদ্বিগ্ন। এ অসাম্প্রদায়িক ধারার জাতীয়তাবাদের নায়ক হচ্ছেন গাফফার খান, সিকান্দার হায়াত খান, আল্লাবকশ এবং বঙ্গের ফজলুল হক। কিন্তু রাজের কূটচালে তাদের প্রাদেশিকতার স্বাদেশিকতা জিন্না-মুসলিম লীগের পক্ষে চলে যায়।

এ বিষয়ে সবশেষ কথা হলো নানামাত্রিক এতো চেষ্টা সত্ত্বেও জিন্না বা লীগ সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বা মুখপাত্র হতে পারেনি। স্বতন্ত্র ভুবন ও দেশবিভাগ তথা পাকিস্তান ইস্যুভিত্তিক নির্বাচন সত্ত্বেও পারেনি। ১৯৪৬-এর নির্বাচনের ফলও অংশত তা প্রমাণ করে। ব্যতিক্রম একমাত্র বঙ্গদেশ। সেখানে জিন্না ঠিকই মুসলিম রাজনীতির মুখপাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্না পাকিস্তান চাননি : প্রশ্নবিদ্ধ মিথ

ভারতীয় রাজনীতির দাবার ছকে কংগ্রেসের তুলনায় হয়তো কিছুটা বেশিই চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে খেলেছেন লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্না। আশ্চর্য যে, সময় ও ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পক্ষে কাজ করেছে। আর রাজশক্তি তো বরাবরই তার পক্ষে। যে রাজশক্তি তাকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক মুখপাত্র হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। বিষয়টা ইতিপূর্বে আলোচিত।

আর এক্ষেত্রে জিন্নার কৌশলটা হচ্ছে ঘরোয়া বা আন্তর্জাতিক যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনায় (ইস্যুতে) তিনি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত দেখে নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিতেন। বলেছেন হডসন। কংগ্রেস বিষয়টা লক্ষ্য করেছিল, না উপেক্ষা করেছে তা আমাদের জানা নেই। তবে জিন্নার পদ্ধতি বরাবরই ছিল এ রকম। যেমন বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভারতীয় রাজনীতির প্রতিক্রিয়া নিয়ে। আগে বলা হয়েছে এ যুদ্ধ জিন্না ও মুসলিম লীগের জন্য 'শাপে বর' হয়ে ওঠে।

সেপ্টেম্বরে (১৯৩৯) বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের ব্রিটিশ শাসক ভাইসরয় লিনলিথগো ঘোষণা করেন (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) যে 'ব্রিটিশরাজ ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ভারতে এখন যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে।' এর অর্থ জরুরি অবস্থার শাসন। এদিক-ওদিক মাথা নাড়লে অর্থাৎ আন্দোলন-টান্দোলনে গেলে জরুরি অবস্থার আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর আন্দোলন মানে কংগ্রেস। লীগ তো জন্মাবধি ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতাবাদী বা স্বরাজ্যবাদী আন্দোলনগুলো থেকে দূরে থেকেছে। কখনো রাজ বিরোধিতায় নামেনি। এই ছিল মুসলিম লীগের রাজনৈতিক চরিত্র।

স্বভাবতই জরুরি অবস্থা, যুদ্ধাবস্থায় রাজনৈতিক দিক থেকে 'রাজ'-এর একমাত্র ভরসা জিন্না ও মুসলিম লীগ, এক কথায় জিন্নালীগ। হিসাব-নিকাশে বেনিয়াজাতি বড় ওস্তাদ। না হলে সমুদ্রের ওপার থেকে বাণিজ্য করতে এসে এত বড় একটি উপমহাদেশ দখল করে নিতে পারে? এ হিসাবটা দেশি রাজনীতিকদের কমই ছিল। ছিল না বলেই ওদের ভাগ কর, শাসন কর নীতি চোখের সামনে দেখেও বড় বড় নেতা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি।

যাই হোক, পাশার দান ঠিক মতোই পড়ল। যুদ্ধ ঘোষণার প্রায় পক্ষকালের মধ্যেই কংগ্রেস ফ্যাসিস্ট নাৎসি শক্তির বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ জানিয়েও ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ-এর মনোভাব জানতে চেয়ে এবং জরুরি অবস্থা জারির বিরোধিতা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। জিন্না অপেক্ষা করছিলেন কংগ্রেসের মনোভাব ও সিদ্ধান্তের জন্য। সেটা জানা হয়ে যাওয়ার পর ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) জিন্না-লীগের বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

তাদের মতে, ভারতীয় ব্রিটিশরাজ বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমান সমর্থন অবশ্যই আশা করতে পারে যদি তারা এমন নিশ্চয়তা দেন যে মুসলিম লীগের অনুমোদন ছাড়া ভারতে কোনো সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টা করা হবে না এবং ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলা ও যে কোনো প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 'ভেটো' দেয়ার অধিকার মুসলিম লীগের থাকবে (হডসন, 'দ্য গ্রেট ডিভাইড' পৃ. ৭৭-৭৮)।

এ প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবেই বলা যায় জিন্না ও লীগের ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র হওয়ার দাবি ১৯৪০-এর পর থেকে শুরু (আয়েশা জালাল) হয়নি। এর সূচনা আগে থেকেই। বর্তমান প্রস্তাবের (অক্টোবর, ১৯৩৯) আগেও নানাভাবে জিন্না তাঁর এ মনোভাব প্রকাশ করেছেন যা নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আসলে 'একমাত্র মুখপাত্র' হওয়ার বিষয়টি গোড়া থেকেই জিন্নার মাথায় এমনভাবে গেঁথে যায় যে, এটাই তার রাজনৈতিক জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র ভুবনের চিন্তা।

AMARBOI.COM

কংগ্রেস ও লীগের পরস্পর-বিরোধী অবস্থান ও প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে হডসনের মন্তব্য : 'সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এর যুদ্ধাবস্থার পরিবেশে কোনো সরকারের পক্ষে পরস্পর-বিরোধী এসব দাবি-দাওয়া মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। বাস্তবিকই শক্তির এই ত্রিকোণ-দ্বন্দ্ব ভারতবিভাগের পূর্বপর্যন্ত সচল ছিল।' এবং এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে এই অনড় দ্বন্দ্বই ভারতবিভাগ নিশ্চিত করেছিল। এর দায় জিন্নার হলেও কংগ্রেস দায়মুক্ত ছিল না।

কংগ্রেসের বরাবরের দাবি বয়স্ক জনভোটে নির্বাচিত গণপরিষদ সংবিধান তৈরি করবে সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষার ভিত্তিতে এবং তা স্বাধীন ভারতে। অন্যদিকে জিন্নার দাবি তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো সংবিধান তারা মেনে নেবেন না। ভাইসরয় লিনলিথগো এ দ্বন্দ্বের সুযোগ ভালোভাবে নিতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে। কংগ্রেসের ক্ষমতা ত্যাগের অদূরদর্শিতা মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি করে। মধ্যপন্থী বা দোদুল্যমান মুসলমান নেতা অনেকে লীগের শিবিরে একে একে জমায়েত হতে থাকেন। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগে উৎফুল্ল জিন্না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় মুসলমানদের 'শুকরিয়া দিবস' পালনের আহ্বান জানান (২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)। কী অদ্ভুত 'স্যাডিস্ট' মানসিকতা!

এই পরস্পর-বিরোধিতার মুখে জিন্না স্পষ্ট ভাষায় একাধিকবার দাবি জানিয়েছেন, 'ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি এবং সে হিসেবে তারা ভারত শাসনে অংশ নেবে'। কথাটা ভি পি মেনন, এইচ ভি হডসন কিংবা আয়েশা জালাল সবাই উল্লেখ করেছেন। এটা স্পষ্টই জিন্না-কথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে অভিমত যা পরে লাহোর প্রস্তাবে জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়।

এর আগের একটি ঘটনায়ও দেখা যায় দ্বিজাতিতত্ত্ব ও ভারতভাগ করে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব ভারত সচিব জেটল্যান্ডের কাছে তুলে ধরেন মুসলিম লীগ নেতা খালিকুজ্জামান। খালিকুজ্জামানের বক্তব্যে জানা যায়, লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক হতাশায় আক্রান্ত খালিকুজ্জামান (১৯ মার্চ, ১৯৩৯) লনডনে জেটল্যান্ডকে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বিশেষ সম্ভাবনার কথা বলেন। তাতে স্পষ্টই ভারত ভাগের কথা বলা হয়। এবং ভারতসচিব 'হ্যাঁ' 'না' কিছু না বললেও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি। (উদ্ধৃতি, যশবন্ত সিং, প্রাগুক্ত)। বরং কিছুটা সহানুভূতির সুরেই কথা বলেছেন তিনি।

AMARBOI.COM

দুই

জিন্নার একের পর এক বিবৃতি, তার রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রমাণ করে যে নানা কারণে ভারত দ্বিখণ্ডিত করে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ভুবন (পাকিস্তান) প্রতিষ্ঠা তার জন্য যেন জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জেদের বশবর্তী হয়ে যুক্তিতর্কের বাইরে দাঁড়ানোর কারণে তিনি ভেবে দেখতে চাননি যে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে, শহরে এবং অলিতে-গলিতে, গ্রামগঞ্জে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি এমনভাবে বাস করছে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভূখণ্ডভিত্তিতে ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে পুরোপুরি আলাদা করা অসম্ভব।

কথাটা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ একাধিকবার বলেছেন এবং সে সম্ভাব্যতা বিচার করেই তিনি যুক্তি দিয়ে, তথ্য দিয়ে মুসলমানদের জন্য খণ্ডিত ভারতের অংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠনের অবাস্তবতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তার বক্তব্যে। সে অবাস্তবতা সামাজিক-রাজনৈতিক। শেষ পর্যন্ত তার আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছে। জিন্নার জেদে সাড়ে তিন কোটি মুসলমান জনসংখ্যা ভারতে ফেলে রেখে ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জিন্নারই ভাষায় 'পোকায় কাটা পাকিস্তান' গঠিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্না কথিত ওই রাজনৈতিক তত্ত্বের কারণে পেছনে ফেলে যাওয়া কয়েক কোটি মুসলমান ভারতে রাজনৈতিক বিচারে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। উপমহাদেশ ভেঙে গঠিত হয় চিরবৈরী দুই ডোমিনিয়ন ভারত ও পাকিস্তান (জিন্না ও মুসলিম লীগের ভাষায় হিন্দুস্তান ও মুসলমানিস্তান তথা পাকিস্তান)। দুই ডোমিনিয়নের সীমানা নির্ধারণেও সেই অবাস্তবতার প্রকাশ ঘটেছে। বঙ্গবিভাগের সময় দেখা গেছে জেলা ভাগ, মহকুমা ভাগ করেও ভাগবাটোয়ারায় সুবিচার করা যায়নি। কারো জমির ওপর দিয়ে, কারো উঠানের ওপর দিয়ে বিভাজন রেখা টানতে হয়েছে। অশেষ দুর্ভোগ তৈরি হয়েছে র‍্যাডক্লিফের টানা সীমান্তরেখার উভয় পারের মানুষের জন্য। বিদেশি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কেউ কেউ (যেমন এমার্সন) এ বিভাজনজাত রাষ্ট্র পাকিস্তানকে 'অদ্ভুত রাষ্ট্র' বা 'উদ্ভট রাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আরো এ কারণে যে সেই এক রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে সীমান্তহীন হাজার মাইলের ব্যবধান। সে উদ্ভটত্বের দায়ও পুরোপুরি জিন্নার, যিনি লাহোর প্রস্তাবের দুই পাকিস্তানকে তার দুর্বুদ্ধির খোঁচায় এক পাকিস্তানে পরিণত করেন। বলেন, states-এর 'এস (s)' অক্ষরটি টাইপের ভুলে যুক্ত হয়েছে।

স্ট্যানলি উলপার্ট তার 'জিন্না অব পাকিস্তান' গ্রন্থে (অক্সফোর্ড গ্রুপের) একাধিক মন্তব্যে জিন্নার পাকিস্তান বিষয়ক 'অবসেশনের' বিষয়টি তুলে ধরেছেন। উল্লেখ করেছেন জিন্নার অসম্ভব অহম্‌বোধের কথা। তার মতে, জিন্না ভাইসরয় লিনলিথগো বা ভারতসচিব জেটল্যান্ডের চেয়েও 'শীতল রক্ত ও অসীম ধৈর্যের মানুষ'। যদি লাহোর প্রস্তাবের সময় থেকেও ধরা যায় তাহলেও দেখা যাবে যে জিন্নার বক্তৃতা ও দেনদরবার কোনোটিতেই সমঝোতার মনোভাব ছিল না। ছিল ভারতভাগ করে পাকিস্তান আদায়ের জেদ।

এ আদায়ের জন্য বরাবর দুটো নীতি অনুসরণ করেছেন জিন্না। প্রথমত, তার মতে ভারতের হিন্দু মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি (ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়), তাদের সহাবস্থান সম্ভব নয় (যদিও শত শত বছর তারা একসঙ্গে থেকেছে)। দ্বিতীয়ত, বিদেশি শাসনমুক্ত ভারতে মুসলমান হিন্দুশাসনে থাকবে না, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক কারণে তাদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র চাই এবং তা ভারতভাগ করে। এ তথ্যগুলো ইতিহাসবিদ সবাই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা বিচারে কেউ কেউ তাতে ভিন্ন তাৎপর্য আরোপ করেছেন। কিন্তু জিন্না একথাও বলেছেন, ভারতীয় মুসলমান হিন্দুর দাসত্বে থাকবে না।

আয়েশা জালাল তার 'দ্য সোল স্পোকসম্যান' বইতে দাবি করেছেন যে লাহোর প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে জিন্নার জন্য ছিল 'দেনদরবারের কাউন্টার' এবং তা দেশবিভাগ বা পাকিস্তান আদায়ের জন্য নয়। কথাটা ২০০৫ সনেও হুসেইন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাক্কানি একই সুরে বলেছেন তার বই 'বিটুইন মস্ক অ্যান্ড মিলিটারি'তে। কিন্তু ঘটনা ও তথ্য তাদের এ দাবি সমর্থন করে না।

জালালের অভিসন্দর্ভে উল্লিখিত মতামত মেনে নেয়া কঠিন। আগেই বলেছি অনেক ঘটনা ও বক্তব্য এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই যায়। আসলে একালে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ গ্রুপের সংশোধনবাদী গবেষকদের একাংশে জিন্নার রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ভিন্ন আদলে তুলে ধরার প্রবণতা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং তা শুধু জিন্না প্রসঙ্গেই নয়, ভারতবিভাগের দায়দায়িত্ব নিয়েও বটে। সেক্ষেত্রে চেষ্টা মূল দায় কংগ্রেসের ওপর চাপানো। ইতিহাস বিচারের এ ধারা পুনর্বিবেচনাবাদী (রিভিশনিস্ট) হিসেবে চিহ্নিত। একে সংশোধনবাদীও বলা চলে। শুধু আয়েশা জালাল নন, একাধিক গবেষক এ ধারায় যুক্ত। যেমন অসীম রায়ের একটি আলোচনা 'সংশোধনবাদী প্রেক্ষাপটে ভারত বিভাগের শীর্ষ রাজনীতি' (সম্পাদনা : মুশিরুল হাসান)।

অসীম রায় পূর্বোক্ত প্রবন্ধে মাওলানা আজাদের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আজাদ নেহরুকে সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে ভারতবিভাগে রাজি হলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না এবং বিভাজনের দায় লীগের নয় কংগ্রেসের ওপরই পড়বে। এখন অনেকের বিচার-ব্যাখ্যায় বিভাগের দায় সেদিকেই ঘুরতে শুরু করেছে। এমনকি তাতে দায়দায়িত্ব বিষয়ক নতুন কিছু শাখা-প্রশাখার উদ্ভব ঘটছে এবং সিদ্ধান্তগুলো (পুনর্বিবেচনাবাদী ধারার) জিন্নার পক্ষে যাচ্ছে। যশবন্ত সিং-এর ঢাউস বইটাও ওই একই ধারার। তবে বিশেষ উদ্দেশ্য সেখানে পরিস্ফুট। সে উদ্দেশ্যটি রাজনৈতিক যা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির তাত্ত্বিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে সহায়ক হতে পারে। আরো স্পষ্টভাষায় ভারতভাগের দায়টা পুরোপুরি কংগ্রেসের ওপর চাপানো গেলে অখণ্ড ও সনাতন ভারতপন্থীদের রাজনৈতিক প্রচারে সুবিধা হয়। আর একটি কথা, জিন্না কনফেডারেশন চাইলে মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব বিনাশর্তে মেনে নিতেন। কারণ ওই প্রস্তাব কনফেডারেশন তুল্যই ছিল। কিন্তু জিন্না কনফেডারেশন চাননি, বরং লাগাতার পাকিস্তান দাবিই তুলে ধরেছেন। তাই জিন্না কনফেডারেশনে রাজি ছিলেন, এমন বক্তব্য ধোপে টেকে না।

তিন

ইতিহাস পাঠকের জন্য 'ভারতবিভাগ, জিন্না ও কংগ্রেস' বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে এর ব্যাপকতা ও ধীমান ইতিহাসবিদগণের তাতে অংশগ্রহণের কারণে। চরিত্র বিচারে এগুলোকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিভাজন সাহিত্য' হিসেবে চিহ্নিত করা মনে হয় অসঙ্গত হবে না। বর্তমান প্রবণতা হলো বিভাজন বিতর্ককে দুই বিপরীত ধারায় বিন্যস্ত করা। একদিকে প্রচলিত ধারণা-ভিত্তিক ইতিহাস যা মূলত নব্যতাত্ত্বিকদের বিচারে রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যবাদী ধারা, অন্যদিকে নব্য বিপরীত ধারাটিকে বলা হচ্ছে 'রিভিশনিস্ট' বা সংশোধনবাদী।

সংশোধনবাদীদের বক্তব্যের ও সিদ্ধান্তের পক্ষে দাঁড়িয়ে অসীম রায় তার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে চমক লাগানো বাক্যবন্ধে যা বলেছেন সে বিষয়ের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। তার ভাষায় 'জিন্না ও কংগ্রেসের লড়াইয়ে দুই পক্ষই তারা যা চাননি প্রকাশ্যে সেটার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, এবং যা বলেছেন সেটা আসল কথা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে যা চেয়েছেন তা খোলামেলা বলেননি। বরং তাদের মৌল উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও তৎপরতায় বিশ্বাস হননই করেছেন। তারা তাদের মূল উদ্দেশ্য গোপন রেখে ভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশ্য লড়াই চালানোর কারণে ভারতবিভাগ বিষয়ক চিরাচরিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা আদপেই ঠিক নয়।' এগুলো নব্যতাত্ত্বিকদের পক্ষে বেশ চমক লাগানো কথা।

চার-পাঁচ ছত্রের এই কথাগুলোর ব্যাখ্যায় নামলে বড় একটি প্রবন্ধ লেখা হয়ে যেতে পারে। তবে বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়েও এ বক্তব্যের মর্মোদ্ধার করা যায় এভাবে : কংগ্রেস মুখে অখণ্ড ভারত ও শক্তিশালী কেন্দ্র দাবি করেও ভারতবিভাগ চেয়েছে। অন্যদিকে জিন্না ভারতভাগের দাবি তুলেও পাকিস্তান চাননি। যে কথা বলেছেন আয়েশা জালাল ও আরো দু-একজন। তাদের বক্তব্য : জিন্না ভারতীয় মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায়ের রাজনৈতিক দরকষাকষির উদ্দেশ্য নিয়ে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি তুলেছিলেন। তিনি ভারত ভেঙে পাকিস্তান চাননি।

কিন্তু চমক লাগানো এসব কথার ভিত্তি বড় নড়বড়ে। যুক্তিগুলো অসংলগ্ন। জিন্নার রাজনৈতিক মানসিকতা এবং কংগ্রেসের ভারতমাতা ভাবমূর্তি ও শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক ফেডারেশনের পরিকল্পনা নিয়ে অনড় অবস্থান উভয় পক্ষেই যথাক্রমে তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল– এবং তা এমন ধর্মীয় অনড়তার চরিত্র অর্জন করেছিল সে সেখানে থেকে পেছন ফেরা যায় না। বিকল্প একটাই। সর্বনাশ দেখা দিলে বুদ্ধিমানের মতো অর্ধেক ছেড়ে বাকি অর্ধেক রক্ষা করা। শাস্ত্রীয় প্রবচনে যা অর্ধেক এক্ষেত্রে তা কংগ্রেসের জন্য ভারতের বৃহত্তর অংশ বিশেষ এবং জিন্নার জন্য তা এক-দশমাংশ জনসংখ্যা ও আনুপাতিক ভূমিত্যাগ। উভয় পক্ষই ক্ষুব্ধ। ক্ষোভ নিয়েই তাদের সান্ত্বনা। যারা লক্ষ্য অর্জনের জন্য রক্তাক্ত পথে তৎপর হতে পারেন তারা কি সেই লক্ষ্য নিয়ে অভিনয় করতে পারেন? জিন্না বা গান্ধি নেহরু? মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য বলতে কি নব্যতাত্ত্বিকদের জিন্নার দাবি বিষয়ক বক্তব্য ১৯১৬ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে করা গেলেও তিরিশের দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে লন্ডন থেকে ভারতে ফিরে এসে মুসলিম লীগের হাল ধরা জিন্নার বক্তব্য ও পদক্ষেপ নয়া ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য ও যুক্তি জোগায় না। বরং ১৯৩৫-এ ব্রিটিশরাজের 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের' সম্প্রদায়বাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট জিন্নার পরবর্তী কার্যক্রম, বক্তব্য-বিবৃতি সবকিছুই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় ভারতভাগের ও পাকিস্তান দাবির পক্ষে।

জিন্না যে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দাবি হিসেবে পাকিস্তান অর্থাৎ খণ্ডিত ভারতে স্বতন্ত্র মুসলিম বাসভূমির দাবিতে অটল ছিলেন তা যেমন ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের আগে, তেমনি ওই প্রস্তাবের পরে এ সম্বন্ধে তার বক্তৃতা-বিবৃতিতে যথেষ্ট স্পষ্ট। তাতে ঘোরপ্যাঁচ নেই। 'পাকিস্তান' শব্দটি লাহোর প্রস্তাবে ব্যবহৃত না হলেও পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্বতন্ত্র মুসলিম ভূখণ্ড তো প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানই, নামে কী আসে-যায়।

স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রগঠনে জিন্নার ভূমিকা যে কতটা অনড় ও গভীর ছিল তা বোঝা যায় যখন তিনি বলেন, পাকিস্তান অর্জন তার এবং 'ভারতীয় মুসলমানদের জন্য জীবনমরণের প্রশ্ন।' এ ধরনের কথা দৃঢ়কণ্ঠে কড়া ভাষায় বহুবার বলেছেন জিন্না। এগুলো কি কথার কথা বা 'দেনদরবারে'র ভাষা? স্ট্যানলি উলপার্ট জিন্নার দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে নমনীয় হয়েও লিখেছেন : 'পাকিস্তান দিবসের বাণীতে জিন্না আবিষ্কার করেন চক্রান্ত, ক্ষমতা নিয়ে খেলা এবং এসব থেকে উত্তরণের পথ ঐক্য ও আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস' (পৃ. ২৪)। সেই সঙ্গে তার দৃঢ় ঘোষণা : 'দশ কোটি মুসলমান একত্র হলে পাকিস্তান আসবেই– ইনশাল্লাহ আমরা জয়ী হব' (পৃ. ২৪১)। এসব কথার তাৎপর্য নিয়ে ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ নেই।

চার

আমরা জানি ভাষার যেমন আছে বহুমুখী রূপে উপস্থাপনার জাদু, তেমনি আছে প্রচণ্ড উদ্দীপক শক্তি। তার দৈহিক শক্তির বাহ্য ভঙ্গি (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) থেকে কোনো দাবির গভীরতা বা গৌণতা বুঝে নিতে পারা যায়। পাকিস্তান সম্বন্ধে জিন্নার বক্তব্য উপস্থাপন ও ভাষা ব্যবহার মনোযোগী পাঠককে বুঝতে সাহায্য করে যে, ভারত বিভাগভিত্তিক স্বতন্ত্র মুসলমান ভুবন গঠনে জিন্না কতকটা দৃঢ়পণ ছিলেন– বলা যায় চরমপন্থী। আর এই দৃঢ়তা ও অনমনীয় আকাঙ্ক্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণেই পাকিস্তান অর্জন তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য ওই ধাতব ইচ্ছার সঙ্গে সাফল্যের পথে যুক্ত হয়েছিল জিন্না নামক তীক্ষ্ণবুদ্ধি আইনজীবীর দক্ষ পদক্ষেপ।

লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' বিষয়ক অস্পষ্টতা (হডসন) সত্ত্বেও দাবির মূলনীতিতে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না, ছিল তা বাস্তবায়নের পদ্ধতিতে। মূল দাবি স্পষ্টই ছিল বিভক্ত ভারতে স্বতন্ত্র মুসলমান আবাসস্থল বা রাষ্ট্র। এর পেছনে বহুকথিত বক্তব্য– 'হিন্দু মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি– এক কথায় তারা সব কিছুতে ভিন্ন– কাজেই সহাবস্থান অসম্ভব।' যদিও ইতিহাস এক্ষেত্রে ভিন্ন কথা বলে। লাহোর প্রস্তাবে অস্পষ্টতা থাকলেও অধিবেশনের (১৯৪০ মার্চ) সভাপতি হিসেবে জিন্নার দীর্ঘ ভাষণ মোটেই অস্পষ্ট ছিল না। তার সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব (দ্বিজাতিতত্ত্ব), স্বতন্ত্র নির্বাচন, হিন্দু-মুসলমানের ভিন্নতা, কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদিতা, ভারতীয় মুসলমানের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারণ ইত্যাদি বিষয় রাজনৈতিক কৌশলে ধরা হয়। যে জন্য তার বক্তৃতার বিশেষ অংশের লাখ লাখ কপি ভারতীয় মুসলমানের হাতে পৌঁছায়। সে লিফলেট সাম্প্রদায়িক বিরূপতা তৈরিতে সাহায্য করে। কথাগুলো এর আগেও বলা হয়েছে। এখন প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি।

এসব কর্মকাণ্ড ও বক্তব্য কি কথার কথার প্রতিফলন? মুশিরুল হাসান তাই সঙ্গত যুক্তিতেই বলেন যে, 'জিন্না লাহোরে লড়াইয়ের হাঁক (war cry) দিয়েছেন– যে লাহোরের রয়েছে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও সংহতির গৌরবময় ইতিহাস। বহুজাতিক রাষ্ট্রের সমন্বয়বাদী যে তত্ত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে হাকিম আজমল খান, এমএ আনসারি, মাওলানা আজাদ প্রমুখ সেকুল্যার রাজনীতিবিদ তুলে ধরেছিলেন জিন্না তা নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন যে, 'হিন্দু-মুসলমানের একক রাষ্ট্রিক জাতীয়তা নেহাতই একটি স্বপ্ন।' এই বক্তব্যের সমর্থনে আরো অনেক কথা বলেছেন তিনি।

জিন্না যদি আন্তরিকভাবে পাকিস্তান না চাইবেন, লাহোর প্রস্তাব যদি ক্ষমতার অংশীদারিত্ব নিয়ে দরকষাকষির প্রস্তাবই হয়ে থাকে তা হলে তিনি 'যুদ্ধংদেহী' ঘোষণায় স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রের পক্ষে সাম্প্রদায়িক স্লোগান তুলতেন না যা জনমানসে বিরূপ সাম্প্রদায়িক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যা পরে রক্তক্ষয়ী সহিংসতায় পরিণত। অথচ একই সময়ে (১৯৪০) মাওলানা আজাদ রামগড় কংগ্রেসের বক্তৃতায় বহুজাতি-বহুভাষা-বহুধর্মী ভারতীয় নাগরিকের জন্য গ্রহণযোগ্য সমন্বয়বাদী ব্যবস্থার পক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তথ্য ও যুক্তি তুলে ধরছিলেন ইতিহাস-ঐতিহ্য উদ্ধার করে। জিন্না সেসবের বিরোধিতাই করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবমনে বা জনমনে হয়তো গড়ার চেয়ে ভাঙনের টানের প্রতি আকর্ষণ থাকে বেশি। এই সহজাত সত্য সম্ভবত ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের মনকে প্রভাবিত করে থাকবে। বাস্তবে তা করেছে লাহোর প্রস্তাবে এবং লাহোর প্রস্তাবে ধৃত দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে জিন্নার তাৎক্ষণিক ও ক্রমাগত বক্তব্য উপস্থাপন এবং ক্রমাগত বিচার-ব্যাখ্যায়। সহাবস্থান ও 'শান্তির ললিত বাণী' সেখানে বাস্তবিকই 'ব্যর্থ পরিহাস' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুশিরুল হাসানের ভাষায় 'এসব বক্তব্য-মন্তব্য ছিল অশুভ সঙ্কেত' ও তেমনই বার্তাবাহী যদিচ তখনো তা অখণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদে পরিপূর্ণ শক্তি অর্জন করে উঠতে পারেনি। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হলো কংগ্রেস সে পরিস্থিতির তথা তৎকালীন পরিস্থিতি বা দুর্বলতার রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি।

মুসলিম শিক্ষিত জনসংখ্যা ও ভূস্বামী পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তপ্রদেশের কথাই যদি ধরা যায় (যেখান থেকে লিয়াকত-খালিকুজ্জামানদের মতো লীগ নেতৃত্বের উদ্ভব) সেখানে ১৯৩৬ সালেও মুসলিম লীগের পক্ষে সমর্থন খুব জোরালো ছিল না। প্রদেশের গভর্নর হ্যারি হেইগ ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ভাইসরয়ের কাছে যেসব গোপন বার্তা পাঠিয়েছেন তাতে দেখা যায় সেখানকার উচ্চবিত্ত শ্রেণি, বিশেষ করে ভূস্বামী বাদে সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ কমই ছিল। হয়তো তাই ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব ও জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা সংবলিত উগ্র বক্তব্যের ইশতেহারের বিশেষ টার্গেট ছিল যুক্তপ্রদেশ। এখানে আবারো বলতে হয় কংগ্রেস মুসলমানমানস জয়ে এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণে অনেকটা উদাসীনতাই দেখিয়েছে। যুক্তপ্রদেশে লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে অস্বীকৃতি জানিয়ে কংগ্রেস এবং নেহরু পর্বতপ্রমাণ ভুল করেছিলেন। এ অভিমত সব বিশ্লেষকের। মুসলমানপ্রধান বঙ্গ-পাঞ্জাবের পর রাজনৈতিক বিচারে যুক্তপ্রদেশের গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য।

লীগের লাহোর অধিবেশনে দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থনে জিন্না যখন বলেন : 'এটা একটা স্বপ্ন যে হিন্দু-মুসলমান মিলে কোনোদিন একটি সমন্বিত জাতীয়তা তৈরি করতে পারবে, এটা ভুল ধারণা' তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, জিন্না মনেপ্রাণে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ভুবন চাইছেন। স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান অসম্ভব। এমনকি এ কথাও বলেছেন, 'দুটি জাতিকে একক রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা হলে– যেখানে একটি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ অপরটি সংখ্যালঘু, সেখানে অসন্তোষ দেখা দিতে বাধ্য এবং অবশেষে পরিণামে তা ধ্বংস হতে বাধ্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আরো বলেন, 'ভারত যুগ যুগ ধরে হিন্দু ভারত ও মুসলমান ভারত হিসেবে বিভাজিত ছিল।' তার মতে, বর্তমান ঐক্য ব্রিটিশ শাসনের কারণে ঘটেছে। এখানে জিন্না কৌশলগত বক্তব্য পেশ করেছেন ভূখণ্ড ও জাতিকে সমরূপী হিসেবে উপস্থিত করে। মুঘল শাসনে বিশাল ভারত ঐক্যবদ্ধভাবে থাকা সত্ত্বেও ছোট স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্বও ছিল। কিন্তু সেখানে মূল দ্বন্দ্ব তখন ভূখণ্ডের অধিকার নিয়ে, হিন্দু-মুসলমান নিয়ে নয়, যা জিন্না ভিন্নভাবে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে বারবার উল্লেখ করেছেন। মুঘল ভারতে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করেছে সাধারণ সমঝোতা ও শান্তি নিয়ে। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

দ্বিতীয়ত একাধিক রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকার বিষয়টা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ছিল না। হিন্দুরাজ্য যেমন মুঘল শাসন থেকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বিচ্ছিন্ন থাকতে চেয়েছে, তেমনি একাধিক মুসলমান শাসনকর্তাও মুসলিম-দিল্লির শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে থাকতে চেয়েছে। এজন্য বলা যায়, বহুজাতিক ও বহুভাষিক উপমহাদেশে স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিটা তখন ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক চরিত্রের ছিল না। ছিল ক্ষমতার লড়াই এবং তা মূলত রাজ্য ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এদিক থেকে আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে পৌঁছে পূর্ব-ইতিহাসের নজির তুলে বিচ্ছিন্ন মুসলমান রাষ্ট্র গড়ার যুক্তি তাই ধোপে টেকে না।

AMARBOI.COM

সমন্বিত সহাবস্থানে জিন্না 'গৃহযুদ্ধে'র আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। আসলে ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করে জিন্নাই গৃহযুদ্ধের ভাবনা মাথায় রেখে এগিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬-৪৭-এ মহাসাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নীতি গ্রহণ করে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন এবং যুক্তভারতে দেনদরবার নয়, গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ভারতভাগ ও পাকিস্তান গঠন করে তার ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই।

পাঁচ

লাহোর প্রস্তাব, হিন্দু-মুসলমান ঘিরে দ্বিজাতিতত্ত্ব ও ভারতবিভাগ শুধু জিন্নারই রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল না, ছিল ভারতীয় শাসক ব্রিটিশরাজেরও। তাদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি ওই বিভাজনের প্রেক্ষাপট এবং ১৯৩৫-এর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ওই দ্বিভাজিত রাজনীতির বীজতলা যা স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করেছে। অবশেষে তা সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও হত্যাযজ্ঞের বিষবৃক্ষে পরিণত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস পাঠকের অবাক হওয়ার কথা যে লাহোর প্রস্তাব শাসকরাজের তাৎক্ষণিক সমর্থন পেয়েছিল (মুশিরুল হাসান)। কিন্তু ইতিহাসের মনোযোগী পাঠকের জন্য তা বিস্ময়কর নয়। ইতিহাসবিদ সবার একই বক্তব্য ওই 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি সম্পর্কে। এটা তারই ধারাবাহিকতা। লাহোর প্রস্তাবের রচয়িতা কে এবং এর পেছনে কোন্ শক্তি কাজ করেছে এসব তথ্য ইতিহাসে স্পষ্টই ধরা আছে। আছে জাফরুল্লাহ খান ও ব্রিটিশরাজতন্ত্রের সংশ্লিষ্টতা। ওয়ালি খানের দেশবিভাগ বিষয়ক গ্রন্থে (ফ্যাক্টস আর ফ্যাক্টস) তা বিশদভাবে তথ্যসহকারে লিপিবদ্ধ।

এমনকি 'সোল স্পোকসম্যান' রচয়িতা আয়েশা জালালের বক্তব্যেও দেখা যায় যে, 'লাহোর প্রস্তাবের সময়ক্ষণ ব্রিটিশরাজের প্রয়োজনমাফিক নির্ধারিত হয় এবং তা জরুরি হয়ে ওঠে কংগ্রেসের দাবি-দাওয়া ও আন্দোলনের কারণে' (পৃ. ৬০)। অর্থাৎ কংগ্রেসের রাজ-বিরোধিতা, স্বাধীনতার দাবি ইত্যাদি কারণে বিব্রত, বিরক্ত, অসন্তুষ্ট ব্রিটিশ শাসককে জিন্নার সাহায্য নিতে হয়। মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বিষয়ক লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশরাজের জন্য রাজনৈতিক স্বস্তির প্রস্তাবও বটে।

শুধু 'সময়ক্ষণ নির্ধারণ'ই নয় ইতিহাসের তথ্য আরো বলে, গোটা প্রস্তাবটাই ব্রিটিশ স্বার্থ-প্রণোদিত ও ব্রিটিশ পরিকল্পনাপ্রসূত। উদ্দেশ্য ক্রমাগত স্বাধীনতার দাবি তোলা সংগঠন কংগ্রেসকে একহাত নেয়া। ঠিক যেমনটি দেখা গেছে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাতে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনে 'রাজ'-এর সহায়তাদানে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শাসকশ্রেণির নির্বিকার নিষ্ক্রিয় ভূমিকাও তাদের শাসননীতির অংশ ছিল।

বিভিন্ন ঘটনায় 'রাজ' সরকারের পক্ষ থেকে লীগ ও জিন্নার প্রতি সমর্থনের প্রমাণ মেলে। পাঞ্জাবের সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতা খিজির হায়াত খান ভাইসরয়কে পাকিস্তান সম্বন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্ট করে জানাতে এবং অযৌক্তিক হলে সেটা বর্জন করতে আহ্বান জানান। কিন্তু ভাইসরয় এ বিষয়ে নির্বাক থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। খিজিরের আপত্তি ছিল পাকিস্তান ধারণার সঙ্গে ধর্মীয় চেতনার সংশ্লিষ্টতায়। একই ধারণা ছিল সিকান্দার হায়াতের, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত। এমনকি সিন্ধুর আল্লাবকশ একই কারণে সিন্ধুর গভর্নর সাহেবের বিরাগভাজন হন। ভাইরসয়দের ভূমিকা বরাবরই ছিল স্বতন্ত্র নির্বাচন ও পাকিস্তান প্রসঙ্গে জিন্নাকে সমর্থনের।

আয়েশা জালাল পাকিস্তান ও জিন্না সম্পর্কে হডসনের ইতিবাচক মতামতের কথা উল্লেখ করেছেন ঠিকই, কিন্তু হডসনই আবার তুলে ধরেছেন বিপরীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্তব্য। তার মতে, কংগ্রেস যতই সহযোগিতার বক্তব্য উপস্থিত করেছে মুসলিম লীগ (জিন্না) ততই বিপরীত শর্তাদি তুলে ধরেছে এবং ১৯৪১ সালে লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব শুধু অনুমোদিত হয়নি মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এমনকি জিন্নার আবারো যুক্তিহীন দাবি ভাইসরয়ের কাছে যে কেন্দ্রে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব হবে হিন্দুদের সমান, তার ভাষায় পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। জনসংখ্যা বিচারে যে দাবি একেবারেই যুক্তিহীন।

সংশোধনপন্থীরা (রিভিশনিস্টগণ)ও বলেন, জিন্নার পাকিস্তান দাবি ছিল ক্ষমতার অংশীদার হতে দরকষাকষি। কিন্তু কী দাবি ছিল তার, কী নিয়ে দরকষাকষি? শুধু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনই নয়– কেন্দ্রে সমান সমান আসন, এমনকি তার ক্ষুব্ধ বক্তব্য– 'গান্ধির তিন ভোট, আর আমার একটি'(১৯৪০)। ভুলে গেলে চলবে কেন যে, ভারতে মুসলমান মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম? আসলে জিন্না চেয়েছিলেন অবাস্তব নানা দাবি তুলে সব রকম সমাধানের রাস্তা বন্ধ করে দিতে, যাতে শেষ পর্যন্ত চরমপন্থায় (সহিংসতায়) পাকিস্তান অর্জন সম্ভব হয়।

এটা ঠিক যে, মুসলিম লীগের শীর্ষনেতাদের কেউ কেউ (যারা হিন্দুপ্রধান প্রদেশের ভূস্বামী বা উচ্চবর্গীয় বাসিন্দা) ভারতবিভাগের বদলে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করে কোনোরকম সর্বভারতীয় সমাধান চেয়েছিলেন। এর কারণ শুধু ভূখণ্ডের টানই নয়, কারণ তাদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষা, যেজন্য তারা ছিন্নমূল হতে চাননি। যেমন বোম্বাই প্রদেশের বিশিষ্ট লীগনেতা আইআই চুন্দ্রীগড় যিনি বোম্বাই ছেড়ে চলে যেতে চাননি।

যুক্তপ্রদেশের খালিকুজ্জামানেরও প্রথম দিকে কিছুটা তেমন প্রবণতা ছিল। নেহরুর সঙ্গে এক পর্যায়ে যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল তার। ঠিক যেমন মাহমুদাবাদের নবাব যিনি প্রথম দিকে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। এদের সঙ্গে নেহরু পরিবারের (বিশেষ করে মোতিলাল নেহরুর) ছিল গভীর সৌহার্দ্য। জিন্নার সে সমস্যা ছিল না। কাথিওয়াড় থেকে করাচির সঙ্গে তার জন্মসূত্রের সম্পর্ক। সেখানে তিনি 'স্ট্রেঞ্জার' বা অচেনা অতিথি নন। তাছাড়া তিনি মুসলিম লীগের সর্বাধিনায়ক। করাচি বাদেও সম্ভাব্য পাকিস্তানের সব স্থানই তার বাসস্থান, সব ঘরই তার ঘর– 'কায়েদে আজম' বলে কথা।

ছয়

'পাকিস্তান ধারণা' জিন্নার রাজনৈতিক চিন্তায় কতটা গভীরতা নিয়ে উপস্থিত ছিল, তাতে ধর্মীয় উপাদান কতটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার প্রমাণ মেলে ধর্মাচরণে উদাসীন জিন্না যখন লাহোর মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন : 'জাতিতত্ত্বের যে কোনো সংজ্ঞার বিচারে মুসলমান একটি জাতি। তাদের নিজস্ব আবাসস্থল, নিজস্ব অঞ্চল এবং রাষ্ট্র থাকতে হবে, মুক্তস্বাধীন মানুষ হিসেবে বাঁচতে হবে' তখন কি প্রশ্ন তোলা যায় যে, জিন্না পাকিস্তান চাননি। একদা প্যান-ইসলামিজমবিরোধী জিন্না রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে প্যান-ইসলামের পতাকাও উর্ধ্বে তুলে ধরেন।

চল্লিশ থেকে সাতচল্লিশের প্রথমার্ধ অবধি জিন্নাসহ মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা, এমনকি খালিকুজ্জামানও একের পর এক বক্তব্যে পাকিস্তান দাবির পক্ষে কথা বলতে থাকেন, বিকল্প কোনো ব্যবস্থা সম্বন্ধে নয়। ফেব্রুয়ারি ১৯৪২-এ খালিকুজ্জামান বলেন যে, 'ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতে পাকিস্তানের চেয়ে কম কোনো প্রস্তাব মুসলমানগণ মেনে নেবে না।' আরো একধাপ এগিয়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের জন্য দরকার হবে ব্রিটিশপুঁজি ও সহায়তা এবং তা নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জনের পূর্বপর্যন্ত' (আর. জে. মুর. 'জিন্না ও পাকিস্তান দাবি'তে উদ্ধৃত)।

মুর মনে করেন, মিয়া বশীর আহমদের উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রস্তাব জিন্নার লাহোর প্রস্তাবের পাকিস্তান ধারণার উৎস। ভিন্নমতে তা ইকবাল। কিন্তু স্যার ইকবাল তো ভারত বিভাগ চাননি– চেয়েছেন ভারতের পশ্চিম ভূখণ্ড-সীমানার মধ্যে মুসলমানদের স্বশাসিত আবাসস্থল। কিন্তু জিন্না ইকবাল প্রশস্তির সূত্রে তাদের দুজনের চিন্তার মিল উল্লেখ করে বলেন যে, নানা সাংবিধানিক জটিলতা তথা সমস্যার সমাধান হলো পাকিস্তান (মুর, উদ্ধৃতি)। তার বিচারে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান মুসলমান জাতীয়তাবাদে (দ্বিজাতিতত্ত্ব) এবং বিচ্ছিন্নতাবাদে (পাকিস্তান দাবি)। একথা ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জবাব।

জিন্নার শিষ্যগণ সবাই তারস্বরে একই দাবি তুলে ধরতে থাকেন। চল্লিশ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে রাজনৈতিক পারদের যথেষ্ট ওঠানামা, ১৯৪২-এ গান্ধির 'ইংরেজ ভারত ছাড় আন্দোলন', সর্বোপরি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এসব বিচিত্র পরিস্থিতির সুযোগে শাসকদের সমর্থনপুষ্ট মুসলিম লীগ-প্রধান জিন্না সরকারের সুনজরে আসেন। সে সময়ও (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪) তার জোরালো দাবি ভাইসরয়ের কাছে, ব্রিটিশরাজের কাছে, যাতে ভারত বিভাগের মাধ্যমে দুটো সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হয়– পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান যথাক্রমে ভারতীয় মুসলমান ও অমুসলমানদের জন্য (দ্র. জিন্নার বক্তৃতা ও রচনাবলী)।

এ জাতীয় অনড় অবস্থান, বিশেষ করে দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপক্ষীয় সংলাপের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাদি একটি সত্যই প্রমাণ করে যে, জিন্না সত্যই মনেপ্রাণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান চেয়েছেন। সময় যত গড়িয়েছে, তার এ অবস্থান ক্রমে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৪৫ থেকে, যখন নানা ঘটনায় এটা স্পষ্ট যে, বিদেশি শাসক ভারত ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক, অবশ্য তার প্রভাব যতটা সম্ভব রেখে। শ্রমিক দল ব্রিটেনে ক্ষমতায় আসার (জুলাই, ১৯৪৫) পর ব্রিটিশ নীতির এ পরিবর্তন।

অবস্থাদৃষ্টে জিন্নাও পাকিস্তান দাবি আদায়ে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেন। যেমন গান্ধি ও কংগ্রেস বা মধ্যপন্থীদের সঙ্গে দেনদরবারে বা সংলাপে তেমনি শাসকরাজের সঙ্গে আলোচনায় বা দাবি পেশ করার ক্ষেত্রে। তিনি যে পাকিস্তান দাবিতে কতটা অনড় ছিলেন এবং তা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা আদায়ের উপলক্ষ (জালাল কথিত 'দরকষাকষি') হিসেবে থলিতে রাখেননি তা বোঝা যায় মধ্যপন্থী সাপ্রু (তেজবাহাদুর সাপ্রু) কমিটির প্রস্তাবের মতো একাধিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ঘটনায়।

সাড়ে সাত বছর তার ভারত শাসনের মেয়াদ শেষ করে ১৯৪৩-এর অক্টোবর ভাইসরয় লিনলিথগো যখন লন্ডনে ফিরে যান (হডসনের ভাষায় 'হতাশা নিয়ে') তখন তার কৃতিত্ব ভারতীয় রাজনীতিতে আগের তুলনায় অনেক বেশি দ্বন্দ্ব, বিরূপতায় তিক্ত বিভাজন ঘটানোয়। একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাকে অধিকতর কঠোর অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব অবশ্যই তার। কথাটা পরোক্ষে স্বীকার করেছেন হডসন। অবশ্য তিনি তার শাসন দক্ষতার অনেক প্রশংসাও করেছেন তার বইতে।

সবাইকে অবাক করে লিনলিথগোর পদে এলেন এক সেনানায়ক (ফিল্ড মার্শাল লর্ড ওয়াভেল) রাজনীতি সম্বন্ধে যার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ভালো যোদ্ধা হলেই কি ভালো রাজনীতিজ্ঞ হওয়া যায়, এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে। এ প্রশ্ন হডসনও করেছেন চমকপ্রদ তুলনামূলক মন্তব্যে যে, 'লর্ড লিনলিথগো'র ভাইসরয়ী শাসন যদি নেতিবাচকতায় শেষ হয়ে থাকে তাহলে ওয়াভেলের শাসন শেষ হয়েছে হতাশার মধ্যে' (পৃ. ১১১)।

যথারীতি কংগ্রেসের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করেই ওয়াভেলের শাসনকার্য পরিচালনা শুরু। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পূর্বপ্রসঙ্গ 'জিন্না-পাকিস্তান' পর্যালোচনায় ফিরে দেখতে পাই ১৯৪৪-এর গোটা বছরটা এবং পরবর্তী বছরের প্রথমার্ধ কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার প্রস্তাবগুলো জিন্না একের পর এক প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন। রাজাগোপালাচারির প্রস্তাব তার ভাষায় 'ছায়া, ফলের খোসা এবং ভাঙাচোরা, পোকায় খাওয়া (মথ্‌ ইটন্‌) পাকিস্তান'। কথাটা বহুজন-উদ্ধৃত।

আর ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে জিন্নার সঙ্গে গান্ধির সাক্ষাৎ ও আলোচনা যে ব্যর্থ হবে এটা অনেকেরই ধারণায় ছিল। বাস্তবে তাই ঘটে। যে গান্ধিকে জিন্না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন তার সঙ্গে দেনদরবার কি কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে?

স্বভাবত ভাইসরয় ওয়াভেল হতাশ, অসন্তুষ্টও বটে। গণপরিষদ গঠন বিষয়ক তার প্রস্তাবও ধোপে টেকেনি, খোদ ভারতসচিবের কাছেও। এবার ওয়াভেল-আমেরি দ্বন্দ্ব, তারা বিপাকে ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভারত ছেড়ে আসতে চেয়ে নানা জালে, অনেকটা মাকড়সার জালের আঠায় আটকে পড়ার মতো অবস্থা তাদের। ভারতীয় রাজনীতির এ জটিলতা অবশ্য কড়ায়-গণ্ডায় এমনভাবে মিটিয়ে দেন পরবর্তী ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন, যা চিরকালের মতো স্মরণযোগ্য। তার হাত দিয়ে জন্ম নেয় চিরশত্রু বা চিরবৈরী দুই ভূখণ্ড, ভারত ও পাকিস্তান। গত ৬৫ বছর ধরে এ শত্রুতা চলছে। চলবে দীর্ঘ সময় ধরে, যতদিন না প্রদেশগুলো তাদের স্বাধীন সত্তা অর্জন করতে পারে। উপমহাদেশীয় রাজনীতির কী মহিমা প্রায় দুশ বছরের ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে।

কাজেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লীগ-কংগ্রেসকে মেলাতে কী ওয়াভেল পরিকল্পনা, কী আমেরি ভাবনা সব ভেস্তে যায়। এমনকি প্রত্যাখ্যাত হয় সাপ্রু কমিটির প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে মূল সুপারিশ ছিল : কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠন, তফসিলি হিন্দুগণ বাদে হিন্দু-মুসলমান আসন সমতা– সাংবিধানিক পরিষদে ও কেন্দ্রে এবং তা যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতে। এর মূল গুরুত্ব দুটো বিষয়ে– এক, অখণ্ড ভারতে যুক্ত নির্বাচন ও লীগ-কংগ্রেসের সংখ্যাসাম্য, যে সমতার জন্য জিন্না বরাবর জোরালো দাবি জানিয়ে আসছিলেন, যা জনসংখ্যা বিচারে অযৌক্তিকই ছিল। তবু প্রত্যাখ্যান। এর অর্থ জিন্না পাকিস্তানের বিকল্প কোনো কিছু মানতে চাননি, চাওয়া তো দূরের কথা।

প্রত্যাখ্যানের মূল কারণ যৌথ নির্বাচন ও অখণ্ড ভারত। তাছাড়া পাকিস্তান প্রস্তাব অর্থাৎ ভারতবিভাগ ওই সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত না থাকা। অথচ এক সময় এই জিন্নাই সংখ্যাসাম্যে যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। এখন ১৯৪৫-এ পৌঁছে যখন দেখা যাচ্ছে মুসলিম লীগ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে মুসলমান জনসমর্থনে, তখন পাকিস্তান বাদে কোনো প্রস্তাবই জিন্নার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এরপরও কি বলা যাবে জিন্না পাকিস্তান চাননি। তিনি অখণ্ড ভারতে মুসলমানদের পক্ষে সম্মানজনক ক্ষমতার অংশীদারিত্ব চেয়েছিলেন? কোনো সমঝোতা প্রস্তাবেই জিন্নার ভূমিকা এ তত্ত্ব সমর্থন করে না।

এই বিশেষ রাজনৈতিক বিচারে ১৯৪৫-৪৬ বছর দুটো ছিল ভারতবিভাগের পরিণাম নির্ধারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, সাপ্রু কমিটির সুপারিশ হিন্দুত্ববাদীরাও সমর্থন করেনি। করেনি ওই হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাসাম্যের কারণে। জিন্না যদি সত্যই অখণ্ড ভারতের পক্ষে আন্তরিক হতেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে তার বহুকথিত সংখ্যাসাম্যের সুবিধা নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু পাকিস্তান পরিকল্পনা তাকে এতটা অভিভূত করে রেখেছিল যে, ওই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর অন্তত একটা বড় কারণ (যা প্রসঙ্গান্তরে হয়তো একাধিকবার বলা হয়েছে) ভারত ভেঙে গান্ধি-নেহরুর ওপর প্রতিশোধ নেয়া, তার প্রতি কংগ্রেস মঞ্চের অবহেলা, তার নিজের হিসেবে যা অবমাননা, তা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেয়া।

এ পরিস্থিতির সৃষ্টি গান্ধি-জিন্না-রাজ– এই ত্রিভুজ ঘিরে। জয়-পরাজয়ের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছেড়ে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে গান্ধি-নেহরু-আজাদ প্রমুখের সঙ্গে ক্ষমতার অংশগ্রহণ জিন্নার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। তাতে ভারত রসাতলে যাক, ক্ষতি নেই। পোকায় খাওয়া পাকিস্তান নিয়েই তার আত্মতৃপ্তি। অন্তত অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন তো ভেঙে দেয়া গেল।

জানুয়ারি ১৯৪৫–এ আবারো সমঝোতার চেষ্টা। যেটা কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই এবং লীগনেতা লিয়াকত আলী খানের উদ্যোগে যা ' দেশাই-লিয়াকত চুক্তি' নামে পরিচিত। তাতে ভাইসরয় ওয়াভেলেরও সম্মতি ছিল। বোম্বাই গভর্নর এ বিষয়ে ভাইসরয়ের প্রতিনিধি হিসেবে জিন্নার মতামত যাচাই করতে গেলে জিন্না বলেন– এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না (হডসন)। এটা কি সম্ভব যে, জিন্নার মতো একনায়ক লীগপ্রধানের অজ্ঞাতে লিয়াকত আলী খান দেশাইয়ের সঙ্গে একটা সমঝোতা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলবেন? এমন সাহস কোনো লীগ নেতার ছিল না। ওয়াভেল হতাশ।

ছমাস পর (১৯৪৫) জুন মাসে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে রাজনৈতিক সমঝোতার উদ্দেশ্যে সিমলা কনফারেন্সের আয়োজন। মূলত ভাইসরয় ওয়াভেলের চেষ্টায়। এখানেও মতভেদ। সংখ্যাসমতা বিষয়ক ছাড় দেয়া সত্ত্বেও মুসলমান প্রতিনিধিত্ব (সোল স্পোকসম্যান) নিয়ে দ্বন্দ্ব। কংগ্রেসী মুসলমান, এমনকি কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদকেও মানতে নারাজ জিন্না। এ ধরনের মতামত গণতন্ত্রের কোন্ বিধিসম্মত সেটা সংশোধনবাদী লেখকগণ ভেবে দেখেছেন বলে মনে হয় না। এ তো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অস্বীকার– অর্থাৎ সব মুসলমানকেই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে হবে– অন্য কোনো দলে যোগ দেয়া চলবে না। এ কোন্ দেশি জবরদস্তি? কিন্তু জিন্না তা করেছেন। কারণ তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন– এটা তার নিজেরই কথা।

সবচেয়ে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন জিন্না তার বক্তৃতায় দাবি করেন যে, 'পাকিস্তান ব্যতিরেকে কোনো সংবিধান মুসলিম লীগ মেনে নেবে না। লীগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কোনো প্রকার সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের বিরোধী' (হডসন)। লীগ-কংগ্রেসের বিপরীত অবস্থান ভারতীয় রাজনীতিতে সঙ্কট সৃষ্টি করে। লীগের ভারতবিভাগ (পাকিস্তান) ও কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত অনেকটা দুই মেরুতে অবস্থানের মতো হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান সংখ্যানুপাত সত্ত্বেও সমস্যা তৈরি হয় জিন্নার অনড় দাবিতে যে, সব কজন মুসলমান সদস্য লীগ সংগঠন থেকে নিতে হবে। কারণ তার মতে তিনি ও মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি।

কিন্তু তখনো জিন্না এবং মুসলিম লীগ সমগ্র ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র মুখপাত্র নয়; সংখ্যাগরিষ্ঠ বৃহৎ অংশের প্রতিনিধি। সেক্ষেত্রে সব মুসলমান প্রতিনিধিকে লীগ থেকে নেয়ার দাবি যুক্তিতে টেকে না। তার ওই উদ্ভট দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সীমান্তের সেক্যুলার নেতা ডা. খান সাহেব বলেন যে, কংগ্রেস একমাত্র হিন্দুদের সংগঠন নয়। এ কথা বলার কারণ কংগ্রেসে তখনো বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান নেতা রয়েছেন। তাদের অনুসারী বা সমর্থকদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। বঙ্গদেশের বাইরে পশ্চিমের প্রদেশগুলোতে নির্বাচনী জরিপই তেমন প্রমাণ দেয়। দেয় ভোটার সংখ্যায়, যা মুশিরুল হাসান উল্লেখ করেছেন।

তাহলে কেন জিন্নার অযৌক্তিক জেদ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হওয়ার? কারণ একটাই। সব সমঝোতা প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়া। তার মর্জিমাফিক অর্জন নিশ্চিত করা। হডসনের ভাষায় : 'কংগ্রেসের দাবি স্বাধীনতা আর জিন্নার দাবি পাকিস্তান।' একটু ঘুরিয়ে বলতে গেলে কংগ্রেসের দাবি অখণ্ড, অবিভক্ত স্বাধীন ভারত আর জিন্নার দাবি বিভক্ত ভারতের পটভূমিতে স্বাধীন পাকিস্তান। এ দুই বিপরীত বিন্দুর মিলন কিছুতেই সম্ভব নয়। যথারীতি ওয়াভেলের চেষ্টা ব্যর্থ, ব্যর্থ সিমলা সম্মেলন। ওয়াভেল পরিকল্পনাও বাতিল। সৈনিক-ভাইসরয় মহাবিরক্ত।

জিন্না যে ভারতীয় ফেডারেশনে সম্মানজনক অবস্থানের পরিবর্তে স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসস্থল পাকিস্তানের দাবিতে অনড় ছিলেন তার প্রমাণ তিনি পদে পদে রেখেছেন। তার বক্তব্য বরাবর কংগ্রেস পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্য-বিরোধী, বলা যায় বিচ্ছিন্নতাবাদী। সিমলা সম্মেলনের সময়ও তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র পাকিস্তানের পক্ষেই যায়। বিশেষ করে তিনি যখন বলেন : 'লীগ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাকিস্তান ও অখণ্ড ভারতের ধারণা পরস্পরবিরোধী।'

একইভাবে বলা যায়, যে কোনো মূল্যে পাকিস্তান অর্জন করতে হবে এমন ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে লীগের লড়াই পাকিস্তান ইস্যুভিত্তিক এবং পাকিস্তান অর্জনের জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (১৯৪৬)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ্বান করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। এমনকি বীভৎস কলকাতা দাঙ্গা (পাকিস্তান অর্জনে দাবার চাল) তাকে বিচলিত করেনি। বরং এ বিষয়ে বিদেশি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জিন্না বলেন : 'আমার মতে সরাসরি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।'

এ বিষয়ে তার পরবর্তী বক্তব্য নির্মম পরিহাসের মতো শোনায় যখন তিনি বলেন : 'পাকিস্তানে আমি অমুসলমান ও বর্ণহিন্দুদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিচ্ছি।' কিন্তু তার এ গ্যারান্টি একেবারেই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এবং তা ভারতবিভাগের অব্যবহিত পরেও। আসলে লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে লীগের প্রচারে মুসলমান জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় চেতনায় এমনভাবে তাতিয়ে তোলা হয় যে তার ফলে তুচ্ছ কারণে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা যেন এক স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্প্রদায়িকতার ও ধর্মীয় বিদ্বেষের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার মুসলমান মানসকে ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতায় সহাবস্থানের বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়াতে সাহায্য করে। মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ড তো ছিল সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী, যাদের সঙ্গে বেলচাধারী খাকসাররাও পেরে ওঠেনি। এ তো গেল সাংগঠনিক দিক যা ধর্মের নামে অনেকটা জিহাদি স্টাইলে মুসলিম জনমতকে লীগের পেছনে সংহত হতে সাহায্য করেছিল। আর স্বপ্ন দেখিয়েছিল এমন এক স্বতন্ত্র ভুবন পাকিস্তানের যেখানে দুধ-মধুর নহর বয়ে যাবে।

দুস্থ বা নিম্নবর্গীয় মানুষের সামনে পাকিস্তান ছিল অর্থনৈতিক সচ্ছলতার স্বপ্ন, কৃষকদের কাছে বিশেষত বঙ্গে জমিদারি শোষণ-শাসন অবসানের নিশ্চয়তা আর বৃহৎ মুৎসুদ্দি ও পুঁজিপতিদের জন্য প্রতিযোগিতাহীন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ-সুবিধা। মূলত শেষোক্ত শ্রেণি ছিল লীগের অর্থনৈতিক শক্তি যারা মনেপ্রাণে ভারতভাগ ও পাকিস্তান চেয়েছে। পাকিস্তান এভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ স্পর্শ করেছে। বাস্তবে কী হবে না হবে সে বিবেচনা অন্তত নিম্নবর্গীয়দের মাথায় ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাবের হাতিয়ার নিয়ে এবং তা অর্জনে রক্তাক্ত পথ গ্রহণেও দ্বিধাহীন জিন্না গান্ধি-নেহরু ও কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াইয়ে নামেন। এর পেছনে যতটা ছিল মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ অর্জন তার চেয়ে অনেক বেশি তার ব্যক্তিগত অহমবোধ তৃপ্তি, গান্ধি-নেহরুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং সে কাজে ভূস্বামী ও পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষা ও তাদের সাহায্য গ্রহণ। তাই যেকোনো মূল্যে তার পাকিস্তান চাই, হোক তা পোকায় খাওয়া। তবে এটাও ঠিক যে জিন্না তার স্বপ্নের পাকিস্তান সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপরীত দিকটা তিনি উপেক্ষা করেন মূলত তার রাজনৈতিক শক্তির কারণে। সে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তিনি অখণ্ড ভারতে সংখ্যাসাম্যভিত্তিক শাসন শক্তির অধিকারী হওয়ার চেয়ে পোকায় কাটা পাকিস্তানই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন। তাই ভুল হবে ভাবলে যে জিন্না পাকিস্তান চাননি।

প্রসঙ্গত আরো একটি তথ্য মনে রাখা দরকার যে ভারতের অমুসলমান পুঁজিপতিগণ মুখে অখণ্ড ভারতের কথা বললেও তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবিভাগ যাতে হিন্দুস্তানি ভারতে প্রতিযোগিতাহীন পরিবেশে শিল্প-বাণিজ্যের বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায়। বিড়লা, টাটা, গোয়েঙ্কা, ঠাকুরদাস প্রমুখ বৃহৎ পুঁজিপতিদের বক্তব্য ও তৎপরতা থেকে তা বোঝা যায়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন সুনীতিকুমার ঘোষ তার 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাজ' গ্রন্থে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান অর্জন কতটা ইতিবাচক রাজনীতির প্রতিফলন

চল্লিশের দশক নানাদিক থেকে, বিশেষত রাজনীতি ক্ষেত্রে যেন ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক সময় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। অবশ্য বঙ্গদেশে এই দশকটি ছিল দ্বিমাত্রিক ব্যঞ্জনায় বিশিষ্ট। একদিকে সম্প্রদায়বাদিতা, অন্যদিকে প্রগতিবাদী সমাজচেতনা দুইয়ে মিলে ইতি ও নেতির বৈপরীত্য নিয়ে হাজির হয়েছিল। সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় ও রাজনীতির একাংশে এমন প্রগতিবাদী চেতনার প্রকাশ এর আগে বঙ্গে দেখা যায়নি। তবে এক্ষেত্রে ছিল হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণির প্রাধান্য।

তবে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে এর রাজনৈতিক চেতনা ও ঘটনাবলীই ছিল প্রধান নিয়ামক শক্তি। বিশ্বযুদ্ধ তাতে প্রধান উপাদান সরবরাহ করেছিল, এমনকি রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও। কারণ যুদ্ধের কারণে শুরুতে বিপর্যস্ত ব্রিটিশসিংহের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিবাদী ভূমিকায় নেমে দেশের স্বাধীনতার দাবি নতুন করে তোলে। স্বভাবতই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায় করতে ভারতীয় শাসকশ্রেণি, বিশেষ করে ভাইসরয় লিনলিথগো জিন্নার দিকে সহযোগিতার জন্য হাত বাড়ালেন, যথারীতি পেয়েও গেলেন।

ভারতসচিব জেটল্যান্ডের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাইসরয় জানান : 'কংগ্রেসের দাবি-দাওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জিন্না আমাকে অতীব মূল্যবান সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছেন যে জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যদি জিন্না কংগ্রেসের দাবির প্রতি সমর্থন জানাতেন তবে তা আমাদের প্রশাসন ও ব্রিটিশ সরকারের ওপর গুরুতর চাপ সৃষ্টি করত।' এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, কী ছিল কংগ্রেসের দাবি? উত্তর স্পষ্ট : ভারতের স্বাধীনতা। আর ইতিহাস বলে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কখনো আগ্রহ দেখাননি জিন্না কিংবা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে মুসলিম লীগ রাজনীতি সংখ্যালঘু রাজনীতির অজুহাতে শাসকশ্রেণির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাবি-দাওয়া আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে গেছে। জিন্নার নেতৃত্বে তা আরো কুশলী ও কৌশলী হয়েছে এই যা। সে সুযোগ নিয়েছে ইংরেজ শাসক দুই পক্ষকে নিরন্তর লড়াইয়ে ব্যস্ত রাখতে। যুদ্ধ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কংগ্রেসের দাবি– এ দুই প্রতিকূলতার মুখে সম্ভবত ভাইরসয় লিনলিথগো জিন্নাকে কংগ্রেসের দাবি প্রতিহত করতে, রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন করতে উৎসাহ জোগাতে থাকেন– এমন ধারণা অনেকের। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করে, তেমন ধারণা ভুল ছিল না।

জিন্নার স্বতন্ত্র ভুবনের চিন্তার পেছনে আরো একাধিক কারণ সক্রিয় ছিল। যেমন চিরাচরিত মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদি। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর উত্তরপ্রদেশসহ হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলোতে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেসের অসম্মতি এবং সেসব স্থানে লীগ তথা মুসলিম স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করার মতো বিষয় যা জিন্নাকে সমঝোতার জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়। এ ঘটনা কংগ্রেসের দুয়েকজন বিচক্ষণ রাজনীতিকের চোখে রাজনৈতিক ভুল হিসেবে চিহ্নিত। পরে এ সত্য সবারই স্বীকৃতি পায়, বিশেষ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ইতিহাস লেখকদের কাছে।

তবে এক্ষেত্রে ব্রিটিশ 'রাজ'-এর নীতি, ভূমিকা ও চাতুর্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত, সেই সঙ্গে মূল্যায়ন। কারণ তারা সর্বদাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণে যথেষ্ট দক্ষ ছিল। ১৯৩৭-এর নির্বাচন ফল তাদের জন্য খুব একটা স্বস্তিদায়ক হয়নি, হয়নি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের জন্য। তবু মুসলিম লীগের পক্ষে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণে কিছু সম্ভাবনা কংগ্রেসের অদূরদর্শী পদক্ষেপে নষ্ট হয়ে যাওয়া জিন্নার জন্য অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে ওঠে।

এমন এক পরিস্থিতিতে শাসকরাজ জিন্নার দিকে নজর দেবেন এটাই স্বাভাবিক। দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসকগণ তো বরাবর ব্রিটিশরাজের পক্ষে। শুধু প্রজাবিদ্রোহ দমনে সহায়তার জন্যই নয়, অন্য কোনো কারণেও মাথা নাড়তে গেলে গদিচ্যুত হতে হবে তাই। উদাহরণ রয়েছে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই। বিভাজননীতিতে তপসিলিদের আলাদা করতে খুব একটা সুবিধা হয়নি শাসকদের, মূলত গান্ধির হরিজননীতির কারণে। পরবর্তী ভরসা জিন্না ও লীগ পরিচালিত মুসলমান সমাজ। অগত্যা সেদিকেই হাত বাড়ানো। বিশেষ করে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে জিন্না-তোষণনীতি তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের আন্দোলন, স্বাধীনতা দাবি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংশ্লিষ্টতা শাসকদের জন্য শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। তাই তাদের জন্য দরকার শক্তিমান কংগ্রেসবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি। আর বৃহত্তর মুসলিম-সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম লীগই পারে এ শক্তি জোগাতে। সেজন্য দরকার ভবিষ্যতে লীগকে, জিন্নাকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ পরিকল্পনার পরিণতি বিবেচিত হতে পারে ভারত ভেঙে স্বতন্ত্র মুসলিম ভুবন প্রতিষ্ঠা করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একালের ভারতবিভাগ বিষয়ক নানামাত্রিক বিশ্লেষণে এমন সত্যই উঠে আসে যে, ভারতবিভাগ ও স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় লীগের প্রধান সহায়ক শক্তি ছিল ব্রিটিশরাজ। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (১৯৩৫) এ লক্ষ্য অর্জনে ছিল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। গোটা বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা, পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন ভারত সচিবের কাছে, যার মূল কথা হলো ভারতবিভাগ ও ভারতীয় মুসলিম জাতির (নেশন) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা (উদ্ধৃতি ওয়ালি খান, ফ্যাক্টস আর ফ্যাক্টস : ভারতবিভাগের অপ্রকাশিত কাহিনী, ১৯৮৭, বাংলাদেশ)।

দুই

অবশ্য ব্রিটিশসিংহের অন্য একটি আশঙ্কা বা ভয় ছিল বলশেভিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে। তবে এমন যুক্তিও ছিল যে ভারতীয় জঙ্গি মুসলিম শক্তি সঙ্গত কারণে নাস্তিক বলশেভিকদের কাছে সাহায্য চাইবে না। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা গেলে তা রুশ সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে মজবুত প্রাচীর হিসেবে কাজ করবে। এভাবে ব্রিটিশ কূটনৈতিক চিন্তার রাজনৈতিক রূপায়ণ হয়ে ওঠে জিন্নার ধর্মীয় দ্বিজাতিভিত্তিক ভারতবিভাগ ও স্বতন্ত্র মুসলিম ভুবন প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে কথিত পাকিস্তান)।

আশ্চর্য যে, ঐতিহাসিক যে লাহোর প্রস্তাবে এ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয় সে বিষয়টি নিয়েও জিন্নার মতো তুখোড় আইনজীবী-রাজনীতিবিদকে বারবার ব্রিটিশ পরামর্শের জন্য ভাইসরয়ের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। ঘটনা তাই বলে। কারণ এ সময়ে ওই পরিকল্পনা ঘিরে যথেষ্ট ভিন্ন মত উপস্থিত ছিল। যেমন গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্জাব প্রদেশের সেক্যুলার রাজনীতিবিদ সিকান্দার হায়াত খানের জাতিসত্তা-ভিত্তিক সাতটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসননির্ভর ভারতীয় ফেডারেশন, বলা যেতে পারে কনফেডারেশন পরিকল্পনা যা জিন্না এক কথায় নাকচ করে দেন। আয়েশা জালাল মনে হয় এ তথ্যটি বিচারে আনেন নি।

নাকচের কারণ আরকিছু নয়। অখণ্ড ভারত (যা গান্ধি-নেহরুর স্বপ্ন) কোনো মতেই তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ভারতসচিব জেটল্যান্ড ও উপসচিব মুরহেডের সঙ্গে খালিকুজ্জামান-আলোচিত বিভক্ত ভারতে মুসলিমপ্রধান অঞ্চল নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রই বিবেচ্য হয়ে ওঠে এবং মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তা গ্রহণ করে জিন্নার সম্মতি সাপেক্ষে। কিন্তু জিন্না কখনো ভেবে দেখেননি যে, ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যৎ হিন্দুশাসনের হাত থেকে মুক্ত করতে গিয়ে তার প্রস্তাবে সাড়ে তিন কোটি ভারতীয় মুসলমান হিন্দু শাসনে থেকে যাবে, যে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাওলানা আজাদ ভারতবিভাগের আগে ও পরে একাধিকবার বলেছেন। বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে এদের অবস্থা কি খুব স্বস্তিকর হবে বিশেষ করে যখন তারা ছিলেন অন্ধ আবেগে পাকিস্তানের পক্ষে?

মুসলমানপ্রধান প্রদেশভিত্তিক বিভাজনের নীতিতে বড় অসুবিধা ছিল, বিপুল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর শহর-গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলমান জনসংখ্যা কীভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে? কোনো সীমানা নির্ধারকের সাধ্য নেই তাদের স্বপ্নের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা। অসম্ভব হলেও একমাত্র উপায় গোটা ভারতীয় মুসলমানদের শহর-গ্রাম থেকে কুড়িয়ে স্বতন্ত্র ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া। এ কাজটি যেমন অবাস্তব, তেমনি স্বতন্ত্র অঞ্চলগুলোতে স্থানাভাবও অসম্ভবের আওতায় পড়ে। সম্ভবত এসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাননি জিন্না। তাই ভারতবিভাগ ও পাকিস্তানের পক্ষে ক্রমাগত যুক্তি-অযুক্তি খাড়া করেছেন।

ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব পাস করিয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪০) জিন্না তৎকালীন ভাইসরয়কে জানান তার পরিকল্পনার কথা এবং ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে তা উপস্থাপনের কথা। উপস্থাপনের অর্থ প্রস্তাব পাস, ভারতবিভাগ সময়ের ব্যাপার মাত্র। ভাইসরয় তাদের সাম্প্রদায়িক অর্জনের কথা ভারতসচিব জেটল্যান্ডকে জানান। তাদের সমর্থন নিয়ে ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে প্রস্তাব পাস যা ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

AMARBOI.COM

এর মূল বিষয় ছিল ভারতবিভাগের মাধ্যমে পশ্চিমে ও পুবে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে দুটো স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। পশ্চিমে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান এবং পুবে পূর্ববাংলা ও আসাম (যদিও আসাম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নয়)। শুরু থেকেই এভাবে স্বতন্ত্র মুসলিম ভূখণ্ড নিয়ে নীতিগত স্ববিরোধিতা। অন্যান্য স্ববিরোধিতার কথা না হয় বাদই গেল। এ প্রস্তাব উপস্থাপন করেন ফজলুল হক, সমর্থন জানান চৌধুরী খালিকুজ্জামান। এ প্রস্তাব উপস্থাপনে ফজলুল হকের উদ্দেশ্য ছিল অনুন্নত বাঙালি মুসলমানের স্বার্থরক্ষা করে বাংলা, বাঙালির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। তিনিও তখন ভাবেননি বাঙালি-অসমী জাতিসত্তার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সম্ভাবনার বিষয়টি।

পরদিন (২৪ মার্চ) ভারতীয় কাগজগুলোতে (হিন্দু সম্প্রদায় পরিচালিত) বড় বড় হরফে ছাপা হয় 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ার কথা। অথচ লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দটির উল্লেখ ছিল না। তাই পরবর্তী সময়ে জিন্না তার তিক্ত মন্তব্যে এমন কথা বলেছেন, হিন্দু কাগজগুলোর কল্যাণে আমাদের 'পাকিস্তান' প্রাপ্তি। এভাবে 'পাকিস্তান' শব্দটি বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে আত্মিক প্রিয়তা পেয়ে যায়। তিক্ত রাজনীতির বিরূপতা এভাবে বিপরীত স্বার্থ সিদ্ধ করতে থাকে। বলতে হয় নিয়তির নির্মম পরিহাস।

লাহোর প্রস্তাব শুরুতে সর্বশ্রেণির ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন পায়নি। জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃত্বের সমর্থক মুসলমান জনসংখ্যা তার প্রমাণ। সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী আল্লাবকশ সমরু থেকে সীমান্ত প্রদেশের লালকুর্তা নেতাদের সমর্থক জনগোষ্ঠী, এমনকি পাঞ্জাবের সেক্যুলার, ইউনিয়নিস্ট নেতা সিকান্দার হায়াত খানের মতো জনপ্রিয় নেতাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তবু এ কথা সত্য যে, লাহোর প্রস্তাব রাজনৈতিক অঙ্গনে তীরন্দাজি খেলার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয়ে 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' লেখে : 'এ মুহূর্তে ভারতে বিশৃঙ্খলার রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন জিন্না' (২ এপ্রিল, ১৯৪০)। লাহোর প্রস্তাবের সাংগঠনিক ও সাংবিধানিক জটিলতাদি বিচার করেই এ মন্তব্য। মুসলিম লীগ সদস্য ড. সৈয়দ আবদুল লতিফ তার মন্তব্যে সঠিক বিন্দুটি চিহ্নিত করেছিলেন এ বলে যে, মূল সমস্যা মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলোর মুসলিম অধিবাসীদের নিয়ে নয়, বরং সমস্যা তাদের নিয়ে যেখানে তারা সংখ্যালঘু এবং যারা জিন্নার লাহোর পরিকল্পনার ফলে চিরদিন এতিম হয়ে থাকবে। একথা মাওলানা আজাদেরও। তাই লতিফ দুর্বল কেন্দ্র নিয়ে গঠিত অখণ্ড ভারতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল গঠনের পক্ষে যেখানে স্বেচ্ছাস্থানান্তরের সুযোগ থাকবে।

অন্যদিকে অন্যান্য মুসলিম শিল্পপতির মতো স্যার আবদুল্লাহ হারুন ভারতবিভাগসহ স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে, মূলত তাদের প্রতিযোগিতাহীন শ্রেণিস্বার্থের সমৃদ্ধির সম্ভাবনায়। স্যার মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ খান অবশ্য ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থার পক্ষে যার কিছুটা পরবর্তী কেবিনেট মিশন প্রস্তাবের সঙ্গে তুলনীয়। সিকান্দার হায়াতের কথা আগেই বলা হয়েছে।

তিন

প্রকৃতপক্ষে লাহোর প্রস্তাবে ধৃত ভারতবিভাগ ও স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রের দাবি অনেকটা হঠাৎ করেই আসে এবং তা ভূখণ্ডভিত্তিক ও বিভাজনধর্মী হওয়ার কারণে এর গুরুত্ব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলে। পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বলা হতে থাকে যে, লাহোর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য শুরুতে ছিল মুসলমান স্বার্থ আদায়ের উপলক্ষ বা কৌশল মাত্র যা পরে দৃঢ় দাবিতে পরিণত হয়। এ তত্ত্বটি প্রধানত আয়েশা জালালসহ রিভিশনিস্ট ঘরানার অবদান যা জিন্না চরিত্র ও তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৎপরতা বিচারে সঠিক মনে হয় না।

আরো মনে হয় না এ কারণে যে, গোটা পরিকল্পনা ও প্রস্তাবের নেপথ্য কারিগর ব্রিটিশরাজ। তাদের ইচ্ছা এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী ও অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা কংগ্রেসকে শায়েস্তা করা। সে কাজটা তাদের ইচ্ছামতোই সম্পন্ন হয় ব্যাপক রক্তপাতের মাধ্যমে– সামনে হিমশীতল রক্তের একজন সেনাপতি, নরহত্যায় নৃশংসতায় যার কিছু আসে-যায় না। সে উদাহরণ ১৯৪৬-এর আগস্টে স্পষ্টই দেখা গেছে।

আর এই লাহোর প্রস্তাব যে আসলেই পাকিস্তান প্রস্তাব, ভারত ভেঙে দু-টুকরো করে দুই ডোমিনিয়ন তৈরির প্রস্তাব তা ভারতসচিবের কাছে ভাইসরয় লিনলিথগোর লেখা চিঠির বক্তব্যেও স্পষ্ট। স্পষ্ট জাফরুল্লাহ খানকে দেয়া নির্দেশনামায়। সে নির্দেশে শুধু প্রস্তাব তৈরি নয়, ভারতবর্ষকে দুই ডোমিনিয়নে বিভক্ত করে মানচিত্র তৈরির কথাও ছিল। এ বিষয়ে ১২ মার্চ (১৯৪০) ভাইসরয় লিনলিথগো ভারতসচিবকে লেখেন যে, তার নির্দেশমাফিক জাফরুল্লাহ ভারতবিভাগের মানচিত্রসহ প্রস্তাব তৈরি করছে। জাফরুল্লাহ কাদিয়ানি বিধায় বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছে। এর কপি জিন্নাকে এবং সম্ভবত আকবর হায়দারিকে (হায়দরাবাদের) পাঠানো হয়েছে ইত্যাদি (ওয়ালি খান, প্রাগুক্ত)।

লাহোর প্রস্তাব যদি আদপেই রাজনৈতিক প্রত্যাশা-প্রাপ্তির দরকষাকষিই হয়ে থাকবে তাহলে প্রতিটি বিকল্প প্রস্তাবে জিন্না তার আপত্তি জানাবেন কেন। বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে জিন্না তার সভাপতির ভাষণে সুস্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদের জন্য ভারত ভাগ করে দুটো স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি আবারো তুলবেন কেন। এরপর খালিকুজ্জামানসহ একাধিক শীর্ষনেতা আরো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, 'পাকিস্তানের চেয়ে কম কোনো কিছুই মুসলিম লীগ মেনে নেবে না। এমনকি দীর্ঘস্থায়ী ব্রিটিশ উপস্থিতিও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে (আর. জে. মুর, প্রাগুক্ত)।

বাস্তবে পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় খালিকুজ্জামান কথিত ব্রিটিশনির্ভরতা ঠিকই দেখা গেছে। যেমন প্রশাসনে, তেমনি সেনাবাহিনীর শীর্ষপদে। আর. জে. মুরের বিবরণ মতে, ১৯৪৯ সালেও পাকিস্তানের তিনজন গভর্নর ও তিন চিফ অব স্টাফ এবং ৪৭০ জন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন ইংরেজ। শুধু জিন্নার কারণে গভর্ণর জেনারেল পদে মাউন্টব্যাটেনকে বসানো হয়নি। আর মাউন্টব্যাটেন তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ইতিহাস তেমন প্রমাণ দেয়।

ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, বিকল্প প্রস্তাবগুলো নাকচ করার মধ্য দিয় জিন্না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় মুসলমান জনসমাজে এমন ভাবমূর্তি তৈরি করেন যে তিনি সবকিছুই করছেন সম্ভাব্য হিন্দু শাসনের বিপদ থেকে ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষার উদ্দেশ্যে। এবং ১৯৪৪ সালে পৌঁছে তার পায়ের নিচে মাটি যখন মোটামুটি শক্ত তখন (ফেব্রুয়ারি) তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'এখন ব্রিটেনের উচিত ভারতকে দুই সার্বভৌম জাতির জন্য বিভক্ত করার উপযোগী সংবিধান তৈরি করা' (মুর)।

পাকিস্তান দাবির মর্মকথা ছিল হিন্দু ভারতের বাইরে ভারতীয় মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি যা অখণ্ড ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে ব্যাহত হবে। এই ডাকে প্রধানত বাঙালি মুসলমান সাড়া দেয় যদিও পশ্চিমের মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র প্রকৃতির। পাকিস্তান ইস্যুভিত্তিক ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক নির্বাচন যদি মাইলফলক হিসেবে ধরা যায় তাহলেও দেখা যাবে, এরপর সীমান্ত প্রদেশের ওপর জবরদস্তি করে পাকিস্তান চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সিকান্দার-খিজিরের পাঞ্জাব বিভাজিত পরিণতি চায়নি, ফলে রক্তস্নান গোটা পাঞ্জাবজুড়ে। সিন্ধু মোহাজির ভারে আক্রান্ত। বেলুচিস্তানে জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন চলছে। পাকিস্তান একমাত্র বিভাজিত পাঞ্জাবের আর্থ-সামাজিক স্বার্থরক্ষা করে চলেছে। আর বাঙালির কাঁধে পাকিস্তান এমন ভারী বোঝা হয়ে চেপেছিল যে, অনেক রক্তের বিনিময়ে সে বোঝা নামাতে হয়েছে বাঙালিকে। অবাঞ্ছিত সংহিসতায় ও নেতিবাচক রাজনীতির মাধ্যমে অর্জিত পাকিস্তান এভাবে সংশ্লিষ্ট জাতিসত্তা ও তাদের ভূখণ্ডগুলোকে স্পর্শ করেছে এবং করে চলেছে যা তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার দায় কার?

সিমলা কনফারেন্সের (জুন, ১৯৪৫) ব্যর্থতা ছিল অখণ্ড ভারতের কফিনে বড়সড় একটি পেরেক পুঁতে দেয়ার মতো ঘটনা। বিষয়টা নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তবু এর ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব নিয়ে কিছু আলোচনা দরকার। অতিসংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, অচলাবস্থার জন্য এবার দায়ী জিন্নার অনড় দাবি যে, নির্বাহী কাউন্সিলের মোট পাঁচটি মুসলিম আসনের সব কটিই মুসলিম লীগ দল থেকে নিতে হবে। সেই সঙ্গে ভেটো দেয়ার অধিকার। ভাইসরয় ওয়াভেল এই অযৌক্তিক দাবি মেনে নিতে পারেননি।

এছাড়াও জিন্না পাঞ্জাব ইউনিয়নিস্ট পার্টি থেকে কাউন্সিলে মুসলিম সদস্য গ্রহণের ঘোরবিরোধী। ফজলি হোসেন, সিকান্দার হায়াত খান থেকে খিজির হায়াত খান পর্যন্ত সেক্যুলার চরিত্রের ইউনিয়নিস্ট নেতা শাসিত পাঞ্জাবে তখনো তাদের যথেষ্ট প্রভাব– সে হিসেবে ভাইসরয়ের সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন ছিল না (হডসন)। কংগ্রেস এক্ষেত্রে ইউনিয়নিস্ট পার্টিকে ছাড় দিতে রাজি ছিল তাদের দল থেকে কোনো মুসলমান নেতা মনোনীত না করে। কিন্তু মুসলিম সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে ছাড় দিতে রাজি হননি জিন্না যে জন্য এবং এমনি একাধিক কারণে ওয়াভেল পরিকল্পনার মৃত্যু।

যারা বলে থাকেন এবং এ বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে থাকেন এই বলে যে, ভারতবিভাগ ও পাকিস্তান জিন্নার মূল লক্ষ্য ছিল না, দরকষাকষির অস্ত্র ছিল মাত্র, তাদের এমন দাবি পূর্বোক্ত একাধিক কারণে ধোপে টেকে না। টেকে না যখন জিন্না মাওলানা আজাদের বক্তব্যের জবাবে বলেন, 'লীগ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভিন্ন এবং পাকিস্তান আইডিয়া ও অখণ্ড ভারতের আইডিয়া পরস্পরবিরোধী।' স্বভাবতই লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে মতের মিল, মনের মিল এক অসম্ভব বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় পাকিস্তানের কোনো বিকল্পই জিন্নার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং তা হয়নি।

এভাবে প্রতিটি ইস্যুতে জিন্নার অনড় 'সাম্প্রদায়িক অবস্থানে'র কারণে সিমলার ঠাণ্ডা আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐকমত্য সম্ভব হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। কংগ্রেস অন্য বিষয়ে যা-ই করুক হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়ে জিন্নাকে অনেকটা ছাড় দিয়েছিল সিমলা সম্মেলন সফল করে তুলতে। ভারতের মুসলমান সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম। সে বিচারে 'প্যারিটি' বা সংখ্যাসাম্য যুক্তিসঙ্গত ছিল না। তা ছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র (সোল স্পোকসম্যান) হওয়ার দাবি থেকে কিছুতেই সরে আসেননি জিন্না– যদিও এ দাবি তখনো পুরোপুরি সঠিক ছিল না। জিন্নার অযৌক্তিক, অনমনীয় মনোভাব ও আচরণে বিরক্ত ওয়াভেল তার পরিকল্পনা নিয়ে আর এগিয়ে যাননি। হয়তো রাজনীতিক না হয়ে সেনানী হওয়ার কারণে এমন সিদ্ধান্ত।

কেন জানি না, সংবিধান প্রণয়ন ও ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা বিষয়ে ওয়াভেলের ভূমিকা নিয়ে মাওলানা আজাদ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ ও প্রকাশ করেছেন। হয়তোবা সংলাপে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা ও নিকট থেকে তাকে দেখা ও তার মতামত জানার কারণে। তবু হঠাৎ আলোচনা বন্ধ করা ওয়াভেলের জন্য রাজনীতিকসুলভ আচরণ ছিল না বলে হডসনও মনে করেন। কেননা রাজনৈতিক সংলাপে বিশেষ করে সমঝোতামূলক আলোচনায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা খুব জরুরি। সেনাপতি ওয়াভেল সহিষ্ণুতার তেমন পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

হয়তো তাই রাজনীতিবিদ, বিশ্লেষক, এমনকি ভাইসরয়ের কিছুসংখ্যক পরামর্শকেরও অভিমত যে জিন্নার ভেটো দেয়ার ক্ষমতা মেনে নেয়া ভাইসরয়ের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয়নি। ঠিক হয়নি জিন্নার ওপর ন্যায্য চাপ দিয়ে তাকে সমঝোতায় আনার শেষ চেষ্টা না করে ময়দান ছেড়ে দেয়া, অভিভাবকের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন না করা। যে জন্য ভারতবিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ওঠে এ কারণে যে, হটকারী আচরণ সত্ত্বেও লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বে জিন্নার অযৌক্তিক-অনমনীয়তা তার পক্ষে ইতিবাচক ফল বয়ে আনে, মুসলমান সমাজে এমন ধারণা ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে যে, তিনি মুসলমান স্বার্থের জন্য লড়ে যাচ্ছেন। আর শাসকও তাকে অযৌক্তিক ছাড় দিয়ে চলেছেন।

ফলে মুসলমান সমাজে জিন্না ও মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সদিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের বিভাজন-নীতি তখনো চলমান যা জিন্না ও তার মুসলিম লীগকে সাহায্য করেছে। যেমন ভারতের দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের একটি বঙ্গদেশের গভর্নরদের বরাবর দেখা গেছে মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন জুগিয়ে যেতে। সমঝোতার চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থতার বোঝা মুসলিম লীগের জন্য ইতিবাচক হয়ে ওঠে। তাই অখণ্ড ভারত নিয়ে সমঝোতার চেষ্টায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াভেলের ব্যক্তিগত সদিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনার অনিবার্য পরিণতি বেগবান হয়ে ওঠে ভারতবিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিকে। এ বিষয়ে জিন্না ছিলেন অনমনীয়।

তা ছাড়া এ বিষয়ে আরো একটি কারণ বিবেচ্য। আর তাহলো ভারতীয় রাজনীতির দ্বন্দ্ব ও ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সম্বন্ধে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের আপসহীন মনোভাব, ভাইসরয়কে তার ইচ্ছামতো খোলা হাতে কাজ করতে না দেয়া। চার্চিলসহ একাধিক রক্ষণশীল দলীয় মন্ত্রীর ধারণা, ভারতীয় রাজনীতিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া পাগলামি বই কিছু নয় (হডসন)। তাই এক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাব কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না।

তবু ঘটনা-বিশ্লেষকগণ হঠাৎ সংলাপ বন্ধ করা এবং তার ফলে সমাধান খুঁজে পেতে ব্যর্থতার জন্য ভাইসরয়কে দায়ী করেছেন এই বলে যে, তার উচিত ছিল বিকল্প পরিকল্পনার জন্য চেষ্টা চালানো। হডসনের ধারণা, এতে জিন্নাও বিস্মিত হন, তারও ইচ্ছা ছিল আলোচনা অব্যাহত থাকুক। তবে সবকিছু বিচারে এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় জিন্না খুশিও হয়েছিলেন হয়তো এই ভেবে যে, তার অভীষ্ট পাকিস্তান অর্জনের পথে আরো এক পা এগিয়ে যাওয়া গেল।

AMARBOI.COM

সিমলা সম্মেলনটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়েছিল সবার পক্ষ থেকেই। এবং এখনো ভারতবিভাগ বিচারে তা মনে করা হয়ে থাকে। সেটা হঠাৎ করে সাত-তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়া রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক ছিল না। অনেকের মতে, এ পদক্ষেপ ভারতবিভাগের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। আশ্চর্য যে, তা সত্ত্বেও সিমলা বৈঠক ভেঙে যাওয়ার পর দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি লীগ-কংগ্রেস উভয়ের পক্ষ থেকে ভাইসরয় ওয়াভেলের উদ্দেশে প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছে এই বলে যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

কথাগুলো বলেছেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদ এবং মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্না। এ প্রশংসা মূলত ভাইসরয়ের সদিচ্ছার কারণে এবং ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে ব্যর্থতার দায়ভার গ্রহণের কারণে। শেষোক্ত বিষয়টাই হয়তো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তার সদিচ্ছার দাম রাজনীতিকরা দেননি, এক্ষেত্রে বিশেষ করে জিন্না। তার জেদ, তার অনমনীয় মনোভাব সমঝোতার অনুকূল ছিল না। আগেও বলেছি, একাধিক ঘটনা প্রমাণ করে যে সমঝোতা-সংলাপ ভেঙে এগিয়ে যাওয়া হয়ে উঠেছিল জিন্নার নীতি। সাপ্রু, দেশাই-লিয়াকত ইত্যাদি প্রস্তাব একের পর এক নাকচ করে দেয়ার দায় তো পুরোপুরি মি. জিন্নারই। সে কথা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার মূল গায়েন জিন্না হলেও একে বিকল্প পরিকল্পনায় টেনে না নেয়ার কারণ আসলে ওয়াভেল নন, কারণ ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত যা পরবর্তী সময়ের তথ্যাদি থেকে জানা যায়। ব্রিটেনে আসন্ন সাধারণ নির্বচানের ফল ও ক্ষমতাসীন সরকারের নীতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই এই সময়ক্ষেপণ। সমঝোতা যখন হচ্ছেই না, তখন কী দরকার তা টেনে নিয়ে অযথা শ্রম ও সময় ব্যয় করা? বরং ওটাকে সময়ের হাতে তুলে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা ভালো। পরবর্তী সরকার এসে যা ভালো বুঝবে করবে। সেই বিশুদ্ধ বেনিয়াবুদ্ধি, চতুর ব্রিটিশ রাজনীতি। তাই সিমলা ব্যর্থতার দায় ওয়াভেলের নয়। সংলাপ টেনে নিলেও সুফল মিলতো না।

প্রসঙ্গত ভারতের স্বরাজ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে চার্চিলের বিরূপ মনোভাবের গুরুত্ব মনে রাখা উচিত। বিষয়টি নানা ঘটনা উপলক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের হস্তক্ষেপের কারণে বিষয়টা নিষ্পত্তির দিকে যেতে পারেনি। শুধু ১৯৪২ বা ১৯৪৪-এই নয়, বরাবরই ভারত সম্পর্কে চার্চিলের মনোভাব ছিল নেতিবাচক এবং ভারতসচিব আমেরির বিচারে তা 'হিটলারসুলভ' একনায়কের। মার্চ ১৯৪৫-এ চার্চিল ওয়াভেলকে বলেন, ভারতের সমস্যা যতদিন সম্ভব বরফচাপা দিয়ে রাখা উচিত। ভাইসরয়ের মনে হয়েছে চার্চিল ভারতকে 'পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, প্রিন্সিস্তান ইত্যাদি নানাভাগে ভাগ করে দেয়ার পক্ষপাতী' ('বড়লাটের রোজনামচা', উদ্ধৃতি সুমিত সরকার)।

ভারতের জন্য এটা ভালো কী মন্দ তা নিয়ে নানাজনে নানাভাবে বিচার করতে পারেন, তবে এটা ঠিক যে, মন্দের ভালো হিসেবে জুলাই নির্বাচনে (১৯৪৫) ব্রিটেনে শ্রমিক দল (লেবার পার্টি) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী এবং ক্লিমেন্ট অ্যাটলি প্রধানমন্ত্রী, ক্রিপস সাহেবও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। তাদের ইচ্ছা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারা। তবে কিছুসংখ্যক শ্রমিক দলীয় নেতাও এমন চিন্তা সুনজরে দেখেননি, যেমন পররাষ্ট্রসচিব বেভিন। কাজেই ভারতের স্বরাজ বা স্বাধীনতা নিয়ে টানাপড়েন একটা স্থায়ী বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একটি বিষয় এ পর্যায়ে স্পষ্ট করা দরকার যে, সিমলা বৈঠকে এবং এর আগেও সরকারপক্ষ থেকে জিন্নার সঙ্গত-অসঙ্গত দাবির প্রতি অস্বাভাবিক নমনীয়তা দেখানো হচ্ছিল এবং তা ছিল ব্রিটিশনীতির অংশবিশেষ। তখনো জিন্না ভারতীয় মুসলমানদের 'একমাত্র মুখপাত্র' হওয়ার বাস্তব যোগ্যতা অর্জন তথা জনসমর্থন লাভ করেননি। এবং তা সরকারি মদত, প্রাদেশিক গভর্নরদের অযৌক্তিক সহযোগিতা সত্ত্বেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ অবস্থার প্রতিফলন দেখা গেছে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়ার মধ্যেও যদিও শাসকশ্রেণির চেষ্টা চলেছে মুসলিম লীগকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে রাখার জন্য। গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্জাব প্রদেশে ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রধান খিজির হায়াত খানের নেতৃত্বে জিন্নার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে গঠিত (১৯৪৪) মন্ত্রিসভা, কংগ্রেস নেতারা কারা-মুক্ত হওয়ার পর সীমান্ত প্রদেশে আবার ডা. খান সাহেবের নেতৃত্বে লালকুর্তা-কংগ্রেস যুক্তমন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মার্চ ১৯৪৫-এ বঙ্গে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন, কিন্তু গভর্নর বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন করতে না দিয়ে নিজের হাতে ক্ষমতা ধরে রাখেন। আসাম ও সিন্ধুতে নড়বড়ে লীগ মন্ত্রিসভা যে কোনো সময় পতনের অপেক্ষায়। ঘটনাগুলো জিন্নার একমাত্র মুখপাত্র হওয়ার দাবির পক্ষে যায় না।

তিন

এ সময়টাতে জিন্না খোশ মেজাজে ছিলেন না। তাই কোনো প্রকার সমঝোতার নীতির প্রতি তিনি সহযোগিতার হাত বাড়াতে রাজি হননি। তার এ নীতি ১৯৩৭-৩৮ পরবর্তী সময় থেকেই, যে জন্য ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে গান্ধি-জিন্না আলোচনাও কোনো সুফল তৈরি করতে পারেনি। এমনকি ১৯৪৫-এ জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার (১৫ আগস্ট, ১৯৪৫) পর জিন্নার চিরাচরিত দাবি– 'এবার পাকিস্তান চাই'। তার বক্তব্য : যুদ্ধের কারণে মুসলিম লীগ এতদিন ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছে। আর অপেক্ষা নয়। এখন পাকিস্তান নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। এরপরও কী বলা যায়, জিন্না পাকিস্তান চাননি?

জিন্নার কথার জবাবে স্যার ক্রিপস বলেন : তথাস্তু। আলোচনায় পাকিস্তান দাবি অবশ্যই প্রাধান্য পাবে। তার আগে সাধারণ নির্বাচন হয়ে যাক যা যুদ্ধের কারণে স্থগিত ছিল। ভাইসরয় এ প্রস্তাবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন। লীগপ্রধান জিন্না আবারো জানিয়ে দেন যে, পাকিস্তানভিত্তিক আলোচনা ছাড়া কোনো সমাধানই মুসলিম লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। অন্যদিকে কংগ্রেস অসন্তুষ্ট ভাইসরয় ওয়াভেলের ঘোষণায় ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গ না থাকায়।

এবার নয়া ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স। ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে যুদ্ধংদেহী উত্তাপ লক্ষ করে নয়া ভারতসচিব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তদুপরি গোদের ওপর বিষফোঁড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার নিয়ে ভারতীয় প্রতিক্রিয়া যা সহিংসতার জন্ম দিতে পারে। তাই তার ঘোষণা : ভারতকে কমনওয়েলথে স্বাধীন সহযোগী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে পাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা হবে। এ উদ্দেশ্যে শিগগিরই ভারতে সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে, যাতে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা শুরু করা যায় (হডসন)।

সব কিছুর হিসাবে বলা যায় রাজ-কংগ্রেস-লীগ এই ত্রিশক্তিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির প্রকাশ তা মধ্য-পঁয়তাল্লিশে এসেও শেষ হয়নি। বরং তা ক্রমশ ঘনীভূত ও জটিলতর রূপ নিতে শুরু করে। ব্রিটেনের নয়া মন্ত্রিসভা তাতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিচার-বিবেচনার যোগ্য যা মানসার-এর বিশাল 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার' গ্রন্থমালায় উদ্ধৃত। লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব ও হিন্দু-মুসলিম বিভেদ ভারতীয় রাজনীতিতে কতটা প্রভাব তৈরি করেছিল তার আভাস মিলবে সঙ্কট থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মাওলানা আজাদের ভাবনা ও পরিকল্পনায়।

লীগ-কংগ্রেস রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কেউ কেউ দেখতে চেয়েছেন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সংখ্যাগুরু বনাম সংখ্যালঘু স্বার্থের দ্বন্দ্ব হিসেবে। বিষয়টা যেভাবেই দেখা যাক না কেন শেষ পর্যন্ত সেটা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে দাঁড়িয়ে যায়। অন্তত এটুকু মানতে হয় যে, সংখ্যাগুরু বনাম সংখ্যালঘু স্বার্থের বিষয়টাকেই জিন্না দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক রূপে উপস্থাপন করেন, যা শেষ পর্যন্ত ছিল ধর্মীয় সহিংসতার অশুভ বার্তাবাহক। সে অশুভ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদ গান্ধিকে তার নিজস্ব চিন্তা ও পরিকল্পনার কথা লেখেন (২ আগস্ট, ১৯৪৫)।

মাওলানা আজাদের প্রথম চিন্তা মুসলিম লীগের বাইরে মুসলমান সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা যাতে তারা ভারতীয় মুসলমানের স্বার্থরক্ষার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ সংবিধান তৈরির পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তা এমন সংবিধান যা তাদের স্বার্থহানির ভয় দূর করতে পারে। একমুখী সরকার যেমন ব্যর্থ হতে বাধ্য, তেমনি ভারতবিভাগও, যা তার মতে মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। আজাদের মতে বিভাজন পরাজিতের মনোবৃত্তি যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাই সঠিক ভবিষ্যৎ সংবিধানে ভারত হবে একটি ফেডারেল কাঠামোর রাষ্ট্র যেখানে ইউনিটগুলো (প্রদেশ) সম্পূর্ণ স্বশাসনের অধিকারী হবে এবং তাদের মতামতভিত্তিতে কেন্দ্রের অধীনস্থ বিষয়গুলোর নির্ধারিত হবে। ইউনিটগুলোর বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার থাকবে। কেন্দ্রে ও প্রদেশে যুক্তনির্বাচন ব্যবস্থা চালু থাকবে। কেন্দ্রে আসন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। কেন্দ্রীয়প্রধান পর্যায়ক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় থেকে মনোনীত বা নির্বাচিত হবেন। আশ্চর্য, প্রায় চার দশক আগে রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যা নিরসনের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ নীতিগতভাবে প্রায় একই রকম প্রস্তাব রাখেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের পাবনা সম্মেলনে সভাপতির দীর্ঘ ভাষণে। কংগ্রেস নেতৃত্ব তাতে কান দেয়নি।

এ প্রস্তাবে গান্ধি আজাদকে থামিয়ে দেন এই বলে যে, কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তার এ মতামত এই মুহূর্তে প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। এতে অন্যদের চিন্তার প্রতিফলন নেই। তাছাড়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনা না করে কোনো রকম প্রস্তাব প্রকাশ্যে আনা ঠিক হবে না। তার অর্থাৎ গান্ধিরও এ বিষয়ে ভিন্নমতের অবকাশ রয়েছে। গোটা বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখনকার লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বে এবং বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনায় মাওলানা আজাদের প্রস্তাব অনেকটাই বাস্তবধর্মী ছিল যা হয়তোবা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারত। কিন্তু গান্ধি সে সম্ভাবনা নষ্ট করে দেন। এবার দায় জিন্নার নয়, গান্ধির। এ প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন পেতে পারত, অন্তত কেবিনেট মিশন প্রস্তাবের আলোকে এমন ধারণা অবাস্তব নয়। ভারতবিভাগ রোধের একটি সম্ভাবনার এভাবে মৃত্যু ঘটে হয়তো কংগ্রেসের পক্ষে অতিপ্রাপ্তির লোভে। এবং রাজনৈতিক রথের যাত্রা নিশ্চিত হতে থাকে ভারতবিভাগের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিগর্ভ ভারত : ছাত্র-জনতা-শ্রমিক ও নৌ-সেনা তৎপরতায়

সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতা ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে হতাশা ও অস্থিরতার কালোছায়া বিছিয়ে দেয় তার প্রভাব থেকে ত্রিভুজের কোনো কোণই মুক্ত ছিল না। এমনকি জনমনেও তার ছাপ পড়ে। ক্রিপস প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় যে-'নেহরু মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন একটা মীমাংসার জন্য' (সুমিত সরকার) তার পক্ষে এবার আরো অস্থির হয়ে ওঠারই কথা। আর জিন্না? তার শীতল সহিষ্ণুতায় চিড় ধরবে না এমন কথা কি জোর দিয়ে বলা যায়? তবে তার বহিঃপ্রকাশ হয়তো এতটা ঘটেনি, এই যা। বিয়াল্লিশে গান্ধি চাপমুক্ত হন 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়ে। এবার শুধু পথ হাতড়ে ফিরছেন। সমাধান মিলছে না।

সবদিককার পরিস্থিতি বিচারে ভারত তখন অগ্নিগর্ভ অবস্থায়। পেন্ডেরেল মুন-এর মতে, ১৯৪৫-৪৬ সময়পর্বে ভারত এক 'আগ্নেয়গিরির কিনারায়' দাঁড়িয়ে (তার ভাষায় On the edge of a volcano)। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ এই পুরো সময়টিই নানাদিক থেকে বিস্ফোরক চরিত্রের। এবং তা সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের প্রতিবাদে তীব্র গণবিস্ফোরণ, সারাভারত ডাক ধর্মঘট, শ্রমিক ধর্মঘট, অবিশ্বাস্য নৌসেনা বিদ্রোহ, বাংলায় তেভাগা আন্দোলন, তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতি মিলেই আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরক পরিস্থিতি, যা সামাল দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায় শাসকশ্রেণির পক্ষে।

সময়ের তাৎক্ষণিক হিসেবে তখনকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যুদ্ধশেষে বন্দি আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার, তাও আবার দিল্লির লালকেল্লায় যে লালকেল্লা দখলের স্লোগান ছিল সুভাষ পরিচালিত ওই বাহিনীর। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে জাপানি সহায়তায় সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি তৈরি করেন সুভাষ এবং ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার অর্থাৎ স্বাধীন ভারতীয় সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। জাপানের হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের মুক্ত করে গঠন করা হয় ওই ফৌজ। মুসলমান শিখ ও হিন্দু সেনা ও অফিসারদের সমবায়ে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বাহিনীতে ছিল মুসলমান সংখ্যাধিক্য, কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা দেখা দেয়নি সর্বাধিনায়কের নির্দেশ পালনে। বরং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এ বাহিনীর নানা ধর্মবিশ্বাসী সদস্যদের মধ্যে ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ যা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য। হডসনের হিসাব মতে, এ বাহিনীতে যোদ্ধা সদস্যের সংখ্যা মাত্র বাইশ হাজার, এবং বেসামরিক খাতে সদস্য সংখ্যা বিশ হাজার। কিন্তু এদের মনোবল ছিল অদম্য। সবচেয়ে অভিনব ঘটনা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের নায়িকা ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী বাঈয়ের স্মরণে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনী। সবাই সুভাষের অনুগত।

জাপানি সহযোগিতায় এ বাহিনীর অভিযান আসামের কোহিমা পর্যন্ত পৌঁছায় যেখানে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়তে থাকে। এসব ঘটনা বঙ্গদেশ ও বাঙালিকে তো বটেই গোটা ভারতীয় সমাজকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। ব্রিটিশ শাসনাধীন বিভিন্ন স্তরের ভারতীয় সেনাদের মধ্যেও বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে যায় যা পরে নৌসেনাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহে প্রকাশ পায়। এই প্রথম এ উপলক্ষে দেশব্যাপী স্বাদেশিকতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটে যা রাজনৈতিক নেতাদের চেষ্টায় ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

কিন্তু জাপানিদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণে ঘটনার গতি পাল্টে দেয়। সেই সঙ্গে আরেক অঘটন কথিত বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু। কিন্তু তাতে স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা শেষ হয়ে যায়নি। বরং বন্দি আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের প্রতিবাদে দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। এর সর্বোচ্চ প্রকাশ বাংলার রাজধানী কলকাতায়। তখন বাঙালি তরুণের কণ্ঠে আজাদ ফৌজের সমর সংগীত ধ্বনিত হতে থাকে– 'কদম, কদম, বাঢ় হায়ে যা'।

দুই

কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের ঘটনাবলী সুনজরে দেখেনি কিন্তু প্রবল জনমত উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব যাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা বা অফিসারদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য শাস্তি দেয়া না হয়। অন্যথায় এক ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হবে। শুধু তাই নয়, বিশিষ্ট কংগ্রেসী আইনজীবী ভুলাভাই দেশাই বন্দিদের পক্ষে দাঁড়ান। এগিয়ে আসেন উদারপন্থী নেতা তেজবাহাদুর সাপ্রু। এমনকি তাদের পক্ষ সমর্থনে যোগ দেন নেহরু। একটি দেশের মুক্তির জন্য যে সেনাবাহিনী লড়াই করেছে তারা ইতিহাস-লেখক হডসনের মতে 'কাল্‌প্রিট'। সাম্রাজ্যবাদী চেতনার চাপে ইতিহাসবিদের নিরপেক্ষতা এভাবে হারিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ওই ফৌজিদের স্বদেশপ্রেমের প্রতিদান দিতে ভুল করেনি বঙ্গ ও ভারতবাসী জনগণ এবং তা সম্প্রদায় নির্বিশেষে। বিচারাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা ও অফিসারদের মুক্তির দাবিতে গোটা দেশ টালমাটাল, বিশেষ করে বঙ্গদেশ ও তার রাজধানী কলকাতা। তরুণদের মুখে মুখে ফিরছে তিন-চারজন বন্দি-অফিসারের নাম– শাহনেওয়াজ খান, পিকে সায়গল ও গুরুবক্স সিং ধীলন যথাক্রমে মুসলমান, হিন্দু ও শিখ। ভিপি মেননের মতে, 'এই বিচার প্রচেষ্টা ছিল একটা বিরাট ভুল'।

১৯৪৫-এর নভেম্বর। বিচারের অপেক্ষায় একসঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী তিন ভারতীয়। অপরাধ– তারা স্বদেশের মুক্তি তথা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। আর সেজন্য সেই স্বদেশেরই রাজধানী দিল্লির লালকেল্লায় তাদের বিচার শুরু হয়েছে। এই ঘটনা দেখে দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। আর সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে তরুণদের চোখে তারা জাতীয় বীর। তাদের মুক্তির জন্য সমাজে রীতিমতো আলোড়ন। এ উপলক্ষে সুভাষ হয়ে ওঠেন স্বাধীনতাযুদ্ধের বীরউত্তম সেনানী। স্বাধীনতাকামী তারুণ্যের মধ্যমণি। পিছিয়ে পড়েন গান্ধি-নেহরু। আজাদ হিন্দ ফৌজের উচ্চারিত 'জয় হিন্দ' (জয় ভারত) স্বাধীনতাকামীদের জন্য 'প্রতীকী স্লোগান' হয়ে ওঠে সর্বজনীন চরিত্র নিয়ে, যেমন এদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধে স্লোগান হয়ে ওঠে 'জয় বাংলা'।

কংগ্রেস চিরশত্রু সুভাষের অনুগত সেনানীদের পক্ষে আইনি ও রাজনৈতিক লড়াই বেশ জোরেশোরেই চালাতে থাকে। ভুলে যায় পূর্বেকার সুভাষ-বিরোধী বক্তব্যের কথা। আর যারা সুভাষচন্দ্রকে 'কুইসলিং' বলে গালাগাল করেছিলেন অবস্থাদৃষ্টে তাদের পিঠ তখন দেয়ালে ঠেকে গেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত বিষয়টি প্রধানত যে ত্রিপক্ষকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে তারা হলো কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও ব্রিটিশরাজ। প্রেক্ষাপটে ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি জনতা (তার সিংহভাগ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত)। তবে তা মুসলিম লীগকেও স্পর্শ করে সম্ভবত ধর্মীয় কারণে।

পরিস্থিতি অর্থাৎ জনমনোভাব লক্ষ্য করে সবচেয়ে বিচলিত ভারতের ইংরেজ শাসকশ্রেণি। ভাইসরয় ওয়াভেল থেকে প্রাদেশিক গভর্নরবৃন্দ ও শ্বেতাঙ্গ আমলা প্রশাসন। তাদের ভয় আরেকটি বিয়াল্লিশ (ভারত ছাড় আন্দোলন) জেগে না ওঠে। অবস্থা তেমনই বা তার চেয়েও গুরুতর চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। অসন্তোষ ভারতব্যাপী। এর সর্বোচ্চ রূপ শুরুতে কলকাতায়, যে কলকাতাকে সবচেয়ে রাজনীতি সচেতন শহর হিসেবে গণ্য করা হয়। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এই কলকাতায়ই আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১৯৪৫-এর নভেম্বরে (২১ থেকে ২৩) ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মতো ঘটনা দেখা দেয়। দেখা দেয় গণঅসন্তোষের প্রবল এক বিস্ফোরণ। ছাত্রদের প্রতিবাদী মিছিলে ধর্মতলায় পুলিশের গুলিতে ছাত্রহত্যা ব্যাপক ও ক্রুদ্ধ গণআন্দোলনের প্রকাশ ঘটায়। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে, ওই ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দেয় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন এবং মুসলিম ছাত্রলীগ। তিন দলের পতাকা নিয়ে ছাত্রদের নির্ভয় মিছিল সবাইকে অবাক করে দেয়।

এতে এতটা আবেগ তৈরি হয় যে সাধারণ মানুষ, ছোটখাটো পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়। শ্রমিক ধর্মঘট এ প্রতিবাদকে সর্বজনীন চরিত্রে পরিণত করে। ট্রামে-ট্রেনে আগুন লাগে। রাস্তায় অবরোধ তৈরি করা হয়। নির্ভীক প্রতিবাদী মানুষ গুলির মুখেও দৌড়ে পালায় না। মোটামুটি হিসাবে গুলিতে নিহতের সংখ্যা তেত্রিশ, আহত কমপক্ষেখ ২০০ সাধারণ মানুষ। আর ৭০ জন ব্রিটিশ ও ৩৭ জন মার্কিন সৈন্য আহত। ভাঙচুর করা হয় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ১৫০টি গাড়ি (সুমিত সরকার)।

সে সময়ের দৈনিক পত্রিকাগুলো আলোড়ন তোলে মৃত্যুকে তুচ্ছ করা ছাত্র-জনতার সংগ্রাম নিয়ে, প্রথম দিন পুলিশের গুলিতে শহীদ রামেশ্বর, সালামকে নিয়ে, যাদের নাম কিংবদন্তির মর্যাদা পেয়ে তরুণদের মুখে মুখে ফেরে। কয়েক মাস পর এ বিষয় নিয়ে জীবনবাদী কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন তার অবিস্মরণীয় উপন্যাসিকা 'চিহ্ন'। বলতে হয় 'চিহ্ন' নভেম্বর বাস্তবতার অসামান্য একটি চালচিত্র। বিশ-বাইশ বছরের তরুণ গুলিবিদ্ধ গণেশ কাহিনীর নায়ক। তার বোধে ওই আন্দোলন এক বিস্ময়, 'তার চেতনাকে গ্রাস করে রাজপথের জনতা আর পুলিশের কাণ্ড। সেই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে। ...হাঙ্গামা যে এমন অনড়, অটল, ধীরস্থির হয়, বন্দুকধারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ এদিক-ওদিক এলোমেলো ছোটাছুটি করে না, এ তার ধারণায় আসে না।' মনে হয় যেন রাজপথে, রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শব্দচিত্র এঁকেছেন 'চিহ্ন' উপন্যাসের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাবি, একুশে-বাইশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকার গণআন্দোলনে পুলিশের হত্যাকাণ্ড নিয়ে এমন একটি উপন্যাস লেখা হলো না কেন বাংলাদেশে।

জনগণের সাহস ও অনমনীয় দৃঢ়তায় অবাক বঙ্গদেশের গভর্নর কেসি একই কথা লেখেন নভেম্বর অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যে গুলির মুখেও জনতা সরে যাচ্ছে না। আর ২৭ নভেম্বর ভাইসরয় ওয়াভেল এ বিষয়ে ভারতসচিবকে লেখেন যে, গভর্নর কেসি অবাক এই প্রতিবাদ-আন্দোলনের পেছনে ব্রিটিশ-বিরোধী চেতনা লক্ষ্য করে। তার ধারণা গোটা পরিস্থিতি এখনো বিপজ্জনক ও বিস্ফোরণধর্মী (ম্যানসার, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দলগুলোর ভূমিকা বিশেষত লীগ-কংগ্রেস সম্বন্ধে একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝে নেয়া দরকার যে তারা সরাসরি এ বিদ্রোহ-প্রতিম ঘটনাকে তাদের রাজনীতিতে ধারণ করেনি। তুমুল গণঅভ্যুত্থানের চাপে কংগ্রেস এতে অংশ নেয়। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় দু-একজন নেতা, যেমন গান্ধি-প্যাটেলের প্রতিক্রিয়া থেকে তা বোঝা যায়। বোঝা যায় কংগ্রেস-বিড়লার যোগাযোগ, বিড়লার ছোটাছুটি ও শাসকদের সঙ্গে দেনদরবার ও আশ্বাসদানের মতো ঘটনায় ('ইন দ্য শ্যাডো অব মহাত্মা', প্রাগুক্ত)। একই চরিত্রের প্রকাশ লীগ নেতৃত্বে।

নির্বাচনের আগে কোনো রাজনৈতিক দলই গণআন্দোলন পছন্দ করে না। এটা এক চিরায়ত রাজনৈতিক সত্য। তাই দেখি এ ঘটনার প্রায় ১৭ বছর পর পূর্ববঙ্গে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে গণতন্ত্রী রাজনীতিকদের একই ভূমিকা। নভেম্বরের অভাবিত ঘটনা সম্বন্ধে ঘনশ্যাম দাস বিড়লা বিলেতের জনৈক বড়কর্তাকে আশস্ত করেন এই বলে যে, নেহরুর উত্তেজক বক্তৃতা নিছকই তাৎক্ষণিক বিষয়। টিভি-সিরিয়ালের ডায়ালগের মতো তার আশ্বাস : 'সব ঠিক হয়ে যাবে'।

তিন

কিন্তু সবকিছু ঠিক হয়নি, ব্রিটিশ শাসকের হিসাবমতো ঠিক হয়নি, তাই তাদের সোনার ভারত ছেড়ে যেতে হয়েছে। সে হিসাবে কিছুটা হলেও ঠিক হয়েছে লীগ কংগ্রেসের চাওয়া-পাওয়া। ওই প্রবল প্রতিবাদী অভ্যুত্থানে জিন্না-লীগের যোগদান কিছুটা দুর্বোধ্য এ কারণে যে বিয়াল্লিশ আগস্টের মতো কোনো শাসক-বিরোধী গণআন্দোলনে জিন্না-মুসলিম লীগ কখনো যোগ দেয়নি। আর কংগ্রেসের সঙ্গে তো যোগ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমার ধারণা লীগের ছাত্রফ্রন্টের বামঘেঁষা ও গণতন্ত্রমনা ছাত্রদের যোগদান যেমন চাপে ফেলে জিন্নার সম্মতি আদায় করে তেমনি দ্বিতীয় কারণ হতে পারে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মধ্যে মুসলমান, বিশেষ করে পাঞ্জাবি মুসলমান সংখ্যাধিক্য। শেষোক্ত বিষয়টি মুসলমান জনশ্রেণিকে স্পর্শ করেছিল। জিন্না হয়তো তা লক্ষ্য করে থাকবেন, তাই এটুকু ছাড়। আর সে কারণে অভ্যুত্থান নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে (১৯৪৬) পৌঁছে যাওয়ার পরও ছাত্রসূচিত গণঅভ্যুত্থানের প্রভাবে রাজপথের সাম্প্রদায়িক ঐক্য রাজনীতিতে স্থায়ী জায়গা করে নিতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গতকারণে ব্রিটিশ শাসকদের ভয় আতঙ্কে পৌঁছায়, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি লক্ষ্য করে। রাজা ষষ্ঠ জর্জকে লর্ড ওয়াভেলের পাঠানো বার্তায় (৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৫) অবশ্য ওই সম্প্রীতি 'সাময়িক বাঁক ফেরা' হিসাবে ধরে নিয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছেন তারা (ম্যানসার, প্রাগুক্ত)। আসলে লীগ-কংগ্রেসের কল্যাণে বিষয়টি তেমন চরিত্রেই পৌঁছে যায়। চতুর বেনিয়াবুদ্ধি ঠিকই বুঝে নেয় ভারতীয় রাজনীতিকদের স্বার্থবুদ্ধি ও চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য। আর বুঝবেই না কেন যখন গান্ধিসহ শীর্ষ কংগ্রেস নেতারা এ বিষয়ে বঙ্গীয় গভর্নর কেসির সঙ্গে একের পর এক দেখা করে চলেছেন সম্ভবত শাসকদের আশ্বস্ত করতে। দেখা করেছেন ভাইসরয়ের সঙ্গেও।

অবস্থাদৃষ্টে ব্রিটিশরাজ বিচার প্রক্রিয়ায় কিছুটা ছাড় দিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে। যেমন বলা হয় যেসব ফৌজি সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা বা নৃশংস আচরণের অভিযোগ রয়েছে কেবল তাদেরই বিচার করা হবে, অন্যদের নয়। রাজনীতিকদের জন্য আরেকটি সুখবর হলো ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য উচ্চপর্যায়ের একটি কেবিনেট মিশন ভারতে পাঠানো হবে এমন আশ্বাস। উদ্দেশ্য ভারতে ক্ষমতার হস্তান্তর।

উনিশ শতকের ধীমান লেখক কালিপ্রসন্ন সিংহ তথা 'হুতোম প্যাঁচা'র ভাষায় বলতে হয় 'তবু হুজুগ মিটল না'। লালকেল্লার বিচারে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য আবদুর রশীদকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়ার প্রতিবাদে ছাত্ররা আবার রাজপথে নামে। এ আন্দোলনের ঢেউ নভেম্বরকেও ছাড়িয়ে যায়। দুই পর্বের এ গণবিস্ফোরণ এতটাই স্পর্শ করে কবি, লেখক ও সংস্কৃতিসেবকদের যে কবি বিষ্ণু দে জনসমর্থন-চেতনার প্রকাশ ঘটান 'ফেব্রুয়ারি খুঁজে পায় নভেম্বরের সীমা'র মতো পঙ্ক্তি রচনা করে।

ফেব্রুয়ারির (১৯৪৬) ছাত্র-জনতার প্রচণ্ড বিক্ষোভের দিনটি পরিচিতি পায় 'রশীদ আলী দিবস' হিসেবে। চরিত্র নভেম্বরের মতোই, ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি শহর কলকাতা অচল। ছাত্রদের চাপে হিন্দু-মুসলমান জনতার প্রতিবাদী ঐক্য গড়ে ওঠে। লীগ-কংগ্রেস-কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা একসঙ্গে উড়তে থাকে মিছিলে, সমাবেশে। এবারও কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা। কাছাকাছি সব শ্রমিক এলাকায় ধর্মঘট, চাকা বন্‌ধ।

ওয়েলিংটন স্কয়ারের বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন মুসলিম লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কংগ্রেস নেতা সতীশ দাশগুপ্ত আর কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী। এ সংঘর্ষে সরকারি হিসাবে নিহত ৮৪ জন, আহত ৩০০ জন (গৌতম চট্টোপাধ্যায়, উদ্ধৃতি সুমিত সরকার)। বিক্ষোভ দমনে পুলিশ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবাহিনী একযোগে কাজ করে। প্রতিবাদে সারাদেশে শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দেয়। এর মধ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) থেকে সূচিত বোম্বাইয়ের শ্রমিক ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য ছিল শান্তির আবহ সৃষ্টি। মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের সে ইচ্ছা আরো প্রবল। কারণ ধর্মঘট মানেই ক্ষতি। সেই সঙ্গে শাসকশ্রেণির সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট। তাছাড়া সামাজিক বিশৃঙ্খলা। নেতারা না চাইলেও এ আন্দোলনের প্রভাব পড়ে ভারতীয় নৌসেনাদের ওপর। শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ বৈষম্য ঘিরে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ এ উপলক্ষে বেরিয়ে আসে। বিদ্রোহ করে ভারতীয় নৌসেনারা। শুরু ১৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) বোম্বাইতে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে করাচি, কলকাতা ও মাদ্রাজে নাবিকদের মধ্যে।

বাইশে ফেব্রুয়ারি নাগাদ বিদ্রোহী নাবিকরা বোম্বাইয়ে ২২টি জাহাজ দখল করে নেয়। এমনকি ব্রিটিশ ভাইস অ্যাডমিরালের ফ্ল্যাগশিপও তাদের দখলে চলে আসে। বিদ্রোহী জাহাজগুলোর মাস্তুলে পূর্বোক্ত তিন দলের পতাকা তোলা হয়। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সুবাতাসে উড়তে থাকে ত্রিদলীয় পতাকা। তাদের দাবির মধ্যে যেমন ছিল তাদের কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের নানাদিকের অবসান তেমনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মুক্তি এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার ইত্যাদি। অর্থাৎ নিজস্ব অর্থনৈতিক দাবির পাশাপাশি রাজনৈতিক দাবিও ছিল।

AMARBOI.COM

চার

সারাদেশে তখন রাজনৈতিক চেতনা এত স্পষ্ট, উত্তাপ এত তীব্র যে লীগ-কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্ভবত প্রমাদ গোনে পাছে শাসক-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব বামরাজনীতি ও জনগণের হাতে চলে যায়। তাই ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) যখন নৌসেনাদের সমর্থনে গোটা বোম্বাই হরতালে অচল তখন লীগ-কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্ব শান্তির ধুয়া তোলে, তাতে সাড়া দেয় না সংগ্রামী জনতা। একমাত্র ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। রাজপথে চলতে থাকে এক ধরনের খণ্ডযুদ্ধ। কলকারখানা বন্ধ। ক্ষুব্ধ মানুষ রাজপথে। তাদের স্তব্ধ করতে সেনাবাহিনী পথে নামে। সরকারি হিসাবে নিহত-আহতের সংখ্যা কলকাতা বিক্ষোভের থেকে বেশি। সে হিসাবে ২২৮ জন নিহত এবং ১০৪৬ জন আহত, সেই সঙ্গে ৩ জন পুলিশ নিহত ও ৯১ জন আহত (ম্যানসার, খণ্ড ৬)।

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী নৌসেনাদের আত্মসমপর্ণ করতে হয় গান্ধি-প্যাটেল-জিন্না প্রমুখের চাপে এবং এই আশ্বাসে যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না। তেইশে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) সেই কালো দিন, মিথ্যা স্তোকে আত্মসমর্পণের দিন। তখনো নৌসেনাদের মনোবল এত অটুট যে তাদের দাবি তারা ব্রিটিশ শাসকদের কাছে নয়, লীগ-কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু লীগ-কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের কথা রাখেনি, জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তারা তাদের দেশপ্রেমের ও জনহিতৈষণার প্রমাণ রাখে।

এ উপলক্ষে একটি ছোট তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৬-এ ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১৯,৬১,৯৮৪ এবং এবং সেই সঙ্গে সমর্থন অগুনতি ছাত্র, তরুণ, কর্মী, কৃষক, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি কর্মচারী, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ এমনকি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বেশ কিছুসংখ্যক সদস্যের। অর্থাৎ একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতি একটি রাজনৈতিক-সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সে সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয় যতটা শাসকশ্রেণি, তারচেয়ে বেশি লীগকংগ্রেস রাজনীতি।

ইতিমধ্যে হায়দারাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানায় কৃষক বিদ্রোহের সূচনা, সূচনা উত্তরবঙ্গে ভাগচাষিদের তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোকে সমন্বিত শক্তিতে পরিণত করা যায়নি, তেমন চেষ্টাও হয়নি। এ বিষয়ে যে দায়িত্ব ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পালন করার কথা নানা কারণে তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কংগ্রেস ও লীগের তুলনায় জনসমর্থন আদায়ে তাদের শক্তি-সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত কমই ছিল। তারচেয়ে বড় কথা বিপ্লব ঘটানোর মতো রাজনৈতিক চিন্তা ও কৌশল কোনোটাই তাদের ছিল না।

স্বভাবতই বিভিন্ন দশকে সংঘটিত ব্যাপক জনবিস্ফোরণ ঢেউ তুলে হারিয়ে গেছে। যেমন বিফলে গেল সর্বশেষ ১৯৪৫-৪৬-এর শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতার তীব্র গণবিস্ফোরণ। তাই ঘটেছে সমঝোতার মাধ্যমে ক্ষমতার হস্তান্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ নির্বাচন ও মুসলিম রাজনীতি

নানাদিক বিচারে তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে সিমলা বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। অবশ্য মূলত বৈঠক ভেঙে যাওয়ার কারণে! এর সঙ্গে যুক্ত দুটো ঘটনা। ব্রিটেনের নির্বাচনে শ্রমিক দলের বিজয় এবং যুদ্ধে জাপানের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা শ্রমিক দলের জয়ে উল্লাস প্রকাশ করে তাদের অভিনন্দন জানান। স্টাফোর্ড ক্রিপস এবারও মন্ত্রী। যুদ্ধাবস্থার কারণে ভারতে নির্বাচন দীর্ঘ সময় স্থগিত ছিল। এখন সেখানে নির্বাচন হওয়া দরকার, এমন ভাবনা তার এবং আরো অনেকের।

জিন্না বিশেষভাবে খুশি। নির্বাচনে কংগ্রেসকে একহাত নেয়া যাবে, নিজেকে ও মুসলিম লীগকে মুসলিম ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি বা মুখপাত্র প্রমাণ করা সম্ভব হবে। তার বক্তৃতায় (৬ আগস্ট, ১৯৪৫) জিন্না স্পষ্ট ভাষায় সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার জন্য গান্ধিকে দায়ী করে বলেন যে, এবার মুসলিম লীগ নির্বাচন করবে 'পাকিস্তান দাবি'র (পাকিস্তান ইস্যু) ভিত্তিতে যাতে সাংবিধানিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায়।

কংগ্রেসও নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী। তবে তাদের দাবি নির্বাচন মুক্ত, নিরাপদ পরিবেশে হওয়া আবশ্যক। অবশ্য এ দাবির নেপথ্য কারণ অগ্রাহ্য করার মতো ছিল না। মুসলিম লীগের যুদ্ধংদেহী ভাব, তাদের 'ন্যাশনাল গার্ড' নামীয় উগ্র ক্যাডার বাহিনী, প্রতিপক্ষের ওপর হামলা ইত্যাদি বিষয় সম্ভবত ওই বক্তব্যের মূল কারণ। কেন্দ্রে ও প্রদেশে মুসলিম আসনের নির্বাচনে দৃষ্ট ঘটনাবলী ওই আশঙ্কার বাস্তব প্রতিফলন। হুমায়ূন কবির থেকে সৈয়দ নওশের আলী, আশরাফউদ্দিন চৌধুরী থেকে আবদুল হালিম গজনভি প্রমুখ জাতীয়তাবাদী প্রার্থীর কারো কারো ওপর দৈহিক আক্রমণ ও তাদের প্রত্যেকের নির্বাচনী সভায় লীগ ক্যাডারদের হামলা তার প্রমাণ। অন্তত একটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকার বিবরণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের একচেটিয়া জয়ের কিছু রহস্য স্পষ্ট করে তোলে।

ইতিমধ্যে ভাইসরয় ওয়াভেল তার লন্ডন সফরে কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ শেষে দিল্লিতে ফিরে ঘোষণা করেন যে, এই শীতেই কেন্দ্রে ও

প্রদেশগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)। শুনে জিন্নার ঘোষণা যে এবার তাদের নির্বাচনী দাবি একটাই– পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং বাংলা ও আসাম নিয়ে সার্বভৌম, স্বতন্ত্র পাকিস্তান গঠন করতে হবে। এ আহ্বানে কিছুটা সাড়া দেখা যায় পশ্চিমাঞ্চলের নেতাদের মধ্যে। তবে বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এই সাড়া ব্যাপকভাবে এবং তা প্রধানত আবুল হাশিম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতার তৃণমূলস্তরে প্রচারের গুণে। সেই সঙ্গে মৌলভী-মাওলানাদের ধর্মীয় প্রচার মুসলিম লীগের নির্বাচনী পালে হাওয়া জোরদার করে। তাছাড়া দৈনিক 'আজাদ'-এর সাম্প্রদায়িক প্রচারও কম গুরুত্ব বহন করেনি।

এ সময়টাতে মাস দুয়েকের জন্য আমি গ্রামে। চেনা গ্রামটাকে তখন রাজনৈতিক দিক থেকে অচেনা মনে হয়েছে। গ্রামের যেসব নিম্নবর্গীয় তরুণ এক সময় রাজনীতির 'র' বুঝত না, সম্পন্ন বাড়িতে বা ক্ষেতখামারে কাজের বাইরে আর কিছু তাদের বোধের অন্তর্গত ছিল না তাদেরও দেখা গেল গ্রাম্য ভাষায় জিন্না-বন্দনা ও কংগ্রেস-বিরোধী গান গাইতে। এবং তা বেশ চড়া মেজাজে। এর অর্থ ভোট-সাম্প্রদায়িকতা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দেখে অবাক লেগেছে।

গ্রাম থেকে শহরে ফেরার পথে শিয়ালদা স্টেশনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা– সন্ধ্যার পর অন্য ট্রেন ধরব বলে। তাই হালকা চালে পায়চারি করতে গিয়ে চোখে পড়েছে মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ড নামীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মাস্তান চেহারার কয়েকজন যুবক সার বেঁধে দাঁড়ানো, আর থেকে থেকে ক্রমাগত ফুকার : 'মুসলিম লীগ কাউন্সিলর', 'মুসলিম লীগ কাউন্সিলর'। আমি কাউন্সিলর নই বুঝে এক বিশালদেহী কর্মী মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে তার পেশল হাতের ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দেয়। তারপর সেই 'ফুকার'।

তখনকার রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তন নড়াইল শহরেও কিছুটা দেখা গেছে বিশেষ করে কলেজের মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে। তাদের রাজনৈতিক মানসিকতার পরিচয় মিলেছে তাদের বোর্ডিং হাউসের সামনে দেবদারুপাতায় সজ্জিত 'জিন্নাহ গেট' তৈরিতে। আরো মিলেছে পরে প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় সৈয়দ নওশের আলীর বিরুদ্ধে অনাচারী মিছিল ও কুৎসিত স্লোগানে এবং সৈয়দ সাহেবের জনসভায় ইটপাটকেল নিয়ে আক্রমণে। এসব অবশ্য শহরবিশেষের ঘটনা। কিন্তু গোটা নির্বাচন পরিস্থিতি ধর্মান্ধতার টানে এক অনাচারী চরিত্র অর্জন করেছিল। দুয়েকটি নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের বয়ানেও এমন ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে কেমন এক ধরনের অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়। একদিকে মুসলিম লীগের উগ্র বৈরিতা, অন্যদিকে কংগ্রেসের মুসলিমনীতি বিষয়ক দোদুল্যমানতা। বিষয়টা ভিপি মেননের লেখায় উঠে এসেছে (পৃ. ২২১)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমান জনতার সমর্থন আদায়ে গান্ধির কাছে মাওলানা আজাদের প্রস্তাব এবং এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের মুক্তচিন্তার গুরুত্ব। এ প্রস্তাব ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য কিছু মাত্রায় সাংবিধানিক ছাড় তথা সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের অবশেষ মতামত বড় একটা জানা যায়নি, লিখেছেন ভিপি মেনন। আমার ধারণা, এ প্রস্তাব এসেছে বেশ দেরিতে। ইতিমধ্যে গঙ্গা-পদ্মায় অনেক জল, অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। এ সময়ে কংগ্রেসের কিছু করার ছিল না। সময়ের ঘণ্টা বেজে গেছে। কিছু করার যথার্থ সময় ছিল ১৯৩৭-৩৮-এ। তবু অভিযোগ রয়েছে কারো কারো লেখায় যে, কংগ্রেস কোনো কোনো জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রার্থীকে অর্থ সাহায্য দিয়েছে।

আসলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলার যথেষ্ট অভাব ছিল যেজন্য মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে তারা সুবিধা করতে পারেনি। তাদের কেউ কংগ্রেস প্রতীকে, কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে, কেউবা অন্য দলবিশেষের পক্ষে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। স্বভাবত তাদের সবার পেছনে আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক সমর্থন ছিল না। তাছাড়া কংগ্রেস প্রতীকে অন্তত বাংলায় বা যুক্তপ্রদেশে বা পাঞ্জাবে মুসলমান প্রার্থীর নির্বাচনে প্রতিযোগিতা বাস্তবতা বিচারে সঠিক ছিল না। সৈয়দ নওশের আলী বা আশরাফউদ্দিন চৌধুরী সম্বন্ধে নিশ্চিত এ কথা বলা যায়। তাদের উচিত ছিল ১৯৪০ সালের পরই জাতীয়তাবাদী মুসলিম ফ্রন্ট গঠন করা যার পেছনে কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকতে পারে।

ফ্রন্ট গড়ার উদ্যোগ তারা অবশ্য নিয়েছেন, তবে দেরিতে, শেষ মুহূর্তে, যেমন শীলা সেন লিখেছেন (মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, প্রাগুক্ত)। লীগ-রাজনীতির বাইরে মুসলিম রাজনৈতিক গ্রুপগুলোকে নিয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ফ্রন্ট গঠিত হয় ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯৪৫)। আশ্চর্য যে এ উদ্যোগ আর কেউ নেয়নি, নিয়েছিল জমিয়াতুল উলেমা হিন্দ নামের ধর্মীয় সংগঠন। এতে অন্তর্ভুক্ত জমিয়াতুল উলেমা, মুসলিম মজলিস, মমিন কনফারেন্স, কৃষক প্রজাপার্টি এবং আঞ্জুমান ওয়াতানের মতো কয়েকটি গ্রুপ, যাদের ঠিক পার্টি বলা চলে না।

কুমিল্লার আশরাফউদ্দিন চৌধুরীর ওপর লেখা 'রাজবিরোধী' বইটিতে চৌধুরী সাহেবের জবানিতে তার নির্বাচন প্রচার অভিযানে মুসলিম লীগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ত্রাসীদের হামলার কথা লেখা হয়েছে। তার ওপর দৈহিক আক্রমণের চেষ্টার কথা রয়েছে তাতে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে লীগের এ বৈশিষ্ট্য প্রায় সর্বত্র দেখা গেছে।

মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে করাচিতে এদের আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২ অক্টোবর (১৯৪৫)। মূল লক্ষ্য লীগ-বিরোধী বিকল্প রাজনৈতিক ধারা গঠন। কংগ্রেস এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। একমাত্র শরৎ বসু এক বিবৃতি মারফত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কংগ্রেসের ছাতার নিচে সংঘবদ্ধ করার কথা বলেন (পৃ. ২০২)। কিন্তু অন্তিম পর্যায়ে সেটাও হতো আরেক ভুল। কারণ জিন্না ও মুসলিম লীগের ক্রমাগত কংগ্রেস-বিরোধী প্রচার মুসলমান জনতার কান এতটা ভারী করে রেখেছিল যে, কংগ্রেস নয় স্বাধীন বিকল্প পার্টি বা ফ্রন্ট গঠন হতে পারত সঠিক সিদ্ধান্ত। এ সাংগঠনিক কাজটি করা উচিত ছিল অন্ততপক্ষে ১৯৪০ সালে যখন মুসলিম লীগের রাজনৈতিক শিকড়-বাকড় মুসলিম জনমানসের খুব একটা গভীরে ছড়িয়ে যায়নি। তবু মনে রাখতে হবে মুসলিম লীগের ক্রমাগত কংগ্রেস-বিরোধী প্রচার এবং কংগ্রেসের কিছু ভুলভ্রান্তির কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের বড়সড় অংশ কংগ্রেসকে হিন্দু স্বার্থের সংগঠন হিসেবে ভাবতে শুরু করে। বড় সমস্যা, কংগ্রেস এ বিষয়টা ততখানি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেনি।

AMARBOI.COM

তিন

মুসলিম লীগ-বিরোধী বিকল্প মুসলিম রাজনীতির অকালবোধন সম্বন্ধে মনে হয় কিছু জানা দরকার। জিন্নার 'পাকিস্তান ইস্যু' ভিত্তিক নির্বাচনী ঘোষণার পর বঙ্গীয় মুসলিম লীগ বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। বঙ্গীয় লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম এ বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক মেনিফেস্টো তৈরি করে তাতে ঘোষণা করেন : 'আসুন, আমরা সবাই লড়াইয়ে নামি'। হাশিম-সোহ্‌রাওয়ার্দী এই দুই নেতা জেলা পর্যায়ে সফর করতে থাকেন। পরে তারা গ্রামগঞ্জে পর্যন্ত পৌঁছে যান যে জন্য প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের সর্বোত্তম বিজয় বঙ্গদেশে। নির্বাচনী প্রচারে আবুল হাশিম বাদে আর সবার কণ্ঠেই ছিল সাম্প্রদায়িক জিহাদি নারা যা বিজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। অন্য কারণগুলো খুব স্পষ্ট যা আগে বিশদভাবে বলা হয়েছে। এবং এর মূলে রয়েছে স্বয়ং ফজলুল হকের তার প্রজাপার্টিসহ একদা মুসলিম লীগে যোগদান। লীগ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর হকের পক্ষে নতুন করে লীগ-বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন বা প্রজাপার্টি পুনর্গঠন সহজ ছিল না। কারণ লীগও কৃষক-প্রজাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন স্বপ্ন দেখিয়েছিল যে পাকিস্তান অর্জিত হলে তাদের ঘরে দুধ-মধুর নহর বয়ে যাবে এবং হিন্দু জমিদারের অত্যাচার-শোষণ বন্ধ হবে, বন্ধ হবে ভয়াবহ মহাজনি শোষণ। এসব প্রচারের প্রভাব কম ছিল না।

তবু সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা চলে জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের, যদিও অনেক দেরিতে। জমিয়াতুল উলেমার বঙ্গীয় শাখা প্রধান উদ্যোক্তা, সঙ্গে কৃষক প্রজাপার্টি (মে, ১৯৪৪)। প্রজাপার্টির নেতা হাশেম আলী খান এ উদ্যোগে হাল ধরেন। পরে এ প্রচেষ্টা চলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, দিল্লিতে ন্যাশনালিস্ট মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে (৬-৮ মে, ১৯৪৪) যে সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে।

এদের মূল বক্তব্য কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠন যাতে হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য দূর করা যায়। সেজন্য উদ্যোগ নেয়া হয় সর্বভারতীয় মুসলিম মজলিস গঠনের। ফজলুল হক এ উদ্যোগের প্রতি অভিনন্দন জানান। কৃষক প্রজাপার্টির সেক্রেটারি শামসুদ্দিন আহমদও সম্মেলনে যোগ দেন। তারা জানতেন এ পর্যায়ে তাদের যাত্রাপথ খুব কঠিন। দিল্লি সম্মেলনের পর ফজলুল হকের চেষ্টায় কলকাতায় অনুরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)।

তাদের চেষ্টা ব্যাহত হয় গান্ধি-জিন্না আলোচনার ফলে যখন গান্ধি জিন্নাকে মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে মেনে নেন। রাজনীতির এমন এক নৈরাজ্যিক অবস্থায় ভাইসরয় ওয়াভেলের সিমলা বৈঠক আহ্বান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেস ও মুসলমান সম্প্রদায় থেকে মুসলিম লীগকে প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিয়ে বৈঠক শুরু করেন। তাতে করে সমস্যা সমাধানের বদলে আরো জটিলতা সৃষ্টি হয়।

চার

সব মিলিয়ে নির্বাচনে পরিস্থিতি মুসলিম লীগের জন্য ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। কেন্দ্রের সব কটি আসন তারা দখল করে। প্রদেশগুলোতে মোট ৫০৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪৪২টি আসনেই মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। সামগ্রিক বিচারে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান দল হিসেবে মুসলিম লীগ স্বীকৃতি পায়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় এটি ছিল বড়সড় অর্জন। সে হিসেবে মুসলিম সম্প্রদায়ের জনমতে পাকিস্তান এক স্বীকৃত সত্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু এর বিপরীত সত্যও অস্বীকার করা চলে না। যেমন মুশিরুল হাসান বলেন : ভোট সংখ্যা হিসাব করলে পাকিস্তানি উন্মাদনা ও ধর্মীয় প্রচারের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অবস্থান খুব একটা খারাপ নয়। তিনি অবশ্য যুক্তপ্রদেশে কয়েকজন খ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী নেতার বিজয়ের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বঙ্গে একমাত্র লীগ-বিরোধী নেতা ফজলুল হক দুই আসনে বিজয়ী। মুশিরুল হাসানের প্রদত্ত সারণিতে দেখা যায় মুসলমান আসনগুলোতে মুসলিম লীগ যেখানে পেয়েছে ৬৪ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট, সেখানে জাতীয়তাবাদী মুসলমান পেয়েছে ১৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং কংগ্রেস ১৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ ভোট। এ দুয়ের যোগফল নিয়ে মুশিরুল হাসানের হিসাব।

অন্যদিকে লীগের নির্বাচনী সাফল্য সত্ত্বেও মুসলমান-প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি এবং মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেনি। বরং সেক্যুলার ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা খিজির হায়াত খান তিওয়ানা কংগ্রেস ও আকালি শিখ দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং তা ফজলি হাসান ও সিকান্দার হায়াতের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারাবাহিকতায়। সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেস ও গাফফার খানের দল মিলে লীগ-বিরোধী মন্ত্রিসভা গঠন করে। সিন্ধুতে সরকারি ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সমর্থন নিয়ে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কোনোমতে লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। একইভাবে আসামে। একমাত্র বাংলায় লীগ স্বচ্ছন্দ সংখ্যাধিক্য আসন নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে। সোহরাওয়ার্দী হন মুখ্যমন্ত্রী।

যে বঙ্গে সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করতে চাননি জিন্না, নির্বাচনে সেই বঙ্গের মাধ্যমেই পাকিস্তান দাবির প্রতিষ্ঠা। সব প্রদেশে ক্ষমতাসীন হতে না পেরে অসন্তুষ্ট জিন্না তাই রাজনৈতিক দেনদরবারেই কেবল তিক্ততা প্রকাশ করেননি, শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে দেশভাগ ও পাকিস্তান অর্জন নিশ্চিত করেন। সে রক্তস্নানের কেন্দ্রস্থলও বঙ্গদেশ। পরে সে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অন্যত্র ছড়িয়ে যায়। পাকিস্তান তাই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়েছে তির্যক, অমানবিক হিংসার পথ ধরে। সমর্থনে ব্রিটিশ 'রাজ'।

সাধারণ নির্বাচনের ফল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে অন্তত এটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এতে করে বঙ্গদেশ বাদ দিলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পাকিস্তানের পক্ষে একচেটিয়া রায় প্রকাশ পায়নি। তখনো ভারতভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তরবারি জিন্নার হাতে পুরোপুরি উঠে আসেনি। অবিভক্ত ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাওয়া খুব জোরালো হয়ে উঠতে পারেনি।

এ পর্যায়ে কংগ্রেসের পক্ষে প্রয়োজন ছিল হিসাব-নিকাশ করে সতর্ক পদক্ষেপ। কিন্তু সাধারণ আসনে কংগ্রেসের একাট্টা বিজয় কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে অতিআত্মবিশ্বাসের উন্মাদনা তৈরি করে যা তাদের জন্য রাজনৈতিক দিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি বিহারে শাসনতান্ত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা, যুক্তপ্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে বীভৎস দাঙ্গা এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের তা জায়েজ করার চেষ্টা (অর্থাৎ নোয়াখালী দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন) মুসলমান জনস্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এভাবে কংগ্রেসের সেক্যুলার ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে। 'বিহারী দুষ্কর্ম', সম্পর্কে যশবন্ত সিংয়ের লেখায়ও সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে (পৃ. ৩৫৬) এবং সেই সঙ্গে গড়মুক্তেশ্বর দাঙ্গার বিষয়েও। স্বভাবতই এসব প্রদেশে সংখ্যালঘু নিরাপত্তার বিষয়টি জনসমাজে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে থাকে। কংগ্রেসের যথাযথ নজর সেদিকে ছিল না।

সে হিসেবে ব্রিটিশ তদারকিতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক সমঝোতার তর্ক-বিতর্কও কংগ্রেস মেটাতে চেষ্টা করেনি। এক কথায় লেনদেনের হিসাব-নিকাশে কংগ্রেস পক্ষে সতর্কতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব ছিল। আবারো বলব নির্বাচনী ফলজনিত অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস কংগ্রেসের ভুল পদক্ষেপের সহায়ক হয়েছে। বলা বাহুল্য, জিন্না সে সুযোগ নিতে ভুল করেননি, দেরি করেননি। পরে কংগ্রেস বুঝতে পেরেছে লক্ষ্য তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবিনেট মিশন : সমঝোতার নয়া প্রচেষ্টা

আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের বিচার নিয়ে দেশজুড়ে তুমুল বিক্ষোভ, সারা ভারতে শ্রমিক ধর্মঘট, বিশেষ করে নৌসেনাদের বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকদের বুঝিয়ে দেয় যে, তাদের রাজত্ব শেষ। তাই সুসম্পর্ক রেখে বিদায় নেয়া ব্রিটিশ শাসকদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কমনওয়েলথের গোয়ালে বেঁধে রেখে যতটা স্বার্থ আদায় করতে পারা যায় তা-ই ভালো– এমনই ছিল ব্রিটিশনীতি। কিন্তু বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সম্প্রদায়গত বিভেদ, লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব। আরো স্পষ্ট করে বলতে হয় গান্ধি-জিন্না দ্বন্দ্ব। আরো ছোট বৃত্তে নেহরু-জিন্না দ্বন্দ্ব।

এ দুই ভিন্ন মেরুকে নিরক্ষরেখায় টেনে আনা অসম্ভবই ছিল। তাই ব্যর্থ হয়েছে ক্রিপস মিশন, ব্যর্থ ওয়াভেল পরিকল্পনা। কংগ্রেস পক্ষে অখণ্ড ভারত এবং মুসলিম লীগ পক্ষে খণ্ডিত ভারতে পাকিস্তান দাবি সমঝোতার বিরুদ্ধে পাথুরে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। জনমত বিচার করে দেখার প্রয়োজনবোধ করেন না কেউ। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, প্রচারের মহিমায় জনতার বড়সড় অংশই তখন বিভ্রান্ত। কাজেই গণভোট ওই উন্মাদনার মুখে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াত। জনমতের রথের রশি তখন দুদলীয় নেতৃত্বের হাতে। তবে ১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি সময়পর্বে গৃহীত গণভোট হয়তো ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে সহাবস্থানের পক্ষে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু তেমন সুযোগ ছিল না। তবে এ কথা ঠিক যে ভারত তখনো অগ্নিগর্ভ। আর সেটা ব্রিটিশ তো বটেই ভারত সফরে আসা ইউরোপীয় কোনো কোনো সাংসদেরও মন্তব্য (ঘোষ, প্রাগুপ্ত)।

তাই ভারতে বিরাজমান বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই বোধহয় বিলেতে শ্রমিকদলীয় মন্ত্রিসভা ১৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিন সদস্যের একটি দল সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়– যা রাজনৈতিক অঙ্গনে 'কেবিনেট মিশন' (মন্ত্রী মিশন) নামে পরিচিত। দলনেতা ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, অন্য দুজন স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস ও এভি আলেকজান্ডার। এরা রাজধানী দিল্লিতে আসেন ২৪ মার্চ (১৯৪৬) এবং প্রথমে ভাইসরয় ওয়াভেলের সঙ্গে আলোচনায় বসেন পরিস্থিতির খুঁটিনাটি জেনে নিতে।

শুরুতে ব্রিটিশ তরফে নিরপেক্ষ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৫ মার্চ কমন্সসভায় এক বক্তৃতায় ভারতকে যত দ্রুত সম্ভব

স্বাধীনতা দেয়ার অঙ্গীকার করেন। নীতি হিসেবে তিনি ঘোষণা করেন এই বলে যে, সংখ্যালঘুর অধিকার সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং ভয়ভীতি থেকে মুক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের রয়েছে। অন্যদিকে সংখ্যাগুরুর অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা 'ভেটো' দেয়াও আমরা মেনে নিতে পারি না (হডসন)। কিন্তু সঙ্গত যুক্তির পথ ধরে হাঁটতে ভারতীয় রাজনীতিকদের বড় একটা আগ্রহ ছিল না। সেখানেই যত সমস্যা, প্রত্যেকে নিজ নিজ পাতে ঝোল টেনে নিতে উদগ্রীব।

দুই

দিল্লিতে পৌঁছে কেবিনেট মিশনের প্রথম কাজই ছিল ভাইসরয় ওয়াভেলের সঙ্গে শলা-পরামর্শ শেষ করে ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা এবং ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাদের মতামত জানা। বিশেষ করে অখণ্ড ভারত ও পাকিস্তান বিষয়ক কংগ্রেস ও লীগের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি বুঝে নেয়া। কারণ অবিভক্ত ভারতের পক্ষে জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও শিখসহ আরো কেউ কেউ তখন দাবি তুলেছিলেন।

কেবিনেট মিশনের সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের পূর্বঘোষিত নীতিরই প্রকাশ ঘটায়। যেমন কংগ্রেস-সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মূল কথা (৩ এপ্রিল, ১৯৪৬), ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি মাথায় রেখে সেই ভিত্তিতে গঠিত গণপরিষদ ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা করবে। মধ্যবর্তী সময়ে কার্য পরিচালনা করবে অন্তর্বর্তী সরকার, তারা গণপরিষদ গঠনের দায়িত্বও পালন করবে।

সংবিধান ফেডারেল কাঠামোর হবে। কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ বিষয়ক দায়িত্ব। বাকি ক্ষমতা স্বায়ত্তশাসিত (অটোনোমাস) প্রদেশগুলোর ওপর বর্তাবে। সংবিধান রচনার পর কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে ওই সাংবিধানিক আওতার বাইরে থাকতে পারবে। কিন্তু কংগ্রেস কোনোক্রমেই ভারতবিভাগ মেনে নেবে না। মুসলিম লীগ-কথিত পাকিস্তান দাবি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আর সাংবিধানিক প্রস্তাব এমন হওয়া দরকার যাতে দেশীয় রাজ্যগুলো তাতে আকর্ষিত হয়।

প্রসঙ্গত গান্ধির মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে যেন আলোচনা সম্পন্ন হয়। তবে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাব সঠিক বলে মনে করেন না। এ বিষয়ে রাজাগোপালাচারি ফর্মুলা (সিআর ফর্মুলা) আলোচনার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। আর দ্বিজাতিতত্ত্ব তার মতে একটি বিপজ্জনক বিষয়। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর বাস্তবতা স্বীকার করেন না এবং দুই গণপরিষদও সঠিক বলে মেনে নিতে পারেন না। তবে তার মতে, প্রথম সরকার গঠন করতে জিন্নাকেই ডাকা উচিত। তিনি গররাজি হলে কংগ্রেস সে দায়িত্ব পালন করবে (ভিপি মেনন)।

এরপর ৪ এপ্রিল মুসলিম লীগ সভাপতি জিন্নার সঙ্গে আলোচনা শুরু। জিন্না তার বহুকথিত যুক্তিগুলো তুলে ধরেন এই বলে যে, ভারতের অখণ্ডতা রূপকথার বেশি কিছু নয়। ভারত কখনো এক রাজ্য ছিল না। ব্রিটিশ শাসনে ভূখণ্ড ঐক্য সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমান নানাদিক বিচারে দুই জাতি, তাদের পক্ষে ভারতে সহাবস্থান সম্ভব নয়। তাই তাদের জন্য দরকার ভারত ভাগ করে একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্তান। ইতিহাসের দোহাই দিয়ে জিন্না এসব অনৈতিহাসিক কথা বলেন। তার মতে ভারত ইউরোপ নয়, আয়ারল্যান্ডও নয়। হিন্দু ও মুসলমানের মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি সবকিছুই পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

শিখদের পক্ষে মাস্টার তারা সিং বলেন, তিনি অখণ্ড ভারতের পক্ষে। সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা উচিত। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের কারণে যদি ভারত বিভক্তই হয় তাহলে শিখরা আলাদা স্বাধীন শিখরাষ্ট্র চাইবে, অবশ্য হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের সঙ্গে ইচ্ছামাফিক যুক্ত হওয়ার অধিকারসহ। জ্ঞানী কর্তার সিং ও হরনাম সিং উভয়ই ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। তাদেরও কথা বিভক্ত ভারতে স্বাধীন শিখরাষ্ট্র চাই। আর ড. আম্বেদকরের দাবি সংবিধানে তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য মানবিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে।

মধ্যপন্থী বা উদারপন্থী নেতা স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ভারত বিভাগের বিরোধিতা করে বলেন, অবিলম্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা এবং মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট ক্ষমতার ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা দরকার। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। তিনি মুসলিম লীগকে পাশ না কাটাতে কেবিনেট মিশনকে পরামর্শ দেন। তবে তিনি জানান যে, তিনি শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে। আবার কেন্দ্রে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদের আসন সমতার পক্ষেও কথা বলেন। তার প্রস্তাবই হডসনের কাছে সবচেয়ে গঠনমূলক বলে মনে হয়েছে।

তিন

এভাবে কেবিনেট মিশন ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা মুনির নানামত সংগ্রহ করে (দেখে-শুনে বোধহয় অবাকই হয়ে থাকবেন তারা) তাদের নিজস্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাব প্রকাশ করেন। তাতে ছিল অবিলম্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন (যা তাৎক্ষণিক প্রস্তাব হিসেবে বিবেচিত) এবং অখণ্ড ভারতে গ্রুপিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধান, যে ব্যবস্থা তাদের মতে আধা পাকিস্তান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এতে থাকবে দুর্বল কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের হাতে যথারীতি থাকবে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ।

ত্রিস্তরীয় এ ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলো এবিসি এই তিন গ্রুপে (অঞ্চলে) বিভক্ত হবে এবং তা হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় সংখ্যাগুরুত্ব বিচারে। গ্রুপ 'এ'তে থাকবে বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ (ইউপি), মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িষ্যা। গ্রুপ 'বি'তে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্তপ্রদেশ ও বালুচিস্তান। আর গ্রুপ 'সি'তে বঙ্গদেশ ও আসাম। গ্রুপগুলো তাদের সংবিধান তৈরি করবে। এরপর দেশি রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলে কেন্দ্রীয় সংবিধান রচনা করবে, যাতে সবার মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর কেন্দ্রীয় গণপরিষদের সিদ্ধান্ত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হবে।

এ প্রস্তাবের নেপথ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও উপস্থিত ছিল। ব্রিটিশ-ভারত বিভক্ত হবে কি না এ বিষয়ে এক মাসের মধ্যে মীমাংসায় পৌঁছতে হবে। অন্যথায় মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলো ৭৫ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ গণভোটে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এ পর্যন্ত বিষয়টি জিন্নার পক্ষে কিন্তু (ওই 'কিন্তু'তেই যত গণ্ডগোল) ওইসব প্রদেশের অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা অনুরূপ ভোটে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্নিহিত মূল ভারত ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে (হডসন)। একেই বলে ইংরেজের বেনিয়া বুদ্ধি (দুষ্টবুদ্ধি)। একহাতে দেবে অন্য হাতে নেবে। মিশন অবশ্য স্পষ্টই বলে দিয়েছিল যে, জিন্না প্রস্তাবিত পাকিস্তান সম্ভব নয়, কারণ সেখানে বিরাটসংখ্যক অমুসলমান অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যা দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিবিরোধী। উদাহরণ বঙ্গ ও আসাম।

কিন্তু জিন্না এ বিষয়ে আগের মতোই অনড়। তার পাথুরে দৃঢ়তা এবারো ভাঙতে পারেননি স্টাফোর্ড ক্রিপস। অন্যদিকে এ প্রস্তাব জওহরলাল নেহরুও বাতিল করে দেন। যুক্তিবাদী মানুষ প্রশ্ন তুলতে পারেন, কী খেলায় রত ছিলেন ভারতভূমির এই ত্রিপক্ষ, বিশেষত স্বদেশ নিয়ে লীগ-কংগ্রেস? কিছুতেই তারা কোনো বিষয়েই ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি, নিজ নিজ জেদ ও অহমবোধের কারণে।

পৃথক আলোচনায় তো নয়ই, এমনকি ৫ মে সূচিত সিমলা বৈঠকেও দ্বন্দ্ব (এটি দ্বিতীয় সিমলা বৈঠক)। এ বিষয়ে ভিপি মেননের মন্তব্য : দুদিনের দীর্ঘ আলোচনার পরও দেখা গেল দুপক্ষের মতভেদ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দূরত্ব কমার কোনো লক্ষণ নেই। বরং হঠাৎ করে অঘটন ঘটাল কংগ্রেস। পূর্ব অবস্থান থেকে সরে এসে তারা জানায় যে, আসনসংখ্যার সাম্য অর্থাৎ প্যারিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণতান্ত্রিক বিচারে যুক্তিসম্মত নয়, তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির চাপে কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদকে তার নিজস্ব চিন্তার বিরুদ্ধে উল্লিখিত মতপ্রকাশ করে চিঠি লিখতে হয়।

সে বছরটায় দিল্লিতে অস্বাভাবিক গরম। তাতেই কি রাজনৈতিক নেতাদের মস্তিষ্ককোষে উত্তাপ-উত্তেজনা? পেথিক লরেন্স তো একদিন প্রচণ্ড গরমে অচেতন হয়ে পড়েন (হডসন)। এত টানাটানি সহ্য করা বোধহয় বয়স্ক মানুষটির পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই টানাপড়েনে অগতির গতি হিসেবে বিবেচিত গান্ধির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতেও অচলাবস্থা নিরসনের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। ইতিমধ্যে কেবিনেট মিশন সদস্যদের মধ্যেও লীগ-কংগ্রেস নিয়ে মতভেদ বা বিভাজন দেখা যায়। ক্রিপসের কংগ্রেস ঘেঁষা মনোভাব পছন্দসই ছিল না মিশনের তৃতীয় সদস্য আলেকজান্ডার সাহেবের এবং ভাইসরয় ওয়াভেলেরও। এক্ষেত্রে দলপতি পেথিক লরেন্স মধ্যবর্তী অবস্থানে। ভারতীয় রাজনীতিকরা যে কী পদার্থ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন ইংরেজ আলোচকরা। অন্যদিকে স্থানীয় নেতারাও বুঝতে পারছিলেন তাদের প্রতিপক্ষকে। অর্থাৎ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরকে চেনা।

AMARBOI.COM

চার

কেবিনেট মিশন প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক মহলে এত পানি গোলা করা হয়েছে যে, এর বিশদ বিবরণ দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই ক'মাসে অনেক 'হ্যাঁ', 'না', অনেক গোপনবার্তা আদান-প্রদান চলেছে। যেমন ব্রিটিশ পক্ষে নিজেদের মধ্যে তেমনি তাদের পক্ষ থেকে লীগ-কংগ্রেসের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত একদিকে আলোর রেখা—৬ জুন মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু সেই সঙ্গে বলে রাখে যে, সার্বভৌম পাকিস্তান এখনো তাদের অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য। এরপরও কী বলা চলে যে, জিন্না পাকিস্তান চাননি, ওটা দরকষাকষির হাতিয়ার?

অর্ধেক হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন মিশন সদস্যরা। দুদিন পরই জিন্না ভাইসরয়কে এক প্রকার হুমকি দিয়েই বলেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য সংখ্যা যেভাবে নির্ধারিত হওয়ার কথা তিনি অর্থাৎ ভাইসরয় যা বলেছেন (কংগ্রেস ৫, লীগ ৫, একজন করে শিখ ও খ্রিস্টান) তার কোনো ব্যত্যয় যেন না হয়। হলে তারা প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেবেন। জিন্নার রাজনৈতিক কলাকৌশল বরাবর এমনই দেখা গেছে। ভাইসরয় জিন্নাকে সাফ জানিয়ে দেন যে, তেমন কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি জিন্নাকে দেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে এ বিষয়ে কংগ্রেসের বিপরীত প্রস্তাব, তারা ভারতের জনসংখ্যা বিচারে প্যারিটি মানতে নারাজ। অগত্যা দুপক্ষকে সামাল দিতে ভাইসরয় ওয়াভেলের নয়া প্রস্তাব কংগ্রেস : লীগ : সংখ্যালঘুর জন্য ৬:৫:২ হিসেবে আসন সংখ্যা নির্ধারিত হবে। পরে কংগ্রেস ও শিখদের আপত্তির মুখে সংখ্যানুপাত ৬:৫:৩-এ গিয়ে দাঁড়ায়। মিশন এবার পাল্টা হুমকি দিয়ে বলে, এ প্রস্তাব কেউ মেনে না নিলে ভাইসরয় নিজ উদ্যোগে পছন্দমতো সদস্য নিয়েই অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করবে। ফলে তিক্ততা আরো বাড়ে।

সমস্যা শুধু প্যারিটি নিয়েই ছিল না, ছিল মূলত কংগ্রেস পক্ষে মুসলমান সদস্য গ্রহণে জিন্নার প্রবল আপত্তিতে। কারণ তার মতে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র। কিন্তু তার এ দাবি যে যুক্তিসঙ্গত ছিল না সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অনেক পানি ঘোলা হওয়ার পর ২৫ জুন মাওলানা আজাদ কেবিনেট মিশনের ১৬ মের প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে বলেন যে, কিছু কিছু বিষয়ে তাদেরও ভিন্নমত রয়েছে। কংগ্রেসের জন্য ব্যাপারটা ছিল প্যাঁচে পড়ে জবরদস্তির ঢেঁকি গেলা।

একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট করে না বললেই নয়। দেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিচার করে মাওলানা আজাদ নিশ্চিত হন যে, দেশের স্বার্থে লীগকে কিছু ছাড় দিতে হলেও কংগ্রেসের উচিত মিশন-প্রস্তাব গ্রহণ করে তারপর যতটা সম্ভব দাবি আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। দলীয় নিয়মনীতি রক্ষা করে আজাদ যতটা সম্ভব স্বচ্ছতার সঙ্গে সমঝোতার পথ ধরে এগোতে চেয়েছেন। যে জন্য লীগ-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণকে তিনি 'গৌরবময় ঘটনা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তখনো তিনি জানতেন না যে, ওই 'আনন্দের দিন' অচিরেই কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়বে। কারণ সব ভালো যার শেষ ভালো। 'শেষ ভালো' ভারতের জন্য অনর্জিতই থেকে গেছে।

আজাদের সততা, স্পষ্টবাদিতা, আন্তরিকতা রাজনৈতিক অঙ্গনে অন্যদের মধ্যে সচরাচর আচরিত গুণাবলী নয় বলেই বোধহয় একাধিক রাজপুরুষের মতো হডসনও তার প্রশংসা করে লিখেছেন যে, মাওলানা আজাদ পূর্বাপর স্বচ্ছ, আন্তরিকতা ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ, যার মধ্যে দুর্বুদ্ধি, সন্দেহপরায়ণতা দেখা যায়নি। অনিচ্ছার সমঝোতায় এগুলো এক সময় কুৎসিত রূপ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় (পৃ. ১৫৯)। কংগ্রেসের সমস্যা ছিল তার রথী-মহারথী নেতাদের নানা মত, গান্ধির নিজস্ব পথ ধরে চলা ইত্যাদি। তাই কংগ্রেস সভাপতি হয়েও আজাদের পক্ষে কঠিন ছিল ওয়ার্কিং কমিটিকে সব সময় স্বমতে নিয়ে আসা। তবু কেবিনেট মিশনের মূল প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে পাস করাতে পেরেছিলেন মাওলানা আজাদ(আত্মজীবনী, ভারত স্বাধীন হলো)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি। প্রস্তাব গ্রহণ সত্ত্বেও 'শেষ ভালো' আর হয়ে ওঠেনি। মাওলানা আজাদ এ জন্য দায়ী করেছেন মুসলিম লীগকে। আসলে জিন্নার অনমনীয় জেদই তিনি দ্বিতীয় সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ বলে মনে করেন। তার ভাষায় 'ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সিমলা বৈঠক একটি যুগান্তকারী ঘটনা... বৈঠক ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণ মুসলিম লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবসঞ্জাত অসহযোগিতা' (আত্মজীবনী)। যেমন জিন্না দাবি তোলেন, 'কংগ্রেস শুধু হিন্দু সদস্যদের মনোনীত করবে এবং মুসলমান সদস্যদের করবে মুসলিম লীগ'। বাস্তবিক জিন্নার এ দাবির পেছনে যুক্তি ছিল না। কংগ্রেস বলে কথা নয়, যে কোনো দলেরই যে কোনো সদস্যকে মনোনীত করার অধিকার রয়েছে, তা সে সদস্য যে ধর্মবিশ্বাসীই হোন না কেন। এটা তো গণতন্ত্রের সাধারণ নিয়মে পড়ে। কিন্তু জিন্না তা মানেননি।

জিন্নার ওই অযৌক্তিক দাবির জবাবে আজাদ সঙ্গত যুক্তিতেই বলেন যে, কংগ্রেস কাদের মনোনয়ন দেবে না-দেবে সে সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার জিন্না বা মুসলিম লীগের নেই। কংগ্রেস যদি মুসলমান, শিখ, পারসি বা খ্রিস্টান সদস্য মনোনীত করে সেক্ষেত্রে তো হিন্দু সদস্যের সংখ্যা কমে যাবে। আজাদ এ বিষয়ে ওয়াভেলের মতামত জানতে চাইলে তিনি লীগের দাবি বাস্তবানুগ বলে মনে করেননি। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে বিষয়টি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আলোচিত হওয়া উচিত বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যান। অর্থাৎ জিন্নার অযৌক্তিক দাবির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চাননি ভাইসরয়।

জিন্নার অনড় বিরোধিতার মুখে সিমলা বৈঠক ভেঙে গেছে এমন অভিযোগ এনে মাওলানা আজাদ সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষভাবে মুসলিম লীগ যে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি (আয়েশা জালালের ভাষায় 'সোল স্পোকসম্যান') নয় সে বিষয়ে দাবি করেন যে, 'সীমান্তপ্রদেশে রয়েছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা, সিন্ধু প্রদেশে গোলাম হোসেনকে কংগ্রেসের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, আসামেও একই অবস্থা। (পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট কোয়ালিশন তখন ক্ষমতায়)। অতএব মুসলিম লীগই যে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এ দাবি ধোপে টেকে না। ভারতীয় মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ তখনো মুসলিম লীগের আওতার বাইরে (আজাদ, আত্মজীবনী)।

পাঁচ

কিন্তু কেবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করানোর ঘটনা কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদের কাছে যত স্বস্তিদায়ক হোক না কেন অঘটন নামক নিয়তিকে ঠেকাবে কে? এর মধ্যে কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন পণ্ডিত জওহরলাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেহরু। প্রস্তাব মাওলানা আজাদের। কিন্তু নেহরুর কিছু 'রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি ও অদূরদর্শী বক্তব্য' (হডসন) গোটা রাজনৈতিক চিত্রপট এমনভাবে পাল্টে দেয় যে, দেশ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়, রক্তস্নান ও দেশবিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে, যা একদিন আগেও কেউ ভাবেননি।

অবস্থাদৃষ্টে ক্ষুব্ধ আজাদ যা ভেবেছিলেন তারই প্রকাশ ঘটে পরে লেখা তার আত্মজীবনীতে। আরো একবার কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার আহ্বান সত্ত্বেও নেহরুকে সভাপতি করার জন্য মাওলানা আজাদের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন : 'আমি যা সবচেয়ে ভালো ও সঙ্গত মনে করেছিলাম সেভাবেই কাজ করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী দেখে আমার মনে হয়েছে আমি হয়তো ভুল করেছিলাম। এবং যারা আমাকে সভাপতি হিসেবে আরো কিছুকাল থাকার কথা বলেছিলেন তারাই হয়তো সঠিক ছিলেন' (ভারত স্বাধীন হলো)।

শুধু ওয়ার্কিং কমিটিতে নয়, কেবিনেট মিশন প্রস্তাব ৬ জুলাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে যথারীতি অনুমোদিত হয়। আর সেই প্রস্তাব নিয়ে এক ঐতিহাসিক ভুলের সূচনা ঘটান সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত নেহরু। বোম্বাইয়ে ১০ জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে নেহরু বলেন : 'কংগ্রেস গণপরিষদে অংশগ্রহণ করবে স্বাধীনভাবে, কোনো রকম বাধ্যবাধকতা নিয়ে নয়।' আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস উক্ত পরিষদে যোগ দেবে এটাই শুধু স্বীকার করেছে। সুতরাং প্রয়োজনবোধে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার হেরফের করার স্বাধীনতা তার রয়েছে।' ব্যস, মৌচাকে ঢিল।

নেহরুর মতো একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিকের এ ধরনের দায়িত্বহীন বক্তব্য যেমন অভাবিত তেমনি এর কার্যকারণ নিয়ে সমকালে এবং পরেও অনেক বিচার-ব্যাখ্যা চলেছে। মাওলানা আজাদ তার নমনীয় ভাষায় বিবৃতিটিকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। হডসন বুঝতে চেয়েছেন এটা কি 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সমঝোতা, নাকি রাজনৈতিক বিচারের স্থূল বিভ্রান্তি।' যশবন্ত সিং এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। বলেছেন, 'তার বক্তব্য যে মিশন প্রস্তাবের সমাধি রচনা করেছে সে ভুলটা নেহরু বুঝতে পারেননি।' পারেননি যে এতে সমঝোতার সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে, বিশেষ করে যখন তেমন সম্ভাবনার দরজা খুলতে শুরু করেছিল। সরদার প্যাটেলের মতে নেহরুর মন্তব্য তার 'অপরিণত আবেগের ফল'। আর জিন্নার মতে তা হলো 'শিশুসুলভ বিবৃতি'।

মাত্র একটি বিবৃতি, একটি সাংবাদিক সম্মেলন যে একটি দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিতে পারে, যে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতিপথ অশুভ ঘটনাবলীর, নেহরুর ১০ জুলাইয়ের বক্তব্য তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই বক্তব্যের কারণে শুধু যে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব শেষ হয়ে গেল তাই নয়, কংগ্রেস-লীগ বিরোধিতায় সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিরূপতা তুঙ্গে ওঠে। রাজনৈতিক আস্থার কোনো জায়গাই আর অবশিষ্ট থাকে না। এতে করেই নেহরুকে কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রস্তাব করার জন্য মাওলানা আজাদের আত্মধিক্কারের কারণ বোঝা যায়।

নেহরুর 'স্বাধিকার প্রমত্ত' বক্তব্য নিয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা প্রতিটি প্রদেশের রাজনৈতিক নেতাদের কম বেশি স্পর্শ করে, বিশেষ করে যারা কেবিনেট মিশন প্রস্তাব নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। এমনকি যেসব মুসলমান অখণ্ড ভারতে পাকিস্তানের বিকল্প নিয়ে খুশি থাকতে চেয়েছিলেন সেসব রাজনীতিকও কংগ্রেসের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য এ ঘটনার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তাদের পূর্ব অবস্থান স্পষ্ট করা হলেও সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্যই সবার কাছে প্রাধান্য পেয়ে যায়।

কেন হঠাৎ করে এমন নেতিবাচক মন্তব্য কংগ্রেস সভাপতির কণ্ঠে, তাও আবার দলের শীর্ষনেতা, এমনকি গান্ধির সঙ্গে আলাপ না করে এবং ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন না নিয়ে। এর কারণ সত্যিই বোঝা মুশকিল। তবে আমার বিশ্বাস এটা নিছকই নেহরুর তাৎক্ষণিক চিন্তার ফসল। এবং এর পেছনে সম্ভবত রয়েছে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং কংগ্রেসের প্রতি কেবিনেট মিশনের কিছুটা নমনীয় আচরণ। তাই আগ-পাছ না ভেবে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটানো, যা ছিল জওহরলালের বরাবর স্বভাববৈশিষ্ট্য। যে জন্য প্রায়ই গান্ধিকে দেখা গেছে নেহরুর আবেগপ্রবণ বক্তব্যের রাশ টেনে ধরতে।

স্বভাবতই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ভাবতে পারেন নেহরুর বদলে সরদার প্যাটেল কংগ্রেস সভাপতি হলে কি এ ধরনের অঘটন এড়ানো যেত? অর্থাৎ ইতিহাসের যাত্রা ভিন্নপথ ধরত? বলা কঠিন। কারণ প্যাটেল কংগ্রেসের রক্ষণশীল ঘরানার নেতা, তবে ধীরস্থির কঠিন মেজাজের। আবেগের টানে হঠাৎ কিছু বলা তার স্বভাববৈশিষ্ট্য নয়। তার খুবই ইচ্ছা ছিল এ পর্বে কংগ্রেস সভাপতি পদটিতে আসীন হওয়া। কারণ ইতিপূর্বে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু নেহরুর আন্তর্জাতিক পরিচিতির কারণেই বোধহয় তাকে সভাপতি পদের প্রতিযোগিতায় যোগ্যতর মনে করা হয়েছিল। তাছাড়া ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহলে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনেক বেশি যদিও মাঝে-মধ্যে সমাজতন্ত্রের পক্ষে কথা বলতেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে এত কথা বলার কারণ এ ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য তৎকালীন ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছিল। এ ঘটনার পরম্পরায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পরিণামে যা কিছু ঘটে তাই-ই ভারতবিভাগের পথ নিশ্চিত করে দেয় এবং অখণ্ড ভারত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মৃত্যুঘণ্টা বাজায়। এমনিতেই কংগ্রেস মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেও কিছু কিছু বিষয় নিয়ে বিরোধী অবস্থান নিয়েছিল। এর মধ্যে নেহরু-কথিত স্বাধীন আচরণের বজ্রপাত সব সম্ভাবনার মূলে আঘাত করে। রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখা দেয় আলোড়ন, যার ঢেউ বিলেতের কমন্সসভা পযন্ত পৌঁছে।

সেখানে ১৮ জুলাই এক বিতর্কে ভারত সচিব পেথিক লরেন্স বলেন, ১৬ মের বক্তব্য গ্রহণ করার পর কোনো দলই গণপরিষদ বিষয়ক শর্তাবলীর বাইরে যেতে পারে না। আর স্টাফোর্ড ক্রিপস প্রদেশগুলোর সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে দেন। কিন্তু এসব বিচার-ব্যাখ্যায় কান না দিয়ে জিন্না চরমপন্থাই বেছে নেন। তিনি ২৭ জুলাই বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিক্ত ভাষায় কংগ্রেসের সমালোচনার পর কেবিনেট মিশন প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তার জিহাদ ঘোষণা। এর ভয়াবহতা ও তাৎপর্য কংগ্রেস বা ব্রিটিশরাজ বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

জিন্না লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে নির্দেশ দেন 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' (ডাইরেক্ট অ্যাকশন) পরিকল্পনা ও রূপরেখা প্রণয়নের জন্য। তার ক্ষোভ ছিল ভারতীয় ইংরেজ শাসকদের ওপরও কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে মুসলিম লীগকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান না জানানো এবং এ বিষয়ে তার অনুরোধ না রাখার কারণে। লীগ সদস্যদের উদ্দেশে তিনি নির্দেশ রাখেন সরকারের প্রদত্ত সব খেতাব বর্জনের জন্য।

হডসন ঠিকই লিখেছেন, 'এটা ছিল কেবিনেট মিশন প্রস্তাবের ওপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা'। শুধু কেবিনেট মিশন নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ ছিল অমুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং রাজনৈতিক-সামাজিক অঙ্গন সহিংসতার রক্তে ভাসিয়ে দেয়া। জিন্নার মতো বুদ্ধিমান রাজনীতিকের না জানার কথা নয় এ ধরনের জিহাদ ঘোষণার ফল কী হতে পারে। তিনি জানতেন এবং জেনেশুনেই তার ক্রোধ মিটাতে নিরপরাধ মানুষের রক্ত নিয়ে খেলায় মেতে ওঠেন রক্তের বিনিময়ে জিঘাংসার তরবারিতে দেশবিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে। নেহরু কি জানতেন তার এক অদূরদর্শী বক্তব্যের পরিণাম কী ভয়াবহ হতে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস : কলকাতায় সাম্প্রদায়িক গণহত্যা

সাংবাদিক সম্মেলনে জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য বাস্তবিকই এক অশনিসঙ্কেত হয়ে দাঁড়ায়। এ ঘটনা লীগমহলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। ক্রুদ্ধ জিন্নার বক্তব্য হয়ে ওঠে ধারালো। তাতে যুদ্ধংদেহী মনোভাব স্পষ্ট। তার ভাষায় 'এতদিন আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ ধরে চলেছি, এখন হাতে পিস্তল তুলে নেয়া ও তা ব্যবহারের সময় এসে গেছে' (ভিপি মেনন, এইচ ভি হডসন)। প্রশ্ন উঠতে পারে, নেহরুর একপেশে বক্তব্যের বিপরীতে জিন্নার এতটা উত্তেজক মনোভাব কি সঠিক ছিল?

মনে হয় এ বিষয়ে জিন্নার রাজনৈতিক অবস্থান গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিচায়ক ছিল না। একে তো নেহরুর কথায় পিস্তলের কোনো ইঙ্গিত ছিল না। অন্যদিকে সাবেক কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নেহরুর বক্তব্যের পরপরই তাদের পূর্ববর্তী অবস্থানের পক্ষে বিবৃতি প্রচার করে। কিন্তু জিন্না তাতে শান্ত হননি। তিনি ২৯ জুলাই মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় উত্তেজক সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা শেষে নেহরুর বক্তব্যের এবং ভাইসরয়ের ভূমিকার প্রতিবাদে ১৬ আগস্ট ভারতের সর্বত্র 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের ঘোষণা দেন, যা ওই সভায় সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি এ সুযোগে তার রাজনৈতিক লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জনের জন্য জিহাদের ডাক দেন (ওয়াভেলের ডায়েরি)।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচিতে যদিও ছিল প্রতিবাদী সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদির কথা, কিন্তু ইঙ্গিত ছিল সহিংসতার। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে ঠিক কী করা হবে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে লীগ নেতাদের বক্তব্যে ছিল নৈরাজ্য সৃষ্টির স্পষ্ট আভাস। সে সময় 'যুগান্তর' পত্রিকায় গজনফর আলী খানের অনুরূপ মন্তব্য পড়ে অবাক হয়েছিলাম। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে মুসলিম লীগের প্রতিবাদী উত্তেজনা, সাম্প্রদায়িক প্রচার অন্যপক্ষে পাল্টা প্রচার ইত্যাদি কারণে শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভূগর্ভভুবনের দুর্বৃত্ত শক্তিও সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রস্তুতি নেয়। এসব খবর সাধারণত চাপা থাকে না। নাগরিকদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা। প্রস্তুতি চলে উভয়পক্ষে। বঙ্গীয় লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিমের

মতে, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল বাহিনী দ্বারা দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল।' এটা তার নিজস্ব ভাবনা। কারণ অন্য লীগ নেতাদের মধ্যে ছিল জিহাদি মনোভাব। ঘটনা বলে, প্রাথমিক দায় তাদের, সেই সঙ্গে অন্যদের। আবুল হাশিম ছিলেন অনেকটাই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো।

ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে এমন গুজব বাতাসে ছিল। দূর শহরেও ছিল তেমন বার্তা। সেই উত্তেজক, উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বঙ্গীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দায় ছিল প্রতিরোধের সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া। এমনকি উভয় পক্ষের সংবাদপত্রগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসা। বিষয়টা তারা প্রয়োজনীয় গুরুত্বে নেননি। পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যে ছিল উত্তেজনা। বিশেষ করে কলকাতা শহর মুসলিম লীগের পক্ষে দেখা গেছে উত্তেজক সাম্প্রদায়িক প্রচার। আর সেখানে ছিল অবাঙালি প্রাধান্য। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভাও সাম্প্রদায়িক প্রচারে পিছিয়ে ছিল না। ফলে পরিবেশ উত্তপ্ত। শহরে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর মারাত্মক ভুল ১৬ আগস্ট সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা (আবুল হাশিম)। হডসন এ সিদ্ধান্ত 'অতীব বিপজ্জনক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (পৃষ্ঠা ১৬৬)। এ মন্তব্য ভুল ছিল না।

কথাটা আরো অনেকে বলেছেন। এমনও বলা হয়েছে যে, সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করে সম্ভাব্য সহিংসতা রোধের ব্যবস্থা নেয়া মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তায় ছিল না (সুমিত সরকার)। এ বিষয়ে আবুল হাশিমের বক্তব্য অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু ইতিহাসবিদ অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেছেন। তাদের মতে মুখ্যমন্ত্রী এমন বিবৃতিও দেন যে কংগ্রেসকে যদি ক্ষমতায় বসানোর (অন্তর্বর্তী সরকারে) চেষ্টা চলে সেক্ষেত্রে বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করে সমান্তরাল স্বাধীন শাসনব্যবস্থা চালু করবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে কর ও রাজস্ব প্রদান বন্ধ রাখবে ইত্যাদি (ভিপি মেনন, পৃষ্ঠা ১৯৪, যশবন্ত সিং)।

আর ময়দানে আয়োজিত জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দিনের মতো নম্রভাষী লীগ নেতাও কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিলেন (আবুল হাশিম)। সঙ্গে খাজা নুরুদ্দিন। এর আগে পাঞ্জাবের লীগ নেতা রাজা গজনফর আলীর বক্তৃতায় আহ্বান ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও দিল্লির সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করার। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্ররোচনা শুরু। আবুল হাশিম অবশ্য বলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে (কামরুদ্দিন আহমদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২)। আবুল হাশিম তেমন কথাই লিখেছেন তার আত্মজীবনীমূলক বইতে। কিন্তু ময়দানি বক্তৃতার উত্তেজনায় সভা শেষ হওয়ার আগেই শুরু হয়ে যায় ভাঙচুর ও হত্যালীলা। দুই সপ্তাহের প্রচার, পাল্টা প্রচারের ফল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সম্বন্ধে হডসনের মন্তব্য হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী সরকার দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে মারাত্মক প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেয় এবং দানবদের তৎপরতা ঠেকাতে এবং ওই বাক্স বন্ধ করতে সরকার অনিশ্চয়তায় ভুগেছে। আর গভর্নর স্যার ফ্রেড্রিক বারোজ মন্ত্রীমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে গিয়ে সেনাবাহিনী তলব করতে উদ্যোগ নেননি। সে কাজটি তারা করেন ১৭ আগস্ট দুপুরে। তখনো অলিতে-গলিতে ফৌজ মোতায়েনের মতো অবস্থা ছিল না। বরং সেনাবাহিনীকে রাস্তা থেকে লাশ সরানোর কাজেই অধিক ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। উনিশ তারিখ গণসহিংসতা বন্ধ হয়। ঘটনার দায়দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির কাজ পরে বনধ করে দেয়া হয় (পৃ. ১৬৭)।

হডসনের হিসেবে 'তিন দিনের সহিংসতায় হতাহতের সংখ্যা বিশ হাজারের মতো'। ভাবা যায়, কী ভয়ঙ্কর খুনের নেশায় মেতে উঠেছিল কলকাতার দুই সম্প্রদায়, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে। রাস্তায় শুধু লাশ– নারী-পুরুষ নিরীহ মানুষের। তবে হডসন এবং আরো অনেকের মতে শুরুটা মুসলমান পক্ষে হলেও শিখ ও হিন্দুদের প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান নিধন সংখ্যায় বেশি। মুখ্যমন্ত্রী হয়তো ভেবে দেখেননি যে কলকাতা হিন্দুপ্রধান শহর, নানাদিক বিচারে রয়েছে ওদের প্রাধান্য। আবারো বলি, হিসেবে ভুল ছিল তার। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নেশায় ভুল করেছিলেন তিনি। কলকাতার 'আন্ডারওয়ার্ল্ডের' নেতা হওয়ার কারণে এ ভুল।

দুই

কলকাতা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্বন্ধে সুমিত সরকার লিখেছেন 'ময়দানের জমায়েতের পরই ব্যাপক মুসলিম আক্রমণ শুরু হয়। সুহরাবর্দি তার কিছু সমর্থক পরিবেষ্টিত হয়ে দীর্ঘ সময় লালবাজার কন্ট্রোল রুমে কাটান আর নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের দুর্দশার জন্য হতাশাজনক ব্যতিব্যস্ততা দেখান,' (ওয়াভেলকে গভর্নর বারোজ-২২ আগস্ট, ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৯৭-৩০০)। 'হিন্দু ও বিশেষত শিখ গুণ্ডারা জোরদার পাল্টা আক্রমণ চালায়'। ফলে 'কলকাতার অন্ধকার মহলের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে তা এক গণহত্যালীলায় পরিণত হয়। পরিণামে ১৯ আগস্ট (নাগাদ) ৪ হাজার নিহত ও ১০ হাজার আহত হন। ...হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই এতে নিহত হয়েছিলেন বেশি, শুধু ওয়াভেল নয়, প্যাটেলও একই মত পোষণ করেছিলেন' (প্রাগুক্ত)। এরপরও দাঙ্গা কলকাতায়, মার্চ-এপ্রিলে এবং মহাহত্যাকাণ্ড তথা কলকাতা গণহত্যাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশবিভাগ নিশ্চিত করে, জিন্নার আশা পূর্ণ হয়। সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার এবং আহত ১৫ হাজারেও বেশি (ভিপি মেনন)। অবিশ্বাস্য এক হত্যাকাণ্ড!

কলকাতা হত্যাযজ্ঞের ছবিটা যশবন্ত সিংহের বইতে কিছুটা বিশদ। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষে ঘোষিত হরতালে ১৬ আগস্টে খোলা দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটের মধ্যে দিয়ে বিশৃঙ্খলা শুরু। মুসলমান পরিচালিত সংবাদপত্রগুলো কদিন আগেই প্রচার শুরু করে যে এই রমজান জিহাদের মাস। একটি প্রচারপত্রে লেখা হয় 'দশ কোটি ভারতীয় মুসলমান ভাগ্যদোষে হিন্দু ও ব্রিটিশের দাস। এ অবস্থা থেকে মুক্তি চাই।' আরেকটি ইশতেহারে তরবারি হাতে জিন্না। তাতে বলা হয়েছে, 'মুসলমান এক সময় ভারত শাসন করেছে। তৈরি হও, হাতে তরবারি নাও। কাফেরদের দিন শেষ, হত্যার দিন সামনে' (পৃ. ৩৮৭)। প্রশ্ন উঠতে পারে এসব ঘটনা আবুল হাশিম বা সোহরাওয়ার্দী সাহেবদের অজান্তে ঘটেছিল? তরবারি হাতে জিন্না!

আসলে ময়দানের জনসভা থেকেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় গাড়ি পোড়ে, ট্রাম পোড়ে, দোকানপাটে আগুন, পথচারী ছুরিকাহত– ছবিটা এ রকমই। কিম ক্রিশ্চেন তাঁর যুদ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে এ বিষয়ে ' স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লেখেন : 'এটা দাঙ্গা নয়, স্রেফ উন্মত্ততা। এবং এর পেছনে অবশ্যই রয়েছে কোনো সংগঠনের পরিকল্পিত তৎপরতা' (উদ্ধৃতি যশবন্ত সিং)। নিঃসন্দেহে সে সংগঠন মুসলিম লীগ এবং পরিকল্পনা লীগ-নেতাদের।

বিভিন্ন লেখায় একটি কথাই উঠে এসেছে যে কলকাতা হত্যাকাণ্ড ছিল ভারত-ইতিহাসের নিকৃষ্টতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য এমন হত্যাযজ্ঞ ছিল সম্পূর্ণ অভাবিত এবং অনভিপ্রেত। দুর্ভাগ্যজনক যে, বিষয়টা পরিকল্পিত। আর পরিকল্পিত বলেই প্রতিহত করতে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তা নেওয়া হয়নি।

তবু বাস্তবে তা ঘটেছে। দাঙ্গার মূল লক্ষ্যই ছিল মানুষ হত্যা, দাঙ্গার অন্যান্য উপসর্গ বড় একটা এক্ষেত্রে দেখা যায়নি। অর্থাৎ পরিকল্পিত গণহত্যা। শুরু যাদের হাত দিয়েই হোক, পরে দুপক্ষই এক অবিশ্বাস্য উন্মত্ততায় হত্যালীলায় অংশ নিয়েছে। এটা বাংলায় সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার জন্য ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

আসলে লীগ-কংগ্রেস ক্ষমতার জন্য, তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এতটা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ তাদের কাছে তুচ্ছ বিবেচিত হয়েছে। কলকাতা হত্যাকাণ্ড হয়তো তাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি। কিছু ঘটনা তেমন ইঙ্গিতই দেয়। কলকাতা সহিংসতার পর অকুস্থল পরিদর্শন শেষে ভাইসরয় ওয়াভেল ২৭ আগস্ট গান্ধি ও নেহরুর সঙ্গে আলাপে ওই হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা বর্ণনা করে বলেন, 'রাজনীতির নামে যে বর্বরতার প্রকাশ ঘটেছে তা অবিশ্বাস্য' (লেনার্ড মোস্‌লে, 'দ্য লাস্ট ডেজ অব ব্রিটিশরাজ')।

মোসলির বিবরণ মতে, ভাইসরয়ের মূল বক্তব্য ছিল এই 'বর্বরতার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে হবে, তা না হলে ভারতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আমার দায়িত্ব এসব বন্ধ করা। বর্তমান অবস্থায় সেজন্য মুসলিম লীগকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। লীগ-কংগ্রেস উভয়কে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা কংগ্রেসের উচিত কেবিনেট মিশন প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করা।' কিন্তু গান্ধি-নেহরু দুজনই কূট-আইনি যুক্তিতর্কের জেরে বিষয়টা এড়িয়ে যান। কারণ মিশন পরিকল্পনার গ্রুপিং তাদের পছন্দসই ছিল না। অন্যদিকে ভাইসরয়ের এটাই বা কেমন যুক্তি যে বর্বরতা বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্টকে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে?

ভাইসরয়ের ডায়েরিতে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য হচ্ছে আলোচনার শেষ কথায় দেখা যায় মুসলিম লীগের প্রতি নেহরুর প্রবল বিতৃষ্ণা। কিন্তু গান্ধির ঠাণ্ডা মেজাজের বক্তব্যও ভাইসরয়কে হতবাক করে। গান্ধি বলেন : 'রক্তস্নানই যদি অনিবার্য হয়ে থাকে তাহলে অহিংসার মধ্যেও তা ঘটতে থাকবে।' সব কিছু শুনে ভাইসরয় ওয়াভেলের গান্ধি সম্বন্ধে মন্তব্য : 'আমার বরাবরের ধারণাই ঠিক, গান্ধির সন্তসুলভ ভাবমূর্তি ও অহিংসানীতি ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার বই কিছু নয়' (ডায়েরি)। আমাদের বিশ্বাস একই সঙ্গে গান্ধি তার সন্ত ভাবমূর্তির সাহায্যে কংগ্রেসকে তার নেতৃত্বে একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। অনেকটা জিন্নার মতো।

এরপর আগস্ট মাসের শেষ দিকে ভাইসরয় ওয়াভেলের যোগাযোগ শুরু নেতাদের সঙ্গে, মূলত গান্ধি নেহরু ও জিন্না। সেই সঙ্গে চিঠি চালাচালি। এ বিষয়ে গান্ধির চিঠিতে আশাপ্রদ কিছুই ছিল না। আর নেহরুর বক্তব্য নেতিবাচক। এ সম্পর্কে পেন্ডেরেল মুনের মন্তব্য : নেহরু সুস্পষ্ট ভাষায় গ্রুপিং সম্বন্ধে পূর্বমতই প্রকাশ করেছেন, নতুন কিছু তাদের বলার নেই। আশাহত ভাইসরয় ওয়াভেল। কংগ্রেস ও লীগ তাদের নিজ নিজ অবস্থানে অনড়। এক কদম ডানে-বাঁয়ে সরতে নারাজ।

কিন্তু ঘটনা কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সে তার নিজের মতো করে চলতে থাকে। সে চলা ভারতের জন্য শুভসঙ্কেতের ছিল না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কোনো কোনো নেতার অদূরদর্শী পদক্ষেপ। অন্যদিকে ভাইসরয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াভেলের ডায়েরিতে সমাধানের লক্ষ্যে যে আন্তরিকতার ছবি ফুটে উঠেছে তা কতটা তথ্যনির্ভর ছিল কোনো কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।

কলকাতা দাঙ্গায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তৎপরতার অভাব নিয়ে মাওলানা আজাদের অভিযোগ অন্য কারো কারো কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে। প্রসঙ্গত এ বিষয়ে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির মন্তব্য স্মরণ করার মতো। সন্দেহ নেই কলকাতায় প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম উপলক্ষে দাঙ্গা তথা নরহত্যার প্রাথমিক দায় সেখানকার উগ্রপন্থী মুসলিম লীগ নেতৃত্বের, ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভার, কিন্তু এর পেছনে শাসকশ্রেণির কি কোনো ভূমিকা ছিল না?

একটি তথ্য এ বিষয়ে সন্দেহ জাগায়। ম্যানসারের উল্লিখিত তথ্যে দেখা যায় ২৪ জানুয়ারি (১৯৪৭) ভারতে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তার মন্তব্যে লিখছেন: 'খেলা ভালোভাবে শেষ হয়েছে। ফলে কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে, ভারতীয় সমস্যাকে সাম্প্রদায়িকতার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, ...মারাত্মক সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করবে না যার ফলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তৈরি হতে পারে।' অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দমন। চমৎকার!

শাসকশ্রেণির আন্তরিকতা সম্বন্ধে আরো দুয়েকটি ঘটনা আমাদের একইভাবে সন্দিহান করে তোলে। আমরা জানি কলকাতা হত্যাকাণ্ড ও তার নেপথ্যের রাজনৈতিক কার্যের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা দেখা দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বিহার, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে দাঙ্গার সূত্রপাত। আরো পরে, বিশেষ করে ১৯৪৭-এর বিভাগপূর্ব মাসগুলো বুঝি রক্ত নিয়ে খেলার তাণ্ডবে মেতে ছিল। জিঘাংসা ও হত্যা আর নারী নির্যাতনের বাইরে অন্য কিছু মানুষগুলোর মাথায় ছিল না। রাজনীতিকদের প্ররোচনায় মানুষ দানবে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশ সিংহ তা হাসিমুখ নিয়ে দেখেছে। কুলদীপ নায়ারের ভাষায়, 'দয়া বলে কোনো শব্দ তখন কারো অভিধানে ছিল না।' (আত্মজীবনী)।

তিন

কলকাতা দাঙ্গায় মুসলমান হত্যার বদলা নিতে নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু এমন একটি মতামত খুবই প্রচলিত। তবে এর অন্য একটি দিকও রয়েছে।

কলকাতা দাঙ্গা উপলক্ষমাত্র। এখানে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য আসল কারণ। সুমিত সরকার লিখেছেন : 'সেখানে কৃষকরা প্রধানত মুসলমান আর হিন্দুরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূলত ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও অন্য পেশাদার গোষ্ঠী।' গভর্নর বারোজের প্রতিবেদন অনুযায়ী 'দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার অস্থিরতা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাধারণ অভ্যুত্থান নয়, বরং এটি একদল গুণ্ডার সংগঠিত কাজ। সাম্প্রদায়িক অনুভূতিকে তার কাজে লাগিয়েছে।' নিহতের সংখ্যা কম, কিন্তু সম্পত্তি নাশের পরিমাণ প্রচুর (ম্যানসার, ৮ম খণ্ড)। আমরা জানি গোলাম সারোয়ার ধর্মের দোহাই তুলে দাঙ্গার সূচনা ঘটায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ঈর্ষার আগুন জ্বালায়। তাতে পোড়ে মানবিকবোধ। আর মান ও সম্পদ।

'২৫ অক্টোবর 'নোয়াখালী দিবস' উদ্‌যাপনের পরপরই বিহারে দাঙ্গা শুরু। ...নোয়াখালী দাঙ্গার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এক হত্যাকাণ্ড, সেখানে নিহতের সংখ্যা অন্তত ৭ হাজার। জনগণকে গ্রাস করছে উন্মত্ততা।' অর্থাৎ সংখ্যাবিচারে বিহার কলকাতাকে ছাড়িয়ে যায়। কলকাতার মতো বিহারেও দেখা গেছে সরকারি নিষ্ক্রিয়তা, যেজন্য মৃতের সংখ্যা এত বেশি। ঘটনার দায় বিহার প্রশাসনের গণ্ডি অতিক্রম করে দিল্লির ভাইসরয় অফিস পর্যন্ত পৌঁছায়, কিন্তু তারপরও তাৎক্ষণিক কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এটা কি ইচ্ছাকৃত?

দাঙ্গা থামাতে বিমান থেকে বোমা বর্ষণের জন্য বিহারি মুসলমানদের আবেদন প্রশাসনে সাড়া জাগায়নি বরং এ প্রসঙ্গে ওয়াভেলের মন্তব্য বিস্ময়কর : 'বাধ্য না হলে কেউ আকাশ থেকে মেশিনগানের মতো অস্ত্র চালায় না, যদিও ১৯৪২-এ এর ব্যবহার করতে আমরা দ্বিধা করিনি' (ভাইসরয়ের ডায়েরি)। এরপর কি বলা যাবে, ভারতে দাঙ্গা নামক গণহত্যায় শাসকদের কোনো ভূমিকা ছিল না?

কলকাতা দাঙ্গার ভয়াবহতা দেখে ওয়াভেলের বিমর্ষ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এ মন্তব্য কি মেলে? নাকি অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সব দায় চাপাতে এ ধরনের নিষ্ক্রিয়তা। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন দমন করতে তৎকালীন ভাইসরয় লিনলিথগো ঠিকই বিমানবহর ব্যবহার করেন। আর সাম্প্রদায়িক হত্যার প্রতিরোধে একজন সেনাপতি-ভাইসরয়ের একই কাজে অনীহা বড় অদ্ভুত!

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের চরিত্র ছিল শয়তানের হাতে খোলা তরবারি তুলে দিয়ে খেলা শুরু করা। আর সে কাজ ভালোভাবেই শুরু করেন বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কলকাতা মুসলিম লীগের অবাঙালি নেতৃত্ব। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় নরকের আগুন জ্বালে কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভাকর্মীসহ হিন্দু-শিখ দুর্বৃত্ত দল। মুখ্যমন্ত্রী যখন নিজের ভুল বুঝতে পারেন তখন ঘটনা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তবে এতে জিন্না ও লীগ নেতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। ভয়াবহ রক্তপাত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে দেয়। এর দায় কি জিন্না এড়াতে পারেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে বেজায় টানাপড়েন

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণার আগেও লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বে ঘটনা হয়ে ওঠে সমস্যা-জটিল। ব্রিটিশরাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব দুই পরস্পর-বিরোধী দল লীগ-কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করানো এবং একটি সাময়িক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় কোন্ দল কটা আসন পাবে তাই নিয়ে। স্বভাবতই প্রত্যেকে চাইবে নিজ নিজ পাতে ঝোল টানতে, তা যুক্তিসঙ্গত হোক বা না হোক।

বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে কয়েক সপ্তাহের সংলাপ শেষেও অচলাবস্থা না কাটায় ভাইসরয় ওয়াভেল কেবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনা করে ১৬ জুন (১৯৪৬) এক বিবৃতির মাধ্যমে তাদের নিজস্ব প্রস্তাব ঘোষণা করেন। চৌদ্দ সদস্যের সম্ভাব্য নির্বাহী কাউন্সিলে কংগ্রেস, লীগ ও অন্য সংখ্যালঘুদের যথাক্রমে সংখ্যানুপাত ৬:৫:৩। বলা হয়, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নিরসনের কথা ভেবে এই সংখ্যানুপাতের প্রস্তাব। যে কথা তারা বলেননি তাহলো সম্প্রদায় সমস্যার কারণে জনসংখ্যার হিসাব না মেনে লীগকে বেশি আসন দেয়া হয়েছে।

মূলত দুটো কারণে কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। প্রথমত সংখ্যাসাম্য, দ্বিতীয়ত তাদের পক্ষ থেকে মুসলমান সদস্য দিতে না পারা। দ্বিতীয় কারণ তাদের কাছে অধিক গুরুত্ব পায়। দুটো আপত্তিই গণতন্ত্রের রীতিনীতির যুক্তিতে টেকে। তবে সব ক্ষেত্রে, সব সময় অঙ্কের হিসাবমাফিক চলা যায় না। কাউকে না কাউকে কিছুটা ছাড় দিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কেউ সে ছাড় দিতে চায়নি। শেষ ঘণ্টা বাজার আগে কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেনের কূটচালে মাত হয়ে ছাড় দিতে রাজি হয় খণ্ডিত ভারত ও খণ্ডিত স্বাধীন পাকিস্তান মেনে নিয়ে। এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেহরু-প্যাটেলের।

যা হোক, ওয়াভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে পেন্ডেরেল মুন লিখেছেন : 'গান্ধি শেষ মুহূর্তে বাগড়া না দিলে কংগ্রেস কেবিনেট মিশন কথিত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব মেনে নিত এবং জুলাইয়ের গুরুতে কেন্দ্রে কংগ্রেস-লীগ

কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতো। সেক্ষেত্রে পরবর্তী কয়েক মাসের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা দেখা দিতো না' (ওয়াভেল ডায়েরি, উদ্ধৃতি ঘোষ, প্রাগুক্ত)।

কিন্তু সে কথা কি নিশ্চিত করে বলা যায়? কারণ জিন্নার আচরণে যা দেখা গেছে তাতে অন্তত একটি বিষয় স্পষ্ট যে পাকিস্তান প্রস্তাব আস্তিনে রেখে জিন্না ব্রিটিশ উত্থাপিত প্রস্তাবগুলো নিয়ে সংলাপে বসেছেন এবং অগণতান্ত্রিক বা অযৌক্তিক দাবি পেশ করে আলোচনা ভাঙার পথ তৈরি করেছেন। তাই পাকিস্তানকে হাতিয়ার (আয়েশা জালাল ও অন্যান্য) নয়, বরং পাকিস্তানের জন্য আর সব সম্ভাবনা তিনি নানা দাবির হাতিয়ারে খণ্ডিত করেছেন। সেসব ক্ষেত্রে তার মূলকথা একটাই : 'মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন'।

দুই

রাজনৈতিক নেতা হিসেবে জিন্না নিজ দলেও নিয়মকানুনের ধার ধারতেন না। এদিক থেকে তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের সর্বাধিনায়ক বা একনায়ক। নিজের প্রস্তাবিত নিয়মও তিনি প্রয়োজনমতো ভেঙেছেন। যেমন অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়ার জন্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মুসলিম লীগ প্রস্তাবিত পাঁচ সদস্যের অন্তর্ভুক্ত করে, যে বিষয়ে মাওলানা আজাদ ভাইসরয়ের কাছে লেখা চিঠিতে অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তফসিলি হিন্দু মি. মণ্ডল যদি লীগ সদস্য না হয়েও মন্ত্রীমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন তাহলে মুসলমান কংগ্রেসি নেতা কেন কংগ্রেস প্রস্তাবিত মন্ত্রীমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।

মাওলানা আজাদের এই বক্তব্যে যুক্তি রয়েছে। আর এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, তার ওয়ার্কিং কমিটি এমনি একাধিক কারণে অনিচ্ছার সঙ্গে ১৬ জুনের (১৯৪৬) অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণে অপারগতা জানাচ্ছে (২৫ জুন, ১৯৪৬)। লীগ-কংগ্রেসের এ জাতীয় কঠিন টানাপড়েনে ভাইসরয় ওয়াভেলের 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা। একদিকে কংগ্রেস অন্যদিকে লীগ, মধ্যিখানে কেবিনেট মিশন– প্রত্যেকে নিজস্ব মতে স্থির– ভাইসরয়ের হাঁসফাঁস ভিন্ন উপায় কী?

আমাদের মনে হয় মুসলমান সদস্য মনোনয়ন ইস্যুটিকে কংগ্রেস দেশের বৃহত্তর দল হিসেবে দেশ ও সম্প্রদায় স্বার্থে হালকাভাবে নিতে পারত, জিন্নার কাঠিন্যের বিরুদ্ধে অনুরূপ কাঠিন্য প্রকাশ না করে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বেও কঠিন চিন্তার, সম্প্রদায়চিন্তার অভাব ছিল না, যেমন বল্লভভাই প্যাটেলের মতো রাজনৈতিক নেতা।

অবস্থা অনুকূল বিধায় জিন্না-লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব (১৬ জুনের) বিবৃতিসহ গ্রহণ করে এবং প্রত্যাশায় থাকে যে কংগ্রেসের টালবাহানার কারণে সরকার গঠন করতে তাদের ডাকা হবে। কিন্তু বৃহত্তর জনপ্রতিনিধিত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দল কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন যুক্তিযুক্ত মনে করেননি ভাইসরয় এবং কেবিনেট মিশনের কোনো কোনো সদস্য। এর পেছনে অবশ্য গূঢ়তর কারণ কংগ্রেসের আন্দোলন সংঘটিত করার ক্ষমতাই নয় সেখানে বামপন্থীদের প্রাধান্য বিস্তারের আশঙ্কা। কংগ্রেস যাতে তার চরমপন্থীদের হাতে ছিনতাই না হয়।

অবশ্য সে মুহূর্তে তেমন সম্ভাবনা ছিল না বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে। তবে বাম রাজনীতির শক্তিবৃদ্ধি, বিভিন্ন খাতে ধর্মঘট দেশে যথেষ্ট অস্থিরতা তৈরি করে চলছিল। তদুপরি আজাদ হিন্দ ফৌজের মতো বিষফোঁড়ার উপস্থিতি যা ব্রিটিশরাজের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভাইসরয়ের ধর্না কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে (অবশ্য তার প্রাসাদেই) যা তার একান্ত মহলে অস্বাভাবিক ঠেকেছে। ঠেকলে কী হবে? ওয়াভেলের চেষ্টা যে কোনোভাবে হোক একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌছানো। এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা। ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিতে চাননি ভাইসরয়। লীগ-কংগ্রেসের অদ্ভুত দ্বন্দ্বের টানাপড়েনে অনভ্যস্ত সৈনিক ভাইসরয় এতটা হতাশায় আক্রান্ত হন যে ভাইসরয়ের দায়িত্ব থেকে তাৎক্ষণিক অব্যাহতির কথা তার মনে হতে থাকে।

তার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল ২৯ জুন কেবিনেট মিশন সদস্যগণ স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগেই লীগ-কংগ্রেসকে নিয়ে একটা সমঝোতায় পৌছানো। কিন্তু লীগ-কংগ্রেসের একগুঁয়েমি তাকে হতাশা ও ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়। সে দায়ভাগে না চাইতে তার অব্যাহতি মেলে কিছু সময় পরে এবং কিছুটা অসৌজন্যমূলকভাবে। হয়তো এর পেছনে ক্রিপসের হাত ছিল। এটাও ছিল নিয়তিতাড়িত ঘটনা, যা দেশভাগের পথ সহজ করে দেয়। কিন্তু ওয়াভেলের চেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না, অন্তত আজাদের তেমনই ধারণা। সঙ্গত কারণে ওয়াভেলের চিন্তা– কোনো একক দল নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন না করা, হোক লীগ বা কংগ্রেস। এদিকে পরিস্থিতি দেখে জিন্না মহাবিরক্ত, মূলত মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে এককভাবে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান না জানানোর কারণে। স্বভাবতই লীগ বা জিন্নার প্রতিক্রিয়ার ফল– বোম্বাইয়ের আহমেদাবাদে জঘন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবশ্য তাতে রাজের কিছু যায়-আসে না।

কিন্তু যেসব বিষয়ে 'আসে-যায়' তাহলো শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট– যেমন কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে ২৯ জুলাই কলকাতায় ডাক ধর্মঘটের সমর্থনে সফল হরতাল। এসব বিষয়ে ৯ আগস্টের গোয়েন্দা প্রতিবেদন হলো– 'শ্রমিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসন্তোষ ক্রমেই বিপজ্জনক মোড় নিতে শুরু করেছে। কাজেই একটি দায়িত্বশীল সরকার এ সম্বন্ধে সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারবে' (ম্যানসার)। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশেরও এ বিষয়ে উদ্বেগ কম ছিল না? বিশেষ করে সরদার প্যাটেলের মতো নেতাদের। তারা চাইছেন না বাম রাজনীতির ক্ষমতা বৃদ্ধি হোক।

বিদেশসচিব পেথিক লরেন্সের কাছে ওয়াভেলের পাঠানো বার্তায় এসব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা রয়েছে। রয়েছে এমন কথাও যে, প্যাটেল সরকার গঠনে যোগ দিতে আগ্রহী এবং সরকার গঠিত হলে কংগ্রেস শক্ত হাতে কমিউনিস্টদের দমন করবে, যাতে শ্রমিক অসন্তোষ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে না পারে। ভাইসরয়ের ওপর ভারতসচিবের দিক থেকে চাপ ছিল দ্রুত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য। যাতে সব দিক ভালোভাবে সামাল দেয়া যায়, বিশৃঙ্খলা দমনের দায় যাতে স্থানীয় নেতাদের ওপর পড়ে।

আলোচনায় কংগ্রেসের গড়িমসির মধ্যেও সরকার গঠনের ইচ্ছা বেশ প্রবলই ছিল। এবার জিন্নার কিছু প্রশ্ন কংগ্রেসের প্রতি ব্রিটিশরাজের নমনীয় ভাবের কারণে। সব শুনে ভারতসচিবের নির্দেশ আপাতত জিন্নাকে হিমঘরে রেখে কংগ্রেস তরফে নেহরুকে সরকার গঠন করতে ডাকা হোক। তবে মুসলমান আসনগুলো পূরণ না করাই ভালো, যাতে মুসলিম লীগের জন্য দরজা খোলা থাকে। সেভাবেই আলোচনা, সেভাবে ব্যবস্থা নেয়া।

কংগ্রেস, বিশেষ করে নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ আমন্ত্রণের জন্য এক পায়ে খাড়া। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর ভাইসরয়কে নেহরুর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তারা দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত। মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনেও তাদের আপত্তি নেই। দেশের জন্য এ মুহূর্তে দরকার একটি শক্তিশালী, কার্যকর, স্থায়ী সরকার, যারা দেশের মনকে জানে এবং সাহসের সঙ্গে কাজ চালাতে পারবে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর এবং সম্রাটের সম্মতি সাপেক্ষে ২ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। লীগ তখনো মন স্থির করে উঠতে পারেনি কিন্তু তারা ক্ষুব্ধ।

মুসলিম লীগের জঙ্গি চরিত্রের কথা নির্বাচন উপলক্ষে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর তেমনই প্রকাশ দেখা গেল। জাতীয়তাবাদী বা কংগ্রেসি মুসলমান নেতাদের জিন্না প্রকাশ্যে 'কুইসলিং' নামে অভিহিত করে গালাগালি দিতে দ্বিধা করতেন না। এমনকি ভাইসরয় ওয়াভেলের কাছে লেখা চিঠিতেও তিনি এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন (ভিপি মেনন)। তাই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রথম পর্বে কংগ্রেস মনোনীত মুসলিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদস্য স্যার শাফায়াত আহমদ খান মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হবেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। সেই সঙ্গে ঘটে বোম্বাই শহরে বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, ঘটক মুসলিম লীগের ক্যাডার বাহিনী।

মুসলিম লীগ এই চরিত্র অর্জন করে চল্লিশের দশকে পৌঁছে লীগ-সভাপতি জিন্নার হাত ধরে, তার পরিচর্যায় এর বিকাশ বিশেষ করে ন্যাশনাল গার্ড গঠনের মধ্য দিয়ে। এ জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে ১৯৪৫ থেকে। পাকিস্তান আমলেও লীগ শাসকশ্রেণির মধ্যে এই সহিংস চরিত্রের প্রকাশ লক্ষ করা গেছে সমালোচক বা বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার নীতি প্রয়োগে। ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশে অবিভক্ত বঙ্গে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার শাসনামলেও দেখা গেছে এমনই উদাহরণ। কুখ্যাত কলকাতা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর তো বটেই ইতিহাস পাঠকের পক্ষেও ভোলা কঠিন।

স্বভাবতই বাংলায় সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল না। জনঅসন্তোষ এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, সোহরাওয়ার্দী নিজেই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের কথা ভাবতে থাকেন, যাতে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা যায়। কিন্তু জিন্না তার এই প্রস্তাব উড়িয়ে দেন। কৃতকর্মের আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতে থাকার কারণেই কি সোহরাওয়ার্দী দেশভাগের পর কলকাতা ছেড়ে পাকিস্তানে না গিয়ে সাম্প্রদায়িক শান্তির প্রচারে গান্ধির সহযোগী হন?

অবশ্য এর পেছনে আরো একটি কারণ স্পষ্ট। পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনে জিন্নার আশীর্বাদধন্য খাজা নাজিমুদ্দীন গ্রুপের প্রাধান্য এবং খাজা সাহেবকে মুখমন্ত্রীপদে বরণ। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতির ভিত কলকাতা ও কলকাত্তাই মুসলমান যাদের গরিষ্ঠ অংশ উর্দুভাষী। অন্যদিকে খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন ঢাকাই নবাব পরিবারের সদস্য এবং বিভাগ-উত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় তাদের প্রভাব যথেষ্ট। এমনি একাধিক কারণ সোহরাওয়ার্দীকে দেশবিভাগের অব্যবহিত পর বেশ কিছুকাল বিষণ্ণ, বিচ্ছিন্ন ও হতাশাগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতায় পরিণত করেছিল। তদুপরি মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বিরোধিতার মুখে তিনি ঢাকা যেতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেননি। পরে অনুকূল অবস্থায় তার ঢাকায় আগমন।

তিন

আবারো অন্তর্বর্তী সরকার প্রসঙ্গ। জিন্না হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে চটজলদি ভাইসরয়ের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হয়নি। কারণ তার অধিকাংশ দাবিই পূরণ করা হয়েছিল। তাই হয়তো দ্বিতীয় বিবেচনায় তারই নির্দেশে স্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজিমুদ্দীন ভাইসরয়ের কাছে প্রস্তাব রাখেন যে, কংগ্রেস প্রদেশ বিষয়ক জেদ পরিত্যাগ করে ১৬ মের বিবৃতি মেনে নিলে জিন্না হয়তো মিশন প্রস্তাব গ্রহণ ও অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়ার বিষয় পুনঃবিবেচনা করতে পারেন।

ভাইসরয় নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাব শুনে অবাক হন, সেই সঙ্গে খুশিও। কারণ তারও অস্বস্তি ছিল মুসলিম লীগকে বাইরে রেখে সরকার গঠন ও পরিচালনার বিষয়ে। তিনি সময় নষ্ট না করে বিষয়টি নিয়ে গান্ধি ও নেহরুর সঙ্গে আলাপ করেন। কিন্তু নেহরু-জিন্নার মধ্যে যে জমাট আগ্নেয় শিলার বাধাবন্ধক তা অপসারণ খুব সহজ কাজ ছিল না। এ দুই ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। একজন আবেগপ্রবণ, তরল ও চঞ্চল প্রকৃতির, অন্যজন শীতল রক্তের ধীরস্থির ব্যক্তিত্ব, কঠিন শিলাখণ্ডের মতো। এই দুই বিপরীত মেরুর দূরত্ব দেশভাগের একাধিক কারণের মধ্যে অবশ্যই অন্যতম। নেহরুর 'হৃদয়াবেগের দ্বারা চালিত হওয়ার' কথা আজাদ একাধিকবার উল্লেখ করেছেন তর আত্মজীবনী গ্রন্থে।

ক্ষমতার এমনই জাদু যে জিন্নার মতো শীতল রক্তের মানুষও ক্ষমতার উত্তাপ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। নেহরু-প্যাটেলদের মতো জিন্নারও একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকার, আর সেজন্যই স্বতন্ত্র ভুবন পাকিস্তান দাবি। এ ক্ষেত্রে অবশ্য তাৎক্ষণিক লক্ষ্য কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার। ভুল শুধরে নেয়ার পদ্ধতিটাও পরোক্ষ, যাতে ব্যর্থতার গ্লানি সরাসরি তাকে স্পর্শ করতে না পারে। তাছাড়া আরো একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল জিন্নার।

নাজিমুদ্দীনের পর এবার সোহরাওয়ার্দী। দিল্লিতে এসে তিনি বলেন যে, কংগ্রেস যদি লীগের দিকে আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়ায় তাহলে জিন্না তার দাবির চেয়েও কম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন (ভিপি মেনন)। এ যেন আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য দুপা বাড়ানো অন্য এক জিন্না। ভাইসরয় বুঝে নিলেন, এখন সময় হয়েছে জিন্নাকে ডেকে পাঠানোর এবং একটা মীমাংসায় পৌঁছানোর। এ বিষয়ে ভারতসচিবের সম্মতিও পাওয়া গেল। নেহরুরও এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই।

অতএব ভাইসরয়-জিন্না বৈঠক ১৬ সেপ্টেম্বরে। দুজনের দীর্ঘ আলোচনা সহযোগিতার আবহে। ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে আশ্বাস প্রদেশ নিয়ে, গ্রুপিং নিয়ে এবং সংখ্যগরিষ্ঠকে মাথার ওপর চড়তে না দেয়ার। কিন্তু শেষমেশ পাথরে ঠোক্কর কংগ্রেস পক্ষের মুসলমান প্রতিনিধি নিয়ে। জিন্নার বক্তব্য, তার অনুসারীগণ এটা মানতে চাইবে না। আসলে আপত্তি বরাবরই জিন্নার। বোধহয় ভেতরে হাসি চেপে ওয়াভেলের মন্তব্য : ওদের না মানাটা খুবই দুঃখজনক। কিন্তু এর পরিণামও খুবই গুরুতর। তাই বিষয়টি নিয়ে জিন্না যেন ভেবে দেখেন পরে আবার আলোচনায় বসা যাবে (ভিপি মেনন)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর কয়েক দফা আলোচনা জিন্না, নেহরু, গান্ধিকে নিয়ে চক্রাকারে। ঘুরে-ফিরে সেই জাতীয়তাবাদী মুসলমান 'ইস্যু'। জিন্নার যুক্তিহীন দাবি মানতে নারাজ কংগ্রেস। এটা আসলে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন। এরপর আবার জিন্নার সঙ্গে ভাইসরয়ের বৈঠক (২ অক্টোবর)। সময় দ্রুত এগিয়ে চলেছে, ঝরঝর করে বালি নেমে যাচ্ছে। ভাইসরয় জিন্নাকে বোঝাতে চাইছেন সময়ের গুরুত্ব এবং এই বিশেষ ইস্যুতে কংগ্রেসের অনড় অবস্থানের কথা। শেষ পর্যন্ত জিন্না তার ৯ দফার ভিত্তিতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকতে রাজি হন।

এরপর ওই ৯ দফা নিয়ে দফাওয়ারি আলোচনা। 'হ্যাঁ', 'না' 'হ্যাঁ'র মধ্য দিয়ে সময়ের বালি গড়িয়ে চলেছে। ওয়াভেল তার ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের জটিল মনস্তত্ত্ব। অবশেষে বরফগলার পালা। ভাইসরয় নেহরুকে জানান, জিন্নার সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। যেন এক বিরাট যুদ্ধজয়। তবে জিন্নার মনোনীত সদস্যদের মধ্যে একজন অমুসলমান থাকবেন। অর্থাৎ দাঁতের বদলে দাঁত।

শেষ পর্যন্ত জিন্নার তরফ থেকে নামের তালিকা এলো : লিয়াকত, চুন্দ্রীগড়, নিশতার, গজনফর, তবে শেষ যে নামটি সবার জন্যই অভাবিত (জিন্নার 'সারপ্রাইজ'!), তাহলো যোগেন মণ্ডল। শেষোক্ত জনের জীবনের ট্র্যাজেডি হলো জিন্নার কুহকে পড়ে ও আত্মস্বার্থের টানে পাকিস্তানে এসেও তার শেষ যাত্রা ফের ভারতে। পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতার চাপে আবার দেশত্যাগ।

দিনটি ছিল ১৫ অক্টোবর। ভাইসরয় ওয়াভেলের জন্য একটি স্বস্তিদায়ক দিন। 'মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিচ্ছে'। 'লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিচ্ছে'। কাগজে কাগজে মোটা হরফে হেডলাইন। এদের জন্য আসন ছেড়ে একে একে বেরিয়ে গেলেন শরৎ বসু, স্যার শাফায়াত আহমদ খান ও সৈয়দ আলী জহির। মহামহিম সম্রাট সমুদ্রের ওপার থেকেই এই পাঁচজনকে বরণ করে নিলেন। 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠল মুসলিম লীগ শিবিরে।

ভাইসরয় ওয়াভেল ভুলেও বুঝতে পারেননি এ স্বস্তি কত ঠুনকো। 'যার শেষ ভালো তার সব ভালো' প্রবাদ যে কত বড় সত্য ব্যক্তিজীবনে, জাতীয় জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে মানুষ তা বারবার ঠেকে বুঝেছে। লীগ পক্ষের সদস্য মনোনয়নে খুশি হননি নেহরু। কেন হননি তা স্পষ্ট ভাষায় ভাইসরয়কে জানিয়েছেন তিনি। গান্ধিও খুব একটা স্বস্তিবোধ করেননি। তবে বুঝতে পারছিলেন, মুসলিম লীগ লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়েছে। এবার শুরু হবে নতুন লড়াইয়ের পালা। কিন্তু কী করা যাবে– 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। আর ভাইসরয় ওয়াভেল? আপাত সাফল্যে তিনি বুঝতে পারেননি যে জিন্নাকে চিনতে তার অনেক দেরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশ সিংহের ভারতত্যাগের ঘোষণা : সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিস্তার

মি. জিন্নার অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান যে উদ্দেশ্যমূলক পরবর্তী ঘটনাবলিতে তার আভাস মেলে। গান্ধির আশঙ্কা হয়তো ভুল ছিল না। স্বল্পমেয়াদি অন্তর্বর্তী সরকার প্রস্তাব গ্রহণ করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ মূল মিশন প্রস্তাব বানচাল করা যে এই তীক্ষ্ণধী আইনজীবী রাজনীতিকের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস অর্থাৎ নেহরু-প্যাটেল তা বুঝতে পারেননি। অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হতে পেরেই আবেগপ্রবণ নেহরু ধরে নিয়েছিলেন জয় তাদের হাতের মুঠোয়। বিষয়টা আসলে ছিল এর ঠিক বিপরীত।

জিন্না যে মূল প্রস্তাব সফল করার পরিবর্তে তা ভাঙনের পথে ঠেলে দিতে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়েছিলেন এবং এরপর একের পর এক আইনি জেরায় আবহ সমস্যাজটিল ও সংশয়জারিত করে তুলেছিলেন ঘটনার দীর্ঘকাল পর হডসন তার বইতে সে বিষয়টা নিয়ে ভালো রকম কাটাছেঁড়া করেছেন। তাতে বোঝা যায়, আইনি সওয়াল-জবাবে দক্ষ জিন্না তার সেই বুদ্ধিমত্তা রাজনীতিতে কাজে লাগিয়ে গান্ধি-নেহরুকে পরাজিত করেন তার লক্ষ্য পাকিস্তান হাসিল করে। তবে তা যে পুরো পাকিস্তান হয়ে ওঠেনি সে কৃতিত্ব অনেকটা মাউন্টব্যাটেনের।

এক্ষত্রে অবশ্য পরাজয় ভাইসরয় ওয়াভেলেরও। তিনি যে ভাবনা নিয়ে ও অখণ্ড ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা নিয়ে সুস্থ পরিবেশে তা সফল করতে গিয়ে জিন্না তথা মুসলিম লীগকে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন সেগুলোই জিন্না যথাসম্ভব তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার করেছেন নানা তাত্ত্বিক ও আইনি প্রশ্নের জটিলতা সৃষ্টি করে। ভাইসরয় ওয়াভেলের অন্তত একটি সদিচ্ছা ছিল বিশেষ একটি দল নিয়ে অবস্থার টানে হলেও সরকার গঠন না করে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা। জিন্না সে সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন।

ভাইসরয় নানাভাবে চেষ্টা করেছেন জিন্নাকে অন্তর্বর্তী সরকারে টেনে আনতে, যেমন চেষ্টা করেছেন কংগ্রেসকেও আনতে। সেই সঙ্গে তার চেষ্টা জিন্না-নেহরুর মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব কমিয়ে আনা যা কখনই সম্ভব ছিল না।

AMARBOI.COM

এ না থাকার কারণ ইতিহাসের অনেক পেছনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সেক্ষেত্রে গান্ধির চেয়েও নেহরুর প্রতি জিন্নার বিরূপতা ছিল অনেক বেশি।

প্রসঙ্গত হডসন জিন্না-উত্থাপিত ৯ দফার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং জিন্নার মূল উদ্দেশ্য আকর্ষণীয় রূপকের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। করেছেন বেশ কয়েক পাতার দীর্ঘ কথকতায়।

অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ সদস্যদের পাঠিয়ে সে সুযোগে প্রশ্নের পর প্রশ্নে মন্ত্রীমিশনের মুল পরিকল্পনা অনিশ্চিত করে তোলেন জিন্না। আর সে উপলক্ষে হডসন লেখেন : মি. জিন্নার বরাবর ব্যবহৃত কৌশলের ছিল দ্বিমুখী রূপ।

দেনদরবারে বা সংলাপে সর্বদাই কোনো প্রকার সমঝোতা বা অঙ্গীকারে অস্বীকৃতি জানানোই ছিল জিন্নার কৌশলগত দিক যাতে করে তর্ক-বিতর্কের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ত্যক্তবিরক্ত বা হতাশাগ্রস্ত প্রতিপক্ষ সচেতন বা অসচেতনভাবে কিছু সুবিধা বা ছাড় দিতে বাধ্য হয় বা ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে পুরো রুটির অংশবিশেষ নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অন্যদিকে প্রতিপক্ষের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সুবিধার পথ তৈরি হয়।

স্বভাবতই হডসনের মন্তব্য : মুসলিম লীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান যে স্বস্তি ও আশার সঞ্চার করেছিল অচিরে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। ভাইসরয়ের চেষ্টা সত্ত্বেও জিন্না তার মৌখিক আশ্বাসের চেয়ে এক পা এগোননি, লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন ডেকে ১৬ মের প্রস্তাব গ্রহণের কোনো চেষ্টা নেননি। কংগেস নেতাদের আহ্বান সত্ত্বেও জিন্নার মন্তব্য : 'সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন ডাকা হলে তা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে।'

এর তাৎপর্য অর্থাৎ জিন্নার উদ্দেশ্য অচলাবস্থা সৃষ্টি করে রাখা, কোনো প্রকার সংবিধান প্রণীত হতে না দেয়া। সেক্ষেত্রে ভাইসরয় জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে অনর্থ সৃষ্টি হতে পারে, যেমন ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। অর্থাৎ দেশ সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হবে। এমন আশঙ্কাই ভাইসরয় জানান বিদেশসচিবকে। কিন্তু ব্রিটিশরাজ দীর্ঘ অনিশ্চয়তা নিয়ে ভারতে বসে থাকতে পারে না। তাদের ভালো পরিস্থিতিতে পাততাড়ি গুটাতে হবে।

ভাইসরয় তাই জিন্নাকে সাংবিধানিক ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানান যাতে লীগ-কংগ্রেস সমঝোতা ও মতৈক্যের ভিত্তিতে এগিয়ে আসে। এ প্রস্তাবে জিন্নার সংক্ষিপ্ত জবাব : 'দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মতৈক্য অসম্ভব। ব্রিটিশ যদি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতেই চায়, তাহলে তারা এক্ষুণি চলে যাক। যাওয়ার আগে তারা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ভূখণ্ড দিয়ে যাক সেখানে তারা দরকার হলে দিনে একবেলা খেয়েও নিজের মতো করে বসবাস করতে পারবে' (হডসন, পৃষ্ঠা ১৭৫)। এ জবাব শুনে একদা সেনাপতি ওয়াভেল কী ভেবেছিলেন তা আমাদের জানা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে জিন্নার আস্তিনে লক্ষ্য হিসেবে বরাবর পাকিস্তানই ছিল অন্য কিছু নয়, যে জন্য অবিভক্ত ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রকার প্রস্তাবই তার কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। ভারতবিভাগ তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। যে জন্য পূর্বোক্ত বক্তব্যে তার কথা, যত ছোটই হোক একমাত্র পাকিস্তানই তাদের অম্বিষ্ট। অবশ্য শেষ মুহূর্তে আক্ষেপ করেছেন এই বলে যে, 'পোকায় খাওয়া (মথ ইটন্) পাকিস্তান নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হলো'। অবশ্য তাও গোটা দেশকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে।

জিন্নার এই ভিন্ন চেহারা দেখে ক্ষুব্ধ ভাইসরয় ওয়াভেল ২৫ নভেম্বর (১৯৪৬) সব দলের উদ্দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক বিবৃতিতে ৯ ডিসেম্বর সাংবিধানিক পরিষদের (কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির) সভা আহ্বান করেন। জিন্না এ পদক্ষেপকে 'মারাত্মক ভুল ও বিপজ্জনক' আখ্যায়িত করে অভিযোগ তোলেন যে পরিস্থিতির বাস্তবতা বিচার না করে কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভাইসরয় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি মুসলিম লীগ সদস্যদের ওই সভায় যোগ না দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছে (হডসন)। এবার থলে থেকে বিড়াল বেরিয়ে এলো।

জিন্নার উদ্দেশ্য এখন পরিষ্কার। পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাব তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এর অর্থ ভারতবিভাগ। কোনো উপায় না দেখে ভাইসরয় বিদেশসচিবের শরণাপন্ন। পেথিক লরেন্সের বক্তব্য : দুই প্রধান দলের মতৈক্য ছাড়া স্থায়ী সংবিধান প্রণয়ন সম্ভব নয়। কাজেই লীগ-কংগ্রেসকে ঐকমত্যে আনার চেষ্টা করা হোক। ডাকা হোক তাদের প্রতিনিধিদের লন্ডনে। কিন্তু মতৈক্য যে কখনই সম্ভভব নয় এ সত্য ভাইসরয় ওয়াভেল ততদিনে বুঝে গেছেন। কী করা যাবে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

সেখানেও সমস্যা। লন্ডন যেতে কেউ রাজি, কেউ গররাজি। ইতিমধ্যে লীগ, কংগ্রেস যে যার মতো অবস্থান নিয়েছে। মতৈক্য দূরে থাক পরস্পরবিরোধিতা একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির আহ্বানও কাজে আসেনি। হডসনের মতে ব্রিটিশ সরকার ইতিমধ্যে লীগের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে। হয়তো সংখ্যালঘুর কথা বিবেচনা করে। শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধি দল লন্ডনে গিয়েও (২ ডিসেম্বর, ১৯৪৬) সমঝোতায় পৌছতে পারেনি, যেমনটা ভাবা গিয়েছিল। বৃথা সময় নষ্ট।

দুই

ডিসেম্বরে (৯ তারিখ) নির্ধারিত সংবিধান সভায় কার্যকর কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি লীগ ওই সভা বয়কট করার কারণে। সভায় শুধু নীতিগতভাবে ভারতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়, এই যা। আর অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ করে দিয়ে লীগ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব এ পর্যায়ে পৌঁছায় যে কংগ্রেস লীগ সদস্যদের পদত্যাগের দাবি জানায়। এমনকি প্যাটেলের প্রকাশ্য ঘোষণা যে লীগ সদস্যদের সরকারে রাখা হলে কংগ্রেস সদস্যরা পদত্যাগ করবেন। সমস্যা এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে তা একজন অরাজনৈতিক ভাইসরয়ের পক্ষে সামলানো সম্ভব ছিল না। কাজেই ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, অর্থাৎ ভাইসরয় পরিবর্তন।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির ঐতিহাসিক ঘোষণা এবং তা রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। দিনটি ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। সে ঘোষণা ব্রিটিশ সিংহের ভারতত্যাগ ও ভারতীয়দের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের, বলতে গেলে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যেই। অবশ্য অ্যাটলির ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ক্ষমতা হস্তান্তর ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

কিন্তু কাদের হাতে হস্তান্তর সে বিষয়ে অস্পষ্টতা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান রচনা ও দিকনির্দেশনা অসম্ভবই ছিল। তবে সে অসম্ভবকে তার মতো করে, বলা যায় ব্রিটিশ শাসকদের মতো করে সম্ভব করে তোলে মাউন্টব্যাটেনের চাতুর্য। সেখানে হার দেশি রাজনীতিকদের। তাদের কারোরই চাওয়া শতভাগ পূরণ হয়নি। ওই ঘোষণায় আরো বলা হয়, এ কাজ সম্পন্ন করতে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে নতুন ভাইসরয় হবেন অ্যাডমিরাল ভাইকাউন্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন। বেচারি লর্ড ওয়াভেল, দিল্লির গরমে মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়েও দুই মাথা একত্র করতে পারেননি।

কিন্তু স্বেচ্ছায় ব্রিটেনের ভারতীয় স্বার্থ পরিত্যাগ? বিষয়টা বহু আলোচিত। মোদ্দা কারণ ব্যাপক জনবিক্ষোভ, আন্দোলন, বিদ্রোহ এমনকি সেনাবাহিনীতে এর বিস্তার। সমুদ্রপার থেকে নতুন করে শ্বেতাঙ্গ সেনাসদস্য যোগ করার অর্থনৈতিক সামর্থ্য যুদ্ধাহত বৃদ্ধ ব্রিটিশ সিংহের ছিল না। তদুপরি বিষফোঁড়া সাম্প্রদায়িক সংঘাত, বামরাজনীতির শক্তিবৃদ্ধি, শ্রমিক-কৃষকের প্রতিবাদী আন্দোলন আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী সুদিন তখন শেষ। নতুন রাজনৈতিক সূর্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দুর্বল, জীর্ণ ব্রিটেন অনেক ঋণে বাঁধা পড়ে আছে। কাজেই ভারত ছেড়ে এসে কমনওয়েলথের অধীনে তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা বরং লাভজনক। ভাঙনের মধ্যে যা কিছু প্রাপ্তি।

এ সহজ সত্য বুঝতে চায়নি ব্রিটেনের অভিজাতকুল, তাদের উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধি লর্ড সভা। ভাইকাউন্ট টেম্পলউড লর্ড সভায় ক্ষমতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হস্তান্তরের শ্রমিক দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রস্তাব তোলেন। তার সমর্থনে কয়েকজন অভিজাত সদস্য এগিয়ে আসেন। তবে আরেক সদস্য লর্ড হ্যালিফ্যাক্স সরকারি সিদ্ধান্তের পক্ষে দাঁড়ান। সেই সঙ্গে ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স প্রমুখের বাকচাতুর্যে শ্রমিক দলীয় সিদ্ধান্ত রক্ষা পায়। অবশ্য কমন্স সভায় রক্ষণশীল দলীয় সদস্য চার্চিল, বাটলার, জন অ্যান্ডারসন প্রমুখ চরমপন্থীর বিরোধিতা খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা বলা বাহুল্য ভারতসহ বিশ্বের অন্যত্র অভিনন্দিত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তো সেই ১৯৪২ সাল থেকে চার্চিলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যাতে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল নানা ছলাকলায় বিষয়টাকে যথাসম্ভব ধামাচাপা দিয়ে রাখেন। নেহরু ব্রিটিশরাজের এ সিদ্ধান্তের প্রতি অভিনন্দন জানান। একই প্রতিক্রিয়া ভারতের সব গণতন্ত্রী ও প্রগতিবাদী মহলের। তবে জিন্না এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে রাজি হননি। এবং তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'মুসলিম লীগ তার পাকিস্তান দাবি থেকে এক ইঞ্চিও সরে আসবে না' (ভিপি মেনন, পৃষ্ঠা ৩৪০)। পাকিস্তান সম্বন্ধে এতটাই 'অবসেশন' জিন্নার।

ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা যেন ভারতীয় রাজনীতির মৌচাকে ঢিল। সম্ভাব্য ফুলফোটা মধুর লোভে শুরু হয় নতুন করে তৎপরতা। যে যার মতো করে তার তরবারিতে শান দিতে থাকে। প্রদেশগুলো নতুন করে হিসাব কষতে থাকে, বিশেষ করে মুসলমানপ্রধান প্রদেশ বাংলা ও পাঞ্জাব। সেই সঙ্গে হিন্দুপ্রধান (যদিও সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ) আসাম যে প্রদেশটিকে মন্ত্রীমিশন প্রস্তাবে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয় যুক্তিহীনভাবে। মন্ত্রীমিশনের এবিসি গ্রুপিংয়ের পর থেকেই শুরু হয় বাঙালি মুসলমানের আসামের দিকে অভিবাসন যাত্রা। উদ্দেশ্য মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। এ ছাড়াও আসামের কোনো কোনো অঞ্চলে ছিল বাঙালি-প্রাধান্য। সম্ভবত এমনি একাধিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ছেচল্লিশ থেকেই খাস অসমিদের মনে বাঙালিবিরোধী প্রতিক্রিয়া– শুরু হয় 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন ও সহিংসতা।

বঙ্গে লীগ মন্ত্রিসভা বহাল থাকলেও সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার অবসান ঘটেনি। কলকাতা দাঙ্গার ক্ষত তখনো উভয় মহলে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, অনাস্থার প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। হিন্দুমহাসভা সক্রিয় হয়ে ওঠে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুবঙ্গ হিসেবে ঘোষণার সম্ভাব্যতা নিয়ে। অন্যদিকে মুসলিম লীগের চেষ্টা বঙ্গের অখণ্ডতা রক্ষার, যা জিন্না ঘোষিত দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বিভাজন নীতির সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না। কিন্তু জাতিসত্তার বিবেচনায় ১৯০৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের ধারায় বঙ্গীয় কংগ্রেসের বাম-ঘরানা এবং বঙ্গীয় লীগের অনুরূপ পশ্চিমবঙ্গবাসী নেতাদের একাংশ বঙ্গের অখণ্ডতা রক্ষার চেষ্টা চালায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবুল হাশিম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসু, কিরণশঙ্কার রায় প্রমুখ। কিন্তু পাঞ্জাবের অবস্থা হয়ে ওঠে বিস্ফোরণমুখী।

সিকান্দার হায়াত খানের মতো অখণ্ড পাঞ্জাবপ্রেমী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতিতে মুসলিম লীগের জঙ্গি সাম্প্রদায়িক প্রচারের দাপটে সেক্যুলার রাজনীতিক খিজির হায়াত খানের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যদিও কংগ্রেস সমর্থনে তিনি তখন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। জিন্নার লক্ষ্য পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন বঙ্গের অনুকরণে। তাই শুরু হয় লীগ ক্যাডারদের পক্ষে ধ্বংসাত্মক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সাম্প্রদায়িকতার তীব্র প্রকাশ ঘটিয়ে। অবস্থা এমনি সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে যে মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াত খানকে পদত্যাগ করতে হয়। এবার লীগের সামনে আপেল। কিন্তু হিন্দু ও শিখ সদস্যদের বিরোধিতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি লীগ। পাঞ্জাবে গভর্নরের শাসন (৯৩ ধারায়) জারি।

এদিকে মুসলিম লীগ ছাড়বার পাত্র নয়। শুরু হয়ে যায় জোরেশোরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। রাজপথে সহিংসতা, মৃত্যু, রক্ত, নারী নির্যাতনে প্রয়াত সিকান্দার হায়াতের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের এ চরিত্র নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন সিকান্দার। কথাটা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন পেন্ডেরেল মুনকে। তবে গভর্নর স্যার জেনকিন্সের চেষ্টায় অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসে। ব্যক্তিভেদে অনেক কিছু ঘটে বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত, ভালো-মন্দ। বঙ্গে ১৯৪৬ আগস্টে দরকার ছিল জেনকিন্সের মতো গভর্নর।

ভারতজুড়ে তখন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস– ক্ষমতার প্রচণ্ড লোভ সর্বপ্রকার মানবিক বোধ কেড়ে নেয়। ভাইসরয় ওয়াভেলের ব্যক্তিগত সদিচ্ছা সেখানে দাগ কাটে না। সম্প্রদায় চেতনা এমন অন্ধতার সৃষ্টি করে যে কোনো সৎ পদক্ষেপকেও সঠিক মনে হয় না যদি তা ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের সঙ্গে না মেলে। ভাইসরয়ের পরামর্শ সেখানে থই পায় না।

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত লিয়াকত আলী খান যখন তার বাজেটে ব্যবসা-লভ্যাংশের ওপর ২৫ শতাংশ কর আরোপের প্রস্তাব করেন তখন বৃহৎ পুঁজি সমর্থিত কংগ্রেস এ পদক্ষেপকে আখ্যায়িত করে হিন্দু ব্যবসায়ীদের শাস্তিদানের চেষ্টা হিসেবে (মেনন)। অবশেষে প্রবল এক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতিতে ব্যর্থতার বোঝা কাঁধে নিয়ে লর্ড ওয়াভেল যখন ভারত ছেড়ে যান তখন একরাশ হতাশা ও বিষণ্নতা তার সঙ্গী। কিন্তু এর সব দায় তার ছিল না। এ সম্বন্ধে মাওলানা আজাদের মূল্যায়ন যথেষ্ট বাস্তবধর্মী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

প্রসঙ্গত সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশপ্রেমী মাওলানা আজাদ সম্পর্কে দুএক কথা বলতে হয়। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাওলানা আজাদ বা রাজনৈতিক নেতা আজাদ কিংবা নিছক ব্যক্তি মাওলানা আজাদের মধ্যে ফারাক দেখা যায় না। রাজনীতিবিদ হয়েও তার মধ্যে রাজনীতিতে প্রচলিত চতুরতা, বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতারণা বা সুবিধাবাদ অনুপস্থিত। তাই প্রচলিত রাজনীতিতে তিনি 'মিসফিট'। নিজ সম্প্রদায়ের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে সচেতন থেকেও অন্ধ যুক্তিহীন সমর্থনের পক্ষে হাল ধরেননি। চলেছেন নিজের বিচার, বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেকের নির্দেশমাফিক।

তবে দলীয় রাজনীতি করেছেন বলে দলীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়েছে, সেখানকার ধরাবাঁধা নিয়মনীতির বাইরে যেতে পারেননি। এতে খানিকটা আপসবাদিতার প্রতিফলন ঘটেছে। হয়তো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ মানুষ বলেই কংগ্রেসে নিহিত স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও সংগঠন ছেড়ে চলে যেতে পারেননি। সহ্য করতে হয়েছে নানা স্ববিরোধী আচরণ। তবে সত্য কথা বলার সৎসাহস তার ছিল। অপ্রিয় জেনেও তা বলেছেন।

সহকর্মী নেহরুর রাজনৈতিক প্রকৃতি ও পদক্ষেপের ভুলভ্রান্তি ও সেসবের বিপদ সম্বন্ধে মাওলানা আজাদকেই বলতে শোনা গেছে। আবার কোনো ইংরেজ প্রশাসকের সদগুণ বা সঠিক পদক্ষেপ নির্ভীক সততায় প্রকাশ করেছেন। যেমন ভাইসরয় ওয়াভেল সম্বন্ধে তার কিছু মন্তব্য, ভাইসরয় হিসেবে ওয়াভেলের কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কারণ ওয়াভেল ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সঠিকভাবে অনুধাবন করে লীগ-কংগ্রেসকে ওই সংঘাতের বৃত্ত থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

ভারতবিভাগ এড়ানো সম্পর্কে তিনি ওয়াভেলের নীতিকে সঠিক বলে মনে করতেন, অংশত মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবও। তার ভাষায় একদিন 'হয়তো ইতিহাস এটা স্বীকার করে নেবে যে লর্ড ওয়াভেলের নীতিকে মেনে নিয়ে তার পরামর্শ মতো চললেই ভালো হতো। তিনি যেভাবে পরিস্থিতি অনুধাবন করেছিলেন তা মোটেই ভ্রান্ত ছিল না' (ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২৫৬)। তাছাড়া তিনি ওয়াভেল পরিকল্পনাও ভারতের জন্য সঠিক বিবেচনা করেছিলেন।

ওয়াভেল সম্বন্ধে আজাদ আরো বলেছেন, 'তাকে আমি দেখতে পাই একজন বাস্তববাদী সৈনিক হিসেবে। রাজনীতিবিদদের মতো তার মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ ছিল না।' আর সে কারণেই রাজনীতিকদের ঘোরপ্যাঁচের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইসরয় ওয়াভেল পেরে ওঠেননি। তাছাড়াও নীতিগত মতভেদ ছিল বিদেশ সচিব পেথিক লরেন্স বা কখনো স্টাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে। স্বভাবতই এ মতভেদ প্রভাবিত করেছে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিকে। এটা ঠিক যে, তার উত্তরসূরির মতো তিনি লীগ বা কংগ্রেসের ওপর জোর করে বা কৌশলে কিছু চাপিয়ে দিতে চাননি। সেজন্যই সমস্যা সমাধানে তিনি ব্যর্থ। ভারতীয় রাজনীতিতে 'মিসফিট'। ওয়াভেল সম্বন্ধে এমনই বোধহয় ভাবতেন আজাদ।

কিন্তু তার উত্তরসূরি মাউন্টব্যাটেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির মানুষ না হয়েও ছিলেন তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাই রাজনীতিকদের ঘোরপ্যাঁচ তিনি সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে পেরেছেন। এমনকি তার বুদ্ধি ও চাতুর্যের কাছে ভারতীয় রাজনীতিকগণ হার মেনেছেন। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় ভাইসরয় ওয়াভেল যা পারেননি অতি অল্প সময়ে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তা করতে পেরেছেন। ভাঙনের পথ ধরে তিনি ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করেছেন। ভারত ভাগ করে চিরবৈরী দুই ডোমিনিয়ন-রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে গেছেন কৃতী ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন। স্বস্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছেন অ্যাটলি মন্ত্রিসভার জন্য।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কি করতে পেরেছেন মাউন্টব্যাটেন ভারত ভাগ করে? ব্রিটিশ শাসকদের ভারতত্যাগের ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, মৃত্যু ও নিষ্ঠুরতা যেন ভারতীয় জীবনের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তা হিন্দু-মুসলমান-শিখ নির্বিশেষে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, ধ্বংসাত্মক ঘটনা, নারী নির্যাতন কোনোটাই আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন ভুবন পাওয়ার পরও কী ভারতে কী পাকিস্তানে বন্ধ হয়নি। সে ট্র্যাডিশন এখনো চলছে। তাহলে বলতে হয় : ভারত বিভক্ত হয়েও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন : ভারতভাগ কি রাজনৈতিক-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সফল বা সার্থক? এ প্রশ্নের জবাব সবারই জানা। আর সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা এসেছে সেটাও তো বিভক্ত স্বাধীনতা, শ্রেণীবিশেষের স্বাধীনতা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন্ ভাঙনের পথে ভারতবর্ষ

ভারতীয় রাজনীতির সম্প্রদায়ভিত্তিক দ্বন্দ্ব যেন ইতিহাসের ঘটনা-নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতা, যেখানে ঘটনা সবচেয়ে ক্ষমতাধর। কেউ চাইলে মিলে-অমিলে একে মিনি কুরুক্ষেত্রও বলতে পারেন, যেখানে ঘটনার নিয়ন্ত্রক অংশত হলেও কৃষ্ণরূপী ব্রিটিশরাজ। তবে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয় পক্ষের। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা কখনো নিয়তির মতো। সেসব ব্যক্তির মধ্যে প্রধান গান্ধি-জিন্না-নেহরু, তার নিজস্ব ভূমিকায় আজাদ, পাশে দাঁড়িয়ে প্যাটেল। নেপথ্যে 'রাজ'-প্রতিনিধি ভাইসরয়। সবাই মিলে মিনি কুরুক্ষেত্রের ময়দান রচনা– সেখানে যে যার মতো করে তৎপর। বলা চলে লড়াইয়ের মহড়া।

অখণ্ড ভারত (শক্তিশালী কেন্দ্র) নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের অনড় ভূমিকার কথা ইতিহাস-পাঠকের জানা। কিন্তু ইতিহাসের ইতিহাস প্রশ্ন তোলে– তাদের এ মনোভাব কতটা আন্তরিক, কতটা নিঃস্বার্থ ছিল? আরো প্রশ্ন সেক্ষেত্রে মসনদ দখলই কি একমাত্র লক্ষ্য ছিল না? এজন্য অতীত ঘাঁটতে খুব দূরে না গেলেও চলে। অন্তত ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ (আগস্ট) পর্যন্ত ঘটনাবলির পর্যালোচনাই যথেষ্ট। তাতে এটুকু স্পষ্ট যে, ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলিম স্বার্থের পক্ষে মুসলিম লীগের দাবিগুলোর বিপরীতে কংগ্রেস বৃহত্তর জনপ্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে কিছু নমনীয়তা, কিছু উদারতা দেখালে এবং বিরাজমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিচারে কিছু বিচক্ষণ ছাড় দিলে হয়তো ভারতবিভাগ রোধ করা যেত। তা সম্ভব হতো অতি আত্মবিশ্বাস, উচ্চমন্যতার মতো কিছু বিষয় যদি কংগ্রেস বড় করে না তুলত। দেশবিভাগ-বিষয়ক মনোযোগীপাঠ এমন সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে।

এ ধরনের বক্তব্য আরো দু-একজনের মতো করে না হলেও ভিন্নভাবে বলেছেন এইচ. ভি হডসন। তার ভাষায়, 'A little greater humility, a little less certainty of righteousness, might have saved their ideal of a united india of all communities' (দ্য গ্রেট ডিভাইড, পৃ. ১৮২)। নিজেকে সঠিক, অভ্রান্ত ভেবে লেনদেনে উদারতার অভাবও যে অচলাবস্থার জন্য দায়ী তাতে ভুল নেই। অন্যদিকে দৃঢ়তা প্রদর্শনের জায়গাতে কংগ্রেস যে ভুল করেছে এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদাহরণও তুলে ধরেছেন হডসন (পৃষ্ঠা ১৭২-৭৩)। যথাসময়ে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বলিষ্ঠতা তারা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দেখাতে পারেননি। মূলত দেশব্যাপী সহিংসতার ভয়ে।

তাই বলে জিন্নার কি এ ব্যাপারে কোনো দায় ছিল না? অবশ্যই ছিল। কারণ তিনিই তো ১৯৪০ সাল থেকে ভারতভাগের রেসে জেতার বাজি ধরে মাঠে নেমেছিলেন। অপেক্ষা করে থাকতেন প্রতিপক্ষের ভুল চালের বিপরীতে পাল্টা সঠিক চাল দেয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের অতি-আত্মবিশ্বাসী না হয়ে ধীরস্থির সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া দরকার ছিল। কিন্তু তেমন সুযোগ কংগ্রেস কমই নিতে পেরেছে। কথাগুলো খোলামেলাভাবে বলেছেন হডসন, (পৃ. ১৮২)। উল্লেখ করেছেন নেহরুর কিছু মারাত্মক ভুলের কথা, যা ভারতভাগের পথ প্রশস্ত করেছে। সে ভুলগুলো অবশ্য পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়ে।

তবে পাকিস্তান নিয়ে জিন্নার 'অবসেসন'-এর কথা জিন্নার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একাধিক লেখক বলেছেন, আয়েশা জালাল বা তার একই ধারার একাধিক ব্যক্তি যা-ই লিখুন না কেন। কিছুটা ওই ঘরানারই স্ট্যানলি উলপার্ট ('জিন্না অব পাকিস্তান', ১৯৮৪) জিন্নার পাকিস্তান বিষয়ক যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তাতেও স্পষ্ট যে ভারতভাগ ও পাকিস্তান ছিল জিন্নার প্রথম ও শেষ কথা। যেমন জিন্না বলেন, **'দশ কোটি মুসলমান একত্র হলে পাকিস্তান আসবেই, ইনশাল্লাহ্ আমরা জয়ী হব। এজন্য দরকার ঐক্য ও আল্লার ওপর বিশ্বাস'** (পৃ. ২৪১)। ব্যক্তিজীবনে ধর্ম ও ধর্মাচরণ নিয়ে নিস্পৃহ জিন্নার কণ্ঠে আল্লার ওপর বিশ্বাস রাখার কথা বড় অদ্ভুত শোনায়!

শুধু তা-ই নয়, জিন্না এমন কথাও বলেন 'আমরা হিন্দুর দাসত্ব থেকে মুক্তি চাই' (পৃ. ২৪৮)। আহমেদাবাদে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, (অক্টোবর, ১৯৪৫) 'পাকিস্তান আমাদের জন্য জীবনমরণ প্রশ্ন। ভারতের সব মুসলমান এক আল্লায় বিশ্বাসী এক জাতি। তারা পাকিস্তান চায়। তারা পাকিস্তান আদায় করবেই।... মাথার ওপর পাকিস্তানি চাঁদ জ্বলজ্বল করছে, আমরা তা পাবই' (পৃ. ২৫১)। পশ্চিমা কেতার জীবনযাপনে অভ্যস্ত জিন্নার মুখে ধর্মভিত্তিক উত্তেজক বক্তৃতা স্ববিরোধী হলেও তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছিল খুবই সহায়ক।

জিন্নাসহ মুসলিম লীগ নেতাদের বক্তৃতা মুসলিম ভারতে যথেষ্ট উন্মাদনা সৃষ্টি করে, বিশেষ করে বঙ্গে ও পাঞ্জাবে যে জন্য এ দুটো প্রদেশ অবশেষ বিচারে পাকিস্তান আদায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরপরই যুক্তপ্রদেশ। সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর পাঞ্জাবের গভর্নর জোরের সঙ্গে বলেন, 'মুসলিম লীগকে পাকিস্তান দাবি থেকে সরিয়ে আনতে না পারলে পাঞ্জাবে গৃহযুদ্ধ বেঁধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে' (উলপার্ট, পৃ. ২৪৭)। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াত খানও অনুরূপ মন্তব্য করেন। অন্যদিকে বঙ্গীয় গভর্নরের মন্তব্য : 'জিন্না না থাকলে পাকিস্তান আইডিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো' (প্রাগুক্ত)।

স্টানলি উলপার্টের বিবরণে জিন্না ও পাকিস্তান প্রসঙ্গ এমন চরিত্র নিয়ে নানাভাবে এসেছে। যে-গৃহযুদ্ধের কথা ১৯৪৫-এ বলা হয় তা আরো ব্যাপকভাবে শুরু হয় ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি সময়ে পাঞ্জাবে, মূলত ভাইসরয় মাউন্টবাটেনের ভারত বিভাজন প্রকল্প দ্রুত সমাপনের পদক্ষেপে। সে পদক্ষেপ ছিল প্রশাসকদের মতের বিরুদ্ধে। এমনকি এ বিষয়ে সর্বনাশের বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর ইভান জেনকিন্স (১১ জুলাই, ১৯৪৭)। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭-এর সময়পর্বে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেফিরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার আগুন জ্বলেছে। মাউন্টব্যাটেন-র‍্যাডক্লিফের বেহিসাবি দ্রুত সমাপনের দায়ে লাখ লাখ নর-নারী নিহত, কয়েক কোটি উদ্বাস্তুদশা বরণ করেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের কূটকৌশলী সফলতার পেছনে রয়েছে শাসক আমলাতন্ত্র বিশেষত মাউন্টব্যাটেনের আত্মবিশ্বাসী, সাম্রাজ্যস্বার্থবাদী তৎপরতা, যা ব্যাপক রক্তপাতের সূচনা ঘটায়। অবশ্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতার দায় লীগ-কংগ্রেসেরও কম নয়, বিশেষ করে জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের কারণে।

AMARBOI.COM

দুই

ভারতে ইংরেজ শাসনের শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন। তার দায়িত্ব পালনের মেয়াদ মাত্র পাঁচ মাসের মতো হলেও তাকে নিয়ে আলোচনা ও বিচার ব্যাখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। কখনো পক্ষে কখনো বিপক্ষে। ইংরেজের ভারতভাগ ও ভারতত্যাগ নির্ধারিত সময়ের দশ মাস আগেই শেষ করেন মাউন্টব্যাটেন, পেছনে যদিও রক্তনদীর ভয়াবহতা। বলা যেতে পারে যে মাউন্টব্যাটেন ভাঙনের দূত হয়ে ভারতে আসেন। লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলের পরিবর্তে রিয়ার অ্যাডমিরাল মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়ের আসনে বসে কাজ শুরু করেন ২৪ মার্চ (১৯৪৭) থেকে। ব্যাপক ভূখণ্ড কাটাকুটির মাধ্যমে ভারত বিভক্ত করে 'চিরশত্রু' ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নের জন্ম নিশ্চিত করেন তিনি। ভারত ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন, যদিও স্বল্প সময়ের জন্য।

ভারতে মাউন্টব্যাটেনের সাফল্যের কারণ একাধিক। হডসন এ সম্পর্কে আলোচনায় মাউন্টব্যাটেনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন যা প্রাসঙ্গিকই নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই সঙ্গে তিনি মন্ত্রীমিশনের ব্যর্থতার কথাও বলেছেন। তার মতে, এর মূল কারণ মন্ত্রীশিনের মূল দায়িত্ব ছিল শুধু আলোচনার, অন্যদিকে মাউন্টব্যাটেনের হাতে ছিল সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। কথাটা অবশ্য চার বছর আগেকার ক্রিপস মিশন সম্বন্ধে আরো বেশি খাটে।

তবে আমার মনে হয় এর চেয়েও বড় কারণ স্বাধীনভাবে কাজ করার পক্ষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে মাউন্টব্যাটেনের শর্ত আদায়, যে সুবিধা ভাইসরয় ওয়াভেলের ছিল না। সেই সঙ্গে অবশ্যই বিচার্য তার ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য ও চাতুর্য, রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে তার প্রভাব, কোনো কোনো ভারতীয় রাজনীতিকের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুবাদে সহায়তা আদায়ের মতো ঘটনাবলি। পরোক্ষে ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটও তাকে সাহায্য করে। যেমন লীগ-কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বে ক্লান্ত নেতাদের ক্ষমতালাভের প্রবল তাগিদ ও অস্থিরতা। এ জাতীয় সব সুবিধা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন মাউন্টব্যাটেন, যেসব সুবিধা পাননি ক্রিপস বা ওয়াভেল।

তাছাড়া হডসনের মতে মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রী এডুইনার নেপথ্য সাহায্য-সহযোগিতা ভাইসরয়ের কাজে সহায়ক হয়েছে। বর্ণধর্মজাতপাত নিয়ে এডুইনা ছিলেন সংস্কারমুক্ত। ভারতে এসে তিনি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেননি। ভারতীয় নারীদের সমস্যায় ও সমাজসেবার কাজে নিজেকে যুক্ত করেছেন এডুইনা। তার সাহস, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিগত সৌন্দর্য ও মানবিক বোধ উদ্দিষ্ট কাজে সাহায্য করেছে (পৃষ্ঠা ২০৬)।

AMARBOI.COM

তাই ক্রিপস বা ওয়াভেল যা করতে পারেননি, ভারতীয় রাজনীতির দ্বন্দ্ব, জটিলতা ও সমস্যার মধ্যেই তা পেরেছেন লক্ষ্য অর্জনে সফল মাউন্টব্যাটেন। ক্রিপস ও মাউন্টব্যাটেন দুজনই আলোচনায় দেনদরবারে দক্ষ। দুজনই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু চতুর চালে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মাউন্টব্যাটেন বোধ হয় অধিক পারদর্শী। হতে পারে আভিজাত্যের মহিমা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মন্ত্রীমিশন প্রস্তাবে দেশভাগের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ছিল ভারতীয় মুসলমানদের আর্থ-রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার পক্ষে গ্রুপিং ব্যবস্থা, প্রদেশের অধিকতর ক্ষমতা। এতে আপত্তি ছিল কংগ্রেসের। দুইপক্ষের বিপরীতমুখী আপত্তি মেটাতে পারেনি মন্ত্রীমিশন। অতএব ব্যর্থ।

মাউন্টব্যাটেনের কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না। তাই তিনি দুইপক্ষের সঙ্গে খোলা মনে নানারকম সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছেন। জিন্নার সঙ্গে আলাপের পর যখন বুঝেছেন সমঝোতায় দেশভাগ অপরিহার্য, তখন সে পথেই হেঁটেছেন, তবে জিন্নাকে একহাত নিয়ে। জিন্না যা চেয়েছেন তার সঙ্গে যা চাননি তা বাড়তি উপহার দিয়ে। এর পরিণাম শুভ হয়নি। অন্যদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনায় গান্ধির চেয়ে নেহরু ও অংশত প্যাটেলকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হডসনের মতে, ক্রিপসের বড় ভুল ছিল গান্ধির মতামত ও ক্ষমতার ওপর অধিক আস্থা স্থাপন।

মাউন্টব্যাটেনের বাড়তি সুবিধা ছিল এক বছর আগে (মার্চ, ১৯৪৬) সিঙ্গাপুরে নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাদের মধ্যকার সুসম্পর্ক। মাউন্টব্যাটেনের সাফল্যের পেছনে ঘটনার গুরুত্ব অনেক। তবে হডসন সংশ্লিষ্টদের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন অধিক। তাই নেহরু ও মাউন্টব্যাটেনের শিক্ষা, মানসপ্রবণতা, ব্যক্তিত্ব-সাদৃশ্য ও গণতান্ত্রিক চেতনা সম্বন্ধে লিখেছেন। তার মতে 'নেহরু দার্শনিক, আদর্শবাদী আর মাউন্টব্যাটেন বাস্তবতাবাদী কর্মতৎপর ব্যক্তি। তারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।' 'নেহরু ও মাউন্টব্যাটেন দুজনই আবেগপ্রবণ (জিন্নার ঠিক বিপরীত) কিন্তু দ্বিতীয়জন নেহরুর মতো অস্থির ও ভাবোচ্ছ্বাসে তাড়িত নন।'

রাজনৈতিক জীবনে নেহরুর প্রাথমিক নির্ভরশীলতা পিতা মতিলাল নেহরুর ওপর, পরে দীর্ঘ সময় গান্ধির ওপর। আশ্চর্য সাতচল্লিশে গান্ধি নন, মাউন্টব্যাটেনকে তিনি আস্থায় নিয়েছেন অনেক সময় (হডসন)। এ সময় প্যাটেলের মতামতেও কখনো কখনো প্রভাবিত হন নেহরু। অন্যদিকে মাউন্টব্যাটেন আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভর। বিপরীত স্বার্থের একজন ক্ষমতাবান মানুষকে আস্থায় নেয়া নেহরুর জন্য ঠিক ছিল না। হডসন সরস বাক্যে একথা পরোক্ষে কবুল করেছেন। তার ভাষায় এরা দুজন হাত ধরাধরি করে চলার মতো মানুষ। কিন্তু এদের একজনের হাতে দস্তানা, অন্যজনের হাত দস্তানাহীন। খালি হাত ও দস্তানাপরা হাতে অনেক তফাৎ। বাঁ-হাতের দস্তানা ডান হাতের জন্য অচল।' এ রূঢ় সত্য কি জানতেন না নেহরু? নাকি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার তাড়নায় সহজ সত্য ভুলে গিয়েছিলেন।

ভারতীয় রাজনীতির এই শেষ ক'মাসের নৈরাজ্যিক পর্বে ঘটনার ওপর মাউন্টব্যাটেনেরই প্রভাব সবার চাইতে বেশি। বাকি সবাই ঘটনা দ্বারা কম-বেশি তাড়িত। এ জাতীয় তাড়নায় এডুইনারও নেপথ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভাইসরয়ের সুতো টানাটানির চালে রুক্ষ-মেজাজ সরদার প্যাটেলও নিস্তেজ। অবশ্য ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার টানে। তাই দেশভাগে অনিচ্ছুক কংগ্রেসকে নড়াতে সফল হন মাউন্টব্যাটেন। লক্ষ্য অর্জনে গান্ধি নন, নেহরুর ওপর এবং মেননের সাহায্যে অংশত সরদার প্যাটেলের ওপর নির্ভর করেন ভাইসরয়।

কারণ গান্ধি এ পর্যায়ে কিছুতেই ভারতভাগ মেনে নিতে চাননি। তার দিক থেকে বিভাজন এড়াতে প্রস্তাবের পর প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা কখনো দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কংগ্রেস প্রধান, কখনো জিন্না মানতে রাজি হননি। ফলে গান্ধির শেষ আশ্রয় তার প্রার্থনা সভায় ভারতভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা– তাতেও কোনো সুফল দেখা যায়নি। ভয়ানক হতাশ গান্ধি, কংগ্রেসের একদা সর্বাধিনায়ক 'মহাত্মা গান্ধি'!

অন্যদিকে জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় যথারীতি অন্য ভাইসরয়দের মতো মাউন্টব্যাটেনেরও অস্বস্তি কম ছিল না। তবে তার স্বভাবসুলভ চাতুর্যে, ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্যগুণে অন্যদের চেয়ে অন্তত এক-পা এগিয়ে ছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত প্রতিবেদনে মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে 'আবেগহীন, শীতল, উদ্ধত ও উন্নাসিক মানুষ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (হডসন)। তার সঙ্গে আলোচনার শুরুতেই মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারেন এই আইনজীবী রাজনীতিককে বাগে আনা মোটেই সহজ নয়। কথায় কথায় জিন্না লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বা উপদেষ্টার দোহাই দিলেও ভাইসরয় ঠিকই বুঝতে পারেন 'জিন্নার উপদেষ্টা জিন্না নিজেই'। অন্যদের তুলনায় এক্ষেত্রে ছিল সেয়ানে সেয়ানে লড়াই।

প্রকৃতি ও মেজাজে জিন্না ও মাউন্টব্যাটেন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মানুষ হওয়ার কারণে তাদের সংলাপে কখনো সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়নি। নিজের দাবির বাইরে প্রতিক্ষেত্রে জিন্নার নেতিবাচক বক্তব্য ভাইসরয়ের কাছে রীতিমতো বিরক্তিকর মনে হয়েছে। তুলনায় নেহরুর সঙ্গে আলাপে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন মাউন্টব্যাটেন। আমার বিশ্বাস জিন্নার জীবনে, আলোচনায় রাজনীতিক জিন্নাকে চালিত ও প্রভাবিত করেছেন আইনজীবী, তথা আইনজ্ঞ জিন্না। যে জন্য তার সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠা কঠিন ছিল। তার 'না' ম্যানিয়াও বোধ হয় এর অন্যতম কারণ। এ বিষয়ে তৎকালীন দৈনিক 'যুগান্তর'-এ তার সম্বন্ধে সরস মন্তব্য (১৯৪৬) পড়েছিলাম যে তার নাম জিন্না বলেই বোধ হয় সব প্রশ্নেই তার জবাব 'জী-না'।

বিষয়টি অবশ্য একতরফা নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে সংলাপে অন্য লীগ নেতারাও খুব বিরক্ত, বিশেষ করে, অন্তর্বর্তী সরকারে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানের কারণে। মাউন্টব্যাটেনের এক প্রশ্নের জবাবে লিয়াকত আলী খান বলেন : 'অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এদের সঙ্গে চলা অসম্ভব। কংগ্রেসের সঙ্গে থাকার বদলে মুসলিম লীগকে যদি স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে সিন্ধুর মরুভূমিও দেয়া হয় তাহলেও তা আমার কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হবে' (হডসন)।

লীগ-কংগ্রেস নেতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ১৯৪৬-৪৭ সালে এমনই এক অসহিষ্ণু বিতৃষ্ণায় পৌঁছেছিল। তাই মাউন্টব্যাটেন যখন সমস্যা সমাধানে জিন্নার মতামত জানতে চান, তখন শেষোক্তের জবাব– সমাধান একমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটাই, আর তা হলো 'ভারতের ওপর সার্জিক্যাল অপারেশন চালানো। অন্যথায় ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে'। কংগ্রেস নেতাদের সারাক্ষণ অবস্থান পরিবর্তন নিয়েও অভিযোগ তোলেন জিন্না। তার মতে, মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব এখন এক অর্থহীন বিষয়। ভারতবিভাগ ও পাকিস্তানই সমস্যার একমাত্র সমাধান।

চতুর ভাইসরয় তখন জিন্নার যুক্তিতেই জিন্নাকে পরাস্ত করেন। তার বক্তব্য: যে দ্বিজাতিতত্ত্বের সুচিন্তিত নীতি অনুযায়ী ভারতবিভাগ গ্রহণযোগ্য, সেই নীতিমাফিকই হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত বঙ্গ ও সেই সঙ্গে শিখ অধ্যুষিত পাঞ্জাবকেও সম্প্রদায় ভিত্তিতে ভাগ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু জিন্না কাটাকুটির পাকিস্তান নিতে রাজি নন। ভাইসরয়ও পিছু হটতে গররাজি। তার প্রস্তাব দুটো– প্রথমত মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব যাতে রয়েছে অখণ্ড ভারতে দুর্বল কেন্দ্র, শক্তিমান প্রদেশ, পাকিস্তানি চেতনার আঞ্চলিক বিভাগ ও এবিসি গ্রুপিং যা নিয়ে কংগ্রেসের আপত্তি। জিন্নার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য মনে হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত ভারত বিভাগ, বাংলা পাঞ্জাব বিভাগ, কাটাছেঁড়া পাকিস্তান– জিন্না কোন্‌টা চান! জবাবে জিন্নার দাবি, টিকে থাকার মতো পাকিস্তান, ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব জাতিরাষ্ট্র ও নিজস্ব সামরিকবাহিনী চাই। বাংলা-পাঞ্জাব-আসাম ভাগ চলবে না। কিন্তু জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভাজন তো নীতিমাফিক যুক্তিসঙ্গত, পূর্ণাঙ্গ পাকিস্তান সেক্ষেত্রে ধোপে টেকে না। তাই ভাইসরয় জিন্নার দাবি অযৌক্তিক বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করেন।

AMARBOI.COM

অন্যদিকে লীগ-কংগ্রেসের তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জের শুধু দলীয় সমর্থকদের মধ্যেই নয়, প্রচারের গুণে তা জনস্তরে পৌঁছে। ভাইসরয় থেকে শুরু করে ব্রিটিশরাজের শীর্ষ প্রতিনিধি সবাই সন্তুষ্ট। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির ফলাফল এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাতে যে কোনো মুহূর্তে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। অবস্থা এমনই যে হিন্দু বা মুসলমান এজন্য পরস্পরকে দায়ী করছে, ব্রিটিশরাজকে নয়। পরিস্থিতি একেবারে গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে।

এমন অবস্থাই চেয়েছিলেন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন, যাতে গৃহযুদ্ধের দায় শাসকশ্রেণির ওপর না বর্তায়। সহিংসতা ও বিভাজনের জন্য রাজনৈতিক নেতারাই যেন দায়ী বিবেচিত হন। রাজপুরুষদের লেখা নোট, প্রতিবেদন ও চিঠিপত্রে এমনটাই প্রতিফলিত। দায়িত্ব হাতে নেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই পরিস্থিতির উত্তাপ উপলব্ধি করেন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন। লেখেন, গৃহযুদ্ধ বুঝি তার হাতের ওপর দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে।

অন্যদিকে লর্ড ইস্‌মে লেখেন : 'মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে বুঝি বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে। যুক্তি নয়, লজিক নয়, এর পেছনে নিছক ভাবাবেগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাধান্য। ...ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব নেই বললে চলে। রয়েছে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখা।'

সব কিছুর দায় রাজনৈতিক নেতাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চিন্তা যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও তার চিফ অব স্টাফ লর্ড ইস্‌মে প্রমুখের ছিল রাজ-সরকার সমর্থকদের লেখায়ও তা বোঝা যায়।

হডসন লিখেছেন, ভাইসরয় সিদ্ধান্তে আসেন যে মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব বা অনুরূপ কোনো প্রস্তাব নিয়ে মতৈক্যের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্রমেই অবনতি ঘটছে। এ অবস্থায় তার প্রস্তাবগুলোর উদ্দেশ্য ভারতবিভাগের দায়-দায়িত্ব ভারতীয়দের ওপরই চাপিয়ে দেয়া (পৃ. ২৯৪)। কথাগুলো এত স্পষ্ট করে কম লেখকই বলেছেন। অবশ্য একইরকম কথা বলেছিলেন ভিপি মেনন যার আনুগত্য প্রধানত ব্রিটিশরাজের প্রতি, অন্যদিকে সরদার প্যাটেলের সঙ্গে রয়েছে তার গভীর সম্পর্ক। তারও মন্তব্য, প্রস্তাবের উদ্দেশ্য দেশভাগের দায় ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দেয়া (পৃ. ৩৫৪)। এই দায় চাপানো শুধু নেতাদের ওপরই নয়, জনসাধারণের ওপরও, বিশেষ করে আসামে (সিলেট নিয়ে) ও সীমান্ত প্রদেশে গণভোট ব্যবস্থার মাধ্যমে। গণভোটের উদ্দেশ্য জনমত যাচাই, তারা ভারত কিংবা পাকিস্তান কোন্ পক্ষে থাকবে। কিন্তু তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মুখে হিন্দু-মুসলমান জনতা কোন্‌দিকে থাকবে তা খুবই স্পষ্ট। তাই মাউন্টব্যাটেন প্রসঙ্গে এ কথাও সত্য যে লীগ-কংগ্রেস নেতারাও ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন না। তারাও কিছুতেই ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি।

আর মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব যখন গৃহীত হলো না তখন মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবে গোটা বিষয়টার নীতিগত দিক পাল্টে যায়। সেখানে প্রদেশগুলোর অধিকার ও ক্ষমতা হ্রাস পায়। পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমান ও অমুসলমান প্রতিনিধিগণ পৃথকভাবে প্রদেশ ভাগের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত দেবেন। তেমনি আসামে ও সীমান্ত প্রদেশে, যে কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পাঞ্জাবভাগের পরিণতি মারাত্মক হবে বলে মত প্রকাশ করেন পাঞ্জাবের গভর্নর ইভান জেনকিন্স। আর সীমান্তে নতুন করে জনমত যাচাইয়ের প্রবল বিরোধিতা করেন খান ভ্রাতারা, যে জন্য শেষ পর্যন্ত তাদের দল ওই জনমত যাচাই বর্জন করে। কারণ মুসলিম লীগ তথা জিন্নার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস-সমর্থিত খান মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো। আর সেইসঙ্গে প্রচার– কোরআন ও গীতার মধ্যে কোনটি বেছে নেবে সীমান্তের পাঠানগণ। লীগ রাজনীতির জাদুকাঠি ছিল ধর্মীয় প্রচারণা, তাতে আরো ছিল সত্যমিথ্যার ভেজাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবের শাখা-প্রশাখা নিয়ে গভর্নরদের মধ্যেও ভিন্নমত ছিল। যেমন বঙ্গীয় গভর্নর ফ্রেড্‌রিক বারোজ বাংলার স্বাধীন অবস্থানের সুযোগ রাখার পক্ষে ছিলেন। অন্যদিকে বারোজ ও জেনকিন্স দুজনেই সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের বিরোধী এবং পাঞ্জাব-গভর্নর মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবেরও পক্ষে ছিলেন না। ছেচল্লিশে যেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, সেক্ষেত্রে নতুন করে একমাত্র সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের অর্থ জিন্নাকে খুশি করা এবং পাঠানদেরকে তাদের কট্টর বিরোধীদের হাতে তুলে দেয়া। এর পরিণাম আমরা দেখেছি বিভাগোত্তর সীমান্ত প্রদেশে।

গাফ্‌ফার খান ঠিকই বলেছিলেন যে, কংগ্রেস দেশভাগ মেনে নিয়ে তাদের নেকড়ের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে। পাকিস্তানে তার বাকি জীবন কেটেছে জেলে। তার স্বাধীন পাখতুনিস্তানের দাবি কিছুতেই মেনে নেননি ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন। যেমন মানেননি দেশভাগ প্রস্তাব কিছু দিন স্থগিত রাখতে মাওলানা আজাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ। অবশ্য নেহরু-প্যাটেল কঠিন জুটির বিরুদ্ধে আজাদ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে বশ মানাতে পারতেন না। গান্ধি তখন দেশভাগের বিপরীতে দাঁড়িয়েও ওয়ার্কিং কমিটির ওপর কোনো প্রকার চাপ তৈরি করেননি। অথচ অতীতে করেছেন। করেছেন হসরত মোহানি উত্থাপিত স্বাধীনতা প্রস্তাব বা সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার বিরুদ্ধে।

যাই হোক এক জটিল ও চরম নৈরাজ্যিক অবস্থার মধ্যে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের ভারতবিভাগ পরিক্রমা, নীতিগতভাবে দুদিক ধরে চলা, যদিও মূল লক্ষ্য ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী স্বার্থরক্ষা আর এ লক্ষ্য অর্জনে নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা ও প্রস্তাব, কখনো নতুন নায়কের মুখ। সবকিছু মিলিয়ে প্রবাদ বচনের মতো 'অসময়ে বর্ষাকাল হরিণী চাটে বাঘের গাল' অবস্থা। মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর, কী আশ্চর্য, তৎকালীন রিফর্মস কমিশনার ভিপি মেননের ওপর দায়িত্ব পড়ে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রস্তাব তৈরির আর মেননের প্রস্তাব একপা পিছিয়ে ভারতের জন্য ডোমিনিয়ন মর্যাদার স্বাধীনতা এবং তা কমনওয়েলথ-এ জোটবদ্ধ হয়ে। কী চমকপ্রদ রাজভক্তি?

আরো বিস্ময়কর যে সরদার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে মেননের প্রস্তাব তৈরি করা হলেও সমাজবাদী ধারণার নেহরু তা খুশিমনে গ্রহণ করেন। এতে যেমন ব্রিটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক নিশ্চিত করা হয়, তেমনি থাকে শক্তিশালী কেন্দ্রের ব্যবস্থা। শেষোক্ত বিষয়টি কংগ্রেস বিশেষ করে নেহরু-প্যাটেলের খুবই কাম্য ছিল, এমনকি গান্ধিরও। গোটা প্রস্তাবটি নিয়ে মাউন্টব্যাটেনের খুশি হওয়ার কথা, এমনকি অ্যাটলি মন্ত্রিসভারও। ভাইসরয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্তব্য 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য এত বড় সুযোগ আর দেখা যায়নি' (ম্যানসার, TOP, ১০ম খণ্ড)। অন্যদিকে জিন্না ও মুসলিম লীগ তো ব্রিটিশ কমনওয়েলথের গোয়ালে ঢুকতে বরাবর একপায়ে খাড়া।

প্রসঙ্গত বাংলাভাগ সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার যে, ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতভাগ মানতে হলে একই নীতিতে বঙ্গভাগও মানতে হয়। যুক্তি অবশ্য দুটোকেই অগ্রাহ্য করে। আবার এক যাত্রায় পৃথক ফলও চলে না। কারণ ভারতভাগের পরিকল্পনায় স্বাধীন বাংলা মুসলিম জনপ্রাধান্যের কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিত, তখনকার রাজনৈতিক সামাজিক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এমনই ছিল। আদর্শ বা যুক্তিসঙ্গত স্লোগান হওয়া দরকার ছিল : না পাকিস্তান, না-বাংলাভাগ। চাই গ্রুপিং থেকে বেরিয়ে আসার অধিকারসহ শক্তিশালী প্রদেশ ও দুর্বল কেন্দ্রের অখণ্ড ভারত ফেডারেশন। লীগ-কংগ্রেসের কল্যাণে তা সম্ভব হয়নি।

কাজেই বাংলাভাগের দোষ বা দায় কংগ্রেস বা অমুসলমান বাঙালির ওপর চাপানো যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষ তখন এমন পর্যায়ে ছিল যে পরস্পরের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাসের সামান্য জায়গাটুকুও শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান যেমন হিন্দুর জন্য আতঙ্ক, অখণ্ড ভারত তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুশাসন মুসলমানের পক্ষে তেমনই অগ্রহণযোগ্য। এ অবস্থায় নিরাপত্তার বাস্তব নিশ্চয়তা ছাড়া কোনো প্রস্তাবে নিশ্চিত হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিভাগোত্তর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা (দুই ভূখণ্ডেই) তা প্রমাণ করেছে। জিন্না-নেহরুর নিরাপত্তা গ্যারান্টি ধোপে টেকেনি।

মানতেই হবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের নয়, প্রধানত আমলাতন্ত্রেরই জয়। সব পরিকল্পনার মৃত্যু ঘটিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস', সবার ওপরে নেহরু-প্যাটেলের তাতে পূর্ণ আস্থা। সাম্প্রদায়িক শান্তির যে আশ্বাস তাতে ছিল তা তাৎক্ষণিক তো নয়ই, পরবর্তী সময়ের জন্যও অবাস্তব প্রমাণিত হয়। রক্তে দেশ ভাসে। তার মধ্যেই নেহরুর ভাষ্যে 'নিয়তির সঙ্গে অভিসার' স্বাধীনতার। কিন্তু রোমান্টিকতা রাজনীতির জন্য সাজে না। তার ফলাফল প্রায়শ তেতো।

মাত্র দুই মাসাধিক সময়ের মস্তিষ্কচর্চা ও টাইপরাইটারের খটাখট। এপ্রিল-মে (১৯৪৭) দুমাসেই সব খতম। তিন বছরের কিছু অধিক সময়েও ভাইসরয় ওয়াভেল যা পারেননি, ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন সেই মূল কাজটি দুমাসে, এবং তার বাস্তবায়ন শেষ করেন মোট সাড়ে চার মাসে (১৯৪৭-আগস্ট)। 'ডোমিনিয়ন মর্যাদা'র যে স্বশাসনের গার্হস্থ্য প্রস্তাব ১৬ মে (১৯৪৭) ভিপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেননের খসড়ামাফিক তৈরি তা সব পক্ষের সমর্থন পেতে মোটেই দেরি হয়নি। মনে হয় তারা সবাই তৈরি হয়ে বসেছিলেন কত তাড়াতাড়ি ভোগের অমৃত পরিবেশন করা হবে। নেহরু সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবের পক্ষে লিখিত সম্মতি জানান। জিন্না তার স্বভাববৈশিষ্ট্যমাফিক মৌখিক সম্মতি দেন, লিখিত কিছু নয়।

উৎফুল্ল মাউন্টব্যাটেনের ১৮ মে মেননকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডন অভিমুখে যাত্রা। লন্ডনে অ্যাটলি মন্ত্রিসভা ও কমন্স সভায় ভারতত্যাগ ও ভারতবিভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা এবং তা গ্রহণ এবং ৩১ মে (১৯৪৭)। আত্মতৃপ্ত ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের দিল্লি প্রত্যাবর্তন। ইতিমধ্যে জিন্নার আরেক বাগড়া, দুই পাকিস্তানের সংযোগ সেতু 'করিডোর' চাই। কিন্তু সে দাবি শেষ পর্যন্ত টেকেনি। বড় কথা হলো ক্ষমতার জন্য তখন সবাই ব্যাকুল, অস্থির। কাজেই প্রস্তাব গ্রহণে দেরি হয়নি। কংগ্রেস ও শিখ প্রতিনিধির কাছ থেকে লিখিত ও লীগ প্রতিনিধি জিন্নার মৌখিক সম্মতি আদায় করে ৩ জুন (১৯৪৭) সকালে মাউন্টব্যাটেন সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বৈঠকে বসেন এবং সেদিন সন্ধ্যায় সে খবর দেশবাসীর উদ্দেশে প্রচার করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর হবে ১৯৪৮ জুনের পরিবর্তে ১৫ আগস্ট (১৯৪৭)। লন্ডন থেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিও একই ঘোষণা প্রচার করেন। ইংরেজ শাসন থেকে ভারতের মুক্তির ভবিতব্য এভাবে নির্ধারিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙনের প্রতিক্রিয়ায় বিপন্ন দেশ

ভাইরসয় ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারতবিভাগ ও ভারতত্যাগের জুন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে উৎফুল্ল ভিপি মেনন লিখেছেন, 'প্রগতিশীল বিশ্বমতামত জুন ঘোষণাকে সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছে। খ্যাতনামা মার্কিনি সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান ওয়াশিংটন পোস্ট-এ প্রকাশিত মন্তব্য-প্রতিবেদনে অ্যাটলি ও মাউন্টব্যাটেনের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতার প্রশংসা করেছেন' (পৃ. ৩৮৩)। কিন্তু এর নেপথ্য ভয়াবহতা সম্বন্ধে বোধহয় সাংবাদিক মহোদয়ের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। ঘোষণার আপাত সদর্থক দিকটাই সবার বিবেচনায় প্রাধান্য পেয়েছিল।

ব্রিটিশরাজের লক্ষ্য ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারতত্যাগ করা যাতে ভারতে ব্রিটেনের শিল্প-বাণিজ্য স্বার্থের কোনো ক্ষতি না হয়। সেজন্যই ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক পদক্ষেপের স্বীকৃতি তাদের খাতায় লেখা হয়, আর মন্দ যা কিছু তার দায় ভারতীয় রাজনীতিকদের কাঁধে বর্তায়। তাই তাদের ভয় সাম্প্রদায়িকতার দানব (যা তাদের দানা-পানিতেও লালিত-পালিত) সব হিসাব যেন ভুণ্ডুল করে না দেয়।

এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার ঘোষ ভিন্ন তথ্য যোগ করেছেন এই বলে যে, একই সঙ্গে 'কমিউনিজমের আতঙ্কও তাদের ছিল।' ক্ষমতা হস্তান্তরে বেশি দেরি হলে গৃহযুদ্ধেরই নয়, হয়তো কোনো অবাঞ্ছিত শক্তির হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে চলে যেতে হতে পারে। কিন্তু এ ভয় নিতান্তই অমূলক ছিল। কারণ ভারতে সমাজবাদী রাজনীতি তখন তো নয়ই এখনো সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তেমন শক্তি অর্জন করতে পারেনি। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অঙ্গনে সম্প্রদায়বাদী শক্তিই প্রবল ও আত্মঘাতী। লক্ষ্য পছন্দসইভাবে ক্ষমতার রশি মুঠোয় নেয়া।

সুনীতিকুমার মনে করেন মাউন্টব্যাটেন যে পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা ঘোষণা এবং সিরিল র‍্যাডক্লিফকে দিয়ে বিভক্ত অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণের সময় ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেই অদূরদর্শিতাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঞ্জাবে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মূল কারণ। তিনি আরো লিখেছেন, নেহরু ও জিন্নার ক্ষমতা হাতে পাওয়ার তাড়াহুড়ো এবং লাখ লাখ মানুষের জীবনের প্রতি উন্নাসিক অবহেলাও এর কারণ (ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭-৩১০)।

আসলে রাজের পক্ষে প্রশাসনিক অবহেলা ও রাজনীতিকদের ক্ষমতার লোভ ও অপরিণামদর্শিতা উল্লিখিত বিপর্যয়ের মূল কারণ। মনে রাখতে হবে পাঞ্জাব হিংস্রতার সূচনা জুন ঘোষণার আরো আগে, তেমনি সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সন্ত্রাস শুরু। লক্ষ্য ক্ষমতা দখল। প্রাদেশিক রাজধানী লাহোরের রাজপথ থেকে বিশেষ বিশেষ শহরে ও স্থানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এতটা তীব্র হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত অস্থির মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াত খান পদত্যাগ করেন সহিংসতা বন্ধ করতে (৩ মার্চ, ১৯৪৭)।

লড়াকু রাজনৈতিক নেতাদের উত্তেজক বক্তৃতা, উন্মত্ত জনতার নর-নারী হত্যা, বাড়িঘর, দোকানপাট এমনকি মানুষজনও পুড়িয়ে ছাই করার মতো নৃশংসতা অবিশ্বাস্য রূপ ধারণ করেছিল। বিশেষ করে লাহোর, অমৃতসর, রাওয়ালপিন্ডি ও আরো বিভিন্ন স্থানে এমনকি গ্রামাঞ্চলে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি। বিপর্যয়ের আঘাত প্রধানত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই বহন করতে হয়। কারণ আর কিছু নয়, পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন ও শাসনযন্ত্র দখল। তবে জিন্নার সে আশা পূরণ হয়নি। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার প্রয়োজনে গভর্নর ইভান জেনকিন্স ৯৩ ধারাবলে ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন।

ব্যাপক সহিংসতা বন্ধ হলেও বিক্ষিপ্ত ঘটনা চলতে থাকে। যেমন শহরে, তেমনি গ্রামাঞ্চলে। এর দায় অবশ্যই মুসলিম লীগের। এ সময় ১৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত গভর্নরদের বৈঠকে পাঞ্জাবের গভর্নর ভাইসরয়কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, পাঞ্জাব যদি বিভক্ত হয় তাহলে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে চার ডিভিশন সৈন্য দরকার হবে (হডসন, পৃ. ২৭৩)। জবাবে ভাইসরয় বলেন, দলীয় নেতাদের সাহায্য নিয়ে এর সমাধান করা হবে।

যত সহজে গুরুতর একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন ভাইসরয়, সমাধান মোটেই তেমন সহজ ছিল না। ইতিমধ্যেই দিল্লি, কলকাতা ও নানা স্থানে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। কারণ সম্ভবত ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা এবং নেতাদের দায়িত্বহীন বিবৃতি ও সংবাদপত্রের একই রকম ভূমিকা। সেকালের ঘটনাদৃষ্টে মনে হয় দুষ্ট সাংবাদিকতা রক্তাক্ত হাঙ্গামার সূচনায় যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। তাই দরকার ছিল কঠোর পূর্বব্যবস্থাপনা ও নিরপেক্ষ তৎপরতা। সেটা বিঘ্নিত হয়েছে শৃঙ্খলারক্ষক বাহিনীর সদস্য কারো কারো সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে। একমাত্র ভরসা সেনাবাহিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্ষেত্রে ভাইসরয় ও প্রশাসনের নানা অজুহাত গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তাই পাঞ্জাবে হত্যা ও নারী নির্যাতনের মহোৎসব শুরু হয়ে যায়, উপলক্ষ যত ছোটই হোক। প্রয়াত পাঞ্জাবি মুখ্যমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খানের মন্তব্য এত তাড়াতাড়ি ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়াবহ বাস্তবতা নিয়ে দেখা দেবে তেমন ভাবনা বক্তা বা শ্রোতা পেন্ডেরেল মুন কারোর ধারণায়ই হয়তো ছিল না। দুর্বোধ্য কারণে প্রশাসন সেনাবাহিনী ব্যবহারে আগ্রহ দেখায়নি। এটা কি বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? অবস্থার ভয়াবহতা দেখে ২৩ জুন জিন্নার অনুরোধ লাহোর ও অমৃতসরে সহিংসতা বন্ধ করতে চরম কঠোরতা অবলম্বনের জন্য। পরদিন নেহরুর একই কথা। তিনি শহরগুলোর নিরাপত্তা সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়ার পরামর্শ দেন। প্রয়োজনে সামরিক আইন জারি (হডসন)। অর্থাৎ যে দানব রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তৈরি ও ব্রিটিশ ভেদনীতিতে পরিপুষ্ট তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অন্তত নেতাদের ছিল না।

অন্যদিকে কৌশলগত কারণ দেখিয়ে, সামরিক বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কমান্ডাররা 'মার্শাল ল' জারি তথা চরম ব্যবস্থা নেয়ার বিপক্ষে গভর্নরকে পরামর্শ দেন। প্রশাসনের এ জাতীয় আচরণে ক্ষুব্ধ লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। কিন্তু ঘটনার সূত্রপাত তো প্রতিক্ষেত্রে তাদের অনুসারীদের হাত দিয়ে, কখনো তাদের কোনো অর্বাচীন নেতার উত্তেজক বিবৃতিতে। হডসনের মতে, জুন ঘোষণার পর জুলাই হাঙ্গামা শিখদের হাত দিয়ে শুরু হলেও এর আগে রাওয়ালপিন্ডিতে তারা মুসলমানদের হাতে ভয়াবহ আক্রমণের শিকার। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ জনতাকে শান্ত করতে কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

শিখদের প্রচণ্ড উদ্বেগ সীমানা কমিশনের কর্মকাণ্ড নিয়ে। শিখ নেতাদের বক্তব্য-বিবৃতিও ছিল রীতিমতো উত্তেজক। কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্য বলদেব সিং থেকে জ্ঞানী কর্তার সিং, কারো বক্তব্যে সংযমের লেশমাত্র ছিল না। এমনকি মাস্টার তারা সিংয়েরও নয়। এসব কিছুর মূলে পাঞ্জাব ভাগ এবং তাতে শিখদেরই সর্বাধিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সেজন্য তারা নাশকতামূলক তৎপরতারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

পাঞ্জাবকাণ্ডের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের অভিযোগ ছিল শ্বেতাঙ্গ প্রশাসনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে গভর্নর জেনকিন্স ঘটনার জন্য দায়ী ও অভিযুক্ত করেন লীগ, কংগ্রেস ও আকালি (শিখ) দলের নেতাদের, তাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎপরতার জন্য। অভিযুক্তদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় সরদার বলদেব সিং, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, লিয়াকত আলী খান, গজনফর আলী খান প্রমুখ ব্যক্তির নাম। সাংগঠনিকভাবে এদের তিনটি দলকেও সহিংসতার জন্য দায়ী করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভর্নর জেনকিন্সের প্রতিবেদন বিশ্বাস করলে বলতে হয় ঘটনা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। মোট ৫ হাজার নিহত, তার মধ্যে ৩৮০০ অমুসলমান অর্থাৎ হিন্দু ও শিখ, বাকি ১২০০ মুসলমান। গুরুতর আহত ৩ হাজার। এদের মধ্যে মুসলমান বনাম অমুসলমানের অদ্ভুত সংখ্যাসাম্য। ঘড়ির কাঁটা যতই ১৫ আগস্টের দিকে এগিয়েছে, পরিস্থিতি ততই অবনতির দিকে দ্রুত গড়িয়েছে। ক্ষুব্ধ শিখরা অমৃতসরকে কেন্দ্র করে যে সশস্ত্র লেঠেল বাহিনী গঠন করে তাদের কাজ ছিল প্রতিরাতে কিছুসংখ্যক নিরপরাধ মুসলমান গ্রামে হামলা।

হডসনের বিবরণ মতে, পার্টিশন কাউন্সিলের পরামর্শমাফিক পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে পয়লা আগস্ট (১৯৪৭) বিশেষ সামরিক কমান্ড গঠন করা হয় (নাম 'পাঞ্জাব সীমানা বাহিনী')। মেজর জেনারেল রিজ এর প্রধান। এদের কাজ শুরু হতে হতে কাটাকুটির মধ্যেই ১৫ আগস্ট এসে যায়। এরপর এই বাহিনী নিয়ে দুপক্ষের প্রবল আপত্তি দেখা দেয়। আশ্চর্য যে ভারতবর্ষ-বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বীভৎস সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বন্ধ করতে পারেনি।

পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয় এবং তা তিন পক্ষেই। খাজা আহমদ আব্বাস, কৃষাণ চন্দর প্রমুখের লেখা অসাধারণ দাঙ্গাগল্প ও সাদাত হাসান মান্টোর অনুরূপ বিভাজনবিরোধী ছোটগল্প 'টোবাটেক সিং' এবং ফয়েজ আহমদ ফয়েজ প্রমুখের কবিতা আমাদের সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদ মানসিকতার অপর দিক তুলে ধরে। যদিও সমাজের অধিকাংশ দূষিত হয়ে যায় সম্প্রদায় রাজনীতির পাকেচক্রে।

এ দূষণ এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে তখন কোনো সম্প্রদায়েরই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আর মানুষ ছিল না। তারা আত্যন্তিকভাবে হয় হিন্দু না হয় মুসলমান বা শিখ। জেনারেল রিজ সহিংসতার যে ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন তা পাঠ করে সুস্থ থাকা কঠিন। শুধু পুরুষ, নারী, শিশু খুন করে এরা সন্তুষ্ট থাকেনি, মানবদেহের প্রতি বিন্দুমাত্র মানবিক শ্রদ্ধা বা মমত্ববোধ তাদের ছিল না। হিংসা ও প্রতিহিংসা এমন উন্মত্ততার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। এ পরিস্থিতি, সন্দেহ নেই রাজনৈতিক নেতাদের দান। তবে 'জনমানসে হত্যা ও ঘৃণার এ বন্য উন্মত্ততা সামরিক তৎপরতার সাহায্য প্রতিহত করা যেত না' (পৃ. ৩৪৫) এমন ধারণা কি যুক্তিসঙ্গত?

দুই

ভারতবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর পর্বের আগে একই সময়ে ও অব্যবহিত পরে মানবতাবিরোধী গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও নারী নির্যাতনের যে বীভৎস ইতিহাস রচিত হয়েছিল, বিশেষ করে ১৯৪৬-৪৭-এ তার তুলনা বিরল। বলার অপেক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখে না যে, ভারতীয় রাজনীতিকদের পাশাপাশি শাসক ব্রিটিশরাজও এর জন্য দায়ী। ভাঙনের শেষ পর্বে এর ভয়াবহতা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে, সীমান্তে এবং বিহারসহ ভারতের একাধিক প্রদেশে, শহরে-নগরে, কখনো গ্রামাঞ্চলে।

ইতিহাস-লেখক অনেকে এই 'মানবিক ট্র্যাজেডি'র জন্য ভাইসরয়দের, বিশেষ করে শেষ পর্বে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনকে দায়ী করেছেন। সম্প্রতি প্রবীণ সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার তার আত্মজীবনীতে একই কথা বলেছেন এমন মন্তব্যে 'যেখানেই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছে সেখানেই দেখা গেছে রক্তপাত।' অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য এটুকু মাসুল দিতেই হয়েছে। যে দ্রুততার সঙ্গে ভাইসরয়ের কাজ শেষ করার তাগিদ তার ফলে সৃষ্ট আতঙ্ক, অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তা এ জন্য দায়ী।

সুনীতিকুমারসহ আরো কেউ কেউ এমন ধারণার সঙ্গে একমত হলেও হডসন যেন পুরোপুরি তাতে সায় দেন না। তবে কুলদীপ নায়ার (যিনি একজন মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ পাঞ্জাবি) স্পষ্ট ভাষায়ই এই নারকীয় তাণ্ডব রোধ করতে না পারার জন্য ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনকে দায়ী করেছেন 'তিনি কথা রাখেননি' এমন অভিযোগ তুলে। ভাইসরয় মাওলানা আজাদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানে তিনি সশস্ত্র পুলিশ, প্রয়োজনে স্থলসেনা, বায়ুসেনা, ট্যাঙ্ক কিংবা বায়ুযান ব্যবহার করার নির্দেশ দেবেন। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি কাজ করেন নি (পৃ. ৫৮)।

কুলদীপ নায়ার আরো প্রশ্ন তুলেছেন, 'সীমানা বাহিনী'র প্রতিবেদনে যেখানে নারকীয় উন্মত্ততার প্রকাশ স্পষ্ট, সেক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সে বাহিনী কেন কঠোর হাতে নিরপরাধ মানুষ হত্যা বন্ধ করতে তৎপর হয়নি। তার ভাষায় দায়িত্ব পালনে এ অবহেলার ব্যাখ্যা মেলে না। এমনকি ১৪ আগস্ট সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক লাহোরে গিয়ে জেনারেল রিজ ও গভর্নর জেনকিন্সের সঙ্গে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পরও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তাদের কাছে খুঁটিনাটি সমস্যা মানুষের প্রাণের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। তাদের কি উদ্দেশ্য ছিল বিভক্ত ভারতের দুদেশের মধ্যে, জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ-বিরূপতা চিরস্থায়ী হয়ে থাকুক এবং সবই তাদের স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থে।

শুধু গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞেই দেশভাগের উপসর্গ সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সঙ্গে বড় একটি বিপর্যয় বাস্তুত্যাগ-অবিশ্বাস্য উদ্বাস্তু মিছিল ছিন্নমূল মানুষের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে থাকবে কিছুই জানা নেই। শরণার্থী শিবির? শুরুতে এর দুরবস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই জানা। এ বিষয় নিয়ে মানবিক সাহিত্যের পরিমাণ খুব কম নয়। এ যাত্রা, এ কাফেলা শুরু হয় ৩ জুনের ঘোষণার পর থেকে। পাঞ্জাবেই নয়, বঙ্গে, বিহারে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনা অনেকাংশে দায়ী। একথা হডসন যদিও বলেছেন পাঞ্জাব সম্পর্কে, কিন্তু অংশত এটা সত্য বাংলাদেশ (পূর্ববঙ্গ) সম্পর্কেও। তবে প্রধানত পাকিস্তান আতঙ্ক, মুসলিম শাসনের ভয় ও অনিশ্চয়তাই সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগের কারণ।

ভারতভাগ যেমন ধর্মের ভিত্তিতে, পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশভাগও সেই একই ভিত্তিতে, বিভক্ত স্বাধীনতা নিয়ে খুশি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, খুশি সাধারণ মানুষও। সাধারণ মানুষের খুশি হওয়ার কারণ বিদেশি শাসনের অবসান, নেতাদের আনন্দ ক্ষমতা হাতে পাওয়ার কারণে। স্বাধীন বাংলা নিয়ে কিছুটা দেনদরবার চলে সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায়ের চেষ্টায়। কিন্তু নেহরুর কঠিন বিরোধিতা ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনমতের আপত্তির কারণে এ প্রচেষ্টা হালে পানি পায়নি। বিষয়টা পরে বিবেচ্য।

বিভক্ত না হয়েও ভারতবিভাগের কারণে রাজনৈতিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। স্বাধীনতাপ্রিয়, স্বাতন্ত্র্যবাদী সীমান্ত প্রদেশের পাঠান জনগোষ্ঠী মূলত খান ভ্রাতাদের রাজনীতির টানে তাদের প্রতি সমর্থন জোগায়। কংগ্রেস সমর্থন নিয়ে খান সাহেব ১৯৩৭ থেকে মন্ত্রিসভা গঠন করে শাসন কাজ চালিয়ে এসেছেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসেবে তাদের রাজনৈতিক পরিচয়। জিন্না অনেক চেষ্টা করে, এমনকি ১৯৪৬-৪৭ সালে আইন অমান্য আন্দোলন করেও পাঞ্জাবের মতো সীমান্ত মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে পারেননি।

কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের কল্যাণে ও কংগ্রেসের ভারতবিভাগ এবং পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়ার কারণে খানভাইদের (খুদাই খিদমতগার/লালকুর্তা) সেক্যুলার রাজনীতি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে প্রবল আপত্তি জানান দুই ভাই খান সাহেব ও আবদুল গাফফার খান। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। বাদশা খানের আপত্তির কথাটি বিভিন্ন জনের লেখায় একাধিকভাবে এসেছে। যেমন কংগ্রেস দেশবিভাগ মেনে নিয়ে জাতীয়তাবাদী পাঠানদের নেকড়ের মুখে ফেলে দিয়েছে (ঘোষ, সরকার)। অন্যদিকে কুলদীপ নায়ার লিখেছেন কংগ্রেস বৈঠকে বাদশা খানের মিনতি : দেশভাগ মানার অর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সর্বনাশ ('হাম তাবা হো গেয়ে')। তার প্রশ্ন : 'শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান গঠনের জন্যই কি আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম?'

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে তখন শাসন-আসন-কর্তৃত্ব অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য। তাই পাঞ্জাবি (শিখ হিন্দু) বা বাঙালি বা পাঠানদের স্বদেশভূমির দাবি নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেসির চিত্তে কোনো দাগ কাটেনি। দাগ কাটেনি ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের বিবেচনাতেও। গাফফার খানের স্বাধীন 'পাখতুনিস্তানের' দাবিও ভাইসরয় নাকচ করে দেন তার ভারতবিভাগ পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিহীন এমন এক যুক্তিতে। বরং তাদের ওপর চাপিয়ে দেন জনমত যাচাই : 'ভারত না পাকিস্তান' কোন ডোমিনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হবেন সীমান্তের পাঠানগণ। এই সুযোগে মুসলিম লীগের ব্যাপক প্রচার : 'হিন্দুস্তান না পাকিস্তান'– কাকে বেছে নেবে পাঠানগণ। প্রবল ধর্মীয় প্রচারণার মুখে লালকুর্তা দল গণভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপস্থিত প্রায় ৫০ শতাংশ পাঠান ভোটারদের অধিকাংশ পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন জানায়। ধর্মীয় প্রচারণার এমনই মহিমা। তবে এখানে অন্য সমস্যাও ছিল।

যেমন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, তেমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ। খান ভাইদের পছন্দ করতেন না ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন। তাই সীমান্তের গভর্নরের বিরুদ্ধে একদেশদর্শিতার অভিযোগ সত্ত্বেও ভাইসরয় তার প্রিয়পাত্রকে সরিয়ে আনেননি। তবে সীমান্ত প্রদেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অশান্তি (মুসলিম লীগের সৃষ্ট) এবং ভবিষ্যৎ গণভোটের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লে. জেনারেল রীজ লকহার্টকে স্যার ওলাফের স্থলভিষিক্ত করেন। প্রকাশ্য যুক্তি গণভোট যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। হডসন এ প্রসঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করেছেন।

তবে হয়তো ইতিহাসের স্বার্থে উল্লেখ করতে ভোলেননি পেশোয়ারে অবস্থানকালে মধ্যরাতে তাকে জিন্নার হুমকির কথা। তার এক লাখ প্রতিবাদী অনুসারীর মিছিল করে পেশোয়ার গভর্নমেন্ট হাউস ঘেরাও করার হুমকি। ভাইসরয় ভয় না পেলেও এ ঘটনা নিশ্চয়ই জিন্নার ক্ষমতা সম্পর্কে তাকে প্রভাবিত করে থাকবে। তিনি তাদের দুজন প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন। এমনকি তিনি তাদের এবং মুসলিম লীগ নেতাদের আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, তার ওপর 'তারা আস্থা' রাখতে পারেন। যেমন রেখেছেন তাদের নেতা জিন্না।

নেহরু-কংগ্রেসের আস্থাভাজন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন স্পষ্টতই দ্বিমুখী খেলায় ক্ষেত্রবিশেষে জিন্নারও আস্থাভাজন হয়েছেন। বিশেষ করে ভৌগোলিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে তার ভিন্নযাত্রায়। সম্ভবত এর কারণ একদিকে আফগানিস্তানকে নীতিগতভাবে দূরে সরিয়ে রাখা এবং সে কারণেই স্বাধীন পাখতুনিস্তান দাবি অগ্রাহ্য করা ও ধর্মীয় চেতনার মুসলিম লীগ রাজনীতির মাধ্যমে এ অঞ্চলকে বলশেভিক স্পর্শ থেকে দূরে রাখা। এ বিষয়ে ভাইসরয় সম্ভবত নিরপেক্ষ ছিলেন না। সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। গণভোটের ঘটনাবলি থেকেও তেমন প্রমাণ মেলে।

তিন

ঘটনা স্পষ্টই বলে দেয় মাউন্টব্যাটেন জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত ভাগ করেছিলেন। অবশ্য একই নীতিতে বঙ্গ ও পাঞ্জাব ভাগ করেন জিন্নার আপত্তি সত্ত্বেও। উদ্দেশ্য কংগ্রেসের সামান্য ক্ষতিপূরণ। কিন্তু প্রশ্ন থাকে কংগ্রেস বরাবর ধর্মভিত্তিক বিভাজনের নীতিগত বিরোধী হয়েও কেন শেষ পর্যন্ত ওই পথে পা বাড়াল, অখণ্ড ভারতের দাবি ছেড়ে দিয়ে। এমনকি প্যাটেলদের মতো রক্ষণশীল সনাতনপন্থীরাও একই হাতির পিঠে সওয়ার। ইতিহাস লেখকদের মতে, জিন্নার অনড় পাকিস্তান দাবির বিপরীতে শাসক সমর্থনের বাইরে তাদের জন্য আর কোনো বিকল্প ছিল না। খণ্ডিত ভারতেও শক্তিশালী কেন্দ্র, দুর্বল প্রদেশ ইত্যাদি ছিল তাদের জন্য বিশেষ প্রাপ্তি। বিড়লা প্রমুখ মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদেরও ছিল এমনই এক বিভক্ত ভারতের দাবি। উঠতি মুসলিম পুঁজিপতিদের দূরে সরিয়ে শিল্প বাণিজ্যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। কংগ্রেস-পুঁজিপতি-ব্রিটিশরাজ এই তিন ক্ষেত্রে পরস্পর-নির্ভর শক্তি। এদের সঙ্গে হাত মিলায় সাম্রাজ্যবাদী আমলা-বুদ্ধিজীবী।

এবার সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে কথা পূর্ব প্রসঙ্গে। হডসন এ বিষয়ে খুব ভালো রকম সাফাই গেয়েছেন একদিকে মাউন্টব্যাটেন অন্যদিকে জিন্না ও মুসলিম লীগের পক্ষে, নেপথ্যে পাঠানদের ধর্মনিষ্ঠা নিয়ে। সীমান্তের পাঠানরা যদি অন্ধ ধর্মনিষ্ঠই হবেন তাহলে দুদুটো নির্বাচনে (১৯৩৭, ১৯৪৬) গাফফার খানের দল জেতে কীভাবে? বিশেষ করে ১৯৪৬ সালের পাকিস্তান ইস্যুর জোয়ারি হাওয়ার মুখে, যখন পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি লীগ হামলায় ঘায়েল? তাই ঘটনার ভেতরে যেতে হয় রহস্য বুঝতে। কেন গণভোট, কেন বিশেষ জিন্নাপ্রীতি, কীভাবে লালকুর্তাদের পিছু হটানো যাবে ইত্যাদি নিয়ে।

এ বিষয়ে ওয়ালি খানের গবেষণামূলকহ গ্রন্থ 'ফ্যাক্টস আর ফ্যাক্টস' কিছুটা সাহায্যে আসবে। লন্ডনের বিখ্যাত ইন্ডিয়া অফিসের মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির ওপর নির্ভর করে লেখা এ বইয়ের তথ্যাদির ওপর নির্ভর করা চলে। আগেই বলেছি সীমান্ত প্রদেশের ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথগুলো চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হওয়ায় সীমান্ত প্রদেশের রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব অধিক। বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসকদের বলশেভিক-আতঙ্কের কারণে।

উত্তর-পশ্চিমের গোটা বলয়টি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল বলে এদিককার রাষ্ট্রনৈতিক তাত্ত্বিক পাহারা জোরদার করতে ইসলাম ও মুসলিম লীগ এই দুয়ের প্রয়োজন হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের। রাজনৈতিক বিবেচনায় এ অঞ্চলে ব্যতিক্রমী ধারা পাঞ্জাবের সেক্যুলার ইউনিয়নিস্ট পার্টি এবং সীমান্তের খুদাই খিদমতগাররা। নাম থেকে বোঝা যায় এরা ধর্মহীন নন, বরং আল্লাহর নিষ্ঠাবান সেবক। কিন্তু বাদশা খানের ধর্মীয় বিদ্বেষহীন চেতনার অনুসারী। সেই সঙ্গে দাসত্বহীনতায়ও বিশ্বাসী।

এদের বাগে আনতে না পারলে দরকার পড়বে ষড়যন্ত্র ও চতুর রাজনৈতিক খেলার। এ চেষ্টাই বরাবর করে গেছে ব্রিটিশ শাসন। সব সময় যে সফল হয়েছে তা নয়। নির্বাচনগুলো তার প্রমাণ। মন্ত্রীমিশনের গ্রুপিংও পাখতুনদের পছন্দসই ছিল না। পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়া মানে শক্তিমান পাঞ্জাবি শাসনে থাকা যা স্বাধীনতাপ্রিয় পাঠান বা বালুচরা চায়নি। তাই জুন-ঘোষণা বা ভারতবিভাগের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় সীমান্তের পাঠান। পাকিস্তান মানে পাঞ্জাবি শাসন। বিষয়টি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, কংগ্রেস-প্রীতির দিক থেকে নয়। পাঠানদের পাকিস্তানবিরোধিতার মূল কারণ পাঞ্জাবি শাসনের আশঙ্কা।

কংগ্রেস তরফে মাউন্টব্যাটেনের ভারতভাগ ও পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ গাফফার খানদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়েছে। কারণ এ প্রস্তাব গ্রহণের অর্থ সীমান্তের পাঠানদের মুসলিম লীগ, বিশেষ করে জিন্নার প্রতিশোধ স্পৃহার মুখে ঠেলে দেয়া। কংগ্রেস আত্মস্বার্থে এ কাজটিই করেছিল। ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, পাকিস্তান সম্বন্ধে পাখতুনদের ভয় অমূলক ছিল না। খান সাহেব, বিশেষত বাদশা খান, ওয়ালি খান প্রমুখের পীড়িত রাজনৈতিক জীবন তার প্রমাণ।

তাই নতুন করে একমাত্র সীমান্ত প্রদেশে গণভোট এরা মেনে নিতে পারেনি। বিশেষত যখন জুন-প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য তা পাঞ্জাব, বঙ্গ ও সিন্ধু প্রদেশগুলোতে পাঠানো হলো তখন সীমান্ত প্রদেশ বাদ কেন? তাদের কী ভয় ছিল সীমান্ত ব্যবস্থাপক পরিষদ (অ্যাসেম্বলি) প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে? তাই তাদের প্রস্তাব নিশ্চিত করতে ভিন্ন কৌশল– গণভোট? তাও আবার লীগের ধর্মভিত্তিক স্লোগান সামনে রেখে– হিন্দুস্তান না পাকিস্তান? ধর্মীয় চেতনা উস্কে দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই পরিণাম নিশ্চিত জেনে বাদশা খানের দল গণভোট প্রত্যাখ্যান করে। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ ব্যাপক প্রচারের আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন প্রদেশ এমনকি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের আনা হয়। সেই সঙ্গে চলে ব্যাপক ভোট জালিয়াতি। এ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন ওয়ালি খান তার বইতে। তার মধ্যে একটি ঘটনা তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার মির্জার বরাত দিয়ে (ওয়ালি খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০)।

সরকারি আমলা ও লীগ কর্মকর্তাদের অক্লান্ত শ্রমে গৃহীত গণভোটের ফল : মোট ভোটারদের ৫০ শতাংশ হাজির, তার অধিকাংশ পাকিস্তানের পক্ষে (২,৮৯,২৪৪)। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো দুর্গম ছয় এজেন্সি ও উপজাতীয় এলাকা গণভোটে বাদ দেয়া হয়। সীমান্তের মোট জনসংখ্যা ৭০ লাখ (ওয়ালি খান)। সে হিসাবে প্রায় ৩ লাখের মতো গৃহীত ভোট সিদ্ধান্তের পক্ষে যায় না। এ সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ৩৫ লাখের কিছু বেশি। কিন্তু ব্রিটিশ ও জিন্নাচাতুর্য মিলে মস্ত এক রাজনৈতিক জালিয়াতি সম্পন্ন করে।

চার

ভারতভাগ ও ভারতত্যাগের পরিকল্পনা নির্ধারিত ১৯৪৮ জুন থেকে ১৯৪৭ আগস্টে এগিয়ে আনা এবং অস্বাভাবিক দ্রুততায় কাজ শেষ করায় রাজনৈতিক নেতারা খুশি, পরিতৃপ্ত মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষক অনেকেরই বিশ্বাস অস্বাভাবিক পদ্ধতির কারণে দেশ রক্তে ভেসেছে। বিশেষত র‍্যাডক্লিফ সাহেবের সীমানা কমিশনের উদ্ভট, অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে। অবশ্য ভাইসরয়ের এ কৃতিত্বে প্রশংসাবাণী ছড়িয়েছেন কেউ কেউ, যেমন ভিপি মেনন বা এইচভি হডসন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ্য ছিল দেশবিভাগ ও প্রদেশ বিভাগের দায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, তাদের দল ও পরোক্ষে ভোটার জনতার ওপর চাপিয়ে দেয়া।

AMARBOI.COM

তাই তাদের তৈরি প্রস্তাব অনুমোদন তথা অনুসমর্থনের জন্য প্রদেশের প্রতিনিধি সভায় (অ্যাসেম্বলিতে) পাঠানো হয়। বঙ্গে তিন ভাগে পরিস্ফুট ফলাফলে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট তিনভাগেই সংখ্যা হিসাবে কম নয় (যেমন– যুক্তবঙ্গে ১২৬ ভোটের বিরুদ্ধে ৯০ ভোট কিংবা পশ্চিমবঙ্গে ৫৮ ভোটের বিরুদ্ধে ২১ ভোট, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে ১০৬ ভোটের বিরুদ্ধে ৩৬ ভোট)। সিদ্ধান্ত একাট্টা ছিল না বিভক্ত বঙ্গ বা যুক্তবঙ্গ কিংবা ভারত-পাকিস্তান নিয়ে। একই ঘটনা পাঞ্জাবে। চাতুরীর বিষয় হলো বিভাজনের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের অর্থাৎ 'না'-ভোটের সুযোগ না রাখা। একই বিষয় দেখা গেছে সীমান্ত প্রদেশের ক্ষেত্রে। গোটা বিষয়টিই ছিল জোড়াতালি বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোঁজামিলের। বলা যায়, কাঁঠালের আমসত্ত্ব। একে কি গণতন্ত্রসম্মত প্রক্রিয়া বলা চলে যেখানে 'হ্যাঁ' বলার অধিকার আছে, 'না' বলার অধিকার নেই।

তবে সর্বনাশা জগাখিচুড়ি কাণ্ড ঘটে র‍্যাডক্লিফের সীমানা কমিশনের কর্মযজ্ঞে। যার ফল পাঞ্জাবে গণহত্যাসহ ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। কুলদীপ নায়ারের মতেও এর কারণ প্রশাসনের অস্বাভাবিক দ্রুততা যে জন্য আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা থেকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্ম। আমাদের বিশ্বাস : মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের উদ্বেগ বা চিন্তা ছিল না। কুলদীপ লিখেছেন, 'যেভাবে ভারতবিভাগ সম্পন্ন হয় তাতে আমি আতঙ্কিত হই'। তিনি বিশেষভাবে পাঞ্জাবের কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে বঙ্গেও ছিল একই ধরনের নৈরাজ্য। কারো উঠান, কারো জমির ওপর দিয়ে চলে গেছে র‍্যাডক্লিফের তীক্ষ্ণ তরবারি সীমারেখা চিহ্নিত করে।

ক্রটি আসলে মাউন্টব্যাটেনের। শেষ মুহূর্তে সীমানা কমিশন নিয়োগ এবং ভূমি জরিপ-টরিপ শিকেয় তুলে ঘরে বসে টেবিলে মানচিত্র বিছিয়ে দ্রুত কাটাকুটির দাগ টেনে যাওয়া। এমনটাই ছিল সীমানা কমিশনের কাজ। আর প্রবল সমালোচনার মুখে র‍্যাডক্লিফের মন্তব্য : 'এজন্য তার কোনো অনুতাপ নেই।' যদিও বিভাজিত অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে ব্যক্তির খেয়ালখুশিতে। অপ্রয়োজনীয় দ্রুততা, অবহেলা এবং সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য এ তিনটি শব্দ বিভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে মাউন্টব্যাটেনের ভারতবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরে।

গোটা বিষয়টি নিয়ে তাই অনেকের অনেক প্রশ্ন। বিভাজনকাণ্ডের নায়করা এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। যেমন প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির প্রথম ঘোষণামাফিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ ধীরেসুস্থে সবরকম ব্যবস্থা নিয়ে ১৯৪৮ জুনের মধ্যে সম্পন্ন করা হলে হয়তো বিপুল মানবিক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব ছিল। কী অসুবিধা ছিল নয় বা সাড়ে ৯ মাস দেরিতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটলে। সময়ের আগে ফোঁড় দেয়ার উদ্দেশ্য কি চমক সৃষ্টি, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল মাউন্টব্যাটেনের? অ্যাটলি মন্ত্রিসভা তো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল ভারত ছাড়তে।

উল্লিখিত এমন এক উদ্ভট-অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে রক্তস্রোতের নৌকায় চড়ে ভারত পাকিস্তান দুই ডোমিনিয়নের দুই বিপরীত দিকে যাত্রা। জন্মের তারিখও কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করা হয়– যথাক্রমে ১৫ এবং ১৪ আগস্ট (১৯৪৭) যদিও এ দায়িত্ব একদিনেই সম্পন্ন করেন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন। এরপর দেশি রাজ্যগুলোর নবাব-মহারাজদের ইচ্ছামাফিক ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের বাধ্যবাধকতা, স্বাধীন কোনো রাজ্যের সুযোগ না রেখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে ভারতবিভাগের মাধ্যমে ঠিকই ক্ষমতা হস্তান্তর করেন দুই প্রধান দলের নেতার হাতে। কিন্তু পেছনে রেখে গেলেন অনেক সমস্যা, অনেক উপসর্গ, অনেক জটিলতা আর পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন দুই স্বতন্ত্র ভূখণ্ড, যাদের জন্মোৎসব এক সময়ে হলেও 'সৌহার্দ্য' শব্দটি তাদের অভিধান থেকে নির্বাসিত। তাই হাতের গণ্ডা পাওয়ার পরই শুরু হয়ে যায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা– মূলত পাঞ্জাব থেকে, তারপর সর্বত্র। পরিণামে ছিন্নমূল মানুষের বিশাল কাফেলা চরম বিপর্যয় মাথায় নিয়ে। যেন এক অন্তহীন যাত্রা! স্বভাবতই প্রশ্ন : এ স্বাধীনতা, এ দেশভাগের সার্থকতা কোথায়?

এ সম্পর্কে ইংরেজ আমলা পেন্ডেরেল মুনও বিপরীত মন্তব্য করেছেন তার লেখা 'ডিভাইড অ্যান্ড কুইট' বইটিতে। তার সমালোচনা একাধিক ক্ষেত্রে। তবে মাউন্টব্যাটেনের সম্পর্কে তা খুবই স্পষ্ট : 'ভারতত্যাগের বিষয়ে মাউন্টব্যাটেন যে বিরাট কৃতিত্ব দাবি করেন তা ফাঁপা শোনায়।' এর বেশি একজন আমলা ভাইসরয় সম্পর্কে কিইবা বলতে পারেন? বলার কারণ মুন দীর্ঘদিন পাঞ্জাবে কাজ করেছেন। সিকান্দার হায়াতের সঙ্গে তার কথোপকথন স্মর্তব্য। অতিদ্রুততায় যথাযথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না নিয়ে দেশভাগ সম্পন্ন করার পরিণাম পাঞ্জাবের গণহত্যা, প্রতিক্রিয়ায় দেশের অন্যত্র নরহত্যা। কৃতিত্বের পেছনে বিরাট এ রক্তাক্ত অন্ধকার ছায়া। সুমিত সরকারও এসব বক্তব্যের সঙ্গে একমত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধি-জিন্না সমাচার

ভারতীয় রাজনীতির বিশ শতকী মঞ্চনাট্যে দুই প্রধান নায়ক এম. কে. জি. (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি) ও এম. এ. জে (মোহাম্মদ আলী জিন্না)। দেশবিভাগের ক্ষেত্রে জিন্না ও মুসলিম লীগ প্রধান ভূমিকা পালন করলেও সেক্ষেত্রে গান্ধি ও কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্বের দায় কম ছিল না। এর প্রেক্ষাপটে ছিল হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও পরিণামে বিচ্ছিন্নতা। নেপথ্যে তৃতীয় শক্তি ব্রিটিশ রাজের কূটকৌশলী চাতুর্য। পুনরুক্তি সত্ত্বেও এই ত্রয়ীর ভূমিকা উল্লেখ নানা প্রসঙ্গে অনিবার্য হয়ে ওঠে। এক সময় 'জি' 'জে' নিয়ে অনেক কথকতা দেখা গেছে, ইদানিং আলোচনায় এসেছেন আরেক 'জে' (জওহরলাল নেহরু)।

তবে সেক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনায় জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সরদার প্যাটেলের নামও উচ্চারিত হয়ে থাকে, তেমনি উঠে আসে উভয় সম্প্রদায়ের উগ্র ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী সংগঠনগুলোর কথা, তাদের দায়দায়িত্ব প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত। আর গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গ ও পাঞ্জাবের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভূমিকা। বিভাজনের ত্রিপাক্ষিক জটিলতা নিয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে প্রধানত ভারতীয় ও বিদেশী লেখকদের হাত দিয়ে। কিন্তু রাজনীতি-পাগল বাংলাদেশে যে কারণেই হোক এ বিষয়ে আগ্রহ কম, লেখাজোখাও কম।

বিভাগপূর্ব অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনামলের ভারতীয় রাজনীতি বিশেষ করে ভারতবিভাগের রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং বিশেষ রাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ। রক্ষণশীল বা স্বাতন্ত্র্যবাদী ঘরানার লেখকগণ সম্প্রদায়গত ভিন্নতার বিষয়টা বড় করে দেখেছেন। অন্যদিকে সমন্বয়বাদীরা পালটা তুলে ধরেছেন মিল ও সহাবস্থানের বিভিন্ন দিক। অবশ্য এ আলোচনায় নিরক্ষরেখায় দাঁড়ানো ইতিহাস-লেখকও আছেন, তবে সংখ্যায় তারা খুবই হাতেগোনা।

যে কারণেই হোক বর্তমানে দ্বিতীয় ধারার কিছুটা প্রাধান্য, বিশেষ করে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ ঘরানার গবেষক-লেখকদের কল্যাণে। তবে তাদের

লেখাতেও কোথায় যেন রাজনীতির বিশেষ একটি ধারণার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ যুক্তিবাদী নিরপেক্ষতার কিছুটা অভাব। সেই সঙ্গে অমোঘ ঘটনাবলী ও সংশ্লিষ্ট নায়কদের একটু ভিন্নভাবে দেখার প্রবণতা বেশ স্পষ্ট। যার যার অবস্থান থেকে নিরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বছর কয় আগে ভারতীয় জনতা পার্টি (বি. জে. পি.)'র শীর্ষস্থানীয় নেতা যশবন্ত সিং-এর 'জিন্নাহ ইন্ডিয়া-পার্টিশন ইন্ডিপেন্ডেন্স' শীর্ষক মোটাসোটা বইটিতেও (২০০৯ খ্রি.) উল্লিখিত ধারার প্রকাশ যেখানে দুই সম্প্রদায়ের সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে কিছু অপ্রিয় সত্যও পরিবেশিত হয়েছে। শাসকনীতি নিয়ে কিছু তথ্য রয়েছে যে দুই ধর্মের আচার-আচরণ-ভেদের উর্ধ্বে সরকার পক্ষের চেষ্টা রাজনীতিসহ ভাষা, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষার ধারা নিয়ে উভয়কে পৃথক করা এবং তা গোড়া থেকেই সচল ছিল। অবশ্য সচেতন পরিকল্পনায়।

গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির তাৎপর্য লীগ-কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাগণ নিজ নিজ স্বার্থের আলোকে বিবেচনা করেছেন– সর্বজনীন জাতীয় স্বার্থে নয়। তাই দেখা যায় ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা ভারতীয় সমাজে বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। উভয় সম্প্রদায়ের শীর্ষ সামাজিক-রাজনৈতিক এবং ধর্মবাদী বিশিষ্ট প্রচারকগণ এর জন্য দায়ী। তাঁদের বক্তব্য, বিবৃতি ও কর্মতৎপরতা বিচার করে দেখলে সেটা বোঝা যায়। এরা ভারতবিভাজনের মূল হোতা।

AMARBOI.COM

দুই

গান্ধি : জননেতা হয়েও বেনিয়া ও 'রাজ'-সমর্থক

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে কাথিয়াড়ের রক্ষণশীল হিন্দু-পরিবারে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির জন্ম (১৮৬৯)। পোরবন্দর থেকে রাজকোটে আসা দেওয়ানজি পরিবারে বৈষ্ণব ও জৈন ধর্মীয় প্রভাবে বড় হয়ে ওঠেন এম. কে গান্ধি। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসা গান্ধির পক্ষে তাই বিলেতি কেতার বদলে অহিংসা ও সত্যাগ্রহ নিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে আবির্ভূত হওয়া বোধহয় স্বাভাবিকই ছিল। এদিক থেকে মস্তবড় প্রভেদ গান্ধির সঙ্গে আরেক বিলেত ফেরত ইংরেজি কেতায় অভ্যস্ত ভারতীয় ব্যারিস্টার-রাজনীতিক মোহাম্মদ আলী জিন্নার। দুজনেই গুজরাটি। কিন্তু স্বভাবে, জীবনাচরণে দুজনের মধ্যে মেরুপ্রমাণ প্রভেদ। অথচ এরাই ভারতীয় রাজনীতির নিয়তি নিধারণে প্রতিপক্ষ হিসাবে মুখোমুখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনরাজনীতিতে নিবিষ্ট হলেও সেজন্য গান্ধির পক্ষে বিশ্বে আলোচিত 'অর্ধনগ্ন ফকির' পরিচিতির প্রয়োজন ছিল না। তবু সেই বিসদৃশ বেশভূষা ও সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবনাচরণে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলেন গান্ধি। সেটা কি অর্ধাহারে অভ্যস্ত, অর্ধনগ্ন ভারতীয় তৃণমূল জনতার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ ও চমক সৃষ্টির ('গিমিক') জন্য? সে যাই হোক অহিংস-নীতির রাজনৈতিক হাতিয়ার নিয়ে গান্ধি ভারতীয় জনতার কাছে 'গান্ধি মহারাজ' এবং শিক্ষিতশ্রেণীর চোখে 'মহাত্মাজী' হয়ে ওঠেন। আর কংগ্রেসে রাজনীতিক সহকর্মীদের জন্য সুদিনে-দুর্দিনে অভিভাবক হিসাবে 'বাপুজি' যদিও তিনি কংগ্রেসের চার-আনার প্রাথমিক সদস্য ছিলেন কিনা তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। বৃহৎ মুৎসুদ্দি বিড়লাদের জন্যও তিনি 'বাপু'। তার সরব বা নীরব সম্মতিবাদে কংগ্রেসের উচ্চতম কমিটি যেমন গঠিত হতো না তেমনি নির্বাচিত হতো না কংগ্রেস-সভাপতি। হলে বিপদ। তার প্রমাণ সুভাষচন্দ্র বসু।

গান্ধির বিরুদ্ধে কোনো কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষকের বড় অভিযোগ তিনি বরাবর আপসবাদী রাজনীতির প্রবক্তা, বিশেষ করে ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে। চাপ-আন্দোলন-চাপ এই নিরামিষ রাজনীতির অনুসারী হয়ে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরোধী। অহিংস সত্যাগ্রহ ছিল তার রাজনীতির মূল হাতিয়ার, যদিও 'হাতিয়ার' শব্দটি তার রাজনীতির সঙ্গে মানায় না। তার আপসবাদিতার চরম উদাহরণ ১৯১৯-এ ডায়ারি হত্যাকাণ্ডে তার প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিটি সম্ভাবনাময় গণ-আন্দোলনের রাশ টেনে ধরা। যেমন, চৌরিচৌরার ঘটনায় ও আগস্ট (১৯৪২) আন্দোলনের ব্যাপক তীব্রতায় আন্দোলন স্থগিত করা, সবশেষে ভারতীয় নৌসেনা বিদ্রোহে। অথচ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে প্রয়োজনীয় নমনীয়তা দেখাতে পারেন নি তিনি। ভারতীয় রাজনীতির জন্য এটা ছিল সবচেয়ে জরুরি। খিলাফতে তার যোগদান ছিল রাজনৈতিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য। মুসলিম ধর্মীয় রক্ষণশীলতার সঙ্গে সমঝোতা বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল।

তিন

শাসকশ্রেণীর সঙ্গে রাজনৈতিক আচরণে গান্ধি-জিন্নায় তফাৎ সামান্য। গান্ধি মাঝে মাঝে শাসকদের ওপর চাপ তৈরি করতে আন্দোলনের ডাক দিয়ে চরমক্ষণে তা স্থগিত করেছেন। কিন্তু জিন্না ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পথ মাড়ান নি। তার আন্দোলন এক পর্যায়ে সম্প্রদায়বাদী অর্থাৎ কংগ্রেস এবং শিক্ষিত ও বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে। এ কাজে তিনি কখনো তপসিলী হিন্দু (অন্তজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলিত)-দের ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার সেই রাজনীতি শুদ্ধাচারী ছিল না। তপসিলী নেতা যোগেন মণ্ডলের ফের ভারত যাত্রা তার প্রমাণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ গান্ধিকে আফ্রিকা থেকে লন্ডন হয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। এ কাজে প্ররোচনা বা প্রণোদনা ছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর ব্যক্তিবিশেষের– যেমন তৎকালীন সহকারি ভারত সচিবের এবং তা ১৯১৫ সালে (সুনীতিকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড)। এর প্রধান কারণ যুদ্ধের নাজুক অবস্থায় ভারতে সন্ত্রাসবাদের তৎপরতা বৃদ্ধি। অন্যদিকে ভারতীয় কমপ্রেডর পুঁজিবাদী ও ভূস্বামীকুলের জন্য রাজনৈতিক সহায়তা দান। সর্বোপরি সন্ত্রাসবাদ রুখতে অহিংসার রাজনীতি ছিল খুবই কার্যকর দাওয়াই। মুৎসুদ্দি শ্রেণীর অর্থনৈতিক সেবা যেমন গান্ধি অকাতরে নিয়েছেন নিজের জন্য, কংগ্রেসের জন্য (বিড়লা সবচেয়ে বড় উদাহরণ) তেমনি পরিবর্তে তাদের মাথায় ছাতা ধরেছেন। স্বদেশী আন্দোলনে বিলেতি বর্জন– সেখানেও শিল্পপতিদের বিপুল মুনাফাবাজি।

অস্বীকারের উপায় নেই ভারতের শীর্ষ মুৎসুদ্দি ধনপতিদের উদার অর্থ দাক্ষিণ্যে গান্ধি সেবাশ্রম থেকে শুরু করে কংগ্রেসের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলেছে, যেমন দেখা গেছে মুসলিম লীগের অর্থভাণ্ডারের ক্ষেত্রে মুসলিম বেনিয়াদের অকাতর সাহায্য। কাজেই এদের স্বার্থরক্ষা না করে গান্ধি বা জিন্নার উপায় ছিল না। তাছাড়া গান্ধি-পত্রাবলী এবং ঘনশ্যামদাস বিড়লার স্মৃতিকথা 'ইন দ্য শ্যাডো অব দ্য মহাত্মা' পড়লে ভালোভাবে বোঝা যায় এইসব ধনপতির হাত দুদিকেই প্রভাব রেখেছে, অন্তত গভীর যোগাযোগ তো বটেই–এক, ব্রিটিশরাজ; দুই, গান্ধি জিন্না তথা কংগ্রেস লীগ। তবে এ বিষয়ে গান্ধির পাল্লাটা ভারি। এরা ভারতীয় রাজনীতিতে শীর্ষনেতাদের মাধ্যমে প্রভাবই রাখে নি, এরাই ভারতবিভাগের অন্যতম প্রধান আড়কাঠি এবং তা ছিল একদিকে টাটা-বিড়লাদের অন্যদিকে ইস্পহানি-আদমজিদের স্বার্থে।

একদিকে গান্ধিকে তাই দেখতে হয়েছে দেশীয় মুৎসুদ্দি ধনিক ও ভূস্বামী স্বার্থ অন্যদিকে অংশত 'রাজ'-স্বার্থ যেজন্য স্বরাজ দাবির পাশাপাশি এমন কথাও তাকে বলতে হয়েছে : 'আমি চাই স্থায়ী ইন্দো-ব্রিটিশ পার্টনার শিপ' (জি. ডি. বিড়লা, 'বাপু')। পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' বা 'কমনয়েল্‌থ'-এর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে রাজশক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলার পক্ষপাতী ছিলেন গান্ধি। তাই একাধিকবার কংগ্রেস-অধিবেশনে উত্থাপিত স্বাধীনতা প্রস্তাব (মোহানি-নেহরু-সুভাষ কর্তৃক) নাকচ বা স্থগিত করেন গান্ধি।

এই যদি গান্ধির নীতি হয়ে থাকে তাহলে প্রসঙ্গত কয়েকটি প্রশ্নের জবাব পাওয়া জননেতা গান্ধিকে বোঝার জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন বিতর্কিত রাজনীতিক 'গান্ধিমহারাজ' ও 'মহাত্মাজি' হয়ে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেন কীভাবে? কেমন করে সম্ভব ভারতীয় স্বাধীনতার 'প্রতীক' হয়ে ওঠা? বিষয়টা নিয়ে দেশীবিদেশী একাধিক লেখক যা বলেছেন তাতে সবটুকু পরিষ্কার হয়নি, অর্থাৎ পুরো জবাব মেলেনি।

আমার ধারণা কংগ্রেসে গান্ধির আবির্ভাবের (১৯১৫) আগে সেখানে বহুমাত্রিক চেতনার বিচক্ষণ জননেতার অভাব ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রান্তিক বাংলার মানুষ হওয়ার কারণেই কি রাজনীতির 'মুকুটহীন সম্রাট' বা 'দেশনায়ক' হয়েও বিশাল অবাংলা-অবাঙালি বলয়ের ভারতীয় রাজনীতির স্থায়ী নেতা হতে পারেন নি? মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে কী হিন্দু কী মুসলমান সম্প্রদায়ে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রাধান্য স্থায়ী হতে দেখা গেছে। বঙ্গের ছিল ক্ষণিক প্রাধান্য।

ব্যক্তিচারিত্র বৈশিষ্ট্য হিসাবে গান্ধির ছিল জনচেতনা বুঝে নেবার ক্ষমতা অন্য ভাষায় জনচিত্তজয়ের দূরদৃষ্টি, ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, বিনয় ও সহিষ্ণুতা, একনায়ককে জননায়ক হিসাবে তুলে ধরার দক্ষতা। তবে ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে যেমন জনচিত্ত জয় করেছেন তেমনি তাতে কখনো অসাম্প্রদায়িকতার আপাত মিশ্রণ ঘটিয়ে শিক্ষিত আধুনিক মনের সমর্থন কুড়িয়েছেন। বিস্ময়কর যে সামন্তবাদী চিন্তা, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও সনাতন বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী হয়েও গান্ধি আধুনিক হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীতে গভীর প্রভাব রেখেছিলেন। এমনকি ভারতপ্রেমী অ্যান্ড্রুজ তার ভক্ত, আর প্রগতিবাদী রলাঁ তাকে স্বাধীনতাসংগ্রামী হিসাবে উঁচুতারে বেঁধে রবীন্দ্রনাথকে অসহযোগ প্রসঙ্গে সমালোচনায় বিদ্ধ করেন।

একাধিক বিদেশী লেখক গান্ধি প্রশংসায় সোচ্চার হয়েছেন। অথচ আধুনিকতা, প্রগতিশীলতার মতো রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ গান্ধির তুলনায় কয়েক পা এগিয়ে ছিলেন। সার্বক্ষণিক লেখক না হয়ে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক হলে তুলনাটা আরো স্পষ্ট হতো। আর সেটা রাজনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আংশিক সংশ্লিষ্টতা থেকেই বুঝতে পারা যায়। গো রক্ষা, প্রতিমাপূজা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি নিয়ে গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রভেদ স্পষ্ট। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক, গান্ধি অনাধুনিক। একজন প্রগতিবাদী, অন্যজন প্রগতিবিরোধী।

আমার বিশ্বাস অহিংসার রাজনীতিই মূলত গান্ধির জনপ্রিয়তার মূল কারণ, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে। সেই সঙ্গে শাদামাঠা পরিচ্ছদ ও জীবনাচরণ আর সন্তসুলভ ধর্মাচরণ, রামধুন ও রামরাজ্যের রাজনৈতিক দর্শন তাকে 'রাজনৈতিক গুরু'তে পরিণত করে ব্যাপক জনসমাজে। ভারতীয় সমাজের বড়ো একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবণতা ভক্তিবাদ ও গুরুবাদী কাল্ট। বহুনন্দিত গুরুবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথও মুক্ত থাকতে পারেননি (গুরুদেব)। ক্রুমফিল্ডের ভাষায় গান্ধি 'মাস্টার অব সিম্বোলিজম'। আর যশবন্ত সিংহের বিচারে 'প্রতিবাদী রাজনীতির মাস্টার কারিগর'। যে লবণসত্যাগ্রহ (ডান্ডি মার্চ) গান্ধিকে জনবান্ধব নেতায় পরিণত করে সেই অভিযানে সমর্থন জুগিয়ে প্রচার চালায় ইংরেজ প্রশাসন (সুনীতিকুমার ঘোষ)।

এতসব অর্জন সত্ত্বেও গান্ধি-রাজনীতির বড়ো ব্যর্থতা হচ্ছে তার 'গুরুভাবমূর্তি শুধু ভারতের একটি সম্প্রদায়কেই মাতিয়ে ছিল। খিলাফত-আঁতাত সত্ত্বেও তিনি মুসলমান সমাজকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করতে পারেন নি। তেমন গভীর চেষ্টা তার ছিল বলে মনে হয় না। একাধিক ঘটনা তার প্রমাণ। তাছাড়া যিনি নিজেকে 'সনাতনী হিন্দু' বলে জানান দেন এবং 'গো রক্ষাকে তার ধর্ম' বলে ঘোষণা করেন তার পক্ষে কি মুসলমানের হৃদয় জয় করা সম্ভব? হয়তো তা হতে পারতো নিম্নবর্গীয় মুসলমানের জন্য যদি তার ও কংগ্রেসের রাজনীতি প্রজাস্বার্থের পক্ষে কাজ করতো। পক্ষে দূরে থাক কৃষক-বিরোধী ভূস্বামী স্বার্থরক্ষা ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় হিন্দু-মুসলমান-পার্সি-খ্রিস্টানদের নিয়ে উচ্চবর্গীয় ও খনিশ্রমিকের পক্ষে সফল সামাজিক আন্দোলনের কারিগর গান্ধিকে ভারতে চরম ব্যর্থতা বরণ করতে হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় '১৯১৩ সালে উল্লিখিতদের নিয়ে একটি স্মরণীয় ধর্মঘট ও দেশজোড়া পদযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন গান্ধি। এই অভিজ্ঞতা তাকে সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা তাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়' (সুমিত সরকার, প্রাগুক্ত)। প্রাথমিক পর্বে ভারতীয় রাজনীতিতে 'গান্ধি মিথ' তৈরি হওয়ার পক্ষে ঐ সাফল্যও একটি বড় কারণ যেখানে মূল চাবিকাঠি অহিংস সত্যাগ্রহ। এবং চম্পারণ, ঘেড়া ও আহমেদাবাদে যথাক্রমে কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে আপস-ফয়সালা তার রাজনৈতিক ভিত তৈরি করে। লবণ সত্যাগ্রহ তার জনমহারাজ রূপ উজ্জ্বল করে তোলে।

কিন্তু সেকুলার রাজনীতির সুতোটা হাতে তুলে নিয়েও তা ধরে রাখতে পারেন নি গান্ধি। পারেন নি তার হিন্দুত্ববাদী প্রবণতা ও মহাসভাপন্থী সতীর্থদের প্রভাবে। আজাদ-আনসারি-আজমল-আসফ আলি-কিদোয়াই প্রমুখের সঙ্গে তার সত্যিকার রাজনৈতিক আদর্শগত ঐক্য তৈরি হয় নি। বিশের দশকে খিলাফতি আবেগের মধ্যেও ঐক্য তৈরি হয়নি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আলীভাইদের সঙ্গে। দেশবিভাগের প্রাক্কালে এ বিষয়ে তার কার্যক্রম সদর্থক হলেও মুসলিম রাজনীতিকদের কাছে তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে এই বক্তব্যে যে 'শুধু নোয়াখালি কেন, বিহার নয় কেন' যে বিহারে মুসলমান হত্যার উন্মত্ততা ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক বেশি (সংখ্যাগত হিসাব সুমিত সরকারসহ একাধিক লেখকের)। তবে বিভাগোত্তর সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা প্রতিরোধে তার ভূমিকা 'মহাজনোচিত'। তাই স্বধর্মীর হাতে প্রাণ দিতে হল মহাত্মা নামখ্যাত গান্ধিকে। এবং তাও তার একান্তশিষ্য প্যাটেল-প্রসাদদের পরোক্ষ মদতে। কী ট্রাজেডি কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক মহাত্মা গান্ধির জন্য! অহিংস পদ্ধতিতে হিংসাকে জয় করা যায় কিনা এ প্রশ্নের সদর্থক জবাব গান্ধির কর্ম ও জীবন দিতে পারে নি। বরং প্রশ্নটা ভবিষ্যত কালের জন্য রেখে গেছে।

চার

জিন্না : ঠাণ্ডা মাথার কঠিন হিসেবি রাজনীতিক

ভারত ভেঙে পাকিস্তান গড়ার স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্না। কেমন ছিলেন তিনি ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদ হিসাবে? অনেক লেখা হয়েছে তাকে নিয়ে বিশেষ করে গত কয়েক দশকে। ভারতে, পাকিস্তানে ও পশ্চিমা বিশ্বের অনেক বিশিষ্টজনের হাতে ইতিহাস তৈরি হয়েছে ভারতবিভাগ ও জিন্না-গান্ধি নিয়ে। সেসব মতামতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশও রয়েছে, বিশেষত জিন্না বিষয়ক বক্তব্যে।

জিন্নার স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়ে একটি কথা অনেকে বলেছেন : তার ছিল প্রচণ্ড অহম্‌বোধ। 'জিন্না অব পাকিস্তান'-এর লেখক স্ট্যানলি উলপার্ট জিন্নাপ্রশস্তির পরও তার মধ্যে দেখেছেন অহম্‌বোধ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও রাজনীতিতে প্রধান ব্যক্তি হওয়ার প্রবল ইচ্ছা। সেই সঙ্গে জিন্নাকে তিনি শীতল রক্তের ও অসীম ধৈর্যের মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এইচ. ভি. হডসনও তাকে 'শীতল স্বভাবের, নিরুত্তাপ ও নিঃসঙ্গ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তার ছিল প্রচণ্ড অহংকার। এবং তা এমনি যে অবহেলা তার কাছে রূঢ় আচরণ এবং উপেক্ষা অপমান বলে মনে হয়েছে! কংগ্রেস কর্তৃক তার দাবি প্রত্যাখ্যানের তিনি শোধ নিয়ে ছিলেন দুই দশক পর তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়ে' (দ্য গ্রেট ডিভাইড, ১৯৬৯)।

ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন জিন্নার 'অতি আত্মম্মন্যতা' (মেগালোম্যানিয়া) প্রসঙ্গে তাকে 'সাইকোপ্যাথিক কেস' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এবং অ্যাটলিসহ একাধিক ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ জিন্না স্বভাবের 'গর্ব ও অহমিকা' ভারতবিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন (আর. জে. মুর-ইন্ডিয়াস পার্টিশন গ্রন্থের প্রবন্ধ)। তবে জিন্নার ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা ও কৌশল-দক্ষতা যে পাকিস্তান অর্জনে প্রধান সহায়ক কারণ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রসঙ্গত চার্চিলের জিন্নাপ্রীতি এবং জিন্না-চার্চিলের সুসম্পর্ক স্মরণযোগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্না-রাজনীতির অনুসারি এ বি. হাবিবুল্লাহ'র মতেও জিন্না ছিলেন 'প্রচণ্ড অহমবোধ সম্পন্ন তোষামোদ প্রিয় মানুষ। এবং এতটা অসহিষ্ণু যে ১৯৪৩ সনের পর থেকে তিনি সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। 'জো হুজুর'দেরই তিনি পছন্দ করতেন' (হেক্টর বলিথোর 'ইন কোয়েস্ট অব জিন্না'-যশবন্ত সিংয়ের 'জিন্না' বইতে উদ্ধৃতি, পৃ. ২০৮)। অন্যদিকে পাকিস্তান আন্দোলনের বাঙালি নেতা কামরুদ্দীন আহমদ কাছ থেকে দেখা জিন্নাকে শনাক্ত করেছেন 'মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত' হিসাবে (বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৩, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ)। তার বিশ্বাস পাকিস্তানের চেয়েও 'রাজকাটের দেওয়ানের পুত্র গান্ধিজি ও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নেহেরুর উপর প্রতিশোধ' নেওয়া জিন্নার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪)। এ ধরনের মতামত প্রকাশ কমবেশি আরো দু-এক জন করেছেন। জিন্নার রাজনৈতিক জীবন-ইতিহাস পাঠে, ঘটনাবলীর দায়ে তেমন মনে হতেই পারে। অগাধ বিশ্বস্ততার জন্য জিন্না নাজিমুদ্দীনকে খুব পছন্দ করতেন। অথচ যুক্তপ্রদেশের মুসলিম লীগ সভাপতি ইসমাইল খানকে দূরে সরিয়ে রাখেন তার ভুলগুলো ধরিয়ে দেবার কারণে (সিং, প্রাগুক্ত)।

জিন্নার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে হেক্টর বলিথো আরো লিখেছেন : 'জিন্না ছিলেন প্রাণশক্তির আধার যদিও রাজনীতিক্ষেত্রে ঠাণ্ডামাথার বাস্তববাদী। তার এক-মুখীমনের পেছনে ঐ শক্তি কাজ করেছে' ('ইন কোয়েষ্ট অব জিন্না')। বলতে হয়, অনেকটা লক্ষ্যভেদী অর্জুনের মতো মানসবৈশিষ্ট্য। সম্পূর্ণ বিলেতি কেতায় ও মানসিকতায় অভ্যস্ত জিন্না দেহাতি মানুষের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন না। শুরুতে তার রাজনীতি ছিল একদিকে নিয়মতান্ত্রিক অন্যদিকে শিক্ষিত ও এলিট শ্রেণীর সমধর্মী। তার অহমবোধ কখনো কখনো সৌজন্য অতিক্রম করেছে যখন তিনি কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদের সঙ্গে করমর্দনে (হ্যান্ডশেক) বিরত হন কিংবা আরেক কংগ্রেস সভাপতি সুভাষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ক আলোচনায় রূঢ় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন।

AMARBOI.COM

জাতীয়তাবাদী মুসলমান রাজনীতিকদের প্রতি তার বিরূপতার কারণ একটিই। রাজনীতিতে তিনি হতে চেয়েছেন ভারতীয় মুসলমানদের 'একমাত্র মুখপাত্র' (আয়েশা জালাল ও আরো দু একজনের ভাষ্যে 'সোল স্পোক্‌সম্যান')। কিন্তু ১৯৩৫ সনের 'রাজ' কর্তৃক জারিকৃত 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' সত্ত্বেও ১৯৩৭ সনের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল বিচারে দেখা যায় জিন্না এবং তার মুসলিম লীগ তখনো ভারতীয় মুসলমানদের 'একমাত্র মুখপাত্র' নয়। এমন কি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম-প্রধান প্রদেশ বাংলা ও পাঞ্জাবেও নয়, সীমান্ত প্রদেশে তো নয়ই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা সত্ত্বেও ঐ সময়ে জিন্না ঐ দাবির পক্ষে এমন বক্তব্য রাখেন যে তিনিই ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার একমাত্র প্রতিনিধি। তার ভাষায় '৯৯ শতাংশ মুসলমান তার সঙ্গে। এর বাইরে রয়েছে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতক, বাতিকগ্রস্ত, অতিমানব বা পাগল'। ১৯৪৮-এ তার ঢাকা বক্তৃতায় অনুরূপ শব্দাবলী স্মর্তব্য যদিও ভিন্ন প্রসঙ্গে। এ পর্যায়ে তার প্রতিটি বক্তৃতায় 'হিন্দুকংগ্রেস' 'হিন্দুভারত', 'হিন্দুরাজ' ইত্যাদি শব্দ ঘুরে ফিরে এসেছে। এক সময় ভাইসরয় লিনলিথগো সাম্প্রদায়িক খেলাটা ভালোই খেলেছেন একাধিকবার জিন্নার সঙ্গে দেখা করে তাকে হাতের মুঠোয় এনে। যেমন খেলেছেন শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন।

প্রসঙ্গত আয়েশা জালালের জিন্না বিষয়ক আরো কিছু বক্তব্য সঠিক মনে হয় না। তার বিচারে জিন্নার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিষয়টি নিছক রাজনৈতিক কৌশল, কোনো প্রকার আদর্শিক অঙ্গীকার (কমিটমেন্ট) নয়' (দ্য সোল স্পোক্সম্যান', ১৯৮৫, পৃ. ৫)। অথচ ধর্মকে টেনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্লোগানে মুসলমান জনমতের সমর্থন আদায়ের বাইরে অন্য কোনো আদর্শই জিন্নার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে (১৯৩৭-পরবর্তী) লক্ষ্য করা যায় না। হডসনের মতেও জিন্নার এ ভিন্ন যাত্রার 'কারণ ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিশ্বাসজাত। তার মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনেক উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে' (পৃ. ৪২)। হডসন বা অনুরূপ বিদেশী লেখকের বক্তব্য বলে নয়, এ সময় থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত জিন্নার রাজনৈতিক বক্তৃতায় শুধু সাম্প্রদায়িক বিভেদের সুর নানামাত্রায় তিক্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে– কখনো বিশেষভাবে গান্ধি বা নেহরুর বক্তব্য উপলক্ষে কিংবা তাদের সমালোচনায়।

পাঁচ

আয়েশা জালাল এবং পাকিস্তানবাদী লেখকদের এমন বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ নয় যে জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাব বা দ্বিজাতিতত্ত্ব কংগ্রেস ও 'রাজ'-এর সঙ্গে রাজনৈতিক চাপ ও দেনদরবারের হাতিয়ার। ১৯৩৫-এর, বিশেষ করে নির্বাচনের (১৯৩৭) পর থেকে জিন্নার বক্তব্য বরং বিপরীত সত্যই তুলে ধরে। এমন কি শীর্ষস্থানীয় বিশেষত উত্তর ভারতীয় মুসলিম নেতাদের বক্তব্যেও। মিয়া বশির আহমদ ও আলীগড় গ্রুপের দ্বিজাতিতত্ত্ব ও স্বতন্ত্রভুবন বিষয়ক বক্তব্যের সঙ্গে জিন্নার ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী বক্তব্যের মিল খুবই স্পষ্ট। এর মূলকথা : 'গত বারোশত বৎসর যাবত ভারতবর্ষ হিন্দুভারত ও মুসলমান ভারতে বিভক্ত। বর্তমান ঐক্য একেবারে কৃত্রিম।...হিন্দুমুসলমান সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি বিচারে দুই স্বতন্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতি। কাজেই ভারতবর্ষকে ভাগ করে এ দুই জাতির জন্য আলাদা বাসভূমি তথা জাতিরাষ্ট্র গঠন করতে হবে'।

যে জিন্নার জন্ম খোজা সিন্ধি পরিবারে (১৮৭৬), গোঁড়া সুন্নি পরিবারে নয়, যার শিক্ষা, বেড়েওঠা আধুনিক পাশ্চাত্য ধারায়, যিনি লন্ডন পরিবেশ থেকে বোম্বের স্বনামখ্যাত আইনজীবী এবং উদারনৈতিক রাজনীতিক নওরোজি ও গোখলের ভাবশিষ্য, সরোজিনী নাইডুর ভাষায় 'হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির দূত'- তিনি কেন তিরিশের দশকের শেষপর্ব পেরিয়ে অসম্প্রীতির তীব্র প্রবক্তা? এ প্রশ্ন বহু-আলোচিত তার প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য ও কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম দাবি বিষয়ক লেনদেনে ব্যর্থতার প্রসঙ্গ টেনে। তাছাড়া ব্যক্তিগত অবস্থানের প্রশ্ন তো আছেই।

সঙ্গত কারণে এমন প্রশ্ন উঠে আসে যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি যদি তার আদর্শই হতো তাহলে কংগ্রেস-বিরোধী হয়েও সেকুলার মুসলিম রাজনীতি তার দাবি আদায়ের হাতিয়ার হতে পারতো। জাতীয়তাবাদী মুসলমান রাজনীতিকের সংখ্যা বিশ থেকে তিরিশের দশকে নেহাৎ কম ছিল না। হয়তো সমস্যা ছিল নেতৃত্ব নিয়ে, ছিল আদর্শগত সমমানসিকতা নিয়ে। তবু সম্প্রদায়বাদী রাজনীতির পথই বেছে নেন জিন্না। এর বড় কারণ প্রতিশোধস্পৃহা, ক্ষুব্ধমনের পরিতৃপ্তি অর্জন। এবং একক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী তথা একনায়ক হওয়া।

AMARBOI.COM

তাছাড়া প্রকৃতিগত আরো একটি প্রবণতা বিচার্য। তার বড় হয়ে ওঠার পরিবেশে তার মানসিকতায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা বা নিখাদ সেকুলার জাতীয়তাবাদী আদর্শের কোনো প্রভাব ছিল না। তাই শাসক সমর্থক উদার রাজনীতির উত্তর প্রভাব বহন করে বিলাতফেরত ব্যারিস্টার জিন্না ভারতে এসে ১৮৯৭ সালে 'আঞ্জুমানে ইসলাম'-এ যোগ দেন যা তার বহিরঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। এমন ভাবনা কি অসঙ্গত যে তার মনোগহনে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ধর্মীয় চেতনার স্ববিরোধী প্রভাব যথেষ্টই ছিল, শুধু অনুকূল পরিবেশের জন্য অপেক্ষা। এ সময় তো কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো সাংঘর্ষিক কিছু ঘটেনি। এরপর ১৯১৩ সনে মুসলিম লীগে যোগদান। তখনো কংগ্রেসে গান্ধির আবির্ভাব ঘটেনি।

অনায়াসে গান্ধিবিহীন কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তার সেকুলার অংশকে সংগঠিত ও সংহত করতে পারতেন এই প্রতিভাবান আইনজীবী-রাজনীতিক। সেক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক চিন্তা ও উচ্চাশা পূরণে কংগ্রেস হয়তোবা নেতিবাদী নিয়তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(নেমেসিস) হয়ে উঠতোনা। তখন সাহেবি পোষাকের জিন্নাকে শেরওয়ানি টুপি পরিহিত 'কায়েদে আজম' হয়ে ওঠার প্রয়োজন পড়তো না। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে জিন্না প্রকৃতিগত ভাবেই জনরাজনীতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না (যেমন ছিলেন গান্ধি বা ফজলুল হক)। বরং জনসাধারণ সম্পর্কে ছিল এক ধরনের উন্নাসিক অবজ্ঞা। ঘটনা এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে বাধ্য করে ছিল জননেতার মুখোশ পরতে এবং তা জনবিমুখ মানসিকতা নিয়ে। কামরুদ্দীন আহমদ প্রমুখের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাই বলে। এদিক থেকে শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তার বেশ অমিল। অমিল বঙ্গীয় মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বা সোহ্‌রাওয়ার্দির সঙ্গে যদিও এরা দুজনই উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মানসিকতা সম্পন্ন।

ছয়

লাহোর প্রস্তাবকে (১৯৪০) দেশবিভাগের ইতিহাসে প্রথম মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আসলে ওই মাইলফলক হচ্ছে ১৯৩৫ সনের কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড (সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ) যার সূচনা ১৯০৯-এর মর্লি-মিন্টো, ১৯১৯-এর মন্টেগু-চেমসফোর্ড এবং পরবর্তী সংস্কার প্রস্তাবগুলো যেখানে পৃথক নির্বাচনের ভেদনীতিকে আইনি বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। লখনৌ চুক্তির পর বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল ও ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপর্যস্ত বিশের দশকের ঘটনাবলীও দেশবিভাগের পথ তৈরিতে কম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক নয়।

এসবের ধারাবাহিকতায় ১৯৪০-এর বিভাজনধর্মী লাহোর প্রস্তাব যা একান্তভাবেই জিন্নার পরিকল্পনা প্রসূত। 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার'-এর বিপুল তথ্যাবলী এবং অন্যান্য সূত্র একথাও বলে যে লাহোর প্রস্তাব প্রণয়নে ব্রিটিশ রাজের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। এ প্রসঙ্গে আরো দ্রষ্টব্য ওয়ালি খানের 'ফ্যাক্টস আর ফ্যাক্টস' গ্রন্থটি। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল থেকে ভারতসচিব আমেরি, কিংবা ভাইসরয় লিনলিথগো থেকে শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তক এবিষয়ে কেউ ধোয়া তুলসিপাতা নন। আর লাহোর অধিবেশনে জিন্নার দীর্ঘভাষণের প্রতিটি বাক্য যেন সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক।

দেশবিভাগের সত্যকার মাইলফলক যদি খুঁজতেই হয় তবে তা একদা-সম্প্রীতির দূত জিন্না'র জিহাদি ডাক– প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে) ঘোষণা এবং তার শিষ্য সোহ্‌রাওয়ার্দির বিভ্রান্তিকর ভূমিকার পরিণামে সংঘটিত 'কলকাতা মহাহত্যাকাণ্ডে (দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং') যার ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্তস্রোতের টানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ উপচে পড়ে। প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি, বিহার ইত্যাদি ঘটনা। সম্প্রীতির কফিনে আসল পেরেকটি পোঁতা হল। এর পর তো একের পর এক ঘটনা দেশবিভাগ নিশ্চিত করে। তাতে লীগ-কংগ্রেস উভয়পক্ষেরই অবদান রয়েছে। ঐ নিশ্চিতিতে জিন্নার অহমবোধ ও প্রতিহিংসাস্পৃহা পরিতৃপ্ত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন থাকে জিন্না কি উপলব্ধি করেছিলেন তার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিণাম? দেখতে পেয়েছিলেন উপমহাদেশের নিরীহ সাধারণ মানুষের ভবিষ্যত? তার মতো প্রতিভাবান রাজনীতিকের বুঝতে না পারার কথা নয় যে ভারতীয় মুসলমান সবার স্বপ্নের ভুবন পাকিস্তানে ঠাঁই হবে না। কয়েক কোটি ভারতীয় মুসলমান জনতা যারা বিচ্ছিন্নভাবে হিন্দুপ্রধান বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তাদের আবাসস্থল সঙ্গতকারণে পাকিস্তানভুক্ত হবে না সেকথা তিনি জানতেন।

তাহলে কেন তাদের স্বপ্ন দেখানো, জেনে শুনে তাদের অসম্ভবের বিষপান করানো। এ অনৈতিক কাজটাই জিন্না করেছেন তার অহমবোধের তাড়নায়। কয়েক কোটি মুসলমানকে তার কথিত 'হিন্দুভারতে' রেখে গেলেন গভীর অনিরাপত্তায়। অবশ্য রাজনীতিতে প্রতারণা বোধহয় অনৈতিক নয়। তবে এ কালো সম্ভাবনার কথা মাওলানা আজাদ বিভাগ-পূর্বসময়ে মুসলমান জনতার উদ্দেশ্যে একাধিক বার বলেছেন (রামগড় কংগ্রেস, ১৯৪০), বলেছেন দেশভাগের অব্যবহিত পরেও দিল্লির জামে মসজিদে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশে।

আর এ জতুগৃহদাহে জ্বালানি কম যোগ করেন নি নেহরু, প্যাটেল, প্রসাদসহ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। গান্ধির কাছে সম্প্রীতির গুরুত্ব সবার উর্ধ্বে– এমন ভাবনা সত্ত্বেও তিনি রাজনৈতিক স্বার্থবাদী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদে দাঁড়াতে পারেন নি। আসলে গান্ধি ও জিন্না দুজনেই অর্ধসত্য পুঁজি নিয়ে রাজনীতিতে তৎপর হয়েছিলেন। একজন অখণ্ড ভারতের নামে, অন্যজন বিভক্ত ভারতের পাকিস্তানের টানে। এর পরিণাম বিশেষ শ্রেণী বাদে সাধারণ মানুষের জন্য ভালো হয় নি।

গান্ধি ভারতভাগের দায়ে ও সম্প্রীতি প্রচারের কারণে রক্ষণশীল স্বধর্মীর হাতে প্রাণ দিলেন। অথচ তার রাজনীতির অর্ধেক ছিল সনাতনধর্ম রক্ষার জন্য। যে সতীর্থদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষায় মহীরুহের ছায়া বিস্তার করেছিলেন তাদের অবহেলায় তার প্রাণ গেল। আর জিন্না। যে ভূস্বামী-মুৎসুদ্দি ও এলিটদের নিয়ে তার স্বতন্ত্রভুবন প্রতিষ্ঠা– গান্ধির বিপরীত পন্থায় ক্ষমতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীর্ষস্থান দখলে রেখেও অবজ্ঞা-অবহেলায়, অর্ধচিকিৎসায় তার মৃত্যু। তার প্রধান সহকারী লিয়াকতের প্রাণ গেছে 'অস্বাভাবিক রাষ্ট্র' পাকিস্তানের অস্বাভাবিক ষড়যন্ত্রে। পাকিস্তানের রাজনীতি পূর্বাপর হত্যা, সামারিক শাসন ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পোষ্য হিসাবে বর্তমান বিপর্যয়ে ভাসমান। গণতন্ত্র শব্দটি সেখান থেকে নির্বাসিত। মরুভূমির তীব্রদাহের অবার প্রান্তরে ক্ষণিক মরুদ্যানের ছায়া হয়ে মাঝে মধ্যে আসে যায় কথিত গণতন্ত্রী নির্বাচিত সরকার। আর সে অপরাধে কখনো প্রধান ব্যক্তিটিকে প্রাণ দিতে হয়, যেমন বেনজির ভুট্টো! কিন্তু পাকিস্তানে এজাতীয় হত্যাকাণ্ডের বিচার দূরে থাক, সুষ্ঠু তদন্তই হয় না। লিয়াকত থেকে বেনজির এর উদাহরণ। এমন চরিত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে পাক রাজনীতি, হয়তো বা দেশভাগের মাশুল দিচ্ছে।

সাত

দেশবিভাগের মাধ্যমে ক্ষমতার হস্তান্তর এবং তাৎক্ষণিকভাবে কমনওয়েলথের গোয়ালে অবস্থান নিশ্চিত করে ব্রিটিশ রাজশক্তির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ভারত পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতার যথার্থ সুফল কতটা নিশ্চিত করতে পেরেছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেছে। স্বাধীনতার স্বাদ কতটা মিঠে কতটা তেতো তা নিয়ে বিচার বিবেচনার অবকাশও রয়েছে। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি সর্বসাধারণ বিশেষ করে তৃণমূলস্তরের মানুষের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য থেকে কতটা মুক্তি বয়ে এনেছে সেসব নিয়ে প্রশ্ন অনেক। পড়তে পারেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাস।

এছাড়াও রয়েছে সমালোচনার আরো কিছু দিক। দেশবিভাগের রাজনৈতিক আদর্শ বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবিক চেতনা ইত্যাদি বিষয় আমলে নিতে চাইলে দেশবিভাগজনিত অবাঞ্ছিত উপসর্গগুলো মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মীয় চেতনাযুক্ত যে সম্প্রদায়বাদী রাজনীতি লীগ কংগ্রেস উভয় পক্ষ কম বেশী ধারণ করেছে ও পরিণামে দেশবিভাগ নিশ্চিত করেছে সেই অবাঞ্ছিত উত্তরাধিকার থেকে বিভক্ত ভূখণ্ড, এমন কি ত্রিধাবিভক্ত রাষ্ট্রও পুরোপুরি মুক্তি পায়নি। কম আর বেশি সে ঐতিহ্য বহন করে চলছে তারা।

সংবিধান যেমনই হোক শাসনযন্ত্র, এমন কি অংশত জনমানস থেকেও সাম্প্রদায়িক চেতনা দূর হয়নি। থেকে থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তার প্রমাণ। বাংলাদেশে এ সহিংসতা অপেক্ষাকৃত কম হলেও ধর্মীয় রাজনীতির মানসিকতা থেকে সে মুক্ত নয়। সমাজ এদিক থেকে শুদ্ধ নয়। সাম্প্রতিক কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনা নতুন করে উদাহরণ তৈরি করেছে। মনে হচ্ছে চল্লিশের দশকের রাজনীতির ভূত এখনো পুরোপুরি আমাদের ছেড়ে যায় নি।

সম্প্রদায়বাদী সামরিক শাসন, বেসামরিক স্বৈরশাসন, রাজনৈতিক-সামাজিক নৈরাজ্য ইত্যাদি বিচারে পাকিস্তান সবার সেরা। জন্মলগ্ন থেকে মার্কিনি পরাশক্তির তাবেদার হয়ে এক পর্যায়ে মাদ্রাসা-ভিত্তিক তালেবান যোদ্ধা তৈরি করে গোটা দেশে গুম, খুন, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অভয়াশ্রম তৈরি করেছে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণী। গণতন্ত্রী-স্বৈরতন্ত্রী সবাই এ বিষয়ে এক কাতারে। দেখা দিয়েছে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের প্রাধান্য। সেনাবাহিনী তা দমন করতে অপারগ বা অনিচ্ছুক। জঙ্গিবাদের সঙ্গে সেনাদফতরের আঁতাত নিয়ে অভিযোগও কম নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, জিন্না কি এই পাকিস্তান চেয়েছিলেন? অবশ্যই চাওয়ার কথা নয়। কিন্তু যে বিপজ্জনক মতাদর্শ ও স্লোগানের সাহায্যে পাকিস্তান অর্জন তার ধারাবাহিকতা থেকে তিনি বা তার উত্তরসূরি কোনো শাসক সরে আসেন নি বা আসতে পারেন নি। পরিণাম যথারীতি। এর প্রভাব পড়েছে সমাজে।

ভারতও এ সম্প্রদায়বাদী ধারা থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। ক্ষমতার লোভ ও দুর্নীতি এই দুইয়ে মিলে সব নষ্ট করেছে। সেই সঙ্গে পূর্বোক্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়বাদী চেতনার প্রভাব, যে প্রভাব আধুনিক সমাজেও সঞ্চারিত। অযোধ্যাকাণ্ড, গুজরাতকাণ্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনাবলী তার প্রমাণ। আর অর্থনৈতিক উন্নতি 'ভার্টিকাল' হওয়ার কারণে তা সর্বজনীন নয়, এবং প্রদীপের নিচে অন্ধকার। রাজনীতি-সমাজ কোনোটাই দূষণমুক্ত নয়। সম্প্রতি রাজধানী দিল্লিতে সংঘটিত প্রকাশ্য গণধর্ষণ এবং বিভিন্ন শহরে তার পরম্পরা সমাজের কোন্ পরিচয় প্রকাশ করে? অন্যদিকে অনাহারে মৃত্যু বা কৃষকের আত্মহত্যা? আর সর্ববিস্তারি দুর্নীতি?

AMARBOI.COM

এসব ছাড়িয়ে দেশবিভাগ সূত্রে পাক-ভারত বৈরিতা, আঞ্চলিক যুদ্ধ, জনমানসে পারস্পরিক বিরূপতা বিভাগপূর্ণ কালের সমাজ, সম্প্রদায় ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব ও বিরূপতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জন্মলগ্ন থেকেই চিরশত্রু দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তান, মধ্যিখানে কাঁটা কাশ্মীর। জুলফিকার আলী ভুট্টোর যে-উপলক্ষে হাজার বছর ধরে লড়াইয়ের বাসনা। দেশবিভাগের এজাতীয় পরিণাম ও উপসর্গের দিকে চোখ বন্ধ করে থাকা যায় না। তাই প্রশ্ন জাগে : সাতচল্লিশের ভারতবিভাগ কি সঠিক ছিল? জবাব দেবার দায় যাদের তারা সবাই প্রয়াত, এখন দায় রাজনীতিমনস্ক লেখক ও ইতিহাসবিদদের। যারা বিচার-ব্যাখ্যায় যে-যার মতো সিদ্ধান্ত টানেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন উঠতে পারে দেশবিভাগ আলোচনায় গান্ধি-জিন্না সমাচার কি প্রাসঙ্গিক? অবশ্যই। এ দুই ব্যক্তিত্ব-বিশ্লেষণ ও তাদের তৎপরতার প্রেক্ষাপট বিচার ছাড়া দেশভাগ আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত নেহরু, প্যাটেল ও মওলানা আজাদ। দেশভাগের কারিগরদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই পঞ্চরাজনীতিক। এবং ওয়াভেল ও মাউন্টব্যাটেন। সেই সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ও বাদামি আমলাতন্ত্র।

উত্তরপত্র হিসাবে ত্রিধাবিভক্ত উপমহাদেশের পরিস্থিতি বিচারে ক্যাস্ট্রো ও চে-গুয়েভারার রাজনৈতিক চিন্তা স্মরণে আনতে হয়। মুক্ত স্বদেশেও ঔপনিবেশিক কাঠামো ও আমলাতন্ত্র বজায় রেখে জনকল্যাণ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা যায় না। দরকার আদর্শবাদী দেশপ্রেমী শাসনযন্ত্র, আর সর্বজনের শিক্ষা, যে শিক্ষা সেকুলার চেতনা নিশ্চিত করতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশভাগের নিয়তি : নেহরু বনাম আজাদ, নেপথ্যে প্যাটেল

দীর্ঘ প্রায় দুই শতক ভারত শাসনের পর অবস্থার বিরূপতায় ব্রিটিশ-রাজ তার উপনিবেশ ছাড়তে বাধ্য হয় (ক্ষমতা হস্তান্তর ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭)। তাদের ভারতত্যাগের শেষ সময়পর্বে ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসের দুই নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নানাসূত্রে সেই জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণ্যাবর্তকালে কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত দেশভাগে রয়েছে তাদের বিশেষ ভূমিকা যা ইতি ও নেতিতে সংশ্লিষ্ট।

'দ্য গ্রেট ডিভাইড'-গ্রন্থের লেখক এইচ. ভি. হডসন ভারত বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিত্ববিচার গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গান্ধি, জিন্না, নেহরু, আজাদ। সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট দুই ভাইসরয় ওয়াভেল ও মাউন্টব্যাটেন। সম্ভবত তিনি ভেবেছেন সংলাপে, রাজনৈতিক পদক্ষেপে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তিক আবেগ ও নিরাসক্তি, বিচক্ষণতা ও অপরিণামদর্শিতা যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ঘটনার ভালো মন্দ, সঠিক বেঠিক পরিণতি সে অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। তাই ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যক্তি ভূমিকায় মনে হয় সর্দার প্যাটেলকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যদিও তার ভূমিকা নেপথ্যে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সন্ধিক্ষণে ঠিকই গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষমতা হস্তান্তরের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত বৈঠক ও সংলাপের দীর্ঘকালীন প্রথমপর্বে মাওলানা আজাদ ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি। এবং অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ শেষ বর্ষে সভাপতির দায়িত্বে নেহরু। তাদের বক্তৃতা, বিবৃতি, সংলাপ, আলোচনা এবং চিন্তার বিচক্ষণতা বা দুর্বলতা রাজনৈতিক ঘটনার গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে, এমন বলা বোধহয় ভুল হবেনা। তবে এটাও ঠিক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একক ব্যক্তির নয়, প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির, পরে কাউন্সিলের (মুসলিম লীগের ক্ষেত্রে একক ভাবে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নার)। তা সত্ত্বেও দলের সভাপতি হিসাবে কিছুটা বাড়তি সুবিধা বা ক্ষমতা থাকে এবং সেটা নির্ভর করে সভাপতির ব্যক্তিত্বের ওপর, কিছুটা পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিরিশ থেকে চল্লিশের দশকের মধ্যে নেহরু দুই মেয়াদে এবং আজাদ এক মেয়াদে কংগ্রেস-সভাপতি, ১৯৩৯-এ সুভাষ নির্বাচিত, কিন্তু পদত্যাগে বাধ্য। এরপর ১৯৪০ থেকে আজাদ নির্বাচিত বিহারের রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনে। বছরটি নানা ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে ১৯৩৬-এ নেহরু সভাপতি, পরবর্তী দুই বছরও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে নেহরুর ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মাউন্টব্যাটেনের পাশাপাশি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবে নেহরুর সমাজবাদ-গান্ধিবাদে একই সঙ্গে আত্মস্থ হওয়া (দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ) এবং হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি সম্পর্কে তার কিছু অবাস্তব ধারণা গুরুতর সমস্যা তৈরি করে।

দুই

সে সম্বন্ধে একটি উদাহরণ। যে যুক্তপ্রদেশে লীগ কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে সমস্যা ভারতবিভাগের সম্ভাবনাকে একপা এগিয়ে দিয়েছিল সে সম্পর্কে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি নেহরুর ভূমিকা তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করেনা। বরং এক ধরনের অবাস্তব চিন্তার প্রকাশ ঘটায়। আসলে বিষয়টি ছিল দৃষ্টিভঙ্গির। কংগ্রেসের উপরমহলে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান নেতার উপস্থিতির কারণে নেহরুর মনে এমন ধারণা জন্মে যে, মুসলমান সমর্থনের জন্য অন্যকোনো সংগঠনের (যেমন মুসলিম লীগ) সঙ্গে সমঝোতার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরিস্থিতি বাস্তবে এর বিপরীতই ছিল। মুসলিম লীগের প্রাপ্ত ভোটের হিসাব (১৯৩৭) নিলেই বিষয়টা সঠিক বোঝা যেতো। কিন্তু নেহরু সে দিকে তাকান নি।

যুক্তপ্রদেশের লীগনেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান মে, ১৯৩৭-এ লীগ-কংগ্রেস সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে নেহরুর সঙ্গে দেখা করার পর শেষোক্তজন রাজনৈতিক তত্ত্বের মতো করে পূর্বোক্ত বক্তব্য তুলে ধরেন। অন্যদিকে খালিকুজ্জামানের মতে প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতে লীগ-কংগ্রেস সমঝোতা নিশ্চিত করা গেলে ভারতীয় রাজনীতিতে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের সুযোগ ও সম্ভাবনা কমে যাবে, স্বাধীনতার পথও প্রশস্ত হবে ('পাথওয়ে টু পাকিস্তান')। কিন্তু নেহরুর ধারণা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা কিছুসংখ্যক ভূস্বামী, ধনিক ও এলিট শ্রেণীর তৈরি। এর সঙ্গে জনসাধারণের কোনো সম্পর্ক নেই। ভিন্নমত প্রকাশ করে খালিকুজ্জামান বলেন যে ভারতে হিন্দুমুসলমান রাজনৈতিক সম্পর্ক একেবারেই ভিন্ন ধরনের, বিদেশী উদাহরণ এখানে অচল। নেহরু একথা মানতে রাজি হননি। যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস মুসলিম সমাজে জনসংযোগের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতেও বাস্তবতা বোঝেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত এ অবাস্তবতা কংগ্রেসের শীর্ষনেতা অনেকের মধ্যেই ছিল। তাই কংগ্রেসনেতা মাওলানা আজাদ একাধিকবার মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম লীগ সম্পর্ক নিয়ে কংগ্রেসের আরো উদার হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করেও তাদের দলীয় চিন্তার বাইরে আনতে পারেননি। পূর্বোক্ত লীগ-কংগ্রেস সমঝোতার বিষয়ে খালিকুজ্জামানের সঙ্গে মাওলানা আজাদের একক বৈঠক (১২ জুলাই, ১৯৩৭) এবং আরেক কংগ্রেস নেতা গোবিন্দবল্লভ পন্থকে নিয়ে বৈঠকের (১৫জুলাই) বক্তব্য ও চরিত্র হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং কংগ্রেস প্রস্তাব এমনই ছিল যা লীগের জন্য আত্মঘাতী। কাজেই সমঝোতা ঐ বৈঠকেই শেষ। বিষয়টি পূর্বে আলোচিত।

এর অর্থ আজাদ মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বের রাজনীতিক এমনটা নয়। কংগ্রেসের নিজস্ব ঘরোয়ানীতি, বিশেষ করে গান্ধি-প্রভাবিত নীতির ওপর আজাদসহ কংগ্রেসী মুসলমান নেতাদের নিজস্ব প্রভাব খুবই কম ছিল। যেমন আরেক ডাকসাইটে নেতা হসরত মোহানি যার স্বাধীনতা প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গুরুত্ব পায়নি। পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে যে ভারতীয় স্বরাজবিষয়ক ক্রিপস প্রস্তাব (১৯৪২) বা কেবিনেট মিশন প্রস্তাব বা ওয়াভেল পরিকল্পনার মতো কয়েকটি ক্ষেত্রে সেগুলোর গ্রহণ-বর্জন বিষয়ক আজাদের ভাবনা গান্ধি বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। অথচ ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় এগুলোর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। এর অর্থ কি তাহলে এমন দাঁড়ায় যে কংগ্রেস রাজনীতিতে মুসলিম নেতাদের চিন্তা হালে পানি পায়নি। জিন্না এমনই ভাবতেন।

তিন

রাজনৈতিক চিন্তায় জওহরলাল নেহরু কতটা জাতীয়তাবাদী, কতটা সমাজবাদী তা নিয়ে বিতর্ক কম ছিলনা। ১৯৩৬ সনের এপ্রিলে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে নেহরু বলেন, 'তার দৃঢ়বিশ্বাস বিশ্বসমস্যা ও ভারত সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে সমাজতন্ত্রে। কথাটা অস্পষ্ট মানবিকতার প্রশ্নে নয়, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক বিচারে সত্য। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া দারিদ্র্য ও বেকারত্বের মতো সমস্যাদি দূর করার অন্যকোনো পথ নেই।'

তাহলে কি এমন ভাবা সঙ্গত হবে যে জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পথে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। এমনকি ওই ভাষণে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের কথাও বলেছেন, অবশ্য নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে। যেমন ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া সফরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন কি রাবীন্দ্রিক ধারায় বলশেভিক একনায়কী শাসনের সমালোচনাও রয়েছে নেহরুর বক্তব্যে।

তার কথা 'দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি। কারণ আমি একজন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক। জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নতির জন্যই আমাদের লড়াই। কংগ্রেসে সমাজতন্ত্র নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। তাই কংগ্রেসের ওপর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে চাইনা' ইত্যাদি। এর অর্থ কি তাহলে এমনই দাঁড়ায় যে পশ্চিমা দেশ সফরে আহরিত সমাজতন্ত্র ছিল নেহরুর চিন্তায় এক ধরনের রোমান্টিক উচ্ছ্বাস?

হয়তো তাই। সেজন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির বুক্‌নি শেষে জওহরলাল বারবার গান্ধিবাদই মাথায় তুলে নিয়েছেন। গান্ধিবাদের আপসবাদিতাও মেনে নিয়েছেন নেহরু। শুধু কি তাই। ১৯৪২ জানুয়ারিতে জওহরলাল তার বক্তব্যে গান্ধিনেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন। কোথায় রইল তার সমাজতন্ত্র? রাজনৈতিক আদর্শবিষয়ক ব্যক্তিগত বিশ্বাস যদি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয় তাহলে তা ইউটোপীয় হয়ে দাঁড়ায়, কিংবা হয় চমক সৃষ্টির ফ্যাসান। গান্ধি বিষয়টাকে সেভাবেই বুঝে নিয়েছিলেন। তার হিসাবে ভুল ছিল না। তাই দেখা যায় স্বাধীন ভারতে নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্বে কমিউনিস্ট দমন, পীড়ন, জেল জুলুম-নির্যাতন। যদিও এক্ষেত্রে মূল নায়ক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেল।

সমাজতন্ত্র দূরে থাক, জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে নেহরুর আপসবাদ, বিশেষ করে সুভাষ-বিরোধিতার ক্ষেত্রে। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের চিঠির জবাবে নেহরু লেখেন : 'আমি আপনার দ্বিতীয়বার সভাপতি হবার বিরোধী ছিলাম। কারণ একাধিক। গান্ধিজির সঙ্গে আপনার বিচ্ছিন্নতা আমি চাই নি। তাছাড়া এতে কংগ্রেসের বামঘরানার ক্ষতিই হবে। কারণ একলা চলার মতো শক্তি তাদের নেই।

'আর কংগ্রেস সভাপতিপদে আপনি জয়ী হলেও কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতার সমর্থন অর্থাৎ গান্ধিবাদীদের সমর্থন আপনার পক্ষে যাবে না। তাই আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সভাপতিপদে আপনার জয়ের ফলাফল যতটা ভালো তার চেয়ে অনেক মন্দ পরিণাম তৈরি করেছে'। এমনই ছিল স্বাধীনতা অর্জনে প্রবল প্রত্যাশী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে নেহরুর বিরাগ।

জাতীয়তাবাদী-সমাজবাদী নেহরুর এ প্রতিক্রিয়ায় হয়তো অবাক হয়েছিলেন সুভাষ। ত্রিপুরিতে সভাপতির ভাষণে তিনি স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশরাজকে চরমপত্র দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বাধীনতাপ্রেমী সমাজবাদী নেহরুর এ সম্পর্কে নেতিবাচক আচরণ প্রত্যাশিত ছিলনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুভাষচন্দ্রের। নেহরুর প্রতিক্রিয়া থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে কংগ্রেসের গান্ধিপন্থী নেতাদের সমর্থন পাবেন না তিনি। পাবেন না এমনকি সমাজবাদী জওহরলালেরও সমর্থন।

তাই নির্দ্বিধায় আপসবাদ থেকে সরে এসে মর্যাদাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলতে পেরেছেন 'কংগ্রেসের পুতুল সভাপতি হয়ে থাকার চেয়ে পদত্যাগ শ্রেয়' (২৯ এপ্রিল, ১৯৩৯)। অতএব গান্ধির ইচ্ছাপূরণ। গান্ধিবাদী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনৈতিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন পি.সি. জোশি, ড. গঙ্গাধর অধিকারী, অজয় ঘোষ, আর. ডি. ভরদ্বাজ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতা (১৩ই আগস্ট, ১৯৩৯) (Indian Struggle for Independence', P114)। আর ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ গান্ধিকে লেখা চিঠিতে প্রতিবাদ জানান।

হতে পারে সমাজবাদী জওহরলালের কথা মনে রেখে সুভাষচন্দ্র বলেন : বামপন্থা বলতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা বোঝায়। বর্তমান যুগ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার আন্দোলনকাল। আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি। স্বাধীনতা এলে জাতীয় পুনর্গঠন পর্বের কাজ শুরু হবে। সেটা হবে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের কর্মকাণ্ড। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতার লড়াই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। পরবর্তী পর্যায়ের তৎপরতায় বামপন্থা ও সমাজবাদ সমার্থক' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫)।

নেহরুর সমাজবাদ নিয়ে উচ্ছ্বাস সহ্য করলেও সুভাষের কট্টর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম হজম করতে রাজি ছিলেন না গান্ধি। তাই কংগ্রেস থেকে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কার, অভিযোগ দলীয় শৃংখলাভঙ্গের। কংগ্রেস আঙ্গিনাতেই বামপন্থীদের নিয়ে ঘটনার পরপরই তাই সুভাষ বসুর নেতৃত্বে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন। অবশ্য এর আগে সুভাষের চেষ্টা ছিল গান্ধির সঙ্গে সমঝোতার। কিন্তু গান্ধি এ ব্যাপারে রাজি ছিলেন না। বরং সুভাষকে জাতীয় রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখার পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকেন নিঃশব্দে। একাজ তার জন্য সহজই ছিল।

তৎকালীন রাজনীতিতে আপসবাদী মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে রামগড়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আপস-বিরোধী প্রতিবাদ–প্রদর্শিত হয়। সুভাষ তার ভাষণে কংগ্রেস নেতাদের ব্রিটিশরাজের সঙ্গে সহযোগিতা ও আপসবাদের অভিযোগ এনে এর বিরুদ্ধে 'সংগ্রামের আহ্বান' জানান। অন্যদিকে বামপন্থী একাংশের 'ঐক্য' 'শৃংখলা' 'তৃতীয় ফ্রন্ট' ইত্যাদি স্লোগানের আওতায় তাদের দোদুল্যমানতার সমালোচনা করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের তৎকালীন গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। কেননা যুদ্ধের কারণে ব্রিটিশ-সিংহ বেকায়দা অবস্থায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য এর আগেই যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। 'বোম্বে ক্রনিকল' পত্রিকায় (১২ আগস্ট, ১৯৩৯) চমক-লাগানো শিরোনাম Wardha's Action against Subhash'/ Three year-Ban for flagrant Breach of Discipline : বিষয়টা এতই নগ্ন যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক রাজনীতিক, কবি, বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদ জানান। সমাজবাদী চেতনার কবি সমর সেন তীব্র বিদ্রুপাত্মক রাজনৈতিক কবিতায় ('বসন্ত'-এ) লেখেন :

'মহাত্মা স্তব্ধপ্রায়, ওয়ার্ধায় উর্দ্ধবাহু,...
তামাম দুনিয়ায় চলে প্রতিবিপ্লবের ব্যভিচার
সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ অনেক দিনই করেছি বরবাদ
শুধু সঙ্গোপনে রসদ জোগানোয়
মিলে মিলে অন্ধকার বোম্বাই, আমেদাবাদ।'

কয়েক ছত্রে অনেক কথা– বিশ্বযুদ্ধ, গান্ধি, সাম্রাজ্যবাদ, মুৎসুদ্দিমুনাফাবাজি ইত্যাদি নিয়ে। নেহরুর দুনৌকোয় পা রেখে চলা বামপন্থী অনেকেরই এবং সমাজবাদী বুদ্ধিজীবীদের পছন্দসই ছিল না।

AMARBOI.COM

চার

আজাদ অর্থাৎ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সেনানী, সেকুলার রাজনীতির ধারকবাহক এবং এই ক্ষেত্রে আপসহীন যোদ্ধা। তারুণ্যে বিপ্লববাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছেন। কংগ্রেসী রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা অক্ষুণ্ন রাখলেও মতাদর্শগত ভাবে তিনি সমাজতন্ত্রী নন, কিন্তু সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে কুণ্ঠাহীন, শুদ্ধ গণতন্ত্রী। ধর্মনিষ্ঠ, কিন্তু ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

মুক্তচিন্তার মানুষ বলেই হয়তো রাজনৈতিক কূটকৌশল ও নীতিহীনতা থেকে মুক্ত ছিলেন মাওলানা আজাদ। আবেগ কিছুটা থাকলেও যুক্তির প্রাধান্য তার রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করেছে। নেহরুর মতো আবেগপ্রবণ ও অস্থিরচিত্ত নন, এসব দিক থেকে রাজনৈতিক আচরণে নেহরুর সঙ্গে অনেক প্রভেদ আজাদের। আবার মোহানি প্রমুখের মতো লীগ-কংগ্রেস উভয় পথে বিচরণ করেননি আজাদ। ধীরস্থির, কিছুটা নিঃসঙ্গ প্রকৃতির, স্বল্পভাষী রাজনীতিক মাওলানা আজাদ।

দুটো বিষয়ে তিনি নীতিগত ভাবে অটল ও অনড়। যেমন সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতায়, তেমনি পাকিস্তান বিরোধিতায়। অখণ্ড ভারতের পূর্বাপর প্রবক্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেহরু-প্যাটেল যখন পাকিস্তান দাবির কাছে নতি স্বীকার করছেন, গান্ধি নীরব, গাফফার খান প্রবলভাবে প্রতিবাদী, তখন ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সহকর্মীদের নীতিভঙ্গে ক্ষুব্ধ, আহত আজাদ নিঃশব্দে ঘরের এককোণে বসে ক্রমাগত সিগারেট টেনে চলেছেন মনের অস্থিরতা চাপা দিতে। রামমনোহর লোহিয়া অবশ্য এ ঘটনা অন্যভাবে দেখেছেন। আজাদ প্রতিবাদ করেননি এমন অভিযোগ তার।

কিন্তু বিষয়টার অন্য দিকও রয়েছে। ভারতের অখণ্ডতা বজায় রেখে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক আজাদের কোনো প্রস্তাবই গান্ধি বা নেহরু বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনঃপূত হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে নেহরু প্যাটেল-প্রসাদ প্রমুখ সহকর্মী সবাই ক্ষমতার জন্য অস্থির হয়ে বরাবরের নীতি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, সেখানে তার একক প্রতিবাদ গ্রাহ্য হবে না। তাই ওই অমোঘ দিনটিতে নীরবতাই প্রশস্ত মনে করেছেন আজাদ। গান্ধিও অবস্থাদৃষ্টে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন নি। তবে নেহরুকে আজাদ বলেছিলেন : 'দেশভাগ মেনে নেওয়ার জন্য ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবেনা'। কিন্তু নেহরু সে নীতিকথায় কান দেন নি।

তার ক্ষমতার মধ্যে যতটা সম্ভব ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় ততটা চেষ্টা চালিয়েছেন আজাদ। এজন্য জিন্নার চক্ষুশূল ছিলেন তিনি। রামগড় কংগ্রেসে (১৯৪০) সভাপতির ভাষণে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও আজাদ বরাবর কঠোর ভাবে দেশভাগবিরোধী এবং পাকিস্তান দাবি মানতে নারাজ। তাই চেষ্টা করেছেন তার সভাপতি থাকাকালীন সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্রিটিশ প্রস্তাবগুলো কাটছাটের মাধ্যমে ওয়ার্কিং কমিটিতে গ্রহণ করাতে। কিন্তু পারেননি একেকজনের বিরোধিতায়। কখনো গান্ধি প্রায়শ নেহরু-প্যাটেল প্রমুখের কারণে। এরা তখন প্রবলভাবে দেশভাগ-বিরোধী।

অথচ শেষ দুজনের হাত দিয়েই শেষ পর্যন্ত দেশভাগ নিশ্চিত হয় জিন্নার পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়ার কারণে। আবারও বলতে হয়, গান্ধি তার দুই প্রিয় শিষ্যকে দেশভাগ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন নি। হয়তো গভীর অভিমান—তার মতামত না নিয়ে দেশভাগে সম্মতিদান যা শেষপর্যন্ত অন্যদের সমর্থনে গৃহীত হয়। নেহরু তখন কংগ্রেসের সভাপতি। তার সেই আলটপকা মন্তব্য, পরিবর্তে জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা, কলকাতা গণহত্যা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আজাদের নেহরু বিরূপতার অর্থ বোঝা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। সভাপতি পদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে নেহরুর নাম প্রস্তাব করার ঘটনা 'মারাত্মক ভুল' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর দেশভাগের জন্য পরোক্ষভাবে নিজেকেও দায়ী করেছেন। তার আত্মজীবনীর গোপন ৩০ পৃষ্ঠায় যেসব অপ্রিয় ঘটনার প্রকাশ তাতে নেহরুর সংশ্লিষ্টতা অনেক বেশি। কিন্তু ওই ভুল সংশোধনের কোনো উপায় ছিল না। ওই যে কথায় বলে : 'পাশার দান পড়ে গেছে', পেছন ফেরার পথ বন্ধ।

নেহরুর বিভ্রান্তিকর অস্থির চিন্তার তৎকালীন শেষ উদাহরণ সম্ভবত ১৯৪৭-এ পাঞ্জাব ত্রিধা-বিভক্ত করার প্রস্তাব, সেখানে প্যাটেল তার সমর্থক আর আজাদ গান্ধি তাতে অনুপস্থিত। মাউন্টব্যাটেন খুশি। বিভাজন-বিরোধী হিসাবে যিনি কথায় কথায় 'বলকানাইজেশনে'র প্রসঙ্গ তোলেন তিনি পাঞ্জাবই নয়, বঙ্গবিভাগেরও পক্ষে, যুক্তবঙ্গের বিরোধী। প্রকারান্তরে জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেন নেহরু-প্যাটেল। তাই দেখে আজাদ ক্ষোভে তিক্ত, আর গান্ধি অভিমানে নীরব। পরিণামে জিন্নার জয়। কিন্তু আজাদের ক্ষুব্ধ নীরবতা যুক্তিগ্রাহ্য হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। গাফফার খানের মতো তারও প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি। আর গান্ধি সম্বন্ধে ভিন্নমত সত্ত্বেও নমনীয়তা ও সমালোচনা না করার কারণ কি তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বলে? নাকি গান্ধির প্রতি তার নীতিগত দুর্বলতা ছিল? বিষয়টি গবেষণার যোগ্য।

AMARBOI.COM

পাঁচ

'লৌহমানব' নামে পরিচিত সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস-নেতা প্যাটেল রাজনৈতিক মতাদর্শে রক্ষণশীল ও হিন্দুত্ববাদী ঘরানার। এ হিসাবে কংগ্রেসের উদারপন্থীদের চেয়ে রক্ষণশীলদের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর। তার চিন্তাভাবনা গভীরভাবে সমাজবাদ-বিরোধী। সম্প্রদায়বাদী বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। এর প্রমাণও মিলেছে স্বাধীন ভারতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তার কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে দিল্লি দাঙ্গা দমনে উদাসীনতায় যা গান্ধিকে পীড়িত করেছে। তবু গান্ধি এই প্রিয় শিষ্যের প্রতি কঠোর হতে পারেন নি। বরং ক্ষুব্ধ হয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে পরোক্ষে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাতে কাজ হয়নি, বরং নিজের প্রাণ দিতে হয়েছে শিষ্যের উদাসীনতায়।

কংগ্রেস-সভাপতি পদের জন্য যথেষ্ট আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেও প্যাটেল প্রকাশ্য বিদ্রোহে নিজেকে সমালোচনার যোগ্য করে তোলেন নি। যা করেছেন নেপথ্যে থেকেই। কূটবুদ্ধিতে নেহরুকে পরাজিত করে শেষ চালে দেশভাগের প্রস্তাব গ্রহণের সব ব্যবস্থা পাকা করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দক্ষিণপন্থীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন তার পক্ষে। ভাইসরয় লুইস মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত তার মতামত আমলে নিচ্ছেন। ভি.পি. মেননকে দূত হিসাবে ব্যবহার করছেন প্যাটেলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং তার মতামত সপক্ষে আনার জন্য। এ ব্যাপারে সফলও হন মেননের দু-দিক-কাটা কূটবুদ্ধির চালে। ভারতবিভাগ প্রকৃতপক্ষে প্যাটেলের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। সেখানে আজাদের ভূমিকা হিসাবে আনার মতো নয়। এমনকি নেহরুও দোটানার মধ্যেই শেষ পর্যন্ত ব্যাটেন ও প্যাটেলের সঙ্গে একমত হন।

প্যাটেলের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা শুধু তার সম্প্রদায়বাদী ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ ভারতীয় নৌসেনাদের ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ দমনে ও শেষ মুহূর্তে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে যা কারো কারো বিশ্লেষণে 'বিশ্বাসঘাতকতা'র শামিল। গান্ধি এ দায়িত্ব কংগ্রেসের তরফ থেকে প্যাটেলকেই দিয়েছিলেন। গান্ধি নিজেও ওই বিদ্রোহের পক্ষে ছিলেন না। এক্ষেত্রে নেহরুর পরিবর্তে প্যাটেলকেই যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। জিন্না এই প্রথম একটি ক্ষেত্রে প্যাটেলের সঙ্গে এক কাতারে।

আর প্যাটেলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমাজবাদ-বিরোধী সমাপন তেলেঙ্গানার (তৎকালীন দেশীয় রাজ্য হায়দারাবাদের অন্তর্গত অঞ্চল) কৃষক বিদ্রোহ-বিরোধিতা এবং পরে স্বাধীন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তা কঠোর হাতে দমন করা। এসব ক্ষেত্রে, এমন কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের ক্ষেত্রেও তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মতামত বা পরামর্শ যে কানে তোলেন নি ইতিহাস তেমন তথ্যই লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। তার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাপূরণ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর চেয়েও ক্ষমতাধর।

তাই আবেগপ্রবণ জাতীয়তাবাদী ও দোদুল্যমান সমাজবাদী জওহরলাল নেহরুর চেয়ে রাজনৈতিক শক্তি সামর্থ্যে প্যাটেল অনেকাংশে দড়। শীর্ষ কংগ্রেসীদের সমর্থনও ছিল তার দিকে। নেহাৎ গান্ধির সমর্থনের জোরে নেহরু কংগ্রেসে দু'নম্বর নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ গান্ধির পরই নেহরু। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষদিককার ঘটনাবলীতে দেখা যায় দাবার ছকে রাজার পরেই প্যাটেল, 'মন্ত্রী' নামের ঘুঁটি। সেই ক্রান্তিকালে কংগ্রেস রাজনীতিতে সরদারজীই দু'নম্বর নেতা, এমন কি শেষ চালে তিনি গান্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছেন। ধীর স্থির, স্বল্পবাক প্যাটেল।

এমতাবস্থায় মাওলানা আজাদের সাধ্য কি প্যাটেলপন্থীদের বিপরীতে তার মতামত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। বরং ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্নমত সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটির মতামত তাকে মানতে হয়েছে, সভাপতিপদে থাকা না-থাকা উভয় পরিস্থিতিতে। তাই কংগ্রেস নেতৃত্বে আজাদের অবস্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত নম্বরে তা নির্ধারণ করা খুব কঠিন। তার আদর্শবাদ-নিষ্ঠা, গভীর অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি কারণে তিনি কংগ্রেস-সভাপতি হতে পেরেছিলেন। সেক্ষেত্রেও কংগ্রেসে তার মতামতের প্রভাব কমই ছিল। তুলনা চলে আরেক কংগ্রেস নেতা যার নামে দিল্লির আনসারিনগর, সেই ডা. এম. এ. আনসারির সঙ্গে।

এমন মূল্যায়ন অপ্রিয় শোনালেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেস রাজনীতির জন্য সত্য। সত্য হিসাবে দেখা গেছে অংশত চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে। আনসারি-আজমল-আজাদদের অবমূল্যায়নের মাশুল দিতে হয়েছে কংগ্রেসকে ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের মাধ্যমে। কালক্ষণের বিচক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতায় অবাঞ্ছিত দেশভাগ এড়ানো সম্ভব ছিল। কিন্তু তেমন পরিচয় কংগ্রেস এই বিশেষ ক্ষেত্রে রাখতে পারেনি। তাই দেশবিভাগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতবিভাগ কি অনিবার্য ছিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় ভয়াবহতার কথা বাদ দিলে বিশ শতকে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারতবিভাগ ও ইংরেজ শাসকের ভারতত্যাগ (১৯৪৭, আগস্ট)। বিভাজিত উপমহাদেশে জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামের দুই ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র। নয়া শাসক যথাক্রমে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। এ ঘটনার গুরুত্ব শুধু ভূখণ্ড বিভাগ ও শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নয়, গুরুত্ব এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রক্তাক্ত মানব ট্রাজেডির কারণে। মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা, নারী নির্যাতন ও ছিন্নমূল-বাস্তুহীন মানুষের অপরিসীম যন্ত্রণা পূর্বোক্ত অবাঞ্ছিত ট্রাজেডির চালচিত্র সৃষ্টি করেছিল।

গুরুত্বপূর্ণ সেই ভারতবিভাগ তথা দেশভাগ ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর ইতিহাস নিয়ে তাই ভারতে ও বিদেশে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। সেসব লেখা যেমন ঘটনার বিবরণ নিয়ে তেমনি সেসবের বিশ্লেষণে। ঘটনার তাৎক্ষণিক চিত্রবিচারে ও পরবর্তী পরিণাম দৃষ্টে বিচলিত কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক চেতনাতাড়িত প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে তাদের রচনায়। সম্প্রতি প্রবীণ সাংবাদিক-কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন সেসময়কার অমানুষিক উন্মত্ততার কথা। তার মতে দেশভাগের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না।

এরপরও ঘটনার ভয়াবহতা বিচারে সংবেদনশীল লেখক, বুদ্ধিজীবী, এমনকি রাজনীতিমনস্ক মানুষের মনে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতবিভাগ কি অনিবার্য ছিল? এর কি কোনো বিকল্প ছিল না যেপথ ধরে তৎকালে বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যেতো? সেই সঙ্গে এত মৃত্যু, এত রক্তপাত, এত নির্যাতনের হাত থেকে মানুষের রেহাই মিলতো? পথ ছিল। কিন্তু শীর্ষনেতা কারোরই সে দিকে নজর বা আগ্রহ ছিল না।

উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব পেতে বিভাজন-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বিশদ পর্যালোচনা দরকার। অন্তত দরকার পরিণাম-নির্ধারক বিশেষ কিছু সময়ক্ষণ ও ঘটনার তাৎপর্য বিচার এবং সেই সঙ্গে দেশভাগের বিকল্প সম্ভাবনার তাত্ত্বিক অনুসন্ধান। পর্যালোচনায় একটি বিষয় নিশ্চিত, এবং ইতিহাস লেখকগণও

একমত যে ভারতে হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের পথ ধরে রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক ধর্মীয় সম্প্রদায়চেতনার যে প্রকাশ তারই শীর্ষ পরিণতিতে ভারতভাগ ও পাকিস্তানের জন্ম। তবে এ দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় অখণ্ড ভারতে ঐক্যের পথ ধরে স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাবনাও উঁকি দিয়ে গেছে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের অবহেলায় বা অনিচ্ছায় সে সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে। কখনো নষ্ট হয়েছে তাদের বিভ্রান্তিকর বা ভুল পদক্ষেপে। কখনো সে বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে।

দুই

অনৈক্যের প্রশ্নে একটি বাস্তব সত্য অস্বীকার করা চলে না যে জাতি, সম্প্রদায়, গোত্র, পরিবার সর্বত্রই, এমন কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও নানা কারণে ভেদাভেদ, বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটে, আবার তা মিটেও যায় সদিচ্ছা বা শুভবুদ্ধির কল্যাণে। যদি না যেতো তাহলে সমাজে মানুষ পাশাপাশি বসবাস করতে পারতো না। বিশ্ব তখন এক অশান্তির ভুবন হয়ে দাঁড়াতো।

কিন্তু ভারতীয় সমাজের বড় সমস্যা ছিল সাময়িক বা অস্থায়ী সামাজিক ভেদ বা বিবাদকে রাজনৈতিক অঙ্গনে টেনে এনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করা। ধর্ম সেখানে বড় একটি প্রেরণা (প্ররোচনা বলাই সঠিক)দায়ক উপাদান। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষিতচিন্তার আধুনিক দুর্বুদ্ধির টানে সমাধানযোগ্য সামাজিক সমস্যাকে ধর্মের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত করা হলে সে সমস্যা বৈনাশিক চরিত্র ধারণ করতে পারে।

ভারতে তেমনটিই ঘটেছিল। ধর্ম বরাবরই জনমানসে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় যা নিয়ে রাজনীতির খেলায় অনর্থ ঘটানো সম্ভব। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা নিয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের উদাহরণ বিশ্বে রয়েছে। এর পরিণাম শুভ হয়নি। আর এ রাজনীতি গণতন্ত্রসম্মত নয়। নয় মানবিক চেতনা-নির্ভর। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্না দ্বিজাতিতত্ত্বের মোড়কে ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার অজুহাতে মুসলিম ধর্মসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাংগঠনিক প্রকাশ ঘটান মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্রভুবনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে (১৯৪০, ২৩-এ মার্চ)।

হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছিল এর প্রায় চারদশক আগে। মুসলিম লীগের জন্মলগ্ন থেকে (১৯০৬)। অবশ্য এ অনৈক্য বা সাম্প্রদায়িক বিভেদের শিকড়বাকড় জন্ম নেয় আরো আগে উনিশ শতকে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের রাজনৈতিক প্রভাবে (মূলত আনন্দমঠ উপন্যাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান বিরূপতা ও বন্দেমাতরম মন্ত্রে একই সঙ্গে দেবীবন্দনা ও স্বদেশ বন্দনার পারস্পরিকতায়)।

এ প্রভাব ছড়িয়ে যায় জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী রাজনীতিতে, এবং বঙ্গ থেকে পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে যুক্ত হয় হিন্দুত্ববাদ, সেই সঙ্গে শিবাজি উৎসব, ভবানিপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় উপাদান। গঠিত হয় হিন্দু মহাসভা, আর্য সমাজ, গোরক্ষা সমিতি ইত্যাদি। শীর্ষ জাতীয় নেতাদের চেতনায় ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রধান হয়ে ওঠে। এর চরম প্রকাশ তিরিশের দশকের শেষদিকে হিন্দুমহাসভা-প্রধান সাভারকারের ঘোষণায় যে হিন্দু মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি। সেকুলার চেতনার কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী নেতা কাউকে এ জাতীয় ঘোষণা ও তৎপরতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অবস্থান নিতে দেখা যায়নি। এমন কি অরবিন্দের মতো ধীমান যখন হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ধর্ম ও জাতীয়তাকে একাকার করেন তখনো কেউ এ সর্বনাশা চিন্তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান নি।

অন্যদিকে মুসলমান ধর্মবাদীদেরও এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকতে দেখা যায় নি। সেখানেও ধর্মীয় শুদ্ধতা রক্ষার অভিযান, ওয়াহাবি, ফারায়েজি ধর্মীয় আন্দোলন, আঞ্জুমান ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫ থেকে) প্রেক্ষাপটে সরকারি মদতে ১৯০৬ সনে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা জাতীয় রাজনীতিকে দ্বিধাবিভক্ত করতে সাহায্য করে। মূল চেতনা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ, সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকার রক্ষার দাবি-দাওয়ার প্রাধান্য।

অনৈক্য ও বিভাজনের এই দ্বিমাত্রিক প্রেক্ষাপটে যুক্ত হয় প্রধান শক্তি হিসাবে ইংরেজ শাসকের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির বাস্তবায়ন। তাদের আশীর্বাদী হাত প্রসারিত হয় ভারতজয়ের প্রথমপর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের দিকে। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের আত্মচেতনার প্রসার ও আত্মশাসনের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে শাসনযন্ত্রের দাক্ষিণ্য দেখা দেয় মুসলমান সম্প্রদায়ের দিকে, তাদের কাছে টানতে। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টারের লেখা 'দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স' (১৮৭১) স্মর্তব্য। ওদেরই কথা ধার করে বলা যায় : রাজনৈতিক খেলা ভালোই জমিয়ে তোলে ইংরেজ শাসক। দুর্ভাগ্য, ভারতীয় রাজনীতিকগণ এ বিষয়ে সচেতনতার প্রকাশ ঘটাতে পারেন নি। এ বিষয়ে তাদের তেমন আগ্রহ দেখা যায় নি।

তিন

ভারতীয় রাজনীতির এ ত্রিধারায় যেসব ঘটনা ও কালক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, ইতিহাসের বিশদ আলোচনায় না যেয়েও সেগুলোর বিচার ব্যাখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে ভারত বিভাগের উৎস সন্ধানে যথেষ্ট। সে অন্বেষায় ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবই নয়, যেতে হয় আরো পেছনে সুনির্দিষ্ট ঘটনার সন্ধানে ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায়, ১৯০৯ সনে মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার প্রস্তাবে, ১৯১৯ সনের একই ধারার মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাবে, ১৯২৬ সনে চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিলের ঘটনায়, ১৯২৮ সনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে মুসলিম লীগ ও জিন্নার ঐক্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে, ১৯৩৫ সনে ইংরেজ শাসকের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ প্রবর্তনে, ১৯৩৭-এ লীগ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের অনৈক্যে, ১৯৩৯-এ সূচিত বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রভাব বিবেচনায়, ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব নির্ধারণে, ১৯৪৫-এ সিমলা বৈঠক ও ওয়াভেল পরিকল্পনার ব্যর্থতা অনুধাবনে, ১৯৪৬-এ জওহরলালের অপরিণামদর্শী উক্তি ও ১৯৪৬ জুলাই-এ জিন্নার ততোধিক অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণার পরিণাম বিবেচনায়। এমনি কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট অবিশ্বাস-অনাস্থা, বিদ্বেষ-বিরূপতা ক্রমে ঘৃণা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দেয়। পূর্ব ঐক্য ও সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের কোনো জায়গা অবশিষ্ট থাকে না। ব্যতিক্রমীরা সংখ্যায় ও শক্তিতে গৌণ।

বিশেষ কালক্ষণের এ ঘটনাগুলো যেন রাজনৈতিক রসায়নাগারে সংঘটিত পরস্পর সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক বিক্রিয়া, বলা যেতে পারে 'চেইন রিঅ্যাকশন'। এদের মধ্যে কয়েকটি বুঝি নিয়তি নির্ধারিত ঘটনা। তবে সব কটিই কমবেশী গুরুত্ব নিয়ে একলক্ষ্যে ধাবমান। লক্ষ্য ভারত-ভাগ (তথা মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান)। তাছাড়া কয়েকটি ঘটনা যেন অর্জুনের লক্ষ্যভেদী শরসন্ধান, অব্যর্থ নিশানায় ছুটে গেছে মানবতা-বিরোধী তীর হয়ে রক্তাক্ত দেশভাগ নিশ্চিত করতে।

প্রতিটি কালক্ষণ আলোচনায় না এনেও গুরুত্বব্যঞ্জক ঘটনাগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যাই বোধহয় প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। ব্রিটিশ ভেদনীতির সূচনা যে কত আগে থেকে শুরু তার প্রমাণ ১৮৮৮ সনে ভাইসরয় ডাফরিনের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। যেমন '**পাঁচ কোটি ভারতীয় মুসলমান তাদের একেশ্বরবাদ, ধর্মীয় উন্মাদনা, পশু উৎসর্গ ও সামাজিক সাম্য নিয়ে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, বরং একটি জাতি**' (পিটার হার্ডি, সুমিত সরকার)। অবাক হবার কিছু নেই যদি জিন্না তার রাজনৈতিক প্রয়োজনে সম্প্রদায়কে জাতিত্বে পরিণত করার বহুমহাজনের উক্তি গ্রহণ করে থাকেন।

এ বিভ্রান্তিকর তথ্য, অনৈতিহাসিক তত্ত্ব প্রমাণ করতে ১৮৭১ সালে হান্টার তার বইতে বিশদ আলোচনা শেষে এমন মন্তব্য করেন যে 'ভারতীয় মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি জাতি, ব্রিটিশ শাসনে যাদের সর্বনাশ ঘটেছে'। এভাবে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে জাতি পরিচয়ে চিহ্নিত করার রাজনৈতিক দুর্বুদ্ধি ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষ থেকে শুরু হয় যা জিন্না পরে (১৯৪০) দ্বিজাতিতত্ত্বে প্রকাশ করেন লাহোর প্রস্তাবে এবং সে তত্ত্বের ভিত্তিতে 'মুসলমান জাতি'র জন্য ভারত ভেঙে স্বতন্ত্ররাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান।

এ ঘটনা অনেক পরের। হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক বিভেদ, পূর্বঘটনাবলী মেনে নিয়েও বলা যায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, প্রতিক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট শাসনতান্ত্রিক ঘটনাবলী থেকে শুরু। ভাইসরয় লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগের (১৯০৫) উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারা। বিপ্লববাদী আন্দোলনপ্রবণ বাংলাকে বিভক্ত করে ব্রিটিশ শাসন নিশ্চিন্ত করা। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ নিশ্চিত করা। শেষোক্ত ব্যবস্থা পূর্ববঙ্গের পশ্চাদপদ উঠতি মুসলমান শিক্ষিতশ্রেণীর জন্য ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। শিক্ষায়, চাকুরিতে, পদমান মর্যাদার নানাদিক বিচারে।

কিন্তু বাঙালি জাতিসত্তা বিভাজনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় যে ব্যাপক শাসক-বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয় তা শুধু রাজধানী কলকাতাকেন্দ্রিক ছিল না। তাতে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষিতশ্রেণীর যথেষ্ট সংশ্লিষ্টতা ছিল। ছিল জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের ইতিবাচক ভূমিকা যেমন গজনভি, রসুল, সিরাজী, ইসলামাবাদী, আবুল হুসেন, লিয়াকত হোসেন প্রমুখের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভূমিকা। ভয় পেয়েছিল ইংরেজ শাসক যে কারণে ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ।

কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববর্তী ঐক্যে ফাটল ধরে। নবাব সলিমুল্লাহ্ ও নওয়াব আলী চৌধুরী গ্রুপ ও শীর্ষ শাসনকর্তাদের সরাসরি মাঠপর্যায়ে প্রচার, স্বদেশী নেতাদের আন্দোলনে ধর্মীয় প্রতীকী চরিত্র (হিন্দুত্ববাদী) আরোপ, স্বদেশী পণ্য কেনাকাটার জবরদস্তিতে প্রতিক্রিয়ার টান জোরালো হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাই নয়, কোথাও কোথাও সংঘাত দেখা দেয়, বিশেষ করে ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে (১৯০৬-০৭ সনে)। সেইসময় জমিদার মহাজন বিরোধী কৃষক অভ্যুত্থান, তাতে সাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রকাশ। অন্যদিকে বিপ্লববাদে হিন্দুত্ববাদের প্রকাশ (গীতা, বন্দেমাতরম, ভবানীপূজা ইত্যাদি)। বিষয়গুলো রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনার কারণ হয়ে ওঠে। শিক্ষা, শিল্পকারখানা, সংস্কৃতি সব কিছু মিলে জাতীয়তাবোধের সেকুলার স্বদেশীয়ানার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মূলত ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতায় ও কিছু বাস্তব কারণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার নেতিবাদী প্রভাব নিশ্চিত করতে শাসক-শ্রেণীর দুটো উদ্যোগ ভবিষ্যত রাজনীতির জন্য সর্বনাশা হয়ে ওঠে। প্রথমত ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়ত, অধিক গুরুত্বপূর্ণ মর্লি-মিন্টো প্রস্তাবে (১৯০৯) হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টির বীজতলা পত্তন যা আবার ১৯১৯-এ মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে আরো পাকাপোক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর জন্য সংরক্ষণই যথেষ্ট ছিল। শেষ বিচারে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের বড় অবদান সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দেশাত্মবোধক গান, জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থান ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের বিস্তার। কিন্তু শেষ দুটোতে হিন্দুত্ববাদের উপস্থিতি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ক্ষেত্রে বিপরীত নিশানাই নিশ্চিত করে।

স্বদেশী আন্দোলন শুধু জাতীয়তাবাদী চেতনারই প্রকাশ ঘটায়নি, হিন্দু এলিট ও ভূস্বামী শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিমান করে তুলতে সাহায্য করে। এর বিপরীতে ক্রমবর্ধমান প্রজা অসন্তোষ বিশ থেকে তিরিশের দশকে শক্তিমান প্রজাআন্দোলন সংগঠিত করে (যা ছিল ব্যাপকভাবে মুসলমান-প্রধান)। এ দুই রাজনৈতিক শক্তিতে দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য হিন্দু-মুসলমান বিভেদের পথ তৈরি করে। সুমিত সরকারের মতে 'হিন্দুপ্রধান বাঙলা কংগ্রেসের ভুল ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতার ফলে মুসলিম বিচ্ছিন্নতার পরিপুষ্টি'। মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা-বিহারসহ একাধিক প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধর্মীয় ও শ্রেণীগত কারণে।

AMARBOI.COM

চার

স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিভেদ চেতনার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের চেষ্টাও চলেছে। এ চেষ্টার স্মরণীয় প্রতিফলন দেখা যায় চিত্তরঞ্জন দাস ও মোতিলাল নেহরুর স্বরাজ্য দলের (১৯২৩) সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সাফল্যে। বিশেষ করে চিত্তরঞ্জনের 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর কারণে হিন্দু-মুসলমান আসনে স্বরাজীদের বাংলা জয়। চিত্তরঞ্জনের এ প্রচেষ্টায় তার তিন তরুণ সহযোগীর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা– মেদিনীপুরের বীরেন্দ্র শাসমল, চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও কলকাতার সুভাষচন্দ্র বসু। রাঢ়বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের সমন্বয়ের কারণে অবিশ্বাস্য সাফল্য।

কিন্তু কংগ্রেসের শর্ষেতে ছিল ভূতের আশ্রয়, আন্তরিকতার অভাব। তাই চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক অকালমৃত্যুর (জুন, ১৯২৫) মতো নিয়তিনির্ধারিত ঘটনার পর ঐক্য ও সম্প্রীতির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। সুভাষ ও বীরেন্দ্র শাসমলের চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেস বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল করে (১৯২৬) মূলত তাদের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব ও হিন্দুমহাসভাপন্থীদের প্রভাবে। মোতিলাল নেহরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বধর্মীদের সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারের শিকার হয়ে পিছু হটেন। এ সময় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর জয়জয়কার। শুরু হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত।

অবশ্য অন্যদিকে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত' হিসাবে আখ্যায়িত জিন্নারও চেষ্টা সম্প্রদায়িক ঐক্যের, মূলত ১৯১৬ (লক্ষৌ প্যাক্ট) থেকে ১৯২৮ সন পর্যন্ত। তার প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল অখণ্ড ভারতের কেন্দ্রে এক তৃতীয়াংশ মুসলমান আসন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যালঘুর জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং সিন্ধুর প্রাদেশিক মর্যাদার মতো কিছু দাবি।

মোটামুটি হিসাবে যুক্তিসঙ্গত এসব দাবি কংগ্রেস তখন মানতে রাজি ছিল না। কারণ দুর্বোধ্য অথবা বলা যায় নিজ শক্তি সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস। পরবর্তীকালে এর চেয়ে বেশি ছাড় দিয়েও কংগ্রেস ভারতভাগ ঠেকাতে পারে নি। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ সর্বদলীয় কলকাতা সম্মেলনেও (১৯২৮) মুসলিম লীগের অনুরূপ প্রস্তাব এবং জিন্নার সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আহবান প্রত্যাখ্যাত হয় মূলত কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থা ও হিন্দুমহাসভাপন্থীদের চাপে। হতাশ, ক্ষুব্ধ জিন্নার মন্তব্য : 'এখন থেকে আমাদের পথ বিভক্ত হয়ে গেল'। এরপর তার লন্ডন-প্রবাস। এসব ঘটনায় কংগ্রেসের অপরিণামদর্শী অদূরদর্শিতাই প্রকাশ পেয়েছে।

পাঁচ

সংখ্যালঘু রাজনীতির প্রতি সহানুভূতি ও ভেদনীতির ওপর নির্ভরতা ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্য বলেই বোধহয় ১৯৩২ সনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতের জন্য সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের রূপরেখা তৈরি করেন। এ প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য পূর্ব ধারায় স্বতন্ত্র নির্বাচন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (অটোনামি) এবং সংখ্যাঘুর জন্য আসন সংরক্ষণ (যা ইউরোপীয়দের জন্য ছিল সর্বাধিক) ও ভাইসরয়ের সর্বময় ক্ষমতা, প্রদেশের ক্ষেত্রে গভর্নরদের। এ ব্যবস্থা ১৯৩৫ সনে ভারতে শাসনতান্ত্রিক আইনে পরিণত। এভাবে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার পাকা সড়ক তৈরি। কংগ্রেস ক্ষুব্ধ। কিন্তু বিরোধিতা ছাড়া তাদের করার কিছু ছিল না। আন্দোলনে গেলে তাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হতো।

ইতোমধ্যে নির্বাচন ঘোষণা। ফিরে এসেছেন জিন্না মুসলিম লীগের হাল ধরতে, কিন্তু ভিন্ন এক জিন্না যার চোখে কংগ্রেস এখন প্রতিপক্ষ। ঘোষিত ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচন সাম্প্রদায়িক নীতিতে হলেও এর ফলাফল সম্ভবত অখণ্ড গণতান্ত্রিক ভারতের জন্য শেষ সুযোগ তৈরি করেছিল। বিশেষ করে বঙ্গ ও যুক্তপ্রদেশকে কেন্দ্র করে। পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ সেকুলারপন্থীদের দখলে। বঙ্গদেশে প্রজাপার্টি ও লীগ কেউ নিরঙ্কুশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এ অবস্থায় ফজলুল হকের আহ্বান সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রজাপার্টির সঙ্গে যুক্তমন্ত্রীসভা গঠনে অসম্মতি জানায়। অগত্যা বঙ্গে লীগ-প্রজাপার্টি মিলে মন্ত্রীসভাগঠন।

এ ঘটনার গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য কংগ্রেস বুঝতে পারেনি। জিন্নার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধেও তাদের সঠিক ধারণা ছিল না। তাই প্রবাদের ভাষায় 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠ্যালা' কংগ্রেসের পক্ষে, যা কংগ্রেস একাধিক বার করেছে এবং ভারতবর্ষকে বিভাজনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই জিন্না সে সুযোগ নিয়েছেন। যেমন এক্ষেত্রে বাংলার 'শের'কে কোলে তুলে নিয়ে পরিচর্যা করা (অবশ্য পরে ছুঁড়ে ফেলার জন্য) যার ফলে বিভ্রান্ত হকের প্রজাপার্টিসহ মুসলিম লীগে যোগদান, এবং তার আত্মহননের পথ তৈরি করা।

দ্বিতীয় ঘটনা কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিচারে দুটোই তুল্যমূল্য। জিন্না যুক্তপ্রদেশ 'ইসু'কে যতই গুরুত্ব দিন না কেন প্রকৃতপক্ষে একাধিক ঘটনায় বাংলাই তার পাকিস্তান অর্জনে প্রধান শক্তি। জিন্নার আহবান ছিল যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস-লীগ যুক্ত মন্ত্রীসভাগঠন। কিন্তু কংগ্রেস তাতে সাড়া দেয়নি নির্বাচনে একেশ্বর হওয়ার কারণে। মুশিরুল হাসানের মতে এটা কংগ্রেসের মারাত্মক ভুল হিসাব। যুক্তপ্রদেশের গভর্নরের আশংকা ছিল, এ ধরনের ঐক্য যুক্তপ্রদেশে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াব (মুশিরুল হাসান)। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত তৈরি হতো। বঙ্গে ও যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের এ ভুল পদক্ষেপ কারো কারো মতে পাকিস্তান গঠনের তথা ভারতভাগের পক্ষে মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত।

বিশ্বযুদ্ধ যে জিন্না ও তার লীগের পক্ষে শাপে বর হয়েছিল তা হডসন, মেনন থেকে সবাই উল্লেখ করেছেন। এর কারণ কংগ্রেসের শাসক-বিরোধিতা ও আন্দোলন এবং লীগের শাসক সমর্থন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ছিল আরেক ভুল যা লীগের জন্য বিরাট সুযোগ এনে দেয়। জিন্না এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন যা লীগের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে। আর ভাইসরয় লিনলিথগো যুদ্ধাবস্থায় জিন্না ও লীগের দিকে সমর্থনের এক হাত নয়, দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তবে এটা ঠিক যে সবকিছুর পরও জিন্না সর্বশেষ প্রত্যাখ্যান (যুক্তপ্রদেশে) মেনে নিতে পারেন নি, যেমন পারেন নি ১৯২৮-এর কলকাতা সম্মেলনের ঘটনা। এবার প্রতিযোগিতা ও সংঘাতই নীতি হিসাবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন জিন্না। পরিণামে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদী লাহোর প্রস্তাব পাশ (১৯৪০)। এর পর থেকে কংগ্রেসকে প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করে যেকোনো মূল্যে তাকে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত জিন্নার। ভারতভাগ ও পাকিস্তান অর্জন হয়ে ওঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার জীবনের ধ্রুবতারা, অথবা বলা যায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ। চিত্রাঙ্গদার মতো বলতে হয় 'তুমি অর্জুন, তুমি অর্জুন'।

ফলে কংগ্রেস যখন স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলনে নেমেছে লীগ তার বিরোধিতা করেছে (যেমন ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলন)। এক্ষেত্রে লীগ মানে জিন্না। জিন্না তখন লীগের সর্বাধিনায়ক। বিশ্বযুদ্ধ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, ভাইসরয় লিনলিথগোসহ সবাই, সবকিছুই তখন জিন্নার জন্য সৌভাগ্যের জাদুকাঠি। তাই জিন্নাও 'এক দল, এক নেতা, এক শ্লোগান'-এ সওয়ার। শ্লোগান : ভারত ভেঙে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান চাই। কিন্তু শাসকশ্রেণী নানা কারণে, বিশেষত কংগ্রেসের আন্দোলন সংঘটিত করার ক্ষমতার কারণে সে মুহূর্তে ভারতভাগের পক্ষে ছিল না। তারা তখন জিন্নাকে অন্য কিছু দানে সন্তুষ্ট করার নীতি গ্রহণ করে চলেছে। তাই সমঝোতার লক্ষ্যে সিমলা বৈঠক, ওয়াভেল পরিকল্পনা ইত্যাদি।

কিন্তু জিন্নার জেদের কাছে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। অযৌক্তিক দাবি নিয়ে চলতে থাকেন জিন্না সমঝোতা প্রস্তাব বা বৈঠক অকার্যকর করে তুলতে। ইতোমধ্যে ব্রিটেনে বড় পরিবর্তন। নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে শ্রমিক দলের জয়। চার্চিলের স্থলে উদারপন্থী ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচারে তাদের সিদ্ধান্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতার হস্তান্তর ও সুসম্পর্ক রেখে ভারত ত্যাগ।

আর সে উদ্দেশ্যে সমঝোতার জন্য ভারতে কেবিনেট মিশন (মন্ত্রীমিশন) প্রেরণ। তাদের প্রস্তাবের বিশেষত্ব ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা, সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলমানের অধিকার রক্ষায় আধা-পাকিস্তান ধরনের ব্যবস্থা, প্রদেশগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্বল কেন্দ্র ইত্যাদি। বিশেষ করে সম্প্রদায় সংখ্যাধিক্য বিবেচনায় প্রদেশগুলোকে তিনটি গ্রুপে বিভাজন (গ্রুপিং ব্যবস্থা)। অনেক টানাপড়েন শেষে মিশন প্রস্তাবে লীগ কংগ্রেসের সম্মতি। ইতোমধ্যে সাধারণ নির্বাচনে জিন্নার বঙ্গদেশ জয়, সীমান্তপ্রদেশে হার, অন্যত্র জয় এবং পাঞ্জাব বাদে অন্যত্র লীগ মন্ত্রীসভা গঠন।

বাহুতে, পেশীতে যথেষ্ট শক্তি নিয়ে দেনদরবার শেষে কিছুটা অহমিকা ধরে রেখে, অনেকটা অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে জিন্নার মন্ত্রীমিশন প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন। হিন্দু আসনে একাট্টা বিজয়ে আত্মহারা কংগ্রেস এবারও পরিস্থিতি বিচারে ভুল করে, লীগের শক্তি পরিমাপে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। অথচ এ মূল্যায়ন একজন সাধারণ রাজনীতিকের জন্যও ছিল সহজ। এ ভুলের দায় ঠিক দলের নয়, নবনির্বাচিত দলীয় সভাপতি জওহরলালের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনিতেই নানা বিষয় নিয়ে মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব গ্রহণ-বর্জনে লীগ কংগ্রেসে টানাপড়েন চলছিল এর মধ্যে নেহরুর এক বেফাঁস উক্তিতে বিনা মেঘে বজ্রপাত। দিনটা ছিল ১০ জুলাই, ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি জওহরলালের, কী ভেবে তা কেউ জানে না, সাংবাদিক সম্মেলনে হঠাৎ মন্তব্য যে, কংগ্রেস মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করলেও সেখানকার নিয়মনীতিতে তাদের হাত পা বাঁধা নেই। বিকল্প চিন্তার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রের হাতে শুধু তিনটে বিষয় থাকবে সেটাও ঠিক নয়। বলা বাহুল্য এ বক্তব্য দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল না।

এর পরিণাম হয়ে ওঠে ভয়াবহ। আজাদ সঙ্গে সঙ্গেই এ বক্তব্য 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাদের পূর্ব অবস্থান নিশ্চিত করে বিবৃতির মাধ্যমে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নেহরুর বক্তব্যে লীগ নেতৃত্বে এবং ব্রিটিশরাজ মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর জিন্না? হিসাব নিকাশ করে মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হন না, পাকিস্তান অর্জনের জন্য ১৬ আগস্ট ভারতব্যাপী 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করেন। এ সংগ্রাম হয়ে ওঠে জিহাদ। তাদের ভাষায় কংগ্রেস তথা হিন্দু এবং ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে।

এর অকুস্থল হয়ে ওঠে বঙ্গের রাজধানী কলকাতা। সেখানে লীগ মন্ত্রীসভা, সোহ্‌রাওয়ার্দি মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা নগর লীগের প্রধান নেতা ইস্পাহানি-সিদ্দিকীদের জ্বালাময়ী সাম্প্রদায়িক ভাষণে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা। হিন্দু মহাসভাও সমান তীব্রতায় প্রচারে নামে। পরিণামে 'মহা কলকাতা হত্যাকাণ্ড', বলা চলে সাম্প্রদায়িক গণহত্যা। সমঝোতার কফিনে শেষ পেরেক।

কারণ এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালিতে দাঙ্গা, পালটা প্রতিক্রিয়ায় বিহারে হত্যাযজ্ঞ যা কলকাতাকেও ছাড়িয়ে যায়। এর প্রভাব দেখা দেয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে। গান্ধি-নেহরু-প্যাটেলদের অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন চুরমার। পরবর্তী ঘটনাবলী এর ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া বা 'চেইন রিঅ্যাকশন'। ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে মাত্রায় অবিশ্বাস, অনাস্থা, বিদ্বেষ-বিরূপতা ও ঘৃণা জন্ম নেয় তাতে সমঝোতার কোনো জায়গাই আর অবশিষ্ট থাকে নি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রাজনৈতিক মিনি কুরুক্ষেত্রের নায়কদের অসহিষ্ণুতা, জেদ, অপরিণামদর্শিতা, সর্বোপরি প্রবল রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঐক্য ও সম্ভাবনা সব নষ্ট করে দেয়, নিবার্য ভারতবিভাগ অনিবার্য করে তোলে। ভারতভাগ ঠেকাতে দরকার ছিল কিছু মাত্রার সহিষ্ণু উদারতা ও লেনদেনের মানসিকতা। ভারতভাগকে পরবর্তীকালে লেখক-বিশ্লেষকগণ নানা অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। কেউ বলেছেন 'ঐতিহাসিক ভুল' যে ভুলের হাত ধরে সম্ভাবনার বিসর্জন। পরিণামে খণ্ডিত ভারত ও 'পোকায় খাওয়া পাকিস্তান'। রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবে নেতাগণ বিভাগের ভবিষ্যত দেখতে পাননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশভাগ বাংলাভাগ : জাতীয়তাবাদ থেকে সাম্প্রদায়িকতায়

বর্তমান আলোচনায় ভারতভাগের পটভূমিতে বাংলাভাগের কারণ খুঁজতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, এমনকি তার পূর্বসূত্রও বিবেচনায় আনতে হয়। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ রদের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু বঙ্গেরই নয়, ভারতীয় রাজনীতির বিচারেও এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, মাইলফলক বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ এর অর্জন ও বিসর্জন দুই-ই তাৎপর্যপূর্ণ। আর সে তাৎপর্য বুঝতে ১৯ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও তার নায়কদের ভূমিকা উল্লেখ করা দরকার পড়ে। প্রথম ও শেষ বঙ্গবিভাগ, দুটোর প্রতিক্রিয়াই আর্থ-সামাজিক রাজনীতির হিসাব-নিকাশের সঙ্গে যুক্ত এবং তা উভয় সম্প্রদায়কে বিবেচনায় নিয়ে।

খুব সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে বলা যায়, ১৯ শতকে এলিট হিন্দু সম্প্রদায়ে রাজধানী কলকাতাভিত্তিক যে সামাজিক নবজাগরণ তা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতিভিত্তিক হলেও সে আধুনিকতার সঙ্গে ধর্মীয় চেতনার গভীর মিশ্রণও এক অবাঞ্ছিত ও অনাধুনিক বাস্তবতা। সেই মিশ্র চরিত্র নিয়ে বঙ্গভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ। এক্ষেত্রে বঙ্গের ভূমিকা, বঙ্গীয় হিন্দু এলিট তথা 'ভদ্রলোক' শ্রেণিরই একক ভূমিকা। পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রেরণা ও উদ্দীপক স্লোগান যেমন 'বন্দেমাতরম' এই সামাজিক ধ্যান-ধারণা থেকেই এসেছে। বিষয়টি বর্তমান আলোচনায় একাধিক প্রসঙ্গের তাগিদে বারকয় উল্লেখ করতে হয়েছে পুনরাবৃত্তির ত্রুটি মনে রেখেও।

ইংরেজ শাসনের পৃষ্ঠপোষকতা ও দাক্ষিণ্যে সৃষ্ট এই ভূস্বামী ও এলিট শ্রেণি একদিকে রাজভজনায় ব্যস্ত, অন্যদিকে এদের উত্তরসূরি ব্রিটিশবিরোধী তথা শাসকবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনক (যেমন নিয়মতান্ত্রিক তেমনি বিপ্লববাদী)। ট্রাজেডি হচ্ছে বহুজাতি-বহুভাষাভিত্তিক ভারতবর্ষে একক ভারতীয় জাতীয়তার উদ্ভব না ঘটায় শাসকবিরোধী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় চেতনায় নিষিক্ত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ জন্মের সুযোগ তৈরি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর সামাজিক-রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা আধুনিকতার সঙ্গে মেলে না– যদিও এ দুটোই শিক্ষিত হিন্দু এলিট শ্রেণির অবদান, বিশেষভাবে বঙ্গে, সেই প্রভাবে অন্য কয়েকটি প্রদেশে। মেলে না ধর্মীয় উপাদান প্রেরণা হিসেবে আধুনিকতা ও রাজনীতি, দেশপ্রেম ও স্বাদেশিক তৎপরতার সঙ্গে একাকার করে নেয়ার কারণে। আধুনিক চেতনা ও সনাতন হিন্দু ভারতীয় ঐতিহ্যের মিশ্রণে যে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রকাশ, স্বভাবতই তাতে ছিল প্রচণ্ড স্ববিরোধিতা, ছিল আধুনিকতার সঙ্গে রক্ষণশীলতার প্রকাশ। মুসলমান সমাজ একই পথ ধরেছে যদিও বেশ কিছু সময় পরে। এ কাজে তাদের সহায়তা দিয়েছে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি। এলিট হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণির এ জাতীয় স্ববিরোধিতা 'মনু ও মার্কসের মিশ্রণ' বলে রসিকতা করেছেন তাদেরই কেউ কেউ।

স্ববিরোধিতা মুসলমানদের ক্ষেত্রেও ছিল। তবে উত্তর ভারতীয় মুসলমানরা এদিক থেকে কয়েক পা এগিয়ে। মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) ইতিবাচক ভূমিকা শেষে একদিকে স্যার সৈয়দ আহমদ ও আলীগড়গোষ্ঠী যেমন আধুনিক শিক্ষার পক্ষে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ সমর্থক এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রদায়বাদী, অন্যদিকে দেওবন্দ উলেমাগণ প্রচ্ছন্ন ব্রিটিশবিরোধী ও অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু মাদ্রাসা-শিক্ষা ও ধর্মীয়চেতনার প্রসার আধুনিকতার সঙ্গে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে। দেওবন্দের ছাত্র মওলানা ভাসানী সমাজবাদী স্বার্থের রাজনীতিক হলেও বাংলাদেশে একই ঘরানার বর্তমান হেফাজতিপ্রধান (চট্টগ্রামের) মাওলানা আহমদ শফি কট্টর রক্ষণশীল। ধর্মীয়চেতনার প্রাধান্য তাই গণতন্ত্রী অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচ্য। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীদের ধর্মীয় হেদায়েত বঙ্গীয় মুসলমানদের আধুনিকতার অঙ্গন থেকে পিছু হটতে সাহায্য করেছে। যেমন করেছে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার।

বঙ্গীয় মুসলমানদের দুর্দশার কারণ ইতিহাসের অমোঘ ঘটনাবলী, ইংরেজের বঙ্গদেশ দখল ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে তাদের ভেদনীতি, সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক শিক্ষানীতি (মাদ্রাসা শিক্ষা) ইত্যাদি। ক্ষমতাবান জমিদার, সুদখোর মহাজন– এ দুইয়ের শাসন-শোষণের শিকার দরিদ্র কৃষক-কারিগর শ্রেণি (যাদের অধিকাংশ মুসলমান)। দারিদ্র্য-মাদ্রাসাশিক্ষা-দারিদ্র্য এই বিষচক্রের পরিণামে ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় সম্প্রদায় চেতনা। উত্তর ভারতের ভূস্বামী ও শিক্ষিত শ্রেণীর তুলনায় বঙ্গে মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণির বিকাশ দেরিতে, তার এলিট উপশ্রেণী তো আরো দেরিতে। ফলে বঙ্গে নানাভাবে সৃষ্ট হিন্দু-মুসলমানের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও দূরত্ব রাজনীতির জন্য অশনিসঙ্কেতই বলতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বৈষম্যের বিচ্ছিন্নতাকে রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করেছেন অনেকে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, এস ওয়াজেদ আলী, অধ্যাপক সুশোভন সরকার, অশোক মিত্র (আই-সিএস) প্রমুখ, পরবর্তী সময়ে অনেকে, বিশেষত কেমব্রিজ অক্সফোর্ড গ্রুপের রিভিশনিস্টগণ। উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁস তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক চরিত্রের স্ববিরোধিতার মধ্যেই হিন্দুত্ববাদ ও সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়ে বিশ শতকের রাজনীতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। এর ফল শুভ হয়নি। এতে করে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

অথচ এই রেনেসাঁসের চরিত্র নিয়ে অন্ধ প্রশস্তিই প্রাধান্য পায়। অধ্যাপক সুশোভন সরকার এ সম্বন্ধে অবশেষ বিচারে নম্র ভাষায় লেখেন : 'এদেশের ব্যাপকসংখ্যক সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের রেনেসাঁসের কর্ণধারদের দূরত্ব ছিল যোজন সমান। ...আন্দোলনের আলোকপ্রাপ্ত 'ভদ্রলোক'দের মধ্যে হিন্দুসুলভ প্রবণতাটা ছিল একান্তই স্পষ্ট। ফলে দূরে সরে গিয়ে ছিল মুসলি-মরা।' এ জাতীয় বক্তব্য আরো তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সূত্রের লেখায় এবং অশোক মিত্রের বিশ্লেষণে। মার্কসবাদী ঘরানার কেউ কেউ যেমন ভবানী সেন, বিনয় ঘোষ তির্যক বাক্যবন্ধে রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতা ও তার সম্প্রদায়বাদী প্রবক্তাদের সমালোচনা করেছেন। লক্ষ্যণীয় এদের রচনাতেই বর্তমানের বহুকথিত 'ভদ্রলোক'তত্ত্বের সূচনা, যে তত্ত্ব একালের বিশ্লেষকগণ নানা শাখায়, নানা প্রসঙ্গে বিকশিত করে তুলেছেন।

AMARBOI.COM

দুই

এ ধারাবাহিকতায় বিশ শতকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ (প্রথম বঙ্গবিভাগ) ও তার প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপক প্রতিবাদী আন্দোলন যা শুধু রাজধানী কলকাতাই নয়, দেশের বেশ কিছু শহরেও আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে ধরা দিয়ে ছিল। মূলত হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণির হাতে সূচিত হলেও জাতিগত সচেতনতার টানে বেশ কিছুসংখ্যক বিভিন্ন পেশার শিক্ষিত মুসলমান এ আন্দোলনে অংশ নেন।

এ আন্দোলন চরিত্র বিচারে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণির। প্রতিবাদের ঝড় এ উপলক্ষে বয়ে যায় এবং জাতীয়তাবাদভিত্তিক স্বদেশিয়ানার গঠনমূলক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৎপরতা প্রকাশ পায় (শিক্ষা এবং কারিগরি ও শিল্পখাতে)। এ ঘটনা বাঙালি জাতির জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাতে ক্রমশ প্রতীকে, বক্তব্যে, প্রচারে হিন্দুত্ববাদের প্রকাশ ঘটতে থাকে। সরকারের দমননীতিও সেই সঙ্গে তীব্র হতে থাকে। কিন্তু একাধিক সূত্রে এর স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতার প্রকাশও দেখা যায়। চরিত্র বিচারে এ আন্দোলন শ্রেণিবিশেষের এবং নগর ও শহর কেন্দ্রিক। এ সম্বন্ধে সুশোভন সরকারের উক্তি উল্লেখযোগ্য : 'অনেক বিখ্যাত জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পেশার নামকরা লোকেরা যোগ দিলেন এই গণআন্দোলনে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে শ্রমিক বা কৃষকদের সংগঠিত করা বা জাগিয়ে তোলার জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়া হলো না।'

এখানে আন্দোলনের প্রকৃত দুর্বলতা এবং 'ভদ্রলোক' শ্রেণির পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক ছিল তাদের শ্রেণিস্বার্থ-বিবেচনায়। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, 'গ্রাম পড়ে আছে মধ্যযুগে, শহর আধুনিক যুগে', এ সত্য নেতাদের উপলব্ধিতে ধরা পড়েনি। 'স্বদেশী জিনিস কিনুন' এ আহ্বানে দরিদ্র কৃষক, কারিগর, জেলে, জোলা, তাঁতি সাড়া দেয়নি। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় উঠে এসেছে। মুনাফালোভী বোম্বাই-আহমেদাবাদের মিলমালিকেরা কাপড়ের দাম এত বাড়িয়ে দেয় যে তা বিলেতি কাপড়কে ছাড়িয়ে যায়। এ বিষয়ে স্বদেশীদের জবরদস্তির প্রতিবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ নিম্নবর্গীয় মুসলমান জনতার পক্ষ নিয়ে। প্রবন্ধ ছাড়াও তার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এর কিঞ্চিৎ আভাস মিলবে।

যুক্তবঙ্গের পক্ষে একটি বিশাল সম্ভাবনাময় দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন নিছক বিচক্ষণতার অভাব ও সম্প্রদায়বাদী সঙ্কীর্ণতার কারণে (বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও) সমন্বয়বাদী রাজনীতির পথ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে নবাব সলিমুল্লাহ, জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখের সম্প্রদায়বাদী প্রচার পূর্ববাংলার মুসলমান জনতাকে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিল। বিক্ষিপ্তভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘাতও দেখা দেয় শাসকশ্রেণীর মদতে এবং উল্লিখিতদের সাম্প্রদায়িক প্রচারের ফলে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের এ ব্যর্থতার জন্য হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির স্বার্থপরতা ও আচার-আচরণগত সঙ্কীর্ণতাকেও দায়ী করেছেন। 'চাষা ব্যাটা বনাম বাবু ভদ্রলোক'তত্ত্বের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ সরস ভাষায় নানা উপলক্ষে তুলে ধরেছেন। এমন কথাও লিখেছেন 'যাহাদিগকে আমরা 'চাষা বেটা' বলিয়া জানি, ...সুদিনে-দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ তাহাদের নিকট ভাই সম্পর্কের পরিচয় দিয়া চড়া দামে জিনিস কিনিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা।' অন্যত্র 'আমরা যে মুসলমানদের বা দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনো দিন দিই নাই।' বড় কঠিন, অপ্রিয় সত্য! হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছিন্নতার সুস্পষ্ট যাত্রা এভাবে চিহ্নিত হয় সামাজিক অঙ্গন থেকে, ছড়িয়ে যেতে থাকে রাজনৈতিক অঙ্গনে।

বঙ্গদেশ থেকে এর সূচনা হলেও পাঞ্জাব মারাঠা তাতে কম জ্বালানি যোগ করে নি। তবে সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের মাধ্যমে বিভেদ-বিদ্বেষের তীব্র সূচনা ঘটান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার উপন্যাসমালায়, বিশেষ করে 'আনন্দমঠ', 'চন্দ্রশেখর' ও 'সীতারাম'-এ। প্রচণ্ড মুসলমান-বিদ্বেষ জারিত 'আনন্দমঠ'-এর মহামন্ত্র 'বন্দেমাতরম' হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লববাদের সঞ্জীবনমন্ত্র, রাজপথের স্লোগান যা গ্রহণ করতে পারেনি বঙ্গীয় মুসলমান। পরিবর্তে তাদের স্লোগানও হয়ে ওঠে ধর্মীয় পঙ্ক্তি 'আল্লাহু আকবর'। ব্যস, তাদের পথ ভিন্ন হয়ে যায়। দুঃখজনক যে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ধীমানদের অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে যুক্তিহীনভাবে উদার। ব্যতিক্রম তরুণ প্রজন্মের কেউ কেউ।

ক্রমে বঙ্কিম-বিরোধী প্রতিক্রিয়া মুসলমান সমাজে এতটা তীব্রতা নিয়ে দেখা দেয় যে, কলকাতার রাজপথে পোড়ানো হয় 'আনন্দমঠ'। অগ্রসর চেতনার শিক্ষিত হিন্দু এলিট শ্রেণি এই মুসলিম মানসকে বুঝতে চায়নি, বোঝার প্রয়োজন বোধ করেনি। পশ্চাদ্‌পদ যাত্রীকে নিয়ে কে মাথা ঘামায়। দীর্ঘকাল পর সেই ভদ্রলোক তথা এলিট শ্রেণিরই স্বনামখ্যাত কবি এই পূর্ববঙ্গীয়দের কপালে চন্দন টিপ পরিয়ে দেন বায়ান্নর ভাষাশহীদদের উদ্দেশে 'শহীদ বাংলা' কবিতা লিখে 'ওরাই মুক্তির দূত বাঙালি জাতির ভয়ত্রাতা/বাঙালি মুসলিম ওরা বাঙালি হিন্দুর মুক্তিদাতা'– বিমলচন্দ্র ঘোষ। আর একাত্তরের যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলা পত্তনের (১৯৭১) সাফল্যে উদ্বেল কবি বিষ্ণু দে লেখেন 'জ্যেষ্ঠ তোমরা। গড়ে দিলে প্রতিভাস'।

এহ বাহ্য! এ রোমান্টিকতাই যে শেষ কথা নয়, তার প্রমাণ মিলেছে আরো পরে। আপাতত সে কথা থাক, তা পরে বিবেচ্য। সাহিত্য থেকে রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রভাব এমনি যে বিদগ্ধ পণ্ডিতজনও এই বিভেদচেতনা বুঝেশুনে, ভেবেচিন্তে তাদের ধ্যানধারণা ও কর্মে এর বিস্তার ঘটিয়েছেন। যেমন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, সমাজ সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ (জয়া চ্যাটার্জি, 'বেঙ্গল ডিভাইডেড')। এদের সঙ্গে যোগ করা যায় উগ্রজাতীয়তাবাদী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালসহ একাধিক জনের নাম। তাদের বক্তব্যও উদ্ধার করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

জাতীয়তাবাদ (ভারতীয় বা বাঙালি) স্বভাবতই আর শুদ্ধ গণতান্ত্রিক চেতনার জাতীয়তাবাদ থাকেনি, ভারতে তো বটেই (তিলক, লালা লাজপত প্রমুখ নেতার কল্যাণে) এবং বঙ্গে। এমনকি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মধ্যপন্থীরাও এ স্রোতে গা ভাসিয়েছেন, বলেছেন সুস্পষ্ট বিভেদপন্থী জাতীয়তার কথা। এসবই তৎকালীন বাঙালি 'ভদ্রলোক' তথা এলিট শ্রেণির অবদান। বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতায় হিন্দু-মুসলমানের মহামিলনযাত্রা চোরাবালিতে তলিয়ে যায় (অবশ্য বেশ পরে)। কলকাতা জামে মসজিদে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য চেতনার 'রাখিবন্ধন' অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমীরা অতিশয় সংখ্যালঘু। তবু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা নিরন্তর।

স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় সে সম্বন্ধে কয়েক অনুচ্ছেদ লেখা। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রসর সম্প্রদায়ের এ বিভ্রান্তি ও সঙ্কীর্ণ মানসিকতা প্রত্যাশিত ছিল না। জাতিসত্তা-জাতীয়তা ভিত্তিক স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫ থেকে) প্রবল জাতীয়তাবাদী আবেগ ধারণ করেও ধর্মীয় চেতনার টানে সম্প্রদায়বাদী রাজনীতির পথ তৈরি করে (জয়া চ্যাটার্জি ব্রিটিশ-বিরোধিতার কারণে একে সম্প্রদায়বাদী হিসেবে চিহ্নিত করেননি)। এ ধারা মাঝে মধ্যে ব্যাহত হলেও শেষপর্যন্ত বিভেদপন্থারই জয় হয়েছে। নিশ্চিত পথ তৈরি হয়েছে বিচ্ছিন্নতার। সুযোগ বুঝে ব্রিটিশরাজ নিয়মিত তাতে জ্বালানি যোগ করেছে।

মূল আলোচনায় ব্রিটিশ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। যেমন বঙ্গভঙ্গ রদ করার বিপরীতে সান্ত্বনা স্বরূপ ১৯০৯ সালে মর্লিমিন্টো সংস্কার প্রস্তাবে স্বতন্ত্র নির্বাচন ও সংখ্যালঘুর জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় শাসক সহযোগিতা, ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারে স্বতন্ত্র নির্বাচন ও মুসলিম সুবিধাদি। এতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদচেতনা ও উত্তেজনা বাড়ে। গান্ধী খিলাফত সৌহার্দ্য (রজত রায় কথিত ধর্মনির্বিশেষ 'ভাইফোঁটা' অনুষ্ঠান) বেশি দিন টেকেনি।

হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী (রিভাইভালিস্ট) প্রচেষ্টা, ভবানীপূজা, শিবাজি উৎসব ইত্যাদি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিচ্ছেদ প্রবণতা আরো বাড়িয়ে তোলে। চৈত্রমেলা হিন্দুমেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগোপাল মিত্র (আইসিএস), রাজনারায়ণ বসুর মতো শীর্ষ ভদ্রলোক শ্রেণির ব্যক্তিরও হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে কোনো অসুবিধা হয়নি। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, এই এলিটদের জীবনে আধুনিকতা ও সনাতনী বিশ্বাস হাত ধরাধরি করে চলেছে। বিশেষ করে আচার-আচরণে, ধর্মীয় সংস্কারে, সর্বোপরি বিশ্বাস ও যুক্তির ক্ষেত্রে। চৈতন্যের গভীরে এমনি ধারা স্ববিরোধিতা শিক্ষিত শ্রেণি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালন করেছে। সে তুলনায় গ্রামীণ সমাজ অনেকটাই একমুখী, দ্বিচারিতায় আসক্ত নয়।

চার

বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সৌহার্দ্য ভেঙে যাওয়ার একাধিক কারণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি উদাহরণ স্বরাজ্য দলের প্রধান চিত্তরঞ্জন দাসের সম্প্রদায়গত সমন্বয় চেষ্টার মৃত্যু। পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে এর শিক্ষিত শ্রেণিকে এগিয়ে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে চিত্তরঞ্জন যে সমঝোতা চুক্তি করেন তা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) নামে খ্যাত। এতে বঙ্গীয় মুসলমানদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণমূলক সুবিধাদির ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ করে স্থানীয় সংস্থাগুলোর নির্বাচনে। এর সুফল দেখা যায় বঙ্গীয় রাজনীতির সম্প্রদায়গত ক্ষেত্রে। প্রমাণ মুসলমান আসনগুলোতে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থীদের বিপুল জয়।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল প্রয়াণের (১৯২৫) পর কংগ্রেসের উদ্যোগে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল করা হয় (১৯২৬)। বীরেন্দ্র শাসমল প্রমুখ চিত্তরঞ্জন অনুসারী স্বরাজ্য-নেতাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আবার দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। মূল কংগ্রেসী নেতাদের সম্প্রদায়গত দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎপরতা লক্ষ্য করে কংগ্রেস থেকে মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতাদের একে একে নিষ্ক্রমণ। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, কংগ্রেস মূলত হিন্দুস্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠান।

জয়া চ্যাটার্জি তার বইতে (বেঙ্গল ডিভাইডেড) তমিজউদ্দিন খানের লেখার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে কংগ্রেসের হিন্দু সম্প্রদায়বাদিতার উল্লেখ রয়েছে। তবু কিছুসংখ্যক মুসলমান তখনো কংগ্রেসে টিকে ছিলেন সেটিকে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে। চল্লিশের দশকে পৌঁছে তাদেরও অনেকের ভুল ভাঙে, বিশেষ করে বঙ্গে। এর পেছনেও ছিল একাধিক ঘটনা। যেমন ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিলের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দলসহ কংগ্রেস সদস্যরা জোটবদ্ধ হন। তারা কৃষক-প্রজা স্বার্থের বিরুদ্ধে জমিদার ভূস্বামীদের পক্ষে অবস্থান নেন। প্রমাণ হয় যে, কংগ্রেস মুসলিম লীগের মতোই ভূস্বামী, বিত্তবান ও শিক্ষিত শ্রেণির প্রতিনিধি এবং এদের স্বার্থরক্ষা তাদের রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব, দরিদ্র কৃষক প্রজাদের স্বার্থরক্ষা নয়।

নানা উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা যেমন সারা ভারতে, তেমনি বিশেষভাবে বঙ্গে যত না রাজনীতিনির্ভর ঘটনা, তারচেয়ে অনেক বেশি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক। একাধিক লেখকের গবেষণাভিত্তিক বিবরণে তা প্রকাশ পেয়েছে। সেই গৌণ সমস্যা নিরসনের দিকে দুই সম্প্রদায়ের শীর্ষ নেতাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। বরং উভয় সম্প্রদায়ে গড়ে উঠতে দেখা যায় রক্ষণশীল ধর্মীয় সামাজিক সংগঠন যা ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সহায়ক এবং সেটা দীর্ঘ সময় থেকে।

যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ে 'আর্য সমাজ', 'শুদ্ধি আন্দোলন', 'গো-রক্ষা সমিতি'র মতো সংগঠন যেগুলোর তৎপরতা সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় জ্বালানি যোগ করেছে। অন্যদিকে মুসলমান সমাজে ধর্মীয় সংস্কার, শুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৃষ্ট উত্তর ভারতীয় মৌলানাদের তৎপরতার প্রভাব দেখা গেছে বঙ্গে, বিশেষ করে শহর ও গ্রামাঞ্চলে (রফিউদ্দিন আহমেদ : 'দ্য বেঙ্গল মুসলিমস')। স্থানীয় মোল্লা-মৌলভীদেরও তাতে উৎসাহ বাড়ে। প্রসঙ্গত কেরামত আলী জৌনপুরীর ধর্মীয় প্রচারের কথা অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এ জাতীয় ধর্মীয় সংস্কারের প্রভাব পড়ে মানুষের সাম্প্রদায়িক মানসিকতায়।

এসবের সঙ্গে রাজনীতির যোগসাজশ ঘটলে সোনায় সোহাগা। কথাটা ইতিপূর্বে উল্লিখিত যে কংগ্রেসের একাংশে হিন্দুত্ববাদের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। সরদার প্যাটেল প্রমুখ রক্ষণশীল নেতাদের কথা বাদ দিলেও গান্ধী নিজেও যেমন ছিলেন হিন্দুত্ববাদী ও সনাতনপন্থী তেমনি চলেছেন মদনমোহন মালব্য, মুঞ্জে প্রমুখ কট্টর হিন্দুমহাসভাপন্থীদের হাত ধরে। ভেবে দেখেননি এর প্রতিক্রিয়া মুসলমান সমাজে কীভাবে দেখা দিতে পারে। অথচ তিনি তো ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও ঐক্যের প্রবক্তা।

মোপলা কৃষক বিদ্রোহ ছিল বিভ্রান্তিকর সাম্প্রদায়িক মূল্যায়নের একটি বড়সড় উদাহরণ। দক্ষিণের শোষিত মোপলা কৃষকদের উত্থানের বড় কারণ ছিল ভূস্বামীদের প্রবল অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অবজ্ঞা। শোষকশ্রেণি বর্ণহিন্দু বিধায় বিষয়টি সাম্প্রদায়িক চরিত্রে চিহ্নিত হয়। অবশ্য এর সঙ্গে মোপলাদের সাম্প্রদায়িক তৎপরতাও জড়িত ছিল। যেমন দেখা গেছে বাংলার ময়মনসিংহে বা একাধিক কৃষক আন্দোলনের দ্বিমুখী চরিত্রে। মোপলা বিদ্রোহ সম্পর্কে হিন্দু মহাসভা নেতা মুঞ্জের একপেশে রিপোর্ট রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল।

সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পেছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও শিক্ষিত শ্রেণির সংশ্লিষ্টতা বরাবরের, নিরপেক্ষ ইতিহাসে তার প্রমাণ ধরা রয়েছে। পূর্বোক্ত ঘটনাদির বিপরীতে উল্লেখ করা যায় কলকাতার সাম্প্রদায়িক সংঘাতে উচ্চশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বা স্যার আবদুর রহিমের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা বা ইন্ধন জোগানোর ঘটনাদি। প্রকৃতপক্ষে দুই সম্প্রদায়েরই 'ভদ্রলোক' শ্রেণি এ বিষয়ে যত নষ্টের গোড়া। এরাই বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থায়ী বা সংহত হতে দেয়নি, বরং বিভেদচেতনা নানাভাবে উস্কে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে তাদের শ্রেণিস্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে হয়তো রক্ষিত হয়েছে। এদেরও নেপথ্যে ছিল উভয় সম্প্রদায়ের পুঁজিপতি শ্রেণি। যেমন একদিকে বিড়লাদের মতো একাধিক গোষ্ঠী তেমনি অন্যদিকে ইস্পাহানিদের মতো গ্রুপ। এদের উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি।

পাঁচ

ইংরেজ বণিক বা শাসক রাজনীতিকদের চাতুর্যের খেলায় ভারত কখনো পেরে ওঠেনি। কী মুঘল ভারত কিংবা নবাবী বাংলা। সে এক সহৃদয় নির্বুদ্ধিতা বা উদারতার ইতিহাস– বলা চলে প্রাচ্য প্রকৃতি। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে পৌঁছে রাজনীতির শতরঞ্জ খেলায় ইংরেজ শাসকের চাতুর্যের কাছে লীগ-কংগ্রেসের হার– লীগের কম, কংগ্রেসের বেশি। এ পরাজয় উভয়েরই কারণে, তবে এ ক্ষেত্রে লীগের তথা জিন্নার দায়দায়িত্ব বেশি।

ভারতবিভাগের সঙ্গে বঙ্গবিভাগের যোগসূত্র অনস্বীকার্য। ভারতীয় রাজনীতির নাট্যমঞ্চে নাটকের কুশীলবদের কল্যাণে এবং নানা অনভিপ্রেত ঘটনার টানে অখণ্ড ভারতের স্তম্ভগুলো ৪৫ থেকে ৪৭-এর প্রথমার্ধ সময়ে এক এক করে ভেঙে পড়ছে দেখেও সতর্ক হয়নি কংগ্রেস নেতৃত্ব ও বামঘরানার রাজনীতিকগণ। একই সঙ্গে যুক্তবঙ্গের সম্ভাবনাও ক্রমশ দূরে সরে গেছে। বাঙালি হিন্দু-মুসলিম রাজনীতিক তখনও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার চাপে ভারাক্রান্ত।

প্রথম বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী নেতাদের পরবর্তী কংগ্রেসী ও হিন্দুমহাসভা নেতৃত্ব পরিস্থিতির টানে এ পর্বে বিপরীতমুখী– মূলত সাম্প্রদায়িক চেতনার ব্যাপক প্রভাবে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাও উভয় পক্ষকে পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। তবু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা বলে কথা আছে না? সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজ করেনি। করেনি বিশেষ করে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড ও বঙ্গীয় খাদিপন্থীদের মধ্যে। তাদের আত্মঘাতী রাজনীতির একাধিক উদাহরণ তুলে ধরেছেন জয়া চ্যাটার্জি।

বঙ্গের সমাজ ও রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার যেমন সম্প্রদায়বাদী মুসলিম লীগের তৎপরতায় তেমনি হিন্দুমহাসভা ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসেরও মাধ্যমে। সামাজিক বিভেদ রচনায় হিন্দু 'ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িকতা' ('ভদ্রলোক কমিউনালিজম')কে মূলত দায়ী করেছেন জয়া চ্যাটার্জি পূর্বোক্ত বইতে। রবীন্দ্রনাথ থেকে একাধিক চিন্তাবিদ সমকালে একই কথা বলেছেন যদিও সংখ্যায় তারা খুবই অল্প।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ও সম্ভাব্য ভারতভাগের অঘটনে দ্বিতীয় বঙ্গবিভাগ যে অনিবার্য হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে সংঘটিত কলকাতা হত্যাকান্ড ঠিকই দেশভাগের অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু এর নেপথ্যে রয়েছে দূষিত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ যা উভয় সমাজের হাতে তৈরি, তাতে বাতাস দিয়েছে ব্রিটিশ রাজ।

এসব কারণে ভারতভাগের পূর্বক্ষণে বঙ্গবিভাগ প্রতিরোধে যুক্তবঙ্গের শ্লোগান হালে পানি পায় নি। সোহ্‌রাওয়ার্দি-আবুল হাশিম এবং শরৎ বসু-কিরণশংকর রায়ের ঐক্য ও সম্প্রীতির আহ্বান কাজে আসে নি। পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর জনসংখ্যা তাতে সায় দেয় নি। দেয়নি বিশেষ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখের নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভার ব্যাপক সাম্প্রদায়িক প্রচারের তীব্রতা ও বঙ্গভঙ্গের পক্ষে প্রচারের কারণে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরাও এ প্রচারের অংশীদার। মূলত পশ্চিমবঙ্গবাসী শিক্ষিত হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণী বঙ্গভঙ্গে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। দেশভাগের পঞ্চাশ বছর পালনের সময় থেকে সেকুলার হিন্দু লেখক বুদ্ধিজীবীদের এ সত্য স্বীকার করতে দেখি।

এমন কি ছিন্নমূল মানুষের অর্থাৎ পশ্চিমে পাঞ্জাবি হিন্দু ও শিখদের, এবং পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুত্যাগী বাঙালি হিন্দুর অবিশ্বাস্য যন্ত্রণা ও আর্তি, দুঃসহ জীবন, ভারতভাগ ও বঙ্গভাগের অসঙ্গতি সচেতন মানুষের চেতনায় রক্তাভ ছায়া ফেলে। অবশ্য এটা ব্যাপক ক্ষেত্রে নয়। কারণ খাস পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি ও এলিটশ্রেণীর বাঙাল-অবজ্ঞা তো বিভাগপূর্ব কালের ঘটনা।

সে ধারা এখনো ২০১৩ সালে পৌঁছেও অব্যাহত। কদিন আগে একটি ভারতীয় টি-ভি অনুষ্ঠানে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বাঙালদের 'অ্যাকার', 'এ'কার উচ্চারণ নিয়ে কী রসিকতাই না করলেন অভিনেতা মনোজ মিত্র যা শুনলে বাঙাল মাত্রেরই গা জ্বলে যাবে। ১৯৪৭-এ মুন্সীগঞ্জের উদ্বাস্তু বন্ধুটি হয়তো এসব শুনে বলতো : 'ভাই, নেবু-নুচি-নিচু'র কথা বলছেন না কেন? আর বাশ (বাস), পাশপোর্ট উচ্চারণ? পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গের বা রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক বাচন কি খুব শ্রবণসুভগ? বিষয়টি অসীম রায়ের উপন্যাস'একালের কথা'য় সরস ভাষ্যে ব্যক্ত।

পশ্চিমবঙ্গে, রাজধানী কলকাতায় 'বর্বর' 'বিচ্ছিরি' বাঙাল তথা রিফিউজিদের নিয়ে স্থানীয় বাঙালি কম ঘেন্না-অবজ্ঞা দেখায় নি। এই পশ্চিমবঙ্গীয় মানসিকতাও সম্ভবত দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের অন্যতম প্রধান কারণ। একই কারণে উদ্বাস্তু বাঙালের শেষগতি দূর দণ্ডকারণ্যে, আন্দামানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ খাস পশ্চিমবঙ্গীয় নেতাদের লক্ষ্য ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক স্বপ্নের বঙ্গদেশ গড়া। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে তা কতটা অর্জিত হয়েছে একালের পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালি তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। পাচ্ছেন রাজনীতিতে, ভাষা-সংস্কৃতিতে হিন্দিবলয়ের দাপটে। হয়তো এসব ভেবেই ক্ষমতা গ্রহণের পঞ্চাশ বছরের সাল-তামামিতে ড. অশোক মিত্র একটু খেদের সঙ্গে সংযত ভাষায় লেখেন : 'এই অবস্থায় আমরা কি পেলাম এবং কি পেতে পারতাম তা নিয়ে পর্যালোচনায় ঈষৎ সার্থকতা আছে বৈকি।... আমার বাঙালি সত্তাকে আমি যদি (অন্যদের) সমপর্যায়ের মর্যাদার ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আমাদের ভারতীয় সত্তাও খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে আসতে বাধ্য। সেই হেতু আমরা কি কি পেলাম না, আর্থিক বিচারের নিরিখে তা নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা হয়তো দৃষ্টিকটু নাও হতে পারে। আমি প্রথমেই ভাষার কথা বলব '(প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা, 'ঈশান', জানুয়ারি, ১৯৯৮)। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত 'ঐকতান গবেষণা পত্রের' প্রচ্ছদলিপি : 'আক্রান্ত মাতৃভাষা। আসুন প্রতিরোধ করি' (২০১০) প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

পঞ্চাশ ষাট বছর পর বাঙালি হিন্দু শিক্ষিতশ্রেণীর একাংশ ঠিকই বুঝতে পারছেন যে স্বাধীন ভারতের যুক্তবঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তা একটি শক্তিমান অবস্থানে দাঁড়াতে পারতো। শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। অন্যদিকে এ পারে বাংলাদেশকে বর্তমান রাজনৈতিক নৈরাজ্যে (ইসলামি) ধর্মীয় জঙ্গিবাদের মোকাবিলা করতে হতো না। সাম্প্রদায়িকতাও সংযত অবস্থানে, হয়তো বা পিছু হটতে বাধ্য হতো।

AMARBOI.COM

প্রসঙ্গটি দীর্ঘ আলোচনার। দুচার অনুচ্ছেদে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে এই বোধোদয় ১৯৪৭-এ সম্ভব ছিল না। পরিস্থিতিও অনুকূল ছিল না। কেউ কেউ তখন গণভোটের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু তখনকার মত্ত, তামসিক পরিবেশে গণভোট যুক্তবঙ্গের পক্ষে যেতো কিনা বলা কঠিন। হয়তো তাই কমিউনিস্ট পার্টির এসেম্বলি সদস্য জ্যোতি বসু পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। অথচ এর বিপরীত ঘটনাও তখন দেখা গেছে। যেমন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'য় যুক্তবঙ্গের পক্ষে রাঢ়বঙ্গ থেকে মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি। একটি উদ্ধৃতি মেদিনীপুর থেকে–'আমরা বঙ্গভঙ্গ চাই না, জননেতাদের ডাকে সাড়া দিন।/...গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নামে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে, স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার নামে, বিপ্লবী বীর ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম আর সূর্য্য সেনের নামে আমাদের এই ডাক। আমাদের ডাকে সাড়া দিন'। না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ডাকে সাড়া মেলেনি যদিও স্থানীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির কমিটি, নারী সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন থেকে ছিল এ আহ্বান (স্বাধীনতা, ০৩.০৬.১৯৪৭)।

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার পাতায় (৯ এবং ১০ এপ্রিল, ১৯৪৭) কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা : 'স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ বাংলার জন্য আওয়াজ তুলুন।' 'বঙ্গভঙ্গ চাই না, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বৃহত্তর বঙ্গও চাই না। আমাদের দাবী (১) স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ বাংলা। বাংলাদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবে কিনা সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বাঙ্গালীর ভোটে তার মীমাংসা চাই'। এ বক্তব্যের স্ববিরোধিতা ও সহজবোধ্য।

এরপর আমরা দেখি বঙ্গীয় কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ভবানী সেনের বিবৃতি : 'ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারত ব্যবচ্ছেদ ও বঙ্গভঙ্গ রোধ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তকে সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছে উহাতে আমাদের পার্টির পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর কূটনৈতিক চাল ব্যর্থ করিবার জন্য আমাদের পার্টি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কমিটির সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করিবে' (স্বাধীনতা, ২৭.০৪.১৯৪৭)।

এতদসত্ত্বেও বিধানসভার ভোটাভুটিতে কমিউনিস্ট-প্রতিনিধি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সমর্থন জানান। এ-স্ববিরোধিতার ব্যাখ্যা তাদের কাছে কেমন ছিল জানি না। তবে আমার ধারণা বঙ্গভঙ্গ অনিবার্য হয়ে ওঠার কারণে হয়তো তারা শাস্ত্রবাক্য মাফিক বঙ্গভঙ্গ অর্থাৎ অর্ধেক ত্যাগই সমীচীন মনে করেছিলেন।

তবু বঙ্গীয় মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দির শেষ চেষ্টায় ক্ষান্তি ছিল না। মাউন্টব্যাটেনের চাতুরি তিনি বুঝতে পারেন নি। ভাইসরয় বঙ্গের ব্যাপারে দুদিকে খেলেছেন যদিও সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে সোজাসুজি 'না' বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এর কারণ পূর্বে আলোচিত। আর হডসনের বক্তব্য (পৃ. ২৪৬) যদি সঠিক হয় তাহলে মানতে হবে যে কলকাতাবিহীন বাংলার বিকল্প হিসাবে স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব জিন্না মেনে নিয়েছিলেন। কারণ বুদ্ধিমান জিন্নার হয়তো বিশ্বাস ছিল, মুসলমান-প্রধান স্বাধীন বঙ্গ ঠিকই একদিন পাকিস্তানে যোগ দেবে। আমার বিশ্বাস, এমন আশংকা থেকেই কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা নেতৃবৃন্দ স্বাধীন বঙ্গের বিরোধিতা করেছেন। এবিষয়ে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুজনতার মতামত নিলে পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়াতো কে জানে!

এভাবে দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ বাঙালির ভবিতব্য হয়ে ওঠে। এবং তা হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ ও মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গ হিসাবে বিভাজিত হয়ে। যে যুক্তিতে ভারতভাগ, একই যুক্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবভাগ। বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০-এ জুন (১৯৪৭) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভোটাভুটিতে। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে, পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুস্থানের পক্ষে অন্তর্ভুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করে। **মাউন্টব্যাটেনের সরসভাষায় 'পুওর ওল্ড ফ্রেড্রি'র সমর্থন সত্ত্বেও হাশিম-সোহ্‌রাওয়ার্দির স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। বঙ্গ বিভক্ত। কার্জনের ইচ্ছাপূরণ প্রথম বঙ্গভঙ্গের ৪২ বছর পর। এরই নাম ব্রিটিশ রাজনীতির জটিল কূটচাতুর্য!**

কিন্তু ভারতভাগের মতো বঙ্গভাগেও যে সমস্যার সমাধান ছিল না, পরবর্তী ঘটনাবলী তা প্রমাণ করেছে। পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখদের মতোই পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল হিন্দুসম্প্রদায়ের জীবনযন্ত্রণা এবং পশ্চিমবঙ্গীয় স্থানীয় হিন্দুদের অবজ্ঞা তার প্রমাণ। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু কাহিনী কিছু কিছু লেখায় উঠে এসেছে, তুলনায় বঙ্গীয় ছিন্নমূলকথা কম। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'র মতো গুটিকয় গল্পে পূর্ববঙ্গে সে ট্রাজেডির সাংস্কৃতিক সমাপন।

আমাদের বাংলাদেশী লেখকদের হাতে দেশভাগ ও উদ্বাস্তুর মর্মবেদনা-কেন্দ্রিক উপন্যাসের দেখা মেলে না, যেমন লেখা হয়নি খাস পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকদের কলমে। কারণ তাদের এবং একই ভাবে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের তো উদ্বাস্তুর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নি। তাই দু'প্রান্তে বাস করেও তাদের একই পথে গতি। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এ বিষয়ে তিনটি উপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা' ও রমেশচন্দ্র সেনের 'পূব থেকে পশ্চিম'। **দেশভাগ-বাংলাভাগ যে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুসম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক স্থিতি নষ্ট করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় সমাজ-সংস্কৃতিরও ভারসাম্য নষ্ট, বিশেষ ভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক বিন্যাস**। এ অবস্থার সংশোধন অসম্ভব।

প্রসঙ্গত স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে একটি বহুকথিত বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। বাংলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণীতে অতি প্রচলিত একটি কথা : পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না। পাকিস্তানবাদীদের মুখেই প্রধানত কথাটা শোনা যায় পাকিস্তানের গুরুত্ব ও বাস্তবতার প্রমাণ হিসাবে। তাৎক্ষণিক বিচারে এ মন্তব্য অনেকেই মেনে নেন এই ভেবে : 'ঠিকই তো, পাকিস্তান হওয়াতেই না এর পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্য, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যুদ্ধ, পরিণামে বাংলাদেশ।' আপাত বিচারে এ হিসাব ভুল মনে হয় না। কারণ মুদ্রার অপর পিঠের ইতিহাস-তথ্য কেউ পড়েন না।

ধরা যাক, কোনো কারণে ভারতভাগ হয়নি, পাকিস্তানও হয়নি। সেক্ষেত্রে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচারে বাস্তবতা হচ্ছে অখণ্ড ভারতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেডারেশন ও যুক্তবঙ্গ– যে যুক্তবঙ্গের জন্য ১৯৪৭-এ হাশিম-সোহরাওয়ার্দীদের আপ্রাণ চেষ্টা, বঙ্গীয় মুসলিম লীগের এ দুই বড় নেতা চেয়েছেন কলকাতাকেন্দ্রিক যুক্তবঙ্গ যেবঙ্গে জনসংখ্যায় মুসলিম প্রাধান্য। যেখানে তিরিশের দশক থেকে মুসলিম মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত শ্রেণীর দ্রুত বিকাশ ঘটছে– শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তারা চেয়েছিলেন এ ধারা বজায় রাখতে বৃহত্তর পরিবেশে।

এর বিকল্প ছিল মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব মাফিক আসাম-বঙ্গ মিলে বৃহদ্বঙ্গ যেখানে অধিকতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা মূলত আসামের প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে। তবে অসুবিধার সম্ভাবনাও ছিল আদি অহমিদের বঙ্গাল-বিরূপতার কারণে। এখন যেমন দেখা যাচ্ছে আসামে চলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। তবে এ দুই বিকল্প বর্তমান বিভক্ত বঙ্গের উভয় অংশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনায় অধিকতর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতো এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ দুই সম্ভাবনা তৎকালীন শীর্ষনেতাদের কারণে ভণ্ডুল হয়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক বিচারে দুর্বল রাজ্য। আর স্বাধীন হয়েও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব যে সবল তা নয়। কাজেই পাকিস্তান না হলে বাঙালি মুসলমানের খুব ক্ষতি হতো না। বিভাগপূর্বকালে ভূখণ্ড ভাঙনের টালমাটাল অবস্থায় দু-এক জন বিশ্লেষক মন্তব্য করেন যে বিভক্ত বঙ্গের উভয় অংশই একাধিক কারণে, অন্তত অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে না। তাদের হিসাব ভুল প্রমাণিত হয় নি।

AMARBOI.COM

বিষয়টা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ সম্ভব। এ বিষয়ে প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী পাকিস্তানবাদী এক বাংলাদেশী লেখকের বক্তব্য (আমাদের সূচনা বাক্য) খণ্ডন করেছেন প্রায় একই যুক্তিতে। দীর্ঘ আলোচনাশেষে তার মন্তব্য : 'পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না এর চেয়ে অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা আর কিছু হতে পারে না। পাকিস্তান না হলে সমগ্র বাংলা ও আসাম মিলে হয় ভারতীয় ফেডারেল কাঠামোর মধ্যে অথবা আবুল হাশিম-শরৎ বোস পরিকল্পনার মতো যে স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক বৃহত্তর বাংলা গড়ে উঠত তা হতো দক্ষিণ এশিয়ার সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী দেশ। তাতে বাংলাদেশী মুসলমানরাই বেশি উপকৃত হতো' (যুগান্তর, ১০ অক্টোবর, ২০১১)।

এ বাস্তবতায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাদেও যেদিকটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তা হল যে-কোনোরকম যুক্তবঙ্গে মুসলিম শিক্ষিতশ্রেণীর প্রতিযোগিতামূলক মেধাবী বিকাশ ঘটতো। সে বিকাশের রয়েছে সামাজিক গুরুত্ব। সেক্ষেত্রে বর্তমান বাংলাদেশে ফাঁপা, অন্তঃসারহীন শিক্ষিত সমাজের প্রাধান্য তৈরি হতো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেধাবী ও মননশীল শিক্ষিত শ্রেণী একটি দেশের মননশীল চরিত্র গঠনে উন্নতির সহায়ক। অখণ্ড বঙ্গ উভয় সম্প্রদায়ের আত্মশক্তি নিয়েই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারতো।

সেক্ষেত্রে আজকের মতো দুই বঙ্গ তথা দুই বাংলাভাষী ভূখণ্ডের কিছু সংখ্যক রাজনীতিমনস্ক, নিরপেক্ষ, সমাজসচেতন মানুষকে আক্ষেপ করতে হতো না তাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে, একদা-বঙ্গের ঐতিহ্য স্মরণ করে। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের দুর্বুদ্ধির কারণে যা ঘটে গেছে (অর্থাৎ ভারতভাগ বঙ্গভাগ) এর কোনো চারা নেই। বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন সম্ভাবনা দূর অস্ত্। সেটাই বাস্তবতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশবিভাগের পটভূমিতে বাঙালি জাতিসত্তা

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে স্থানীয় রাজনীতিকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সেই সূত্রে দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে। প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। দেশবিভাগ মূলত লীগ, কংগ্রেস ও 'রাজ' এই তিন শক্তির হাত দিয়ে সম্পন্ন হলেও এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল লীগ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব। চতুর ইংরেজ শাসক খুশি মনে তাতে হাত লাগিয়েছে। খুশির কারণ বিভক্ত ও পরস্পর-বৈরী দুই ভূখণ্ডে পরোক্ষ স্বার্থ রক্ষার কাজটা ভালোভাবেই চলবে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল দীর্ঘকাল ধরে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে সন্দেহ নেই, করেছেন বিপ্লববাদীরাও। কিন্তু লড়াই-এর মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসেনি। আপসপন্থায় ক্ষমতার হস্তান্তরই ছিল স্বাধীনতা। আর মুসলিম লীগ? সে তার জন্মলগ্ন (১৯০৬) থেকে সরকার–বিরোধিতা নয় কংগ্রেস–বিরোধিতাকেই লড়াই বিবেচনা করে এসেছে এবং ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে যথাসম্ভব পশ্চাদপদ ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ পূরণের চেষ্টা করেছে। তাতে সাফল্য এসেছে, সর্বশেষ সফলতা দেশবিভাগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ভুবন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অধিকার অর্জন।

দেশবিভাগের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার ঐতিহাসিক আর্থ-সামাজিক বৈষম্য। তবে এ বৈষম্য ছিল প্রধানত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। যেমন শিক্ষায় চাকরিতে তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভূস্বামিত্বের ক্ষেত্রে। বৈষম্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তুলনায় পূর্বাঞ্চলীয় বঙ্গদেশে ছিল প্রকট। নবাবী বাংলা থেকে ব্রিটিশ বাংলা হয়েই ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা। সূচনালগ্নে রাজধানী কলকাতাকে ঘিরে ব্যবসা-বাণিজ্য, দেওয়ানি-এজেন্সি থেকে অর্থাগমের যে রমরমা সুযোগ তৈরি হয়েছিল তা হিন্দু বণিক, ভূস্বামী ও শিক্ষিত শ্রেণীর দ্রুত বিকাশ ঘটায়। নবাগত শাসকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াসহ অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়াটাও বাঙালি মুসলমানের জন্য ঐতিহাসিক সত্য হয়ে ওঠে। তদুপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

কল্যাণে সৃষ্ট জমিদারি প্রথায় বিপুল হিন্দু প্রাধান্য এবং অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক দুঃস্থ মুসলমান কৃষকশ্রেণী বৈষম্যের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছিল। জমিদারি-মহাজনি ব্যবস্থার শোষণ ও নির্যাতন হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক চরিত্রের।

বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত বিকশিত বৈষম্য ও ব্যবধান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতায় অরাজনীতিক রবীন্দ্রনাথের নজর পড়ে। তিনি স্বদেশ, সমাজ ও রাজনীতি প্রসঙ্গে তার একাধিক লেখায় এই অসমতার দিকে দেশের রাজনীতিবিদ ও এলিট শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। পরামর্শ রাখেন দুই সম্প্রদায়ের অসমতা দূর করার জন্য অগ্রসর সম্প্রদায়কে এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে সচেষ্ট হতে। কিন্তু তার পরামর্শ কারো মনে ধরেনি। একমাত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এদিক থেকে ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর অকালমৃত্যু পূর্ব অবস্থার পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়, বৈষম্য অবসানের দিকে এরপর আর এক পা এগুনো সম্ভব হয়নি।

এ অবস্থা দেশে সম্প্রদায়গত রাজনীতির পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠেছিল, এমন কি গোটা ভারতীয় পটভূমিতেও। অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের উন্নত, অগ্রসর ও শক্তিমান শ্রেণীর (ভূস্বামী, মুৎসুদ্দি ধনিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের) প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে বসবাসের চেয়ে স্বতন্ত্র ভুবনে আত্মশাসন মুসলমানের কাছে অনেক সম্ভাবনাময় মনে হয়েছে। অবশ্য এ অবস্থা শ্রেণীভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিরিখে সত্য হয়ে উঠেছিল।

AMARBOI.COM

যেমন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মুসলমান ভূস্বামী, উঠতি মুৎসুদ্দি ধনিক ও শিক্ষিত শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা ছিল বাধাবন্ধনহীন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-পার্সি ধনিক ও শিক্ষিত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চাপে ব্যাহত হচ্ছিল। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের উপায় হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র স্বাধীন ভুবন। এরা সাধারণ মুসলমান শ্রেণীকে স্বতন্ত্র ভুবনের অলীক সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিয়েছে। এদের মাধ্যমে বঙ্গীয় মুসলমান ভূস্বামী ও উচ্চশ্রেণীর মানুষ (যত অল্পই হোক) স্বতন্ত্র ভুবনের বিশ্বাসে দীক্ষিত হয়েছে। এদের প্রভাব পড়েছে পশ্চাদপদ উঠতি মধ্যশ্রেণীতে বিশেষত শিক্ষায় আগ্রহী অংশে। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু কৃষক ও শ্রমজীবী মুসলমানদের প্রধান চিন্তা ছিল যেকোনো পথে জমিদার-মহাজনের শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্তি। আর ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে বঙ্গে জমিদার-মহাজনদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এতে করে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ধর্মীয় বৈপরীত্য সামনে এসে যায়। মনে হতে পারে, ইতিহাস বুঝি সংঘাতের ছকটাকে শ্রেণীভিত্তির বদলে সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ এ ঐতিহাসিক ছকটিকে সফলভাবে কাজে লাগায় এবং এতে ধর্মকে টেনে আনাও সহজ হয়ে ওঠে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভূস্বামী, ধনিক, উচ্চশিক্ষিত আমলা-টেকনোক্র্যাটদের স্বার্থ, কিন্তু অবধারিত ভাবে এতে জড়িয়ে পড়ে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণীর স্বার্থ। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক শ্রেণীকে কাছে টানতে লীগের কর্মসূচিতে স্থান পায় স্বতন্ত্র ভুবনে সামন্ত-মহাজনী শোষণ অবসানের আশ্বাস। এভাবেই বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমান স্বতন্ত্র বসবাসের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ছকটাকে যুক্ত করেছে। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রচার এর ভিতটাকে শক্ত করেছে। চৌকশ রাজনীতিক মোহাম্মদ আলী জিন্না ছিলেন মুসলমান ভূস্বামী, উঠতি মুৎসুদ্দি ধনিক ও উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি, তবু এ সম্প্রদায়গত ছকটা বুঝতে তার কষ্ট হয়নি। তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক কারণ ও ব্যক্তিত্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সরে আসার ফলে লীগের সম্প্রদায়গত রাজনীতি তার পক্ষে একমাত্র বিকল্প রাজনীতি হয়ে ওঠে। এ রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সর্বাধিক রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের জন্য তিনি যে কোনো পথে যেতে রাজি ছিলেন। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির মানুষ জিন্না ধর্মনিষ্ঠ না হয়েও (তার ধর্মবিশ্বাস নিয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে) একজন ধর্মীয় নেতার মতোই ঘোষণা করেন: ভারতে মুসলমান বহিরাগত। হিন্দু ও মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি, তাদের ধর্ম, জাতিত্ব, সমাজ-সংস্কৃতি পরস্পর থেকে ভিন্ন, আর্থ-সামাজিক স্বার্থও ভিন্ন। কাজেই উভয়ের একত্র বসবাস হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপস্থিতিতে মুসলমান স্বার্থের অনুকূল নয়। এভাবেই জিন্নার তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্প্রদায়গত রাজনীতির ভিত শক্তিমান করে তোলে।

চতুর ইংরেজ শাসক তার প্রয়োজনে সম্প্রদায়বাদী রাজনীতিকে লালন করেছে, শক্তিমান ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় থেকে 'ভাগ করা ও জয় করা'র সফল নীতি পরবর্তীকালে 'ভাগ করা ও শাসন করা'র নীতিতে পরিণত হয় যা অবশেষে দেশবিভাগের নীতিতে শেষ ফসল তুলে নিতে চেষ্টা করে। এর তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ইংরেজ-বিরোধী রাজনীতি ও শ্রেণীসংগ্রাম দমন করা। স্থায়ী উদ্দেশ্য পেছনে ফেলে যাওয়া উপনিবেশটিকে ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্যবহার করা। তবে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিরোধী একটি ধর্মবাদী রাষ্ট্রের 'করিডোর' তৈরি করাও কমিউনিস্ট জুজুর ভয়ে তাড়িত সাম্রাজ্যবাদের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। বাস্তবে পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদের এই উদ্দেশ্য চমৎকারভাবে সিদ্ধ করেছে। ইদানিং প্রকাশিত রাজ্যশাসনের তথ্যাদিও তা প্রমাণ করে।

রাজনীতির ঐ ত্রিমুখী জটিলতার কারণে স্বাধীনতার নামে শাসনক্ষমতা লাভের প্রক্রিয়ায় দেশবিভাগ সম্পন্ন হয়েছিল প্রচণ্ড সম্প্রদায়গত বৈরিতা, বিদ্বেষ ও রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে। বৃথাই যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, হত্যা ও রক্তপাত বন্ধ করার জন্যই দেশবিভাগ। কথাটা সত্য হলে সম্পদায়গত ভিত্তিতে দেশভাগ তথা যার যার স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর আর হানাহানি ঘটার কথা নয়। কিন্তু তা ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। আসলে যে হিংসা-দ্বেষ-বৈরিতার মধ্য দিয়ে দেশবিভাগ সেই ঐতিহ্য থেকে কোনো পক্ষই মুক্ত হতে পারেনি। সাতচল্লিশ থেকে এ পর্যন্ত দেশীয় শাসকশ্রেণীর নীতি, আচরণ এবং বক্তৃতা ও বিবৃতি থেকে তা বোঝা যায় এবং ক্ষমতার স্বার্থে এ চেতনা জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়ও শাসকশ্রেণীরই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ বৈরিতা ও সংঘাতে বরাবর জ্বালানি যোগ করেছে।

আজ কোনো রাজনীতি-সচেতন ইতিহাস পাঠক যদি প্রশ্ন করে, দেশ বিভাগের জন্য কারা দায়ী এবং এর কোনো বিকল্প ছিল কিনা তাহলে বলতে হয় যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর (এবং নেতৃত্বেরও) জেদ ও একগুয়েমি এবং তৃতীয় শক্তি 'রাজ'-এর কূটচাল মূলত দেশবিভাগের জন্য দায়ী। বিশের ও তিরিশের দশকে সম্প্রদায়গত আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করার যে রাজনৈতিক সম্ভাবনা ছিল জাতীয়তাবাদী তথাকথিত সেকুলার রাজনীতি প্রধানত সামন্ত-বণিক স্বার্থে (শিক্ষিতশ্রেণীর স্বার্থেও) সেদিকে হাত দেয়নি। বরং বৈষম্যকে লালন করেছে, সুযোগ করে দিয়েছে লীগের সম্প্রদায়বাদী রাজনীতিকে। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে এ নীতিটা বিশেষভাবে সত্য। শ্রেণীস্বার্থ সেখানে বড়ো বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল, আর শ্রেণীসংগ্রামের ভয়টাও ছিল। নিবার্য দেশবিভাগ তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ, সে সম্পর্কে নেহরুর আকস্মিক বিরূপ বক্তৃতা, জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা ইত্যাদি প্রসঙ্গত ঘটনা হিসাবে স্মর্তব্য।

দেশবিভাগের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফলের দিকে তাকালে এর নেতির দিকটাই ভারি মনে হয়। সন্দেহ নেই গোটা উপমহাদেশীয় ভিত্তিতে বিচার করে দেখলে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর তথা সামন্ত মুৎসুদ্দি ধনিক ও আমলা টেকনোক্র্যাট দের অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু দীর্ঘকালীন বিপুল মার্কিন সাহায্যের দৌলতে দেশে যথেষ্ট শিল্পপ্রসার ঘটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ও দ্বন্দ্বগুলো দূর হয়নি। জাতিসত্তার শোষণ, অস্বাভাবিক সামরিক ব্যয়ের কারণে অর্থনৈতিক মন্দা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা দেশটাকে সুস্থ থাকতে দিচ্ছে না। যে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থের কথা বলে দেশবিভাগ তাদের বিরাট একটি অংশ সংখ্যালঘুত্বের বেদনা নিয়ে ভারতেই পড়ে আছে। তাদের স্বপ্ন দেখাই সার। ভারতের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ যদিও ভারতীয় শাসন সেকুলার সংবিধান হাতে নিয়ে তাদের উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমৃদ্ধির যাত্রা এখনো অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু ঐ কাগজের নিরিখে সংখ্যালঘুদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার নয়, সাম্প্রদায়িক সংঘাত সেখানে এখনো সচল। ধর্মবর্ণ ও উচ্চ-নীচ সংঘাত দূর হবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

আসলে যে বৈরিতা-বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে দেশবিভাগ ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম তার উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য এখনো যথেষ্ট প্রকট। এর দায় অবশ্য শাসকগোষ্ঠীর এবং দায়ী তাদের ক্ষমতার লোভ এবং বিদ্বেষ-বৈরিতাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার। গত ষাট বছরের রাজনৈতিক আচার আচরণ ও প্রচারের ফলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মানুষগুলো একে অন্যকে শত্রু হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। শান্তি ও সহযোগিতার সম্ভাবনা এক্ষেত্রে দূর অস্ত্। আন্তঃজাতীয় পর্যায়ে ক্রিকেট খেলা থেকে শুরু করে অনুরূপ যে কোনো বিষয়ে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রকাশ যে কোনো মানবিক চেতনার মানুষকে বা বিদেশিকেও অবাক করে দেয়। কী আশ্চর্য এ বিদ্বেষ বিরূপতার চরিত্র যা দশকের পর দশক একই ভাবে চলেছে। পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ সেখানে নেই!

দুই

দেশবিভাগের বিরূপ প্রভাব সম্ভবত সব চাইতে বেশি পড়েছে বাংলা ও পাঞ্জাবের ওপর। প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসাবে দেশবিভাগের নির্ধারিত (দ্বিজাতিতাত্ত্বিক) নীতি অনুযায়ী বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভাজনে পশ্চিমপাঞ্জাব গোটা পাকিস্তানের ঝুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে যেতে পেরেছে, তবু সংঘাত ও নৈরাজ্য থেকে তার শান্তি মেলেনি। পূর্বপাঞ্জাব আবারো বিভাজিত হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতার রক্ত ও ধোঁয়ার মধ্যে অশান্ত দিন অতিবাহিত করছে। কোথায় যে এর শেষ পরিণাম বলা কঠিন। পাঞ্জাবের সমস্যাটা ছিল অর্থনৈতিক হয়েও মূলত সম্প্রদায়গত, সেটা অখণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিসত্তার নয়, শিখ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় মিলে কখনো এক অভিন্ন জাতিসত্তা গড়ে তোলেনি।

কিন্তু দেশবিভাগের তরবারি ভূখণ্ড বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তাকেও দ্বিখণ্ডিত করেছিল। এর জন্য দেশবিভাগের সময় বাঙালি জনগোষ্ঠীর একাংশের আত্মঘাতী পদক্ষেপ দায়ী। অবশ্য তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঐ পদক্ষেপের পক্ষে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছিল। যুক্তির চেয়ে আবেগ প্রবল হয়ে উঠেছিল। আর সেই আবেগের টানে পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যক হিন্দুজনতার রাজনৈতিক প্রতিনিধি আইনসভার সদস্যগণ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে দাঁড়িয়ে যান। লীগ মন্ত্রীসভার শাসনে ১৬ আগস্ট সংঘটিত কলকাতা দাঙ্গার ভয়াবহতার পটভূমিতে হিন্দুমহাসভার ব্যাপক প্রচার এবং কংগ্রেসের রক্ষণশীল অংশের চাপে তারা এতই প্রভাবিত হন যে মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি।

তারা ভুলে গিয়েছিলেন যে অবিভক্ত বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক পার্থক্য সামান্য। তাই অবিভক্ত স্বাধীন বঙ্গের সংসদীয় নির্বাচনে কোনো সম্প্রদায়ের একতরফা একক জয় সম্ভব ছিল না। পরস্পর নির্ভরতায় মন্ত্রীসভা ও শাসন পরিচালিত হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। তদুপরি শিক্ষায় মননশীলতায় হিন্দু সম্প্রদায় অনেক এগিয়ে ছিল। বরং ভয়টা ছিল মুসলমান মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিতশ্রেণীর যে তারা প্রতিবেশি সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কিনা। তাই স্বাধীন বঙ্গের পাকিস্তানে যোগ দেবার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন প্রায় অসম্ভব ছিলো। এসব বিষয় হিন্দু শিক্ষিতশ্রেণী ভেবে দেখেনি।

এ পরিস্থিতিতে বর্ণহিন্দু বা তাদের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মানুষ তাদের শ্রেণী স্বার্থের টানে বঙ্গবিভাগকে অনিবার্য করে তোলে। তাদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যায় পূর্ববঙ্গের তাবৎ হিন্দু ভূস্বামী। এরা নিজ স্বার্থে হিন্দু জনসাধারণের স্বার্থ বলি দিয়েছে। এমনকি স্বধর্মাবলম্বী জনমত যাচাইয়েরও প্রয়োজন বোধ করেনি। অবশ্য তখন অধঃস্তন বর্গের হিন্দু জনসমাজ তাদের শিক্ষিত ও সচ্ছল শ্রেণীর বিচারবুদ্ধির ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেছে। এরা পাকিস্তান নিশ্চিত হবার পর দিব্যি ঐ অসহায় সাধারণদের পেছনে ফেলে সীমান্ত অতিক্রম করতে দ্বিধা করেনি। এদের অনুসরণ করেছে অসচ্ছল মধ্যবিত্তরাও। এরা সীমান্ত অতিক্রম করে অমানবিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে।

এ ভাবে সামাজিক বিন্যাস নষ্ট হওয়াতে পাকিস্তানে পড়ে থাকা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ সংখ্যালঘুত্বের অসহায়তা ও বেদনা নিয়ে জীবন যাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে বাধ্য হয়েছে। বাস্তবে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। ভারতে সংঘটিত দাঙ্গার অপরাধে অর্থাৎ বিনা অপরাধে অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়েছে। তাই সামান্যতম আশ্বাসে ভর করেও তারা দেশত্যাগ করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু দেশত্যাগ করেও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন সবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এতে করে বাঙালি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিরূপতা বেড়েছে বই কমেনি।

কমবেশী একই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বেলায়ও সত্য হয়ে উঠেছে। তারাও দেশবিভাগের প্রশ্নে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেনি। পরে এক ধরনের হীনমন্যতা ও অসহায়তাবোধ থেকে পাকিস্তানের পক্ষে নৈতিক সমর্থন জুগিয়ে গেছে। একই কারণে একাত্তরে তারা পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিল না। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে এই সংখ্যালঘুদের অবস্থা আরো খারাপ। আইনি সেকুলারিজম তাদের কোনো সাহায্যে আসছে না, আসার কথাও নয়।

এভাবেই বিভাজিত বাঙালি জাতিসত্তা, দুই সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ নিজ ভুলের সঙ্গে একে অন্যের ভুলের মাশুল গুনছে। দ্বিখণ্ডিত জাতিসত্তার অবস্থান দুই রাষ্ট্রেই দুর্বল হয়েছে। জাতীয়তার পটভূমিতে আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে যে সম্ভাবনা অবিভক্ত স্বাধীন বঙ্গের ছিল তা এপার ওপার কোনো পারেই বাস্তবের মুখ দেখেনি। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বৃহৎ ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধান জাতিসত্তাগুলোর তুলনায় সর্বাধিক অবহেলিত, রাজ্য হিসাবেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান আহামরি কিছু নয়। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয় কেন্দ্রীয় প্রশাসনে উচ্চপদমান মর্যাদা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকেও তারা হিন্দি অগ্রাসনের শিকার এবং বাঙালি হিসাবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অবমাননা বা হীনমন্যতাই তাদের ভবিতব্য হয়ে উঠেছে।

ঠিক একই অবস্থা ছিল পাকিস্তানে বাঙালিদের, এমন কি বাঙালি মুসলমানের। পাকিস্তানি শাসকদের বিদ্রুপ, অবমাননা, উচ্চমন্যতার চাপ তাদের সহ্য করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক শোষণ ও স্যাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকেও তারা মুক্ত ছিল না। তবে তারা প্রতিবাদের পথই বেছে নিয়েছিল ভাষা ও জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করে। স্বশাসনের জন্য আন্দোলন এবং অবশেষে যুদ্ধ তাদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করেছিল। হয়তো সেখানে সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল দুই পাকিস্তানের বিশাল ভৌগোলিক ব্যবধান আর সঙ্গে ছিল কূটনৈতিক কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাহায্য ও সমর্থন। তাই অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের। তেমন সুযোগ-সুবিধা পশ্চিমবঙ্গের নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র সর্বজনীন বাঙালি জাতীয়তাকে, সেকুলার জাতিসত্তাকে ধারণ লালন করতে পারেনি। রাজনীতির কূটচালে তার পরাজয় ঘটেছে। নতুন করে বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের সমস্যা বাঙালি জাতিসত্তার সম্ভাবনাকে দুর্বল করে তুলেছে। সর্বজনীন বাঙালি জাতিরাষ্ট্র সেকুলার জাতিরাষ্ট্রের ছবিটাকে উজ্জ্বল করে তোলা দূরে থাক ক্রমাগত পিছে ঠেলে দিচ্ছে। সংখ্যালঘুদের অসহায়তা ও অনিরাপত্তাও দূর করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় খণ্ডিত জাতিসত্তার সর্বোত্তম বা আকাঙ্ক্ষিত বিকাশ সম্ভব হতে পারে না। পারে না সংখ্যালঘুত্বের অভিশাপ বহন করে। নিঃসন্দেহে জাতিসত্তার বিভাজনই এ জন্য দায়ী।

ভারতীয় বাঙালিত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, তার জাতিসত্তাও যে সুবিধাজনক অবস্থানে নেই সেকথা আগেই বলেছি। সেখানেও সংখ্যালঘুত্বের অভিশাপ বাঙালি জাতির বিকাশকে পেছনে টানছে, যেমন রাজনৈতিক ভাবে তেমনি আর্থ-সামাজিক দিক থেকে। সবচেয়ে বড়ো কথা বাঙালি জাতিসত্তা ভারতীয় জাতীয়তার চাপে তার জাতিত্বকে ক্রমশ হারাতে চলেছে যেমন রাজনৈতিক দিক থেকে তেমনি অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে। ভাষিক বাঙালি, রবীন্দ্রনাথের বাঙালি ক্রমশ পিছু হটছে আরোপিত জাতি চেতনার চাপে। সমাজবাদী গণতন্ত্রী শাসনও অভীষ্ট লক্ষ্যের অনেক দূরে থেকে যাচ্ছে, মনে হয় না আদৌ সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

প্রসঙ্গত অবিভক্ত বঙ্গের শ্রেণী আন্দোলনগুলোর কথা মনে করা যায়, যা সন্দেহাতীত ভাবে দুর্বল হয়েছে, স্বাস্থ্যহীন হয়েছে, পাকিস্তানি ও ভারতীয় শাসনের প্রবল চাপে। পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গে সে সম্ভাবনার যে মৃত্যু ঘটেছে তা আর সঞ্জীবিত হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই, এখনো নেই। পশ্চিমবঙ্গ হয়তো তার কিছুটা উদ্ধার করতে পেরেছে কিন্তু তাই বা কতটুকু! সত্যিকার অর্থে এতে আকাঙ্ক্ষিত অর্জন সম্ভব হয়নি। এসবই ভূখণ্ড বিভাগের পরিণাম। দ্বিখণ্ডিত জাতিসত্তার দুর্বলতার প্রতিফলন। সমাজের নিম্নতম স্তরে সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করতে গেলে হতাশাই প্রধান হয়ে উঠবে। মনে হয় না বাঙালি জাতিসত্তা অদূর ভবিষ্যতে শ্রেণীসংগ্রামের সম্ভাবনাকে উজ্জীবিত করতে পারবে।

কথাটা যতই অপ্রিয় শোনাক অস্বীকারের উপায় নেই যে দ্বিখণ্ডিত বঙ্গভূখণ্ডে বিভাজিত বাঙালি জাতিসত্তার সর্বজনীন রূপ এখনো যথাযথ ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। দুই বাংলাভাষাভাষী ভূখণ্ডে দুই ভিন্ন কারণে জাতিসত্তার সুস্থ ও শক্তিমান রূপের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। একদিকে যদি শক্তিমান ভারতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেতনার ছাপ জাতিচেতনার অগ্রগতি রুদ্ধ করে থাকে অন্যদিকে বাংলাদেশে পাকিস্তানি ঐতিহ্যের নিহিত প্রভাব জাতিসত্তাকে সংকীর্ণতার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বাঙালি জাতিসত্তার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রিক বিকাশের সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। সেখানে রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও অগণতান্ত্রিকতার পিছুটান, জনস্তরে অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং আমলা-মুৎসুদ্দিদের ব্যাপক দুর্নীতি ও বিপুল সম্পদ অর্জন সে সম্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গ এ সম্ভাবনা থেকে দূরে।

ভিন্নতা সত্ত্বেও দুই বাংলাভাষী ভূখণ্ডের একটি সাধারণ (কমন) বৈশিষ্ট্য হল তাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লঘুত্ব ঘুচিয়ে জাতিচেতনার মূলস্রোতে একীভূত করতে না পারা। এই অপারগতার কারণে জাতিসত্তার স্রোত যথেষ্ট বেগবান হতে পারছেনা। সংহতির অভাব থেকেই যাচ্ছে। অথচ উভয় দেশের রাজনীতি এদিকটায় গুরুত্ব দেওয়া দরকার মনে করছেনা। **রাজনৈতিক চরিত্র বিচারে দ্বিখণ্ডিত জাতিসত্তার দুই ভূখণ্ড তাই মুসলমান বাংলা ও হিন্দুবঙ্গের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এখানেই বাঙালি জাতিসত্তা ও বাঙালি জাতিচেতনার ট্রাজেডি।**

এই স্ববিরোধ ও সংকীর্ণতাবোধ নিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার পক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মর্যাদার মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। মর্যাদা অর্জনও সম্ভব নয়। দেশবিভাগ তথা বঙ্গবিভাগের প্রতিক্রিয়া বাংলাভাষী দুই ভূখণ্ডকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করেছে সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের কারো পক্ষেই অসম্পূর্ণতা জয় করে ওঠা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি বাঙালি জাতিসত্তার সর্বজনীন পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করা, যেমন সম্প্রদায়গত দিক থেকে তেমনি শ্রেণীগত দিক থেকে। তবু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মহলে যে স্বীকৃতি পেয়েছে, নানা সমালোচনার মধ্যেও তাতেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। স্বাধীন যুক্তবঙ্গের আন্তর্জাতিক অবস্থান নিঃসন্দেহে ভিন্ন হতো যদি ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ও স্থানীয় সাম্প্রদায়িক চেতনা বাঙালি জাতিসত্তাকে দ্বিখণ্ডিত না করতো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্নার পাকিস্তান : পাকিস্তানের জিন্না

দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বিচ্ছিন্নতার দাবিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লড়াই ও ভারতবিভাগ নিয়ে সংঘটিত মানবিক ট্রাজেডি সত্ত্বেও তৎকালে এ সম্বন্ধে যত কিছু আলোচনা-সমালোচনা তার বহুগুণ তাত্ত্বিক বিচার-ব্যাখ্যা চলেছে পরবর্তী সময়ে ক্ষমতার হস্তান্তর ও তার প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী নিয়ে। এখনো তা চলছে রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের নানা দিক বিবেচনায়। প্রকৃতপক্ষে দেশবিভাগ (১৯৪৭) এমনই এক রাজনৈতিক তাৎপর্যময় ট্রাজিক ঘটনা যে এর দায়ভাগ থেকে উপমহাদেশবাসী কারো মুক্তি নেই।

দেশভাগের জন্য দায়ী রাজনীতির কুশীলবের সবাই প্রয়াত এবং তারা এখন জবাবদিহির উর্ধ্বে বলেই বোধ হয়। বিষয়টি নিয়ে নানামাত্রিক ব্যবচ্ছেদ রাজনৈতিক অঙ্গন ছেড়ে বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে আশ্রয় নিয়েছে। জন্ম দিচ্ছে নানান ভাবনা-বিচারের মাধ্যমে বিতর্ক। এ অঙ্গনে বিদগ্ধ পণ্ডিতদের বিচরণ কম নয়। যেমন পাকিস্তানে তেমনি ভারতে, ততোধিক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। এ বিষয় নিয়ে বিচার ভাবনায় যেমন রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ধারা তেমনি ভিন্নমতের রিভিশনিস্ট ধারা–এর মধ্যে যোগ দিচ্ছে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ গ্রুপের বৈদগ্ধ্য। অন্যদিকে এদের বাইরে একেবারে নিজস্ব ভাবনায় প্রণোদিত লেখক বা গবেষক, রাজনীতিক বা ইতিহাসবিদ তাদের লেখায় নিজ নিজ মত প্রকাশ করে চলেছেন। তাতে বিতর্কের পরিধি আরো বিস্তৃত হচ্ছে। হচ্ছে বিশেষ করে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য পরিণাম এবং ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের জটিলতার কারণে। এ যেন এক অন্তহীন বিতর্কের ডিসকোর্স।

দেশবিভাগ ঘটনার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় আমলা ভি. পি. মেনন তার বইতে (১৯৫৭) প্রত্যক্ষদর্শীর ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, ক্বচিৎ মন্তব্য ও মূল্যায়নে ('দ্য ট্র্যান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া', ১৯৫৭)। একই রকম দীর্ঘ বিবরণ, ইতিহাসকথা নিকোলাস মানসার-এর 'ট্র্যান্সফার অব পাওয়ার' শীর্ষক গ্রন্থ যা বহুখণ্ডে বিভক্ত। এ ধরনের তথ্যমূলক ইতিহাসের

বাইরে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ধর্মী রচনাই সর্বাধিক, সেই সঙ্গে রাজপুরুষদের নোট, প্রতিবেদন, ডায়েরি, চিঠিপত্র, গোপনবার্তা ইত্যাদি মিলে পার্টিশন বা বিভাজন সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার পড়ে শেষ করা কঠিন। এখন লেখকদের নজর মূলত ঘটনা ও কুশীলবদের তৎপরতা বিশ্লেষণের দিকে। তাতে কখনো বিতর্কের হাওয়া ওঠে, আবার তা মিলিয়ে যায়। কোনো কোনো বক্তব্য বা সিদ্ধান্তের রেশ থেকে যায় তর্ক-বিতর্কের জন্ম দিতে। এসব আলোচনায় জিন্না বিষয়ক বিচার ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে।

যেমন আয়েশা জালালের জিন্না বিষয়ক গ্রন্থ 'দ্য সোল স্পোকসম্যান' (১৯৮৫) অভিসন্দর্ভে ধৃত কিছু সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে কারো কারো মতামত প্রকাশ পেয়েছে। 'জিন্না পাকিস্তান চান নি'—জালালের এমন সিদ্ধান্ত মুশিরুল হাসানসহ কেউ কেউ মানতে নারাজ। এ মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি নেতা যশবন্ত সিং তার ঢাউস বই 'জিন্না/ইন্ডিয়া-পার্টিশন ইন্ডিপেন্ডেন্স'-এ ভারত বিভাজনের সিংহভাগ দায় তৎকালীন কংগ্রেস-নেতৃত্বের ওপর চাপিয়েছেন, ছুঁয়ে গেছেন আয়েশার সিদ্ধান্ত। হুসেইন হাক্কানি আয়েশা জালালের সিদ্ধান্তকে জিন্নার পক্ষ নিয়ে কিছুটা বিস্তৃত করেছেন এই যা ('পাকিস্তান বিটুইন মস্ক অ্যান্ড মিলিটারি', ২০০৫)।

সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দুইখণ্ডে লেখা সুনীতিকুমার ঘোষের 'ইন্ডিয়া/অ্যান্ড/দ্য রাজ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৯৫) ভারতবিভাগ নিয়ে আংশিক আলোচনা, তাতেও বিভাজনের অনেকখানি দায় কংগ্রেসের ওপর আরোপিত। ব্রিটিশ ভারতে কর্মরত সাবেক রিফর্মস কমিশনার এইচ. ভি. হডসন 'দ্য গ্রেট ডিভাইড' (১৯৬৯) গ্রন্থে (যা মূলত তথ্যমূলক) ভারতবিভাগের দায় লীগ-কংগ্রেস উভয় দলের শীর্ষ নেতাদের বলে মনে করেছেন। তবে জিন্নার দায় সেক্ষেত্রে যেন বেশি। স্ট্যানলি উলপার্ট ('জিন্না অব পাকিস্তান', ১৯৮৪)-এর লেখা মূলত এ ধারারই। অন্যদিকে আর. জে. মুর তার 'জিন্না অ্যান্ড দ্য পাকিস্তান ডিমান্ড' প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনা শেষে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 'এমন অনুমানের পেছনে যুক্তিতর্কের কোনো সমর্থন নেই যে জিন্নার পাকিস্তান দাবি অখণ্ড ভারতে ক্ষমতার জন্য দেনদরবারের প্রচেষ্টা বা সে দাবি নিয়ে তিনি নিজ ফাঁদে আটকা পড়েছেন' (১৯৯৫)। অর্থাৎ পাকিস্তান দাবি নিয়েই জিন্নার রাজনীতি।

প্রকৃতপক্ষে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (লক্ষ্মৌ প্যাক্ট) বা বিশের দশক কিংবা তিরিশের দশকের জিন্নার সঙ্গে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের জিন্নার অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্থক্য। জিন্না ততদিনে বুঝে নিয়েছেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে বসে অখণ্ড ভারত মেনে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা। ভারত ভাগ করে মুসলমানদের জন্য (এমন কি তার নিজের অহম্‌বোধ পূরণের জন্যও) স্বতন্ত্র ভুবনের কোনো বিকল্প নেই। আইনজ্ঞ জিন্নাকে তাই ভেবেচিন্তে বেছে নিতে হয়েছে ধর্ম নামক প্রবল শক্তিমান এক হাতিয়ার যা তার রাজনৈতিক সংগঠনে শক্তি সঞ্চার করবে। সম্প্রদায়বাদী স্বার্থ প্রচারের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ মুসলমানদের দিয়ে হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেসের মোকাবিলা করা সহজ হবে। তাই লীগের জন্য রাজনৈতিক রণকৌশল এ ধারায়ই ঠিক করে নেন জিন্না।

মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) প্রদত্ত জিন্নার দীর্ঘ ভাষণের অনুপুঙ্খ বিচার বুঝতে সাহায্য করে যে ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম, তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি তিনি তার রাজনৈতিক লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জনের বিষয় করে তুলেছিলেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনের কাছে তিনি ব্যক্তিজিন্নাকে বিকিয়ে দিয়েছেন। আচরণে ও বক্তব্যে হয়ে উঠেছেন স্ববিরোধী। ১৯৪০ থেকে তার প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ, বিবৃতি, ভাষণ ও সংলাপের সারমর্ম এমনটাই প্রমাণ করে।

ব্যক্তিজীবনে ধর্মাচারী ও ধর্মনিষ্ঠ না হলেও রাজনীতিচর্চায় দুটো বিষয় তার বিশ্বাসের অংশ হয়ে দাঁড়ায় যেমন হিন্দুমুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি (দ্বিজাতিতত্ত্ব)—অখণ্ড ভারতে তাদের সহাবস্থান সম্ভব নয়। এখানে তিনি ইতিহাসের সত্য অস্বীকার করেছেন। তার বক্তৃতায় তিনি বারবার ইসলামি ঐতিহ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। বহুউদ্ধৃত ১৯৪৭-আগস্টে তার সেকুলার বক্তৃতা সম্ভবত আইনবিদ জিন্নার কৌশলী বয়ান। কারণ তার বিভাগোত্তর আচরণ ও বক্তৃতা, বিশেষ করে ১৯৪৮ মার্চের ঢাকা বক্তৃতা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক চেতনা ও সেকুলার চেতনা বিরোধী। তাতে বাঙালি বিদ্বেষ, ভারতবিদ্বেষ ও ধর্মীয় বয়ানও প্রকট। প্রকট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা যে প্রাদেশিক ক্ষমতার জন্য তিনি বিভাগপূর্ব কালে সোচ্চার এবং শক্তিশালী কেন্দ্রের বিরোধী। অথচ পাকিস্তানে সেই শক্তিশালী কেন্দ্রেরই তিনি প্রবক্তা। শেষোক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ সংশ্লিষ্ট লেখকদের রচনায় দেখা যায় না।

আয়েশা জালালের এমন ধারণা ঠিক নয় যে জিন্না মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান সম্পর্কে আলোচনায় ও লেনদেনে প্রস্তুত ছিলেন। আমাদের আলোচনায় ইতঃপূর্বে জিন্নার অনেক বক্তৃতার উল্লেখ রয়েছে যেখানে তিনি পাকিস্তানই সাম্প্রদায়িক সমস্যার একমাত্র সমাধান এবং এর কোনো বিকল্প

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই বলে বারবার জোরালো দাবি জানিয়েছেন। তার অনুসারী শীর্ষ নেতাদেরও একই কথা বলতে শোনা গেছে। আসলে কংগ্রেসের বিরোধিতার মুখে পাকিস্তান তার জন্য এক ধরনের 'অবসেসন' হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় বিষয় : হিন্দু মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি বিধায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তার যেকোনো আলোচনায় নিশ্চিত পূর্বশর্ত হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ভারতবিভাগ ও পাকিস্তান দাবি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অখণ্ড ভারতে স্বশাসিত মুসলমান রাষ্ট্র বা কনফেডারেশন তার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাই গ্রুপিংসহ মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব নেহরুর আলটপকা মন্তব্য উপলক্ষে অজুহাত তৈরি করে ঐ প্রস্তাব বাতিল করে দেন। অথচ মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব মর্মবস্তু বিচারে অখণ্ড ভারতে একরকম পাকিস্তানই উপহার দিয়েছিল জিন্নাকে। যেকারণে কংগ্রেস অনিচ্ছার সঙ্গে ওই প্রস্তাব গ্রহণ করে। সামান্য কারণে ওই প্রস্তাব বর্জন জিন্নার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ভারতবিভাগ নিশ্চিত করা ও গান্ধি-নেহরুর স্বপ্ন ভঙ্গ জিন্নার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভারত কে খণ্ডিত করতে গিয়ে তাকেও অবশ্য খণ্ডিত পাকিস্তান নিয়ে ভারত ছাড়তে হয়।

AMARBOI.COM

দুই

জিন্না যেমন তুখোড় আইনজ্ঞ তেমনি চৌকশ রাজনীতিক। তা সত্ত্বেও তিনি ভেবে দেখেন নি যে তার পরিকল্পিত পাকিস্তানে ভারতীয় মুসলমানের সবাইকে তিনি বসবাসের সুযোগ দিতে পারবেন না। ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের যে ভিত্তিতে তার পাকিস্তান দাবি ও ভারতভাগ তাতে তিনকোটিরও বেশি সংখ্যক মুসলমান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শহরে গ্রামে গঞ্জে ছড়ানো ছিটানো থেকে যাবে। অথচ তাদেরও তিনি পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তারা ধর্মীয় উন্মাদনায় পাকিস্তানের দাবিতে প্রতিবাদী মিছিলে শামিল হয়েছে। তাদের একাংশ সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় অংশ নিতেও দ্বিধা করেনি। আবার পালটা সহিংসতার শিকারও হয়েছে।

জিন্না জানতেন এই হতভাগ্যদের কংগ্রেস শাসনে ভারতে ফেলে যেতে হবে। তা সত্ত্বেও তার রাজনৈতিক প্রয়োজনে এদের কাছে বাস্তবতা গোপন করে তাদের সমর্থন আদায় করতে তার বাধে নি। ১৯৪০-এ রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনে এবং বিভিন্ন সময়ে মওলানা আজাদ ভারতীয় মুসলমানদের সামনে পাকিস্তানের এই সীমাবদ্ধতার কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। অনুরোধ জানান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে। অর্থাৎ জিন্নার ঠিক বিপরীত ধারার বক্তব্য।

আজাদের উদাত্ত আহ্বান, এগারো শ বছরের সহাবস্থানের প্রতি সম্মান জানিয়ে সেকুলার জাতীয়তার শিকড় বাকড়গুলো কেটে না ফেলতে। বরং সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষার ব্রত নিয়ে স্বাধীনতার লড়াইয়ে শামিল হতে। কুলদীপ নায়ার তার আত্মজীবনীতে ১৯৪৫ সালে লাহোরে মওলানা আজাদের ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্যের প্রশংসা করে লিখেছেন যে সাম্প্রদায়িকতার প্রবল ঢেউ যখন নেতাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আজাদ তখনো সেকুলার অবস্থানে দৃঢ় পায়ে দাঁড়ানো (পৃ. ৬৩)।

কিন্তু ওরা তার কথা শোনেনি। পাকিস্তানের স্বপ্নে মুগ্ধ ভারতীয় মুসলমান ঐ স্বতন্ত্র ভুবনে তাদের সমৃদ্ধ আশ্রয়ের ঠিকানা খুঁজেছে। ঐতিহ্যবাহী সহাবস্থানের জাতীয়তা যে যৌথ সম্পদ এ সত্য তারা বুঝতে চায় নি। আর এ ধারার শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ ভাবতে চাননি দীর্ঘকালে অখণ্ড ভারতে সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্য স্থাপত্য ভাস্কর্য কীভাবে বিভাজিত হবে? গালিব ও মীর তকী, মুন্সী প্রেমচন্দ বা মূলকরাজ আনন্দ, খাজা আহমদ আব্বাস বা কৃষান চন্দর, সাদাত হাসান মান্টো বা ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে কি বিভক্ত করা যাবে ভারত-পাকিস্তানের দাবিতে? কিংবা বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুভবুদ্ধির কথা বোঝেনা, বুঝতে চায় না। বুঝতে চাননি জিন্না বা নেহরু-প্যাটেল। তাদের ভুল ভ্রান্তির ফলে সৃষ্ট বিপরীত স্রোত পুরুষানুক্রমে লালিত মৃত্তিকাগভীরের শিকড়গুলোকে বেশ কষ্ট করেই উপড়ে নিয়েছিল বিভাজনের টানে। জিন্না-অনুসারীদের অনেকে যেমন খালিকুজ্জামান, ইসমাইল খান, ছাতারের নবাব, মাহমুদাবাদের রাজা, বোম্বের চুন্দ্রীগড় প্রমুখ তাদের ঐতিহ্য লালিত শিকড় উপড়ে পাকিস্তানে হিজরত করতে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছেন (মুশিরুল হাসান)। অবশ্য জিন্নার কথা আলাদা।

স্বচ্ছচিন্তায়, নিরপেক্ষ বিচার ব্যাখ্যায় প্রশ্ন উঠে আসে পাকিস্তানের পক্ষে প্রকৃত জনসমর্থন কেমন ছিল। হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলোর বিভ্রান্ত মুসলমানদের পাকিস্তান সমর্থনের পেছনে মানসিক কারণ বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চল ও সন্নিহিত ভূমিতে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ভূস্বামী ও শিক্ষিত এলিটরাই ছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে বড় খুঁটি। তাদের সঙ্গে মুৎসুদ্দি ও উঠতি পুঁজিপতিশ্রেণী–ইস্পাহানি, দাউদ, আদমজী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন প্রমুখ। এদের অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রভাব জনসাধারণ্যে ছিল বিপুল। তাদের সঙ্গে ছিল পেশাজীবী-আমলা-টেকনোক্র্যাট। এদের দ্বারা প্রভাবিত সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মোহাম্মাদ আলী জিন্নার ব্যক্তিগত প্রভাবে।

তাসত্ত্বেও তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় জিন্নার পাকিস্তান নিয়ে দ্বিধা সংশয় ছিল অনেকের। ছিল বিরোধিতাও। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে পাকিস্তান অর্জনে জিন্নার জয় কীভাবে? জবাব খুব সোজা। জিন্নার রাজনৈতিক কলাকৌশল, ব্রিটিশরাজের সহযোগিতা, ধর্মীয় প্রচার (মৌলবি-মাওলানাদের সমর্থন) এবং মুসলিম লীগের সন্ত্রাসী ক্যাডারবাহিনীর দাপটে ভোটবাক্সের জয়, সর্বোপরি কংগ্রেস ও সরকার পক্ষে গৃহযুদ্ধের ভয়। এ জাতীয় সবকিছুর প্রভাবে ব্রিটিশরাজ নিশ্চিত হয় যে ভারত বিভাগের বিকল্প কিছু সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরাজ এ পথেই হেঁটেছে। ভারতভাগ ও পাকিস্তান মঞ্জুর করেছে। কিন্তু প্রদেশভাগসহ অনেক কাটাকুটি করে, উভয় পক্ষকেই একদিকে সন্তুষ্ট, অন্যদিকে অসন্তুষ্ট করে। উদ্দেশ্য বিভাজিত দুই রাষ্ট্র (ডোমিনিয়ন) যাতে চিরদিনের জন্য পরস্পরের শত্রু হয়ে থাকে। আর সে ব্যবস্থার কারণে হিন্দু-মুসলমান-শিখ হিংস্র সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় পেশোয়ার থেকে বঙ্গদেশের মাটি নিজদের রক্তে রঞ্জিত করেছে। এই ছিল ব্রিটিশের উপহার বহু-আকাঙ্ক্ষার ধন পাকিস্তান প্রাপ্তির পরিণাম। এ বৈরিতার অবসান ঘটেনি। একুশ শতকে পৌঁছেও ১৯৪৭-এর 'আদিপাপ' সাম্প্রদায়িক সহিংসতা থেকে তারা বিরত থাকতে পারছে না। বাংলাদেশও এ পাপ থেকে মুক্ত নয়। পাকিস্তান থেকে যে বাংলাদেশের জন্ম সেকুলার ভাবনা নিয়ে তার পরিণতিও ভিন্ন নয়। জিন্নার পাকিস্তানি ভূত এখনো আমাদের তাড়া করছে। জামায়াত তো আছেই। সম্প্রতি কওমি মাদ্রাসার হেফাজতি ইসলামের উত্থান তার প্রমাণ। সেই সঙ্গে একাধিক ইসলামি ধর্মীয় জঙ্গিবাদী সংগঠন দেখা দিচ্ছে। কে বলবেন, বাংলাদেশী সমাজের সর্বাংশ সেকুলার?

তিন

জিন্নার এই পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের সব মুসলমান নাম লিখিয়েছিলেন? যেজন্য জিন্নার তখন অনমনীয় দাবি যে তিনি সমগ্র ভারতীয় মুসলমান জনতার 'একমাত্র মুখপাত্র' ('সোল স্পোক্‌সম্যান')। হ্যাঁ ১৯৪৬-এ পৌঁছে তিনি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মুখপাত্র, তবে সবার নন। তখনো সেকুলার ভারতের পক্ষে জাতীয়তাবাদী মুসলমান-ব্যক্তিবিশেষ ও সংগঠন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান কংগ্রেস নেতা ছাড়াও জমিয়েতে উলেমায়ে হিন্দ্‌, আহরার, মোমিন ও শিয়া সম্প্রদায় এবং সীমান্তের খুদাইখিদমতগার ও সিন্ধুর জিয়ে সিন্দপন্থীরা সংখ্যায় কম নয়। তেমনি পাঞ্জাবের খাকসারগণ।

মুশিরুল হাসান লিখেছেন ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের সর্বভারতীয় সম্মেলনগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরা সবাই জিন্নার ভারতবিভাগ ও পাকিস্তান প্রকল্পের বিরোধী, তবে ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গত দাবি-দাওয়া বিসর্জনের পক্ষপাতী নন। এরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতারও সমর্থক। এদের রাজনৈতিক বিশ্বাস আক্রান্ত হয়েছে মুসলিম লীগ সন্ত্রাসীদের হাতে যা আমরা দেখেছি বাংলাতেও।

আবার ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে লাঞ্ছিত বা আক্রান্ত হয়েছেন। মুশিরুল হাসান উত্তরাঞ্চলের এমন কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন। যেমন মওলানা আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক আবদুর রাজ্জাক মালিহাবাদী (সম্পাদক, 'হিন্দ') ওই আক্রমণের শিকার। মওলানা মোহাম্মদ কুদ্দুস ও মোহাম্মদ ইসমাইল কোনোরকমে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। জমিয়ত সভাপতি হোসাইন আহমদ মাদানিকে উত্তরবঙ্গের সৈয়দপুরে লীগপন্থী ক্ষিপ্ত লোকদের হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ (ইন্ডিয়া'স পার্টিশন' সংকলন, অক্সফোর্ড প্রকাশনা)।

AMARBOI.COM

কিন্তু তাই বলে মুসলিম জনতার ওপর জিন্না ও মুসলিম লীগের ব্যাপক প্রভাব ছিল না এমন ভাবনাও যুক্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে লাহোর প্রস্তাব এবং তার আগে ও পরে, বিশেষ করে চল্লিশের দশকের প্রায় সাত বছরে লীগ রাজনীতির ধর্মভিত্তিক প্রচারণা ও হিন্দুভারতে বসবাসের ভয়ভীতির ব্যাপক প্রচার সিংহভাগ মুসলিম মানসে গভীর প্রভাব তৈরি করে। এমন অপপ্রচারও চলেছে যে ব্রিটিশ শাসনের অনুপস্থিতিতে স্বাধীন ভারতে মুসলমান জনতার ধর্মকর্ম পালন ব্যাহত হবে। ধর্মীয় চেতনা, ধর্মপালন বিঘ্নিত হবার ভয়, নিরাপত্তার অভাববোধ, স্বতন্ত্র ভুবনে প্রতিযোগিতাহীন অবস্থান ইত্যাদি কারণে জিন্নার প্রতি আস্থা ও তার পাকিস্তানের প্রতি মুসলিম মানসে মুগ্ধতা তৈরি হয়। যুক্তি সেখানে হার মানে। বিভাগোত্তর পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে মূল কারণ অনেক ক'টাই যুক্তিহীন।

জিন্নার ধর্মীয় চেতনাভিত্তিক পাকিস্তান মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলের জন্য ইতিবাচক হলেও (যেমন বঙ্গ, পাঞ্জাব ইত্যাদি) ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য সর্বনাশের পরিস্থিতিই সৃষ্টি করে। ধর্মীয় প্রচারের প্রভাবে এ সত্য হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রদেশের মুসলমান জনতা বুঝতে পারেনি। জানা ছিল না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে তাদের অবস্থা শিখণ্ডির মতো হবে, পায়ের নিচে মাটির নির্ভরতার অভাব ঘটবে। বিভাগোত্তর কালে তেমনটিই ঘটেছে।

সেজন্যই জিন্নার পাকিস্তান তৎকালীন ভারতীয় মুসলিম স্বার্থের একাধিক 'এজেন্ডা'র সমাধান করতে পারেনি। বরং পাকিস্তান কারোর জন্য অত্যধিক সুবিধা, আবার অনেকের জন্য অসুবিধা বা সংকট তৈরি করেছিল। তেমন সমস্যা পূর্ববঙ্গীয় বাঙালি মুসলমান স্বার্থ নিয়ে যে জন্য প্রত্যাশিত পাকিস্তান অর্জনের পরও তাদের পাকিস্তানি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। এ বিচ্ছিন্নতার বীজ জিন্নার পাকিস্তান পরিকল্পনার মধ্যেই নিহিত ছিল। শিক্ষা-আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনেক পশ্চাদপদ বাঙালি মুসলমান তা বুঝতে পারেনি। বিশেষ করে কৃষক ও কারিগর-প্রধান নিম্নবর্গীয় মানুষ। লীগের নির্বাচনী ইশতেহার, আশ্বাস ও প্রচার তাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জিন্নার পাকিস্তান যে উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় আমলা, ভূস্বামী ও এলিট শ্রেণী ও অনুরূপ পাঞ্জাবি স্বার্থ-ভিত্তিক এবং তা বাঙালি-স্বার্থ-বিরোধী ঐ সত্য শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবনায় ধরা দেয়নি। তাই জিন্না তাদের কাছেও ছিলেন পরিত্রাতা 'কায়েদে আজম'।

শিক্ষিত ও রাজনীতিক শ্রেণীর বাঙালি তা না বুঝলেও সিন্ধুর জাতীয়তাবাদীদের (আল্লাবকশ সমরু থেকে জি. এম. সৈয়দ প্রমুখের) চেতনায় তা স্পষ্ট হয়েই ধরা দিয়েছিল। তবে ধারণা ছিল না বিহার ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে মোহাজিরগণ এসে সিন্ধু, বিশেষ করে করাচি শহর দখল করে নেবে। নিজ রাজধানীতে তারা সংখ্যালঘু, জীবনযাত্রার নানা খাতে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। থেকে থেকে জাতিগত সহিংসতায় পাকিস্তানের অবাঞ্ছিত চরিত্র তাদের সামনে উঠে এসেছে।

সীমান্তপ্রদেশের পাঠান তথা পাখতুনগণ বরাবরই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। সেই সঙ্গে লীগ বিরোধী। এমনকি ১৯৩৭-এর নির্বাচনে গাফফার খানের খুদাই খিদমদগারদের একচেটিয়া বিজয় এবং ১৯৪৬-এ পাকিস্তান দাবির জোয়ারের সময়ও বিজয় একই সত্য প্রমাণ করেছে। জবরদস্তির গণভোট (১৯৪৭) সত্ত্বেও তাদের লড়াই অব্যাহত থেকেছে। থেকেছে পাকিস্তান আমলেও। মাউন্টব্যাটেন কিছুটা নমনীয় হলে ১৯৪৭-এই সীমান্তপ্রদেশে স্বাধীন পাখতুন রাষ্ট্র জন্ম নিতো।

আর বেলুচিস্তানের স্বাধীনচেতা ভিন্ন এথ্নিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষও পাঠানদের মতো জিন্নার পাকিস্তান প্রকল্পের বিরোধী। ব্রিটিশ রাজত্বকালে তারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তার দাবি জানিয়েছে। মন্ত্রীমিশনের কাছে কালাত-এর স্বাতন্ত্র্য ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতার স্মারকলিপি পেশ করা হয়। তাদের স্বাধীনতার আন্দোলন দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে। ১৯৪৭-এর ক্রান্তিক্ষণে চলেছে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক, দেনদরবার।

অবাক হওয়ার মতো ঘটনা যে ১৯৪৭ সালের ১২ আগস্ট কালাত সরকার স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তাদের নিজস্ব পতাকা উত্তোলন করে (কুলদীপ নায়ার)। পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্ম হবার যে আহ্বান জানান জিন্না তারা তা অগ্রাহ্য করে। পরে অবশ্য একধরনের সমঝোতা হয়। কিন্তু বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতার সংগ্রাম প্রবল পাকিস্তানি আক্রমণের মুখেও অব্যাহত থেকেছে। এই তো বছর কয় আগে বেলুচিস্তানের নেতা নওয়াব আকবর খান বুগতি চোরাগোপ্তা পাকআক্রমণে নিহত হন। তবু তাদের সংগ্রাম চলছে। কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, একজন শীর্ষস্থানীয় বালুচ নেতা তাকে বলেন, ভারতের সঙ্গে সীমান্ত যোগাযোগ থাকলে তারা অনেক আগেই পাকিস্তান থেকে মুক্ত হতে পারতেন (পৃ. ৫৪)।

চার

পরিস্থিতি বিচারে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ভূখণ্ড বিভাজন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নিয়তি যা পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকে জিন্নার হাত থেকে গ্রহণ ও বহন করে চলেছে। বিভাগোত্তর কালে পাকিস্তান তার নিজস্ব একক জাতিসত্তা গড়ে তুলতে পারে নি মূলত পাঠান, বালুচ ও অংশত সিন্ধিদের স্বাতন্ত্র্যবোধের কারণে। আর বাঙালিদের পাক শাসকগণ তো বিজাতীয় জ্ঞান করেছে। ইংরেজি 'পি' (P) অক্ষরের প্রতীকে পাঞ্জাব একাই হয়ে উঠেছে প্রকৃত পাকিস্তান। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিচারে এটাই পাকিস্তানের জন্য অপ্রিয় সত্য।

ভারতবিভাগ বিষয়ক বিশাল তথ্যভাণ্ডার এবং লেখকদের বিচার-বিশ্লেষণ থেকেও পাকিস্তানকে একটি স্বাভাবিক রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করা কঠিন। **ভারত বিভাগের জটিল রাজনীতির অসমন্বিত দ্বন্দ্বের পরিণাম 'পাকিস্তান'**। বিভাজন সম্ভবত এই রাষ্ট্রের অনিবার্য নিয়তি। তাই দুই যুগের মধ্যে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিশ্চিত করে। এখনো সে বিভাজন-প্রবণতা শেষ হয় নি।

একাধিক সমস্যা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে তাড়া করে চলেছে। এবং তা পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে। হডসন মনে করেন পাকিস্তানের রূপকারগণের (রূপকার বলতে তো একজনই, মোহাম্মদ আলী জিন্না) ধারণা ছিল যে পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথাসিদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা নির্বাচনে সংসদীয় ক্ষমতা অর্জনে পশ্চিমকে ছাড়িয়ে যাবে (পৃ. ৫৭৬)। তেমন আশংকা থেকে পাকিস্তানের রাজধানী করাচি, পিন্ডি হয়ে ইসলামাবাদে স্থিত হয়েছে। দ্রুত উন্নতি অবকাঠামো নির্মাণে ও শিল্পায়নে। পরিণামে পূর্ব-পশ্চিমে অর্থনৈতিক বৈষম্য যা বিচ্ছিন্নতার মূল সূত্রটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এবং তা বাস্তবে পরিণত করেছে।

ভারতবিভাগের মৌলিক ঐতিহ্য এবং পাক শাসন ব্যবস্থার কারণে জিন্নার পরিকল্পিত পাকিস্তানি জাতীয়তা যেমন তৈরি হয় নি, বিচ্ছিন্নতাবোধের মুখে গঠিত হয়নি জাতিরাষ্ট্র, হয়েছে ধর্মীয় রাষ্ট্র (ইসলামি রাষ্ট্র)। তাই গণতন্ত্র চর্চার বদলে সামরিক, বেসামরিক সর্বখাতে পাকিস্তান ইসলামিকরণের (ইসলামি জোশের) পথ ধরে চলেছে। কিন্তু ধর্মীয় সংহতি রাষ্ট্রীয় সংহতি দৃঢ় করে তুলতে পারেনি। এর কারণ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানদের পাকিস্তান-বিরোধী রাজনীতি প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তপ্রদেশের মুসলিম মানসিকতার পরিচয় নিতে গেলে কিছুটা অবাক হতে হয়। লিয়াকত-খালিকুজ্জামানদের মতো শীর্ষ লীগ নেতাদের আবাসভূমি যুক্তপ্রদেশে লীগের বিজয় সত্ত্বেও সেখানে জাতীয়তাবাদী সেকুলার প্রার্থীদের মোট ভোটসংখ্যা ছিল প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৩১ শতাংশ। সংখ্যাটা একেবারে হেলাফেলার মতো নয়। কারণ লীগের প্রচণ্ড ধর্মীয় প্রচারণা তথা 'কাবা না কাশী' মন্তব্যের উস্‌কানি সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে ৩১ শতাংশ মুসলমান পাকিস্তানের বদলে অখণ্ড ভারতের পক্ষে ভোট দিয়েছে (মুশিরুল হাসান, পৃ. ৪০-৪১)। মুশিরুল হাসান মনে করেন, কংগ্রেসের পক্ষে বিচক্ষণতার অভাব ও ভুলভ্রান্তি না ঘটলে আসন সংখ্যা ও ভোটসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতো। তার মতে ভারতবিভাগ ট্রাজেডির মূল কারণ 'অতি অল্প সংখ্যক লোক বহুসংখ্যকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিল'। আর তারা সবাই শিক্ষিত উচ্চবর্গীয় মুসলমান।

ভারতবিভাগের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক যেমনই হোক একথা অস্বীকার করা যায় না যে পাকিস্তান ধর্মীয় রাজনীতি-প্রসূত জটিলতার এক যুক্তিহীন সন্তান। জনক অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আইনজ্ঞ রাজনীতিক মোহাম্মদ আলী জিন্না। পাকিস্তান এখনো জিন্নাঘোষিত ধর্মীয় রাজনীতির প্রভাব বহন করে চলেছে। শুদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণ তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুক্ত হতে পারে নি সংশ্লিষ্ট উপসর্গ থেকে যেজন্য খুন, গুম, রক্তক্ষয়ী সহিংসতার রাজনীতি নিয়মিত ঘটনা। ভারত এদিক থেকে কিছুটা ভালো অবস্থানে থেকেও সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতার উপসর্গ থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। যুদ্ধংদেহী সম্পর্ক পাকভারতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ম্লান করে দিচ্ছে। শান্তি, শুভবুদ্ধি ও সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণ পদক্ষেপই শুধু তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। পারে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতার দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে।

কিন্তু তেমন সম্ভাবনা দুর অস্ত্। কারণ ভারতবিভাগ ও পাকিস্তান প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা ও অসমন্বিত দ্বন্দ্বগুলো নিয়েই বিচক্ষণ জিন্নার অদূরদর্শী অর্জন যা তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি। অবশ্য তেমন কোনো স্বপ্ন পাকিস্তান অর্জনের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে মনে হয় না। যে সব সাংবিধানিক দাবির ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জিন্নার লড়াই, তার বিপরীত দাবিগুলোই (যা ছিল কংগ্রেসের) জিন্না পাকিস্তানে প্রবর্তন করেন। যেমন শক্তিশালীকেন্দ্র, দুর্বল প্রদেশ, প্রাদেশিকতাকে পাকিস্তান-বিরোধিতা হিসাবে চিহ্নিত করা, 'একভাষা একনেতা-একদেশ' স্লোগান ইত্যাদি।

প্রচ্ছন্ন সমস্যা নিয়ে জিন্না যে-পাকিস্তানের স্থপতি তাতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো ইচ্ছা জিন্নার স্বল্প মেয়াদেও দেখা যায় নি। আর তেমন চিন্তা যে পরবর্তী শাসকদের মধ্যেও ছিল না তা পাকিস্তানের সেনানায়কদের চিন্তায় ও কর্মে প্রতিফলিত। হডসন লিখেছেন ইস্কান্দার মীর্জা বা আইউব খানের মতো জেনারেলদের বিশ্বাস ছিল যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পাকিস্তান ভেঙে পড়বে, বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম দ্বন্দ্বে (পৃ. ৫১৪)। রাজনৈতিক নেতাদেরও একই ধারণা ছিল। আসলে ঘটনা ছিল এর বিপরীত। গণতন্ত্রই ভাঙন ঠেকাতে পারতো।

আর পাকিস্তানের নিজ অবস্থান নিয়ে কী ভাবতেন জিন্না। সে সব নিয়ে অনেক গল্প, অনেক চুটকি রয়েছে যা তার একনায়কসুলভ মানসিকতার প্রমাণ দেয়। এর জন্য লীগের শীর্ষনেতাদের দায় কম নয়। সব ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করে তারা নির্ভার হয়েছিলেন। ভারতবিভাগ ও পাকিস্তান গঠন যখন নিশ্চিত তখন জিন্নার অবস্থান ঈশ্বরতুল্য। তার কথাই শেষ কথা, হোক তা যুক্তিহীন। তাই লাহোর প্রস্তাবের দুই পাকিস্তানকে তিনি এক ধমকে এক পাকিস্তানে পরিণত করেন।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন দিল্লির ইম্পিরিয়াল হোটেলের সুসজ্জিত বলরুমে, জুন ৯, ১০ (১৯৪৭)। শাহি জমজমাট আয়োজন। থেকে থেকে মুমুর্মুহু স্লোগান 'শাহেন শা-ই পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'কায়েদে-আজম জিন্দাবাদ'। ক্ষমতার এমন প্রতাপই বোধহয় চেয়েছিলেন জিন্না যা একমাত্র পাকিস্তানেই সম্ভব–দ্য গ্রেট ডিকটেটরের অবিশ্বাস্য মর্যাদা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই সভায় অবশ্য পাকিস্তান-বিরোধী, পাঞ্জাব-বিভাজন বিরোধী খাকসারদের অতর্কিত হামলা-'কোথায় জিন্না' হুংকারে। স্বভাবতই খাকসার বনাম সশস্ত্র ন্যাশনাল গার্ডদের সংঘর্ষ, ভাঙচুর, কিছু রক্তপাত ও গ্রেফতারের মধ্যদিয়ে সংঘাত শেষ। শক্ত ধাতুতে তৈরি জিন্না এ ঘটনায় বিচলিত হননি। ঐ সভার প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট জিন্নার হাতে ওঠে লীগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা। এমনটাই চেয়েছিলেন জিন্না। লীগ মানেই জিন্না।

পাঁচ

পরবর্তী মাস দুই পাকিস্তানের স্থপতি জিন্নার সময় এমন মুগ্ধতার পরিবেশেই কেটেছে। বোম্বের মালাবার হিলসের সুরম্য প্রাসাদ ভবন থেকে জিন্নার করাচি যাত্রা ৭-ই আগস্ট (১৯৪৭)। সেখানেও অবিশ্বাস্য রাজসিক অভ্যর্থনা। সেখানেও 'শাহেন শা জিন্দাবাদ' স্লোগান। ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের একমাত্র সাধনা। ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বের (সোল্ স্পোক্সম্যান) দাবিও ওই আকাঙ্ক্ষার রকমফের।

অবাক হবার মতো ঘটনা–কোথায় দিল্লি-করাচি আর কোথায় পূর্ববঙ্গের দূরদুর্গম গ্রাম। সেখানেও এক দীনতম শ্রমিকের কণ্ঠে ১৫ আগস্টে গর্বিত উচ্চারণ–'জিন্না আমাদের বাদশা'। কী আশ্চর্য মিল! পাকিস্তানে জিন্নার এ অর্জন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ ধরে নয়। তার লড়াই সাম্প্রদায়িক চেতনার, ধর্মীয় বিভেদচেতনার পথ ধরে। সেখানে গণতন্ত্রী রাজনৈতিক আদর্শের কোনো বালাই নেই। উচ্চাভিলাষই একমাত্র কথা। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পদটি তার চাই, এ বার্তায় হতবাক মাউন্টব্যাটেন। এভাবে ক্ষুব্ধ অহমিকা চরিতার্থ করেন জিন্না তার পাকিস্তানে।

বিভক্ত ভারতের দুই ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রে গান্ধি জিন্না এই দুই প্রধান নেতার শেষ পথ অবশ্য ভিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও শেষ পর্বে গান্ধির সঠিক সিদ্ধান্ত ক্ষমতাবলয়ের বাইরে অবস্থান গ্রহণ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখা। শেষোক্ত কারণে উগ্র স্বধর্মীর গুলিতে মৃত্যু-বরণ। অন্যদিকে জিন্না বেছে নেন দেশের সর্বোচ্চ শাসনপদ 'গভর্নর জেনারেল অব পাকিস্তান'। বিচক্ষণ রাজনীতিক ভেবে দেখেন নি : 'এ মণিহার' তার প্রয়োজন ছিল কিনা। কারণ পাকিস্তানের মানুষ তাকে 'শাহেন শা'র আসনে বসিয়ে ছিল তাদের অন্তরের টানে। তার রাজনৈতিক কর্মের ভুল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রটির হিসাব না করে। পূর্বাহ্নে বিজয়ী হলেও শেষ দানে গান্ধির কাছে হেরে গেছেন জিন্না। সে হারের মাত্রা আরো বেড়েছে যখন গান্ধি হত্যার প্রতিক্রিয়ায় জিন্নার মন্তব্য : একজন হিন্দুনেতার মৃত্যুতে শোকবার্তা জানাচ্ছি।

জিন্নার পাকিস্তান সম্প্রদায়বাদী রাজনীতির এই ঐতিহ্য থেকে এখনো মুক্ত হতে পারে নি। পুরোপুরি পারেনি ভারতও। করাচির উদ্দেশ্যে জিন্নার শেষযাত্রা (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) ছিল আবেগহীন, নিরাসক্ত, শাদামাঠা পরিবেশে যা পাকিস্তানের স্থপতি ও গভর্নর জেনারেলের যোগ্য ছিল না, প্রাপ্য ছিল না পাকিস্তানের কাছে। সে রাতেই করাচিতে তার মৃত্যু। সে সংবাদে নেহরুর প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক সমালোচনা ছিল। তবে শেষ বক্তব্য ছিল ভিন্ন : 'এখন আমার চিন্তায় তার সম্বন্ধে কোনো তিক্ততা নেই। শুধুই আছে গভীর বিষণ্নতা' (যশবন্ত সিং)। দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক এমন অদ্ভুত ধারাবাহিকতা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশভাগ ও উদ্বাস্তুকথা

দেশভাগের একটি বড় অমানবিক দিক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জনশ্রেণীর ধনমান ও মর্যাদার আর্থ-সামাজিক ট্রাজেডি। যেমন বিভক্ত পাঞ্জাবে তেমনি বিভক্ত বঙ্গদেশে। আমরা ভাবছি আপাতত বঙ্গদেশ ও বাঙালিকে নিয়ে। তবে পাঞ্জাবের ঘটনাবলী ছিল ভয়াবহ। প্রবীণ পাঞ্জাবি সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার সম্প্রতি প্রকাশিত তার আত্মজীবনীতে সে ভয়াবহতার কিছু রেখাচিত্র তুলে ধরেছেন। প্রাণরক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সৃষ্ট বাস্তুত্যাগে জনতার বিশাল কাফেলাকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন 'স্বস্থানত্যাগী মানুষের হিমবাহ' রূপে। 'দুই বিপরীত মুখে একই দেশের মানব সন্তানের যাত্রা, যা কেউ চায়নি, কেউ ভাবেও নি। কিন্তু সে অস্বাভাবিক জনস্রোত বন্ধ করার প্রক্রিয়া তাদের জানা ছিল না'। বিনা অপরাধে যাদের ঘরবাড়ি মাটি ছাড়তে হয়েছে হিন্দুমুসলিম শিখ, স্বভাবতই তাদের মনে সঞ্চিত ক্ষোভ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা টগবগ করে ফুটেছে। সে ফুটন্ত চেতনার প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক ছিল না। দিল্লিতে সেই ক্ষোভের সাম্প্রদায়িক প্রকাশ, নেপথ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল।

বাংলার অবস্থা পাঞ্জাবের মতো না হলেও এখানে দেখা গেছে সংখ্যালঘুদের মনে আতংক আর ভয়। অন্যদিকে প্ররোচনা ও বিত্তবানদের সম্পদ দখলের চেষ্টা, সব কিছু মিলে বিত্তবান ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর হিন্দুদের দেশত্যাগ। সেই সঙ্গে অচিরেই ভারতীয় হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়ায় বা স্থানীয় উপদ্রব হিসাবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাবলীর চাপে কথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগ নিয়মিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ এদের চিহ্নিত করেছেন 'প্রান্তিক মানুষ' হিসাবে।

এ প্রক্রিয়া অবশ্য বঙ্গে শুরু হয় দেশভাগের আগেই ১৯৪৬-আগস্টে সংঘটিত কলকাতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি-ত্রিপুরায় দাঙ্গার সময় থেকে। সাতচল্লিশের বঙ্গভাগ সে অস্থিরতায় আরো গতি সঞ্চার করে। যারা হিসেবি মানুষ তারা কিছু অর্থের বিনিময়ে ঘটনার আগেই ঘরবাড়ি ছেড়েছেন, তবে অধিকাংশকেই বিরূপ পরিস্থিতিতে সম্বলহীন অবস্থায় অজানা অচেনা

গন্তব্যে পাড়ি দিতে হয়েছে। তাৎক্ষণিক লক্ষ্য সীমান্ত অতিক্রম করে স্বধর্মী স্বদেশে আশ্রয় গ্রহণ, যেদেশ বিভক্তির কারণে বিদেশ হয়ে গেছে।

এই আশ্রয়গ্রহণ স্বধর্মীগণ খুশিমনে মেনে নেননি। ঘটি-বাঙাল বিরোধ সরস বয়ানে হালকা ভাবে নিলেও তা অনেক আগেকার কথা। তাই পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা, বিশেষ করে তাদের রক্ষণশীল শ্রেণীর চোখে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত 'রিফিউজি'দের ভিন্ন জগতের, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ বলে মনে হয়েছে, বিশেষ করে তাদের ভাষায়, আচরণে। কেন তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে ভাগ বসাতে এসেছে অনাত্মীয় এক জনগোষ্ঠী, ধর্মে যদিও মিল?

দুই

অর্থনৈতিক স্বার্থের এমনি মাহাত্ম্য যে সে স্বধর্মীকেও কখনো কখনো ছাড় দেয় না। যেমন আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি পাকিস্তান আমলে মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পূর্বপাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্ফোরণ। উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো। পাকিস্তানি মুসলিম শাসন থেকে মুক্তি।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পরিণামে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম বঙ্গবাসী হিন্দু সম্প্রদায় ও স্থানীয় প্রশাসনের বিরূপ আচরণ ওই অর্থনৈতিক তত্ত্বটিকেই নতুন করে সত্য প্রমাণ করে। 'ফ্রন্টিয়ার' সম্পাদক কবি সমর সেনও তার লেখা 'বাবু বৃত্তান্ত' বইতে উদ্বাস্তুদের প্রতি বিরূপ আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে :

'পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এখনে এসেছেন। একসঙ্গে নয়, খেপে খেপে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য এমন কিছু করেন নি যতটা করেছেন উত্তর ভারতে।... পাঞ্জাব দিল্লী ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বীভৎস নরমেধ চলে, লক্ষ লক্ষ লোক আদিবাস ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন, নতুন জায়গায় গিয়ে যে সমস্যার মুখোমুখী হন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।... যাঁরা ক্ষমতা পেলেন তাঁদের কোন ক্ষতি হয়নি, তারা মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেয়েছেন।...

'পূর্বপাকিস্তানে ও পশ্চিমবঙ্গে উত্তর ভারতের মতো ভয়াবহ তাণ্ডব ঘটেনি। মাঝেমাঝে গণ্ডগোল বেঁধেছে। লোক মরেছে, আতঙ্কে অনেকে এখানে চলে এসেছেন। এখান থেকে কতজন পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছেন? এখানকার উদ্বাস্তুরা সবাই কলকাতায় বা আশপাশে নেই, অনেককে বাইরে পাঠানো হয়েছে, যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দণ্ডকারণ্যে।... উদ্বাস্তুদের আগমন পশ্চিমবঙ্গের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে সন্দেহ নেই।... আসলে পশ্চিমবঙ্গের অনেকের মনোবৃত্তি উন্নাসিক, উদ্বাস্তুরা সরকারী বেসরকারীভাবে যথেষ্ট সহানুভূতি পান নি' (বাবু বৃত্তান্ত, পৃ. ১১৮)।

সমর সেন সরাসরি না বললেও এটা স্পষ্ট যে পাক শাসকদের মতোই ভারতীয় শাসকদেরও বাঙালি-বিরূপতা নানা ঘটনায় প্রমাণিত। তবে স্বধর্মী, স্বজাতি পশ্চিম-বঙ্গীয়দের বিরূপ অভ্যর্থনা পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। তাই দীর্ঘ সময় ধরে তাদের দুঃসহ জীবনযাপন, পুরো এক প্রজন্মে, অবশ্য অসচ্ছলদের ক্ষেত্রে। বলতে হয় উদ্বাস্তু সমস্যা দেশভাগের পরিণামে এক নতুন মাত্রার জন্ম দিয়েছে। এ সমস্যা উদ্বাস্তু কারো কারো ব্যক্তিগত লেখায় উঠে এসেছে, যেমন বরিশালের দীপক পিপলাই বা মাগুরার দীপংকর রায় প্রমুখ।

তিন

বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের নাট্যব্যক্তিত্ব সুধী প্রধানেরও নজর এড়ায় নি। স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে তিনি লিখেছেন : 'উত্তর ভারতের নেতারা বহুদিন ধরেই বাঙালি বিদ্বেষী ছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তার কাছে একজন বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক বলেন, বাংলাভাষার মৃত্যু না হলে ভারতের সর্বনাশ। ভারত বিভাগের ফলে বাংলা যে দ্বিখণ্ডিত হল তার প্রথম আঘাত এল ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর' ('বিভক্ত ভারতে পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা', ঈশান, ১৯৯৮)।

AMARBOI.COM

আসলে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে ধীরেসুস্থে। তাৎক্ষণিক আঘাত জাতিসত্তার ওপর এবং তার ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যা। সুধী প্রধান আরো বলেছেন, 'দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে যারা পশ্চিমবঙ্গে এল কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য বিশেষ কিছুই করে নি।... কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য ছিল... বাঙালিকে ধ্বংস করা এবং জাতিসত্তা হিসাবে বাঙালিকে দুর্বল করা' (প্রাগুক্ত)। একই চেষ্টা ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারেরও। পশ্চিমবঙ্গ এ মূল বিষয়ে কতটা সচেতন বলা কঠিন।

দেশভাগের পরিণাম সম্প্রদায়গত বিভাজন ঘটিয়েই শেষ হয়নি। উদ্বাস্তু সমস্যা ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক বিভেদেরও জন্ম দিয়েছে। ভাগ্যতাড়িত একশ্রেণীর মানুষের জন্ম দিয়েছে যাদের নাম 'রিফিউজি' তথা বাস্তুত্যাগী, শরণার্থী। পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত এ ট্রাজেডির বিস্তার। তবে স্বধর্মীয়দের আঞ্চলিক মানসিক বিভাজন একমাত্র তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেছে। একে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙাল, তায় বাস্তুত্যাগী। আর সেজন্য স্বধর্মীর অবজ্ঞা থেকে আপন হীনমন্যতার মধ্যেই জন্ম নেয় তাদের প্রতিবাদী চেতনা যা রাজনীতিকেও স্পর্শ করে।

কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক রাজনৈতিক রচনায় দেখেছি 'রিফিউজি' রাজনীতি নিয়ে বিচার-ব্যাখ্যা এবং রিফিউজি তরুণদের বামরাজনীতি শক্তিমান করা নিয়ে তির্যক মন্তব্য। পেছনে ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতি সম্বল করে প্রতিকূল পরিবেশে নতুন প্রত্যাশার জগত তৈরি এদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তবু 'রিফিউজি' শব্দটির সঙ্গে জড়িত অবজ্ঞা যেন লেবেলের মতো এদের গায়ে সেঁটে থাকে। দেশভাগ এদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। পরিবর্তে উপহার দিয়েছে সহিংসতার ক্ষত ও আতংকের তিক্ত স্মৃতি। এ সমস্যা এদের বিত্তবান বা উচ্চমধ্যবিত্তের জন্য ততটা নয় যতোটা নিম্নমধ্যবিত্ত ও অসচ্ছল ছিন্নমূল মানুষের জন্য। ইতিহাস ও সাহিত্য এদের কিছুটা মান্য করলেও আশ্রয়দাতা সমাজ তা করেনি।

কৃপাণধারী, উগ্রমেজাজী শিখ উদ্বাস্তু যেটুকু সুবিধা আদায় করে নিতে পেরেছে বাঙালি উদ্বাস্তু তা পারেনি। তাই তার গতি পুরনো দিল্লি বা অনুরূপ কলকাতায় নয়, বিরূপস্থান বা অস্থানে। এ পরিস্থিতির প্রতীকী ছবি আঁকেন বরিশালের সম্পন্ন পিপলাই পরিবারের তরুণ সদস্য : 'আমাদের দেশ ছিল পূর্বপাকিস্তানের বরিশালে, আমরা উদ্বাস্তু পরিবার, গ্রামের বাড়ি-জমি-পুকুর, শহরের বাড়ি-জমি সবকিছু ফেলে আসতে হয়েছে দেশভাগের ফলে। বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে যেমন ছিল বরিশালে, মা-দাদুর ভিটে তেমনি খুলনায়। ওঁরাও উদ্বাস্তু। কখনো কাশী, কখনো মধুপুর, কখনো কলকাতার জনক রোড কিংবা বড়বাগান—নানা ঘাটে ঠোক্কর খেতে খেতে শেষবন্দর বেহালা। আর ভবানীপুর-মেটিয়াবুরুজ-পাইকপাড়া-এন্টালি ইত্যাদি জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে দিদিমা থিতু হয়েছিলেন ট্যাংরা অঞ্চলে' (আমার প্রশ্নভূমি : বাংলাদেশ', দীপক পিপলাই)।

সম্পন্ন পরিবারেরই যদি এমন 'ঠোক্কর খাওয়া' দশা সেক্ষেত্রে অসচ্ছল উদ্বাস্তুদের দুর্দশার কথা ভাবাই যায় না। ওই সব শরণার্থীর গতি হয় শিয়ালদা প্ল্যাটফর্ম থেকে মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য বা দূর আন্দামানে। জীবন সেসব স্থানে বড় কঠিন। আদি বাসস্থানের মতো সহজ স্বচ্ছন্দ নয়। তাহলে ভিটে ছেড়ে কেন চলে আসা, দুঃসহ অনিশ্চিত জীবনযাত্রার কাছে কেন আত্মসমর্পণ?

যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্যই রয়েছে যেমনটা আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। মূল কারণ পূর্বঘটনাবলী-নির্ভর ভাবনায় 'পাকিস্তান' নামক মূর্তিমান আতংক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ছোট বড় ঢেউ একের পর এক দেখা দিয়েছে দীর্ঘ সময় জুড়ে। জিন্নার নিরাপত্তামূলক 'গ্যারান্টি' সত্ত্বেও তার মুসলিম লীগ শাসন সে গ্যারান্টির মর্যাদা রাখে নি। দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রতিরোধের চেষ্টা দূরে থাক, ক্ষেত্র বিশেষে, যেমন ঢাকায়, সৈয়দপুরে, খুলনায়, চট্টগ্রামে বিহারিদের অথবা স্থানীয় দুর্বৃত্তদের তারা উস্‌কে দিয়েছে সহিংসতা ঘটাতে। পাকিস্তানি শাসকদের গোপন লক্ষ্যই ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে যথাসম্ভব সংখ্যালঘু বিতাড়ন যাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়।

প্রথমত পূর্বপাকভূমি থেকে বিধর্মী বিতাড়ন যা ছিল পাকিস্তানি শাসনের রাজনৈতিক আদর্শ। দ্বিতীয়ত পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা বিচারে ঈষৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গকে হিন্দু বিতাড়নের সুবাদে সংখ্যালঘু প্রদেশে পরিণত করা। সেকারণে পাঞ্জাবের ভয়াবহতা পূর্ববঙ্গে দেখা না গেলেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও বাস্তুত্যাগীদের সীমান্ত অতিক্রম দীর্ঘ সময় ধরে লাগাতার ঘটনা হয়ে থেকেছে। যা এখনো ক্ষীণ ধারায় বহমান।

অথচ পাঞ্জাবের ভয়াবহ দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু মিছিল দেশভাগ-সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ। পাকিস্তানি শাসকদের বিশেষ করে সামরিক শাসকদের এই 'স্যাডিস্ট' মানসিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেছে পূর্বপাকিস্তানে একাত্তরের গণহত্যায়। যেখানে হিন্দুসম্প্রদায় আক্রমণের প্রধান শিকার। সে বিবরণ ধরা আছে ইঙ্গ-মার্কিনি পত্রপত্রিকাগুলোতে। সেকারণেই সাতচল্লিশে পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশ কমে এখন ১০-১২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এই সেদিন বলেছেন : এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকবে না। অবশ্য আমার তা মনে হয় না, ইতিহাস এতটা নির্মম হওয়ার কথা নয়।

চার

দেশবিভাগের প্রাক্কালে শাসন ক্ষমতার লোভে ঘটনার টানাপড়েনে লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বে যে সাম্প্রদায়িক হিংসার আশ্রয়-প্রশ্রয়, তার ওপর ভর করেই শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগ ও ক্ষমতার হস্তান্তর। হয়তো তাই হিংসাই দেশভাগ ও কথিত স্বাধীনতার একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। সব সমস্যা মিটাতে দেশভাগ ও ক্ষমতাগ্রহণের পরও তাই হিংসার প্রকাশ বন্ধ হয় না। সর্বোপরি মাউন্টব্যাটেন-র‍্যাডক্লিফ সাহেবদের অপরিণামদর্শিতায় রুটির টুকরো নিয়ে হিংসার প্রবল প্রকাশ যার নাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আসলে গণহত্যা। হিংসাকে মাথায় রেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত রাজনীতিকদের স্বগতোক্তি হিংসার উদ্দেশে : 'একমাত্র তোমাকে সত্য বলে জানি'। কত ভাবে যে হিংসার রাজনৈতিক ব্যবহার!

সেজন্যই দেশ রক্তের জোয়ারে ভেসেছে, ভিজেছে মাটি। রাজনীতিকদের চোখের পাতা কাঁপেনি, তাদের কারো গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগেনি। এমন কি আকাশযান থেকে মৃত্যুভয়তাড়িত ছিন্নমূল মানুষের দীর্ঘ, অন্তহীন কাফেলা দেখেও নেতার মনে হয়নি : ভুল হয়ে গেছে, এখনি ভুলটা শুধ্রে নেই। না, তেমন সুমতি তার বা তাদের কারো হয়নি। স্বাধীনতার সুবাদে অন্তহীন হিংসার পরিণামে জন্ম জোড়াশব্দ 'রিফিউজি' ও 'উদ্বাস্তু', আর তাদের মিছিল। উদ্বাস্তু থেকে শরণার্থী, জীবন-ধারার দুটো তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। দুটো শব্দই মানবমর্যাদাকে কুরে কুরে খেয়েছে। তবু স্পর্শ করেনি রাজনীতির চৈতন্য। এখনো সে হিংসার রেশ রয়ে গেছে।

দেশভাগ বাংলাভূখণ্ড ও বাঙালি জাতিসত্তাকে এবং তার দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের চেতনাকেই বিভক্ত করেনি, ভূখণ্ড ভিত্তিতে ও চৈতন্যের জগতে সমধর্মী সম্প্রদায় বিশেষকেও দ্বিখণ্ডিত করেছে। এ বিভাজন স্বাভাবিক নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-ভিত্তিকও নয়। ইতিহাস যেকোনো ঘটনাকে তার আপন তাৎপর্যে মেনে নেয়, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

প্রসঙ্গত বিপরীত চরিত্রের একটি ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে যেমন তুলেছেন সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে বিশ্লেষণে আগ্রহী দীপক পিপলাই। তার প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে, যাদের মধ্যে বাস্তুত্যাগীর সংখ্যা পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক কম। তার ভাষায় 'বারবার দাঙ্গা ও গণহত্যা সত্ত্বেও হিন্দুপ্রধান দেশে বাঙালি মুসলিমদের বাস করা যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে মুসলিম-প্রধান দেশে বাঙালি হিন্দুদের পক্ষে 'চৌদ্দপুরুষের ভিটে'তে থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক নয় কেন?' একই কথা বলেন আরেক বাস্তুত্যাগী সমাজসেবী প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি পূর্বাপর সহাবস্থানে বিশ্বাসী, ধর্ম ও ভূখণ্ড নির্বিশেষে।

তাদের বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত। তবে এর মধ্যে যে 'কিন্তু' রয়েছে সে বিষয়টির ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পাকশাসকদের রাজনৈতিক চিন্তা বরাবরই ছিল সম্প্রদায় বিদ্বেষে জারিত। মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ববঙ্গকে যথাসম্ভব হিন্দুশূন্য করা। লীগ শাসনের ফ্যাসিষ্ট চরিত্র এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিহারিদের বিজাতীয় বিদ্বেষ ইত্যাদি মিলে হিন্দুমানসে যে আতংক, ভয়, অস্থিরতা দেখা দেয় তার পরিণামে ব্যাপক হারে সংখ্যালঘুর স্বদেশত্যাগ। অনিশ্চিত ভবিষ্যত মাথায় নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথে বেরোনো। তবে পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানদের উদ্বাস্তু হওয়ার পরিবর্তে স্থিতির মনোভাব সত্যই ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কারণ সেখানকার শাসনও সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত ছিল না। এমন কি এখনো নয়।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানের তুলনায় পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় বিত্ত, সম্পদ ইত্যাদি বিচারে, এক কথায় অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিল অনেক অগ্রসর। তাই ধর্মীয় বিদ্বেষ ছাড়াও বিস্তর জায়গা জমি বিষয় সম্পত্তি দালানকোঠা দোকানপাট ইত্যাদি ভোগ দখলের আকাঙ্ক্ষা স্থানীয় মুসলমানের কম ছিল না। এ পার্থক্যটুকুও উদ্বাস্তু সংখ্যার ভিন্নতার বিশেষ কারণ। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘুরে ফিরে যেমন বিভাগপূর্ব কালে তেমনি বিভাগোত্তর কালেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদচেতনা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি প্রধান করে তুলেছে। অর্থনৈতিক অগ্রসরতাই রাজনীতির কলাকৌশলে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বাস্তত্যাগেরও কারণ হয়ে ওঠে। আমাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উপর্যুক্ত বক্তব্যের পক্ষে তথ্য জোগান দিতে পারে।

তবু দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা মাথায় রেখে কিছু যুক্তি কিছু ভাবনা বলে, পূর্ববঙ্গের সম্পন্ন হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান শ্রেণী প্ররোচনার মুখেও ব্যাপক হারে দেশত্যাগ না করলে সেকুলার সামাজিক শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হতো না। তাৎক্ষণিক কিছু ক্ষতি হলেও আখেরে এর ফল ভালো হতো। অর্থশক্তির গুরুত্ব তাদের অজানা ছিল না। তাছাড়া সমাজে উদীয়মান মুসলিম গণতন্ত্রীরা তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুষ্ট শক্তির প্রতিরোধে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো। যেমন দেরিতে হলেও চৌষট্টির দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ : 'পূর্বপাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'। কিন্তু ততখানি মনের জোর তাদের ছিল না। তাই স্বদেশত্যাগই তাদের বিবেচনায় সঠিক মনে হয়েছিল। তাদের কারো কারো বিচারে 'নিয়তি'।

কারণ 'নিরাপত্তা' শব্দটি তাদের অস্তিত্বের অংশ হয়ে ক্রমাগত ঘণ্টা বাজিয়েছে। সে নিরাপত্তা জানমাল ইজ্জতের। সেই সঙ্গে ধর্মরক্ষারও বটে। এত কটা সূচক অনিশ্চয়তায় বাঁধা পড়লে তখন দাঁড়াবার মতো জায়গা থাকে না; নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাসের অবকাশ মেলে না। তখনকার বিচ্ছিন্ন কিছু হিংসাত্মক ঘটনা পল্লবিত হয়ে আস্থার সব আলো নিবিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে এগিয়ে আসে। তবে সে নিরাপত্তা গৃহত্যাগে।

দেশবিভাগ তার নানামাত্রিক অনুষঙ্গ ও উপসর্গ নিয়ে একটি সীমিত মাপের ঘটনা নয়। এর উত্তর-প্রভাব এখনো বহমান। যেমন ছোট বড় সাম্প্রদায়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহিংসতায় তেমনি দীর্ঘ ছায়াফেলা উদ্বাস্তু মিছিলে। প্রথম যাত্রার উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই হয়তো আজ আর নেই। কিন্তু তারা সমাজে, রাজনীতিতে যে দাগ কেটে রেখে গেছেন, উত্তরপুরুষে তাদের যন্ত্রণা, ভাবনা ও ভবিষ্যত প্রত্যাশা বা স্বপ্নের বীজ রেখে গেছেন সেসবের বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবে না। তা থেকে অঙ্কুর গজাবেই, হয়তো বা ছায়াবৃক্ষের জন্ম দেবে।

কী কথা বলবেন তারা? সংঘাতের না মৈত্রীর? আমার বিশ্বাস, বর্তমান সময়ের আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে তারা শান্তি ও বিভেদহীন সহাবস্থানের কথাই বলবেন সব তিক্ত স্মৃতি দূরে সরিয়ে। কারণ বিভেদের বিষফল তাদের পূর্বসূরিদের খেতে হয়েছে, এবং তা অনিচ্ছায় হলেও। তাই আর বিভেদ নয়, এমনটিই হতে পারে তাদের উচ্চারণ। কিন্তু অন্য পক্ষ কি তা সাদরে গ্রহণ করবে? না কি, সেই পুরাতন দ্বন্দ্বে ফিরে যাবে? জিন্নার অর্থহীন 'মাইনরিটি' তত্ত্বের জের ধরে যে 'রিফিউজি' তত্ত্বের জন্ম তার কি অবসান ঘটবে না কখনো? না কি সে ক্ষতচিহ্ন থেকেই যাবে। এবং তা বয়ে বেড়াতে হবে সীমান্তের ওপারে কিছু সংখ্যক মানুষকে তাদের প্রজন্মান্তরে?

AMARBOI.COM

পাঁচ

কয়েক পাতার উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই এই বলে যে দেশভাগ ও তার রক্তে রঞ্জিত সময় ঘিরে এই যে ছিন্নমূল মানুষের দীর্ঘ মিছিল—এমন একটি ট্রাজিক ঘটনা যা সমাজে আলোড়ন তুলেছে ঠিকই। কিন্তু তা কোনো লেখক-প্রতিভার হাত ধরে এক বা একাধিক মহৎ উপন্যাসের জন্ম দেয় নি কেন? 'ওয়র অ্যান্ড পীস' না হোক, এ যুগের পাঠকমন অনুযায়ী কালোত্তীর্ণ হবার গুণসম্পন্ন একটি বা একাধিক উপন্যাস তো জন্ম নিতে পারতো? কারণ এত বড় মানবিক-অমানবিক ঘটনার তুলনা বিরল।

হ্যাঁ, লেখা হয়েছে কিছু কবিতা গল্প দু-তিনটে উপন্যাস। কিন্তু তা তো সাহিত্য অঙ্গনে বা পাঠক সমাজে সাড়া ফেলে নি। কেন এত বড় ঘটনা—সামাজিক-রাজনৈতিক-মানবিক ঘটনা মেধাবী লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি? এর কারণ আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। আসলে তা কি সত্যের মুখোমুখি হবার ভয়? বিশাল ট্রাজিক সত্যের? যে সত্য সহিংসতার অমানবিক চরিত্র সবার সামনে তুলে ধরবে? তা তো হওয়ার কথা নয়। এটাইতো লেখকের কাজ।

এর অন্য কারণ কি প্রতিভাবান লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব? কিংবা ঘটনা-তাড়িত না হওয়ার কারণে? কিন্তু দ্রষ্টার অভিজ্ঞতাও তো মহৎ সৃষ্টির জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম বড়ো উপাদান নয়? না কি এলিটশ্রেণীর বা নিজদের চেহারা-চরিত্র উন্মোচন করতে চান নি তারা? সেটাও তো হবার কথা নয়। এই উন্মোচন, অঙ্কন লেখকেরই দায়িত্ব, তার সামাজিক দায়বদ্ধতা। তাহলে?

যাই হোক, ছয় দশকেরও অধিক সময়ে অনেক রক্ত নিয়ে, অনেক জল, অনেক পানি গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা দিয়ে বয়ে গেছে। অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক তাজা করুণ দৃশ্যপট হারিয়ে গেছে এক একটি পরিবারের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে। সময় দ্রুত গড়িয়ে চলেছে। এখন আর বোধ হয় সম্ভব নয় তাজা-অভিজ্ঞতাহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তেমন কোনো সৃষ্টির। তবে ইতিহাস সেসব ধরে রাখতে পারে তার শাদামাঠা বয়ানে–সেটাও তেমন ভাবে হয়নি। ইতিহাসের একটি অধ্যায় 'উদ্বাস্তুকথা' হারিয়ে যাবে আমাদের সচেতনতার অভাবে কিংবা অবহেলায়? তা কি ইতিহাসের নিয়ম? একদা শিকড়হীন বা ছিন্নমূল মানুষের কাহিনী তার রক্তক্ষরা ট্রাজেডি জীবনের সত্য হয়ে সাহিত্যের পাতার লিপিবদ্ধ থাকবে না? এও কি হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশবিভাগ বিচার : একুশ শতকে দাঁড়িয়ে-১

বিপ্লবে নয়, বিদ্রোহে নয়, ভারতে ক্ষমতার হস্তান্তর আপসবাদী পথে। ব্রিটিশ রাজ-এর প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তার চতুর হিসাব মাফিক ভারতবিভাগের মাধ্যমে তাদের ভারতত্যাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন। ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই ডোমিনিয়নের শাসনভার তুলে দেন যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে। ক্ষমতার হস্তান্তর সম্পন্ন হয় ১৫ আগস্ট মধ্যরাতের আগে ও পরে। কংগ্রেস ও লীগের পক্ষে এ অনুষ্ঠানের নায়ক যথাক্রমে জওহরলাল নেহরু ও মোহাম্মদ আলী জিন্না। সবাইকে হতবাক করে ক্ষমতার কাটাকুটি শেষের এ অনুষ্ঠানে গান্ধি অনুপস্থিত। ভারতবিভাগ তার মনঃপূত ছিল না, তাই। প্রসঙ্গত মনে করতে পারি লীগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) পাঞ্জাবকেশরী সিকান্দার হায়াত খানের অনুপস্থিতির ঘটনা।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের বিভাজন তথা বহুকথিত 'পার্টিশন' এক রক্তাক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা যা 'মানব ট্র্যাজেডি' হিসাবেও চিহ্নিত। বহুদিন থেকে এ ঘটনা অনেক প্রশ্ন ও বিচার ব্যাখ্যার সম্মুখীন। অবশ্য মাত্র জনাকয় স্বনামখ্যাত নেতা ভারতবিভাগের সময় এর বিরোধিতা করেন। তাদের ধারণা ছিল দেশবিভাগ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান নয়, বরং তাতে নতুন সমস্যা দেখা দেবে।

তবে সমাধানের নামে দেশবিভাগ যে কী ভয়াবহতার জন্ম দিতে পারে এবং সেই সঙ্গে কত যে উপসর্গ তৈরি করতে পারে তা নেতাদের ধারণায় ছিল না। বিভাগোত্তর পর্বেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও অন্যান্য উপসর্গ দুই ভূখণ্ডের বুদ্ধিজীবী ও জনগণকে তাড়িত করেছে এবং শেষোক্তদের অন্তহীন দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার মুখে ফেলেছে। আর শাসকদের কাউকে কাউকে বিব্রত করেছে। নেহরু-লিয়াকত চুক্তি তার উদাহরণ। তবে এতে বড় একটা সুফল মিলেনি। রাজ-এর ভারতত্যাগের ভাবনায় ও কার্যক্রমে সদিচ্ছার অভাব না থাকলেও ছিল তাদের ভবিষ্যত-স্বার্থের কূটচাতুর্য। যশবন্ত সিং-এর ভাষায় 'বিদায়কালে ব্রিটিশ আমাদের স্বাধীনতাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে গেছে' (পৃ. ৪৭৮)। তার মতে আমরা তাদের চেয়েও সরেস, জনগণকে স্বাধীনতার সারসুধা ভোগ করতে দেইনি।

ব্যক্তি যশবন্তের এ জাতীয় বক্তব্যের সততা তার দল বিজেপি সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন তুলতে পারে। কিন্তু তিনি তুলেছেন বলে জানি না।

উপমহাদেশের মানুষ, বিশেষ করে নিম্নবর্গীয় ও সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার সুফল যতটা পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। এর দায় তৎকালীন ভারতীয় নেতাদের যেমন জিন্না-নেহরু-প্যাটেল। এমন কি গান্ধিও সে দায় পুরোপুরি এড়াতে পারেন না। তবে ভারত বিভাগ ও তজ্জনিত সহিংসতার মূল দায় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান-দাবির অনড় নায়ক জিন্নার সবচেয়ে বেশি। এদের পরবর্তী শাসকগণও একই ধারার।

শুধু পাকিস্তান অর্জনের জন্য জিন্না ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের প্রায় হাজার বছরের সহাবস্থানের ইতিহাস অস্বীকার করেছেন। নিছক রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তুলেছেন অনৈতিহাসিক দাবি যে হিন্দু-মুসলমান নানা অভিধায় পরস্পর-বিরোধী পৃথক জাতি, তাদের সহাবস্থান সম্ভব নয়। তাই তাদের স্বার্থে দরকার ভারতবিভাগ ও স্বতন্ত্র পাকিস্তান ভূখণ্ড (১৯৪০)। এ দাবিতে ছিল সংকীর্ণ ধর্মীয় চেতনার প্রতিফলন। আসলে রাজনৈতিক ইচ্ছাপূরণ।

অবশ্য ইতিহাস পর্যালোচনায় এ সত্য অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত যে জিন্নাই দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা নন। লাহোর প্রস্তাবের বছর দুইতিন আগে উগ্র হিন্দুত্ববাদী হিন্দুমহাসভানেতা সাভারকরের বক্তব্যে শোনা গেছে এমন দাবি যে 'হিন্দু-মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি'। দেশবিভাগ এ মানসিকতার অবসান ঘটাতে পারে নি। ভারতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিজেপি'র উত্থান ও ক্ষমতা দখল অন্তত একটি প্রমাণ। সেই সঙ্গে স্মর্তব্য তাদের একাধিক সহযোগী সংগঠনের (আর. এস. এস. বা শিবসেনা ও বজরং দল) নেতাদের উগ্র সম্প্রদায়বাদী প্রচার। দ্বিজাতিতত্ত্বের পরোক্ষ আভাস রয়েছে কবি ইকবালের স্বতন্ত্র মুসলিম অঞ্চলের দাবিতে। তবে তিনি ভারতভাগ চান নি।

অন্যদিকে বিভাগপূর্বকালে কংগ্রেস-লীগ বা হিন্দুমহাসভার মতো পরস্পর-বিরোধী সংগঠনের বাইরে যেমন ছিল বামরাজনীতির দুর্বল অস্তিত্ব তেমনি ছিল জাতীয়তাবাদী মুসলমান নামের একাধিক সেকুলার সংগঠন। যেমন মোমিন, আহ্‌রার তেমনি ধর্মীয় সংগঠন হয়েও সেকুলার চেতনার জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ্‌ যারা ভারতবিভাগের বিরোধী, হিন্দুমুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা। তবে তাদের মধ্যে ছিল সংহতির অভাব। এছাড়া রাজনৈতিক বিচারে মোটাদাগে সেকুলার সংগঠন বঙ্গে ফজলুল হক পরিচালিত 'কৃষক প্রজাপার্টি' এবং পাঞ্জাবে সিকান্দার হায়াত খানের ইউনিয়নিস্ট পার্টি, সীমান্তের খুদাইখিদমদগার দল, সিন্ধুতে আল্লাবক্‌শ প্রমুখের সিন্ধি জাতীয়তাবাদী সংগঠন। কিন্তু এদের পরস্পর-বিচ্ছিন্নতা তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি গঠনের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাবক্‌শ বা ফজলুল হকের এ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য হলেও ভারতবিভাগ রদে এরা সফল ভূমিকা রাখতে পারেননি।

যশবন্ত সিং তার বইতে জিন্না-বিষয়ক সহৃদয় পর্যালোচনায় একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন রেখেছেন : 'ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের জন্ম ভারতবিভাগের কারণে। ১৯৪৭-আগস্টের পূর্বপর্যন্ত আমরা এক ছিলাম। এখন আমরা তিন স্বতন্ত্র সত্তা, কিন্তু সত্যই কি আমরা পৃথক? এমন প্রশ্ন না করে পারছি না', (পৃ. ৪৮৩)। এ প্রশ্নের জবাব বিদগ্ধ বিজেপি নেতারই ভালো জানার কথা। তাদের দলীয় বিচারে সহাবস্থান তো অধীনতার নামান্তর।

বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর শাসনামলে শিক্ষা, ইতিহাসচর্চা থেকে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে হিন্দুত্ব আরোপের চেষ্টাসহ সেকুলার সংবিধান পরিবর্তনের দাবিও উত্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য আধুনিক ভারতকে হিন্দুভারত হিসাবে গড়ে তোলা। বঙ্গে উনিশ শতকী নবজাগরণের হিন্দুত্ববাদ বিশ শতকে পৌঁছেও প্রভাব রেখেছে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লববাদী আন্দোলনে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরাও বসে থাকে নি। দ্বিতীয় বঙ্গবিভাগের (১৯৪৭) প্রধান কারিগর তো হিন্দুমহাসভা, সঙ্গে কংগ্রেস। আর এখন মুসলিম নিধনযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখে বিজেপির চেষ্টা ভারতকে হিন্দুত্ববাদে পৌঁছে দেবার। এর পরও বিজেপি নেতা যশবন্ত সিং কী ভেবে লেখেন : 'সত্যই কি আমরা ভিন্ন?'

AMARBOI.COM

দুই

ভারতবিভাগে সম্প্রদায়বাদী রাজনীতি প্রধান ভূমিকা রেখেছে সন্দেহ নেই। ক্রমাগত প্রচারে (এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের কারণেও) বিভেদ ও বিরূপতা হিন্দু মুসলমান জনমানসে গভীর প্রভাব রেখেছিল। সে প্রভাব কি তিন দেশের জনচেতনা থেকে অন্তর্হিত? ঘটনাবলী দেখে তা মনে হয় না। তাই এমন অনুমান কি ভুল হবে যে, বিরাজমান পরিস্থিতিতে বিভক্ত দেশগুলোতে আমরা বোধহয় আর আগের মতো সহোদর নই। বরং মানবিক সৌহার্দ্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টাই এখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয়তার নামে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদিতা ও বিচ্ছিন্নতার টান সবাইকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, যেমন দেখা গেছে প্রধানত চল্লিশের দশকে। সম্প্রদায়বাদীচেতনা এখনো ক্রমবর্ধমান।

ভারতবিভাগ যে কোনো রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছাড়াও ভাষা জাতিসত্তা ও সংস্কৃতিনির্ভর জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতার লড়াইও তার প্রমাণ। যেমন ভারতে তেমনি পাকিস্তানে। লড়াই মোটামুটি হিসাবে সেকুলার চরিত্রের। তবে সেক্ষেত্রেও হতাশার প্রাধান্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যতিক্রম শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় (১৯৭১)। হডসনও তার বইতে ১৯৮৫ সনে লেখা নয়া 'উপসংহারে' এই হতাশার কথা ব্যক্ত করেছেন। তার ভাষায় নেতাদের প্রত্যাশা মাফিক 'বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয়েও উপমহাদেশে গণতন্ত্র ও সমৃদ্ধির সোনালি যুগ ধরা দেয় নি' (পৃ. ৫৬৬)।

জবাবে বলা যায়, যে-পদ্ধতিতে ক্ষমতার হস্তান্তর ও চিরশত্রু দুই দেশের জন্মদান সেই বিরোধ-বিদ্বেষের পটভূমিতে গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ দেখা দেবার কথা নয়। অবশ্য সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ও দেশ-বিভাজন এ দুই ক্ষেত্রেই ভারতীয় রাজনীতিকদের তুলনায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের দায়দায়িত্ব কোনো অংশে কম ছিলনা। বিষয়টি মূল আলোচনায় বিশদভাবে এসেছে।

রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে বাস্তবে যে কতটা প্রভেদ থাকে ইউরোপীয় রাজনীতির ইতিহাসেও তার উদাহরণ রয়েছে। কথাটা অবশ্য হডসনও উল্লেখ করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের প্রাথমিক পর্বে কবি ওয়ার্ডসওয়র্থের স্বাপ্নিক উপলব্ধি : 'সেই প্রভাতে বেঁচে থাকা যে কী মধুর'! কিন্তু সে মাধুর্য টকে যেতে বেশি সময় লাগে নি। বিভাগোত্তর উপমহাদেশে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমীকরণে পরিস্ফুট হতাশার কারণ একাধিক। প্রায় প্রতিটি কারণের সঙ্গে দেশবিভাগ কমবেশি জড়িত। এমন কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও। বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব বিভাজন এদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

অন্যান্য দিকেও বিভাজনসৃষ্ট নীতির প্রভাব ব্যাপক। প্রথম থেকেই পারস্পরিক বৈরিতার কারণে উভয় রাষ্ট্রে বিপুল সামরিক ব্যয় অর্থনৈতিক চাপের একটি বড় কারণ। তাছাড়া উত্তর-পশ্চিমে সীমান্ত প্রতিরক্ষা সম্পর্কে ধর্মভিত্তিক সৌহার্দ্যের ওপর ভরসা ছিল জিন্নার যা আদপেই ফলপ্রসূ হয় নি। পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বরং পাকিস্তানি তালেবান ও ধর্মীয় যুদ্ধবাজদের সাহায্যে আফগানিস্তান জবরদখলের পর সমস্যা আরো বেড়েছে। এমন কি বর্তমান সময়ে তা আরো জটিল।

এসব জটিলতার কারণে গোটা পাকিস্তান এখন বোমাবারুদ ও গুম হত্যার নৈরাজ্যিক ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। নৈরাজ্যের অন্যতম প্রধান কারণ শুধু ভারতের সঙ্গে কয়েক দফা যুদ্ধই নয়, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন পরাশক্তির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে তাদের স্বার্থপূরণ, জম্মুকাশ্মীর নিয়ে লাগাতার যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি, বিশেষ করে বিভাজন ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিক্রিয়া জনিত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর (মোহাজিরের) পুনর্বাসন ব্যবস্থার মস্ত চাপ ইত্যাদি।

শেষোক্ত বিষয়টি ঘিরে সিন্ধি-বিহারি দ্বন্দ্ব ক্রমে এমন সহিংস অবস্থায় পৌঁছেছে যে তাতে পাকিস্তানের সংহতিতে টান পড়েছে। রাজধানী করাচি জ্বলছে, সেখানে সিন্ধিরা নিজবাসভূমিতে সংখ্যালঘু। বিহারি জনগোষ্ঠী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক সংগঠন (এম. কিউ. এম) তৈরি করে স্থায়ী দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন নিয়ে যে পাকিস্তান অর্জন সেখানে শান্তি অনেক দূরে– করাচি রক্তাক্ত, রাওয়ালপিন্ডি বুলেটবিদ্ধ, ইসলামাবাদে প্রবল সন্ত্রাস– সরকার-প্রধান নিহত। বেলুচিস্তানে বোমাবাজি ও চরম অশান্তি। একই অবস্থা সীমান্ত প্রদেশে। একের পর এক রাষ্ট্রপ্রধান হত্যা কি গণতন্ত্রী আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষণ? সেই সঙ্গে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব?

ইতিহাস লেখক অনেকেই উল্লেখ করে থাকেন, ১৯৪৭ আগস্টে (১১ই) জিন্নার গণতন্ত্রধর্মী বক্তৃতার কথা। কী মনে করে দিয়েছিলেন তিনিই জানেন। কারণ জিন্না তার রাজনৈতিক জীবনে কখনো গণতন্ত্রের চর্চা করেন নি। আদর্শ হিসাবেও গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেন নি। বলেছেন, ভারতের জন্য গণতন্ত্র এক অচল আইডিয়া। লীগ সংগঠনে তিনি ছিলেন একনায়ক। মুসলিম লীগের শীর্ষনেতা কারো সাহস ছিল না জিন্নার অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানায়। একমাত্র ফজলুল হক প্রতিবাদ করেছিলেন। পরিণামে বহিষ্কৃত।

নিজে ধর্মাচারী না হয়েও ধর্মকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার যে জিন্নার কত বড় ভুল পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা তার প্রমাণ। তার একনায়কসুলভ স্বেচ্ছাচারী মানসিকতার প্রমাণ মিলেছে ১৯৪৮ মার্চে ঢাকায় তার রাজনৈতিক বক্তৃতায়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরুদ্ধে, সমাজবাদী রাজনীতি ও ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি সংস্কৃতির আহ্বানে। ঐ বক্তৃতায় জিন্না গণতন্ত্রকে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ছাত্রদের বড়সড় অংশে ঐ বক্তৃতার পরে দেখা দিয়েছিল বিতৃষ্ণা।

দীর্ঘসময় বেঁচে থাকলে বাংলায় তার অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা কোন্ তলানিতে গিয়ে ঠেকতো তা অনুমান করা চলে। ১৯৪০ মার্চে লাহোরের লীগ সম্মেলনে ধর্মীয় রাজনীতির স্লোগান তুলে ১৭ বছরে তার বিজয়। পাকিস্তান সে উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। লীগ নেতাদের কথায় কথায় তাদের 'কায়েদে আজম'-এর 'ইসলাম বিপন্ন' ইত্যাদি বক্তব্যের উদ্ধৃতি। পরিণামে ১৯৫৬ সনে পাকিস্তান হয়ে ওঠে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের বদলে 'ইসলামি রাষ্ট্র'। রাষ্ট্রশাসনে 'ইসলাম বিপন্ন' এই ধুয়া তুলে চলেছে কত যে অনাচার, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্যাতন তার ইয়ত্তা নেই। সংখ্যালঘুর ওপর নির্যাতন নিয়মিত বিষয় হয়ে উঠেছিল যে জন্য বিভাগোত্তর ১৯৪৭-এর পূর্ববঙ্গে অমুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ কমে বর্তমানে ১০-১২ শতাংশে এসে পৌঁছেছে। পাকিস্তান এই রাজনৈতিক উত্তরাধিকারই বহন করছে। তাই জিন্নার ১১ আগস্টের (১৯৪৭) গণতান্ত্রিক বক্তৃতা অর্থহীন 'গিমিক' বলে মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় আরো কিছু ঘটনায়। কুলদীপ নায়ার তার আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন, ১৯৪৭-এ পাঞ্জাবে যে সব অমুসলমান মাটির টানে পাকিস্তানে নিজ বাস্তুভিটায় ফিরে যেতে চেয়েছেন তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। স্বভাবতই তাদের দুর্বিসহ উদ্বাস্তু জীবন, জীবনজীবিকার জন্য লড়াই। শুধু পাঞ্জাবে নয়, পূর্ববঙ্গেও চলেছে সীমান্তের দিকে ছিন্নমূল মানুষের কাফেলা। সে ধারা এখন ক্ষীণ হলেও একেবারে শেষ হয় নি।

স্বাধীনতাসংগ্রামী সীমান্তের বাদশা খান 'প্রতিবাদ-কারাগার-প্রতিবাদ' করেই জীবন শেষ করেছেন। সমাজবাদী ওয়ালি খান দীর্ঘ সময় জেলে কাটিয়েছেন। একই অবস্থা সিন্ধুর জি. এম. সৈয়দ বা আবদুল মজিদ সিন্ধি প্রমুখের। সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতি পাকিস্তানে শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সামরিক শাসন ও হত্যার রাজনীতি নিয়ে পাকিস্তান যেন এক নৈরাজ্যিক রাষ্ট্র। স্বভাবতই 'গ্যারিসন প্রদেশ' পাঞ্জাব হয়ে ওঠে পাকিস্তানি রাজনীতির নিয়ন্ত্রক ভূখণ্ড। এ পাঞ্জাব সিকান্দার হায়াত খানের স্বপ্নের পাঞ্জাব নয়।

জিন্নার হাত ধরে ধর্মীয় রাজনীতির যে ঐতিহ্য পাকিস্তান ধারণ ও লালন করেছে তার পরিণতি পাকিস্তানের জন্য শুভ হয় নি। জিন্না-লিয়াকত সে পরিণতি দেখে যেতে পারেন নি। ধর্ম ও সমরতন্ত্র হয়ে ওঠে পাকিস্তানের রাজনৈতিক আদর্শ, শাসনতান্ত্রিক আদর্শ। পাকিস্তান-আন্দোলনের দু একজন শীর্ষনেতা শেষ বয়সে (সম্ভবত পাকিস্তানের পরিণতি দেখে) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মগ্লানিতে ভুগেছেন। এঁরা অবশ্য একসময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তাও ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের কিছু ভুল ভ্রান্তি তাদের পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়।

কুলদীপ নায়ার তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও এদের দু একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখেছেন যে তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের শীর্ষনেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান বার্ধক্যে ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত অবস্থায় ভারতবিভাগের জন্য প্রচণ্ড অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। এক ধরনের অপরাধবোধ তাকে তাড়িত করেছে এমন অনুশোচনায় যে যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদের ভারতে ফেলে রেখে এসে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। পাকিস্তান গঠন ছিল ভুল। একই কথা মাহমুদাবাদের নবাবেরও যিনি তারুণ্যে নেহরু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। পরে জিন্নার আকর্ষণে তিনি লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কনিষ্ঠতম সদস্য। কুলদীপ নায়ারের মতে বহসংখ্যক মুসলমান ভারত বিভাগের পক্ষে ছিলেন না (পৃ. ১৯)। কথাটা যুক্তপ্রদেশে লীগ-বিরোধী ভোট সংখ্যা উল্লেখ করে মুশিরুল হাসানও বলেছেন (ইন্ডিয়াস পার্টিশন, পৃ. ২৮-৩০)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতপক্ষে বিভাগোত্তর কালের অবাঞ্ছিত ঘটনাবলী, স্বপ্নের পাকিস্তান নিয়ে স্বপ্নভঙ্গের তিক্ততা, অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি অনেক কিছুর পরবর্তী 'পোস্টমর্টেম' থেকে অনেকের কাছে মনে হয়েছে যে তাৎক্ষণিক আবেগের তরবারিতে ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্তান কেটে আলাদা করে আনার দ্রুত সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। বিশেষ করে ভারতে কয়েক কোটি মুসলমানকে ফেলে আসা শুধু অনৈতিকই ছিল না, ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে অন্যায় ও ভুল সিদ্ধান্ত। শেষোক্ত বিষয়টি পাকিস্তান পোস্টমর্টেমে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

তিন

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, পাকিস্তান নিয়ে যদি এতই সমস্যা, এত অবাঞ্ছিত উপসর্গ, মুসলিম স্বার্থ যদি পুরোপুরি পূরণই না হয়ে থাকে তাহলে পাকিস্তান অর্জনের জন্য কেন অমন প্রবল উম্মাদনা তৈরি হয়েছিল যে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের কোনো বিকল্প নেই। পশ্চাদপদ ও বৃহৎসংখ্যক দরিদ্র বঙ্গীয় মুসলমানের কথা যদি বাদও দি, শিক্ষিত-সম্পন্ন-ভূস্বামী-প্রধান যুক্তপ্রদেশের মুসলমানই বা কেন অনুরূপ উম্মাদনার অংশীদার হয়েছিলেন?

দু একটি তথ্য প্রশ্নের যথার্থতা প্রমাণ করবে। গুরুত্বপূর্ণ হিন্দুপ্রধান যুক্ত প্রদেশে জনপ্রশাসনের নির্বাহীপদে মুসলমান প্রায় ৪০ শতাংশ, বিচার-বিভাগে ২৫ শতাংশ, কৃষি বিষয়ক পদে ২৫ শতাংশ, পুলিশে (ডি. এস. পি) ২৮ শতাংশ, ইন্সপেক্টর পদে ৩০ শতাংশ, সাব-ইন্সপেক্টর পদে ৪৪ শতাংশ, প্রকৌশল বিভাগে (প্রথম শ্রেণী) ২০ শতাংশ, আয়কর বিভাগে ৩০.৭ শতাংশ, শিক্ষায় ২৬.৭ শতাংশ (প্রথম শ্রেণী), পরিদর্শক ৩২.২ শতাংশ, সমবায়ে গেজেটেড অফিসার্স ৩৭.৫ শতাংশ। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে অবস্থা খুব একটা ভিন্ন নয় (মুশিরুল হাসান পৃ. ২৩-২৪)। এ তথ্য ১৯৩৯ সনের। জনসংখ্যার অনুপাতে সন্তোষজনক অবস্থান। পরিস্থিতি কি এক বছরে (১৯৪০) এতই মন্দ হয়ে গেল যে মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন বলে জিহাদি ডাক দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে ছিল? জিন্নার ক্ষোভ ছিল মূলত যুক্তপ্রদেশ নিয়ে যেখানে মুসলিম অবস্থান সচ্ছন্দ। ক্ষোভের কারণ সেখানে লীগ-কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট না হওয়া। তাই বিচ্ছিন্নতার আহবান (দ্বিজাতিতত্ত্ব)। কংগ্রেস এর দায় এড়াতে পারে না। অবশ্য তুলনায় বঙ্গীয় মুসলমানের অবস্থা ছিল বিপরীত যা নিয়ে জিন্না কখনো মাথা ঘামান নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানপন্থী গবেষকগণ নিজ নিজ ধারায় দ্বিজাতিতত্ত্ব যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কেউ হিন্দু-মুসলমান ভিন্নতার, কেউবা বৈরিতার ইতিহাস টেনে পাকিস্তানকে ইতিহাসের সত্য হিসাবে ধরতে চেয়েছেন। অর্থনৈতিক দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফারজানা শেখ 'ইসলামি ভ্রাতৃত্ব, ইসলামি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ও ইসলামি শাসনে মুসলমান' ইত্যাদি নিয়ে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন যার পেছনে যুক্তির চেয়ে ধর্মীয় আবেগের প্রাধান্য ('Community and Consensus in Islam : Muslim Representation in Colonial India', 1989, P230)। এসব যুক্তি যে অসার প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস বিভেদ ও সৌহার্দ্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিয়ে তা প্রমাণ করে। দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনে হিন্দু-মুসলিম মিলে যেসব ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহ বা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে সেসবের লক্ষ্য ছিল একটাই– স্বাধীন ভারত, বিভক্ত ভারত নয়। মনে রাখতে হবে ইংরেজের বঙ্গ দখলের (১৭৫৭) পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে শুরু হয় ফকির ও সন্ন্যাসীবিদ্রোহ। এর পর ক্রমাগত বিদ্রোহ ও আন্দোলন।

আধুনিক পর্বে এসে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের রাজনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্র, মুসলিম জাতীয়তাবাদ ('মুসলিম ন্যাশনালিজম') নয়। অর্থাৎ সম্প্রদায়বাদী রাজনীতি নয়, সেকুলার রাজনীতি তাদের উপজীব্য। ধর্ম ও ধর্মাচরণ সেখানে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অন্তর্গত। মুসলিম লীগ ১৯০৬ সাল থেকে মুসলিম উচ্চশ্রেণীর স্বার্থ নিয়ে যে দেনদরবার করেছে তাতে রাজনৈতিক আদর্শ বলতে কিছু ছিল না। তবে ১৯৪০-এ ঘোষিত দ্বিজাতিতত্ত্বে ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদ তথা স্বাতন্ত্র্যবাদ, বিচ্ছিন্নতা যার লক্ষ্য।

তবু মানতে হয় যে বিশ শতকের প্রথমার্ধে (মূলত ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ আগস্ট) মুসলিম রাজনীতি কোনো সুনির্দিষ্ট একক রাজনৈতিক আদর্শ বহন ও লালন করেনি। সেখানে পরস্পর-বিরোধী চরিত্র ছিল প্রকট। জাতীয় কংগ্রেস ও বিপ্লববাদী রাজনীতির ছিল ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট আদর্শ। তাদের মধ্যে মত-পথের ব্যবধান ছিল গভীর। সেখানেও ছিল স্ববিরোধিতার মিশ্রণ। কংগ্রেসের শক্তি ও দুর্বলতা দুইই ছিল এর সাংগঠনিক চারিত্র বৈশিষ্ট্যে। অর্থাৎ গণসংগঠন হয়ে ওঠার পর কংগ্রেস আসলে একটি পার্টি নয়, বাস্তবে হয়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ।

কংগ্রেস তার ঘোষণায় সেকুলার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতীক হলেও সেখানে হিন্দুত্ববাদী ও হিন্দুমহাসভাপন্থীদের উপস্থিতিতে ছিল অদ্ভুত এক স্ববিরোধিতা। তার চেয়ে বড় স্ববিরোধিতা কংগ্রেস সোসালিস্টদের অবস্থান, কিংবা বিপ্লবী সমাজবাদীদের উপস্থিতি। ডান, বাম, মধ্যবাম ও জাতীয়তাবাদের মিশ্রণের মধ্যে সংযোজন খিলাফতপন্থী মুসলিম রাজনীতি– হাকিম আজমল খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা মাওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী। মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে অবশ্য ব্যতিক্রমী হিসাবে ধরা উচিত। কারণ আজাদ মাওলানা হয়েও একজন সেকুলার, স্বাধীনতাসংগ্রামী রাজনীতিক। একদা বিপ্লবী দলেও নাম লিখিয়েছিলেন। অন্যদিকে গান্ধি সেকুলার হয়েও প্রগাঢ় হিন্দুত্ববাদী, গোরক্ষা যার ধর্মের অংশ। আবার খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গেঐক্য গড়তে তার বাধে না।

কংগ্রেসের এই বিচিত্রসভায় রাজনৈতিক বিচারে নানামতের সমাহার। কথিত আদর্শ হিসাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, হিন্দু জাতীয়তাবাদ, মুসলিম জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন ধারার বাম মতাদর্শ, শুদ্ধ সেকুলার চেতনার গ্রুপ, এর মধ্যেও চরমপন্থী ও নরমপন্থী মিলে কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতির এক অদ্ভুত আয়ুর্বেদী পাচন। এমন একটি রাজনৈতিক মঞ্চের পক্ষে অর্জুনের মতো এক লক্ষ্যের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা বা ব্যর্থতার এটা অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া ছিল ভূস্বামী স্বার্থ, কমপ্রেডর পুঁজিপতি স্বার্থ, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর স্বার্থ, ঘোষিত স্বদেশী ও জনস্বার্থ– যেগুলো পরস্পরবিরোধী।

নেতৃত্ববৈশিষ্ট্য বিচারেও ভারতীয় রাজনীতিতে স্ববিরোধিতা ব্যাপক। অথচ এরা কমবেশী মেধাবী রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক আদর্শ বিচারে গান্ধি জিন্না গুজরাতি হয়েও সর্বমাত্রায় বিপরীত মেরুর, অথচ ভিন্ন মাত্রায় গান্ধি মোহানি বিপরীত চিন্তার। সেকুলার নেহরুর সঙ্গে সেকুলার আজাদের মিলের চেয়ে অমিল বেশি। রোমান্টিক সমাজবাদী জওহরলাল আর রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী প্যাটেল এক পঙ্ক্তিতে বসার মতো নন অথচ কাজ করতে হচ্ছে এক সঙ্গে। চিত্তরঞ্জন ও গান্ধি যদিবা কখনো এক নৌকোর যাত্রী হতে পারেন সুভাষ-গান্ধি কখনোই নন। ফজলুল হক ও জিন্না ঘটনার টানে এক যাত্রায় শরিক হলেও দুজনে ভিন্ন নৌকোর যাত্রী। আবার মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও জিন্নার মতো দুই প্রতিভা প্রচণ্ড রকম বিপরীত মতাদর্শের। এমন অনেক বৈপরীত্যে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ভারতীয় রাজনীতি ঘুরপাক খেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশবিভাগ বিচার : একুশ শতকে দাঁড়িয়ে-২

ভারতীয় রাজনীতির দুর্ভাগ্য যে সে যুক্তিবাদী ও সেকুলার চিন্তার বিচক্ষণতায় ভর দিয়ে বরাবর চলতে পারে নি। বরং স্ববিরোধিতা তার চলার পথ নিয়ন্ত্রণ করেছে। ইতিপূর্বে আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে ওই 'প্যারাডক্স' যেমন আদর্শে তেমন ব্যক্তিনেতৃত্বে এই উভয় দিকে পরিস্ফুট। বিগত শতকের ১৯০৫ সন থেকে চার দশকের রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও নেতাদের আচরণে তেমন আভাস মেলে।

প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের ব্যক্তিত্বেও ছিল যথেষ্ট স্ববিরোধিতা। গান্ধি (১৮৬৯-১৯৪৮) বিলেতি ব্যারিস্টার হয়েও গভীর ভাবে সনাতন ধর্মে ও গো-রক্ষায় বিশ্বাসী। রামরাজ্য স্থাপন তার রাজনৈতিক আদর্শের জীবন সাধনা। খাদি-চরকা সে আদর্শের ব্রত। তবু হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাস নিয়ে আলীভ্রাতাদের সঙ্গে কথিত ইসলাম রক্ষার খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিতে তার আদর্শে বাধেনি। ওটা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক কৌশল। অন্যদিকে ধর্মাচরণে যে অনাগ্রহী, পুরোপুরি বিলেতি কেতার জীবনাচরণে অভ্যস্ত সেই বিলেতি ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্না (১৮৭৬-১৯৪৮) মুসলিম রাজনীতির হাতেখড়ি নিয়ে এক পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত হয়েও শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় রাজনীতিকে লক্ষ্য অর্জনে হাতিয়ার করে তোলেন (১৯৪০)। এমন কি পাল্টে ফেলেন নিজেকে—থ্রিপিস্ স্যুট-টাই থেকে টুপি-শেরওয়ানিতে। প্রচারে বক্তৃতায় প্রধান বিষয় ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতি, তাও মধ্যপ্রাচ্যের।

আর খিলাফত-প্রধান মাওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৬-১৯৩১) আধুনিক শিক্ষায় মেধাবী রাজনীতিবিদ, লেখক, সুবক্তা ও সম্পাদক (উর্দু 'হামদর্দ', ইংরেজি 'কমরেড' পত্রিকার) এবং জামিয়া মিল্লিয়ার মতো সেকুলার প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা (১৯২০) হয়েও ধর্মীয় রাজনীতিকে বর্জন করতে পারেন নি। অথচ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা-অর্জন তার রাজনৈতিক আবেগের অংশ যা গান্ধির ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আহমেদাবাদ

AMARBOI.COM

অধিবেশনে হসরত মোহানি উত্থাপিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গান্ধির বিরোধিতায় বাতিল। স্বাধীনতাসংগ্রামী এই মোহানিও লীগ-কংগ্রেসের মতো দুই নৌকোর যাত্রী। একই দোলাচলবৃত্তি ও স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু ধর্মীয় আচারের প্রবক্তা ছিলেন বিলেতিকেতায় অভ্যস্ত, দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুমিত সরকার)। চিত্তরঞ্জনও এ দ্বিচারিতা থেকে খুব একটা মুক্ত ছিলেন না (বেঙ্গল প্যাক্ট প্রসঙ্গ বাদে)।

আরেক খাস কংগ্রেস নেতা হাকিম আজমল খান (১৮৬৩-১৯২৭) সেকুলার রাজনীতিক ও স্বাধীনতাসংগ্রামী হয়েও খিলাফত প্রধান, লীগ-প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, জামিয়া মিল্লিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। প্রায় একই কথা খাটে কংগ্রেস-নেতা ডা. এম. এ. আনসারি সম্পর্কে। ভিন্ন নন হসরত মোহানি। তবে মোহানি কট্টর ব্রিটিশ-বিরোধী, কবি, স্বাধীনতাসংগ্রামী। এরা ভারত স্বার্থের পাশাপাশি মুসলিম রাজনৈতিক স্বার্থকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। যে জন্য কংগ্রেস-লীগ উভয় অঙ্গনে তাদের বিচরণ।

অথচ রাজনৈতিক বিচারে বিচক্ষণতার প্রকাশ ঘটতো যদি এরা দুই পরস্পর-বিরোধী অঙ্গনে বিচরণ না করে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মুসলিম স্বার্থনির্ভর ভারতীয় স্বাধীনতার আদর্শের ভিত্তিতে পৃথকভাবে সংগঠিত করে স্বতন্ত্র সেকুলার রাজনৈতিক শক্তির সংগঠন গড়ে তুলতেন। তাহলে কংগ্রেসের ওপর মুসলিম স্বার্থবিষয়ক চাপ যেমন থাকতো তেমনি জিন্নার হাত ধরে মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে মুসলমান স্বার্থের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে প্রবল শক্তিমান হয়ে উঠতে পারতো না। স্ববিরোধিতা অনেকাংশে হ্রাস পেতো। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিরোধের সম্মুখীন হতো। ভারতবিভাগের পথ বাধাগ্রস্ত হতো। কিন্তু এরা স্বনামখ্যাত রাজনীতিক হওয়া সত্ত্বেও জিন্নার মতো এক লক্ষ্যমুখী 'অর্জুন' হতে পারেন নি। রাজনীতিতে উদারতা ও নমনীয়তার সংমিশ্রণ ঘটানোতে অভ্যস্ত বিধায় এরা মুসলিম সেকুলার রাজনীতিকে শক্তিমান সাফল্যে পৌঁছে দিতে পারেন নি।

অন্যদিকে কংগ্রেস তার ঘোষিত সেকুলার জাতীয়তাবাদী আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি মূলত গান্ধি ও দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীলতার প্রাধান্যের কারণে। সরদার প্যাটেল (কথিত লৌহমানব)-এর জাতীয়তাবাদী চেতনায় হিন্দুত্ববাদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। কংগ্রেস রাজনৈতিক চেতনা বিচারে দক্ষিণী আদর্শে প্রভাবিত। তাই সেকুলার বাম জাতীয়তাবাদী, প্রবল স্বাধীনতাকামী সুভাষচন্দ্র দু'বার কংগ্রেস সভাপতি হয়েও কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। হিন্দি বলয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতিগতভাবে তার সমর্থক শীর্ষনেতা না থাকায় শুধু বঙ্গের পরিণত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসকে সেকুলার রাজনীতিতে পৌঁছে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে কংগ্রেস এজাতীয় দ্বিচারিতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি।

কথিত সেকুলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে এ ধরনের স্ববিরোধিতা ও নৈরাজ্য সত্যি বলতে কি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পটভূমিতে কংগ্রেসকে দুর্বল করে তুলেছিল। বিশেষ করে ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাবে জিন্নার জিহাদি ডাকের পর থেকে সেটা আরো স্পষ্ট। স্বতন্ত্র নির্বাচনে স্বধর্মীয় বলয়ে একাট্টা বিজয় সর্বসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক লেনদেনে যে যথেষ্ট নয় তার প্রমাণ তো পরবর্তী সাত বছরের ঘটনাবলী। প্রতিপদে কংগ্রেস পিছু হটেছে। তার আদর্শবাদী অন্তরশক্তিতে ক্ষয় ধরেছিল। হিন্দুত্ববাদী প্রভাব ক্রমশ বেড়েছে। আজাদ বা নেহরুর সাধ্য কি তা ঠেকায়।

বিশ শতকের শুরু থেকে মধ্যপর্বের সালতামামিতে দেখা যায় গান্ধির মধ্যপন্থী দোদুল্যমানতা, তিলক-লাজপত প্রমুখের সঙ্গে মালব্য-মুঞ্জে প্রমুখ হিন্দুত্ববাদীর সখ্য, চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল প্যাক্টেরও অকাল মৃত্যু (১৯২৬), কলকাতা সম্মেলন (১৯২৮) ও ঐক্য প্রসঙ্গে ডানপন্থী প্রভাবিত কংগ্রেসের অযৌক্তিক জিন্না বিরোধিতা, বঙ্গে প্রজাপার্টি এবং যুক্তপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ে লীগের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠনে কংগ্রেসের অসম্মতি, সুভাষের বহিষ্কার, পাঞ্জাবে সিকান্দার হায়াত খানের অকালমৃত্যু (১৯৪২) ইত্যাদি ঘটনা সম্প্রদায়বাদী লীগ রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। মুসলিম রাজনীতিতে জিন্নার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশ নিশ্চিত হতে থাকে ভারতবিভাগের বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত পথ।

দুই

বিভাগোত্তর ছয় দশকেরও বেশি সময়-পর্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আজ প্রশ্ন উঠতে পারে, পূর্বোক্ত পরিস্থিতি কি এতটাই নিয়তি-নির্ধারিত ছিল যে দেশবিভাগের কোনো বিকল্প ছিল না? পথ কি মাত্র একটিই ছিল যে অন্য কোনো পথে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব ছিল না? রাজনীতিতে বিশেষ করে বিতর্কিত সমস্যায় এমনটি সাধারণত দেখা যায় না। বিষয়টা তো অভিমন্যুর মৃত্যুব্যুহ নয় যে এতে বিকল্প একাধিক পথ খোলা থাকবে না। পথ অবশ্যই ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা বহুমত-বিভক্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের ছিল না। মন্ত্রীমিশন প্রস্তাবে আজাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, কিন্তু নেহরুর এক আলটপকা মন্তব্যে ও জিন্নার জিহাদি মনোভাবে সব ভণ্ডুল। এরপর শুধু নেতির তিক্ততা। এর মধ্যে দূর হতাশায়ও আজাদের ১৫ এপ্রিলের ফেডারেল ব্যবস্থার প্রস্তাবটি পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব ছিল। আজাদ বরাবরই পাকিস্তান-দাবির কট্টর বিরোধী। তবু অবস্থাদৃষ্টে তার ইচ্ছা ছিল মুসলিম স্বার্থে জিন্নাকে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার চেষ্টা করা হোক। কখনো কখনো গান্ধিও এমন ধারণা পোষণ করেছেন।

কিন্তু কংগ্রেসী চরমপন্থীরা ভারতমাতাকে খণ্ডিত করতে রাজী, তবু শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা হতাছাড়া করতে রাজী নন। প্যাটেল এদের মধ্যমণি। নেহরু বরাবরই শক্তিশালী কেন্দ্র ও দুর্বল প্রদেশের পক্ষে। তাই হয়তো বহুজাতিক-বহুভাষিক প্রদেশের স্বশাসন-নির্ভর বিজ্ঞানসম্মত ফেডারেশন ব্যবস্থার কথা তার মনে ধরে নি। গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ভাবনার প্রবক্তা নেহরুর পক্ষে এমন অবস্থান অবিশ্বাস্যই ঠেকে।

আর জিন্নার পথ তো একটাই ছিল যে-পথের শেষে একটি মাত্র মাইলফলকে চাঁদতারা-সহ আট অক্ষরে খোদিত শব্দ 'পাকিস্তান' (PAKISTAN)। বিচক্ষণ আইনজীবী এর বিপরীত বিচারে ভাবতে চান নি যে অখণ্ড ভারতে মুসলমান জনসংখ্যার প্রতিনিধি রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে। অখণ্ড বঙ্গ, অখণ্ড পাঞ্জাব মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ হিসাবে তার দাবার ছকে হতে পারতো গজ ও ঘোড়া। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-সচেতন নেহরু ভেবে দেখেননি খণ্ডিত ভারতের তুলনায় উপমহাদেশীয় অখণ্ড স্বাধীন ভারতবর্ষ বিশ্বভুবনে এশিয়ার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এমন একাধিক শুভ সম্ভাবনা মাটি করেছে ভারত বিভাগ, যদি দুষ্ট 'উপসর্গগুলোর' কথা বাদও দেই। আর যুক্তবঙ্গ উভয় হিসাবেই প্রান্তিক প্রদেশ হয়েও বর্তমানের তুলনায় অধিক রাজনৈতিক শক্তি ও আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির অধিকারী হতে পারতো। পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থাও হ্রাস পেতো।

তিন

রাজনৈতিক নেতারা (বিশেষত জাতীয়তাবাদীগণ) সাধারণত দলীয় স্বার্থের বাইরে সুস্থ সামাজিক স্বার্থ ও জনস্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামান না, বুঝেও বোঝেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। প্রগতিচেতনার শিক্ষিতশ্রেণী যেমন কবি, সাহিত্যিক সেসব বিষয় পূর্বাহ্নেই বুঝে নেন, প্রকাশ করেন তাদের রচনায়, ধারণ করেন সমকালীন সংকট ও উত্তরণপন্থা। দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িকতা, মানবিকতার বিপর্যয় ইত্যাদি প্রসঙ্গেও এমনটি দেখা গেছে। মুশিরুল হাসানের মতে 'চল্লিশের দশক থেকে জাতীয়তাবাদী লেখকগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও সহাবস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাদের রচনায়। আজ (১৯৯৩-এ লেখা) ভারত, পাকিস্তানের মানুষ ও তাদের সরকার দেশবিভাগের উত্তরাধিকার নিয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ, হতাশাগ্রস্ত। এবং দেশভাগের প্রভাব প্রশমনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন (পৃ. ৩৫, ৪৩)। ফয়েজের কবিতা উদ্ধৃত করে তিনি কবি লেখক শিল্পীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সমাজে শান্তি ও প্রগতি প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসতে। প্রশ্ন তুলেছেন, এদেরকে কীভাবে ভাগ করা যাবে? অর্থাৎ যাবে না। যেমন একইভাবে অন্নদাশংকর রায়ের মন্তব্য যে দেশভাগ হলেও 'ভাগ হয়নিকো নজরুল'।

প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি তিরিশের দশকের শেষদিক থেকে চল্লিশে এসেও প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘের মতো প্রতিষ্ঠানের গণসংস্কৃতিচর্চা, লেখকদের হাতে রচিত বিপুল পরিমাণ 'প্রগতি সাহিত্য'-এর কথা যা বিষাক্ত রাজনীতির ওপর সুপ্রভাব ফেলতে পারেনি। মুল্‌করাজ, মান্টো, ফয়েজ, কৃষাণ চন্দর, মাজাজ, সাজ্জাদ জহির ও হীরেন মুখার্জি থেকে সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের সব চেষ্টা বৃথা গেছে। কুলদীপ নায়ার ফয়েজের কবিতা উদ্ধৃত করে লিখেছেন 'দেশভাগজাত স্বাধীনতা নররক্তে রঞ্জিত স্বাধীনতা'। ফয়েজের প্রশ্ন 'এই কি মুক্তির সকাল, রাতের আঁধারবিদ্ধ সকাল?' ১৯৪৮-এও কিছু সংখ্যক মানুষ ঝুঁটা আজাদির সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির আনন্দে সাধারণ মানুষ, এমন কি শিক্ষিত শ্রেণীর সিংহভাগ মানুষ তা বুঝতে পারেন নি।

দিন যত গেছে ক্রমে বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় টিভি'র জমজমাট অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষিতকে আজাদি সম্পর্কে, দেশবিভাগ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে শুনেছি। এরা হয়তো সংখ্যায় অল্প। ভারত-পাকিস্তানের মানুষ দেশবিভাগ সংক্রান্ত সম্প্রদায়চেতনার 'আদিপাপ' থেকে এখনো মুক্ত হতে পারেনি। এমন কি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার ঘটনাবলীর ইতিহাস সামনে রেখেও বাংলাদেশ সংকীর্ণ ধর্মীয় চেতনার (১৯৪৭) প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে দ্বিজাতিতত্ত্ব ও ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতে দেশবিভাগ (১৯৪৭) নানা কারণে এবং বিশেষ করে সেকুলার গণতন্ত্রী শাসনের তথা সুশাসনের অভাবে উপমহাদেশীয় সমাজ সে প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি। এটা দেশবিভাগের অন্য এক ট্রাজেডি। কংগ্রেস প্রমাণ করতে পারেনি তারা সংখ্যালঘুর স্বার্থে আন্তরিক। বিভাগোত্তর ভারত সর্বজনীন স্বার্থের পরিচর্যায় ব্যর্থ। জিন্নার পাকিস্তান প্রতিশ্রুতির পরও ভারতীয় মুসলিম স্বার্থের একাংশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, অন্যদিকে মূলত পাঞ্জাবি ও ভারত প্রত্যাগত আমলা, উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী ও পুঁজিপতি স্বার্থই রক্ষা করেছে, সেই সঙ্গে সামরিক শ্রেণীর সমৃদ্ধি। জনস্বার্থ বিপন্ন।

দেশবিভাগের রাজনৈতিক লাভক্ষতির হিসাব সম্প্রদায়গত প্রেক্ষাপটে মিলাতে গেলে ক্ষতির ভার মুসলমানের দিকে। এর দায় জিন্না ও তার পাকিস্তানের। পাকিস্তান মেনে কংগ্রেস তথা হিন্দুজনতার ক্ষতি কিছুটা ভৌগোলিক বাকি সবটুকু নান্দনিক এবং তা ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদে। তবে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে ক্ষতিটা বাস্তবিক। র‍্যাডক্লিফ স্বীকার করেছেন (কুলদীপ নায়ারের কাছে) যে তিনি ভাগবাটোয়ারায় পাঞ্জাবি অমুসলমান (হিন্দু-শিখ) ও বাঙালি মুসলমানদের প্রতি অবিচার করেছেন। উভয়েরই অধিকতর ভূখণ্ড প্রাপ্য ছিল (পৃ: ৫৯)। কিন্তু কেন করেছেন? সে জবাব তিনি দেন নি।

তবে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ছিন্নমূল পাঞ্জাবি হিন্দু ও শিখ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত, তেমনি তুলনায় কিছু কম হলেও ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ববঙ্গের সচ্ছল ও বিত্তবান শ্রেণীর ছিন্নমূল তথা উদ্বাস্তু হিন্দু সমাজ যাদের ভারতে গিয়েও ন্যূনতম মাত্রার জীবন যাপনের জন্য দীর্ঘকাল লড়াই করতে হয়েছে। নিম্নবিত্ত বা মুরুব্বিহীন উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তাহীন জীবনযাত্রা শেয়ালদা স্টেশন চত্বর হয়ে এক রিফিউজি ক্যাম্প থেকে আরেক রিফিউজিক্যাম্প এবং 'ধুবুলিয়া-কুপার্স-দণ্ডকারণ্য-মরিচঝাঁপির অজস্র কলোনিতে' (দীপক পিপলাই) জীবনের দুর্দশা চিহ্নিত করেছে। কোথায় কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরাগণা, আর কোথায় মধ্যপ্রদেশের দুর্গম দণ্ডকারণ্য! সবই জিন্না-নেহরু-প্যাটেল ও মাউন্টব্যাটেন সাহেবদের হাতে কাটা দেশবিভাগের দান!

দেশবিভাগের বিপজ্জনক কুহকে পড়ে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান পরাধীনতামুক্ত স্বদেশে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ঝড় মুক্তবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে স্থায়ী ঠিকানা তছনছ করে দিয়েছিল। অবশ্য সবার নয়। মূলত সংখ্যালঘুদের। তারা হিন্দু নন, মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নন, শিখ নন, তারা সংখ্যালঘু। জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব আসলেই ছিল 'মাইনরিটি তত্ত্ব'। সে তত্ত্ব ধর্মনির্ভর ও মীমাংসাহীন। তাই মাইনরিটি তত্ত্বের যন্ত্রণা ত্রিধাবিভক্ত উপমহাদেশকে এখনো বহন করতে হচ্ছে। কথিত সর্বসমস্যাহর (প্যানেশিয়া) দেশবিভাগ অনেক উপসর্গের মতো 'মাইনরিটি উপসর্গ'ও দূর করতে পারেনি। করতে হলে গোটা উপমহাদেশকে ঢেলে সাজাতে হতো যা বাস্তবে অসম্ভব এক প্রকল্প।

দেশবিভাগ নামক ঘটনাটিকে (১৯৪৭-আগস্ট) দীর্ঘসময় পর আজ ২০১৩ আগস্টে দাঁড়িয়ে এ পর্যন্ত সংঘটিত নানা ঘটনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখলে মূল ঘটনার উত্তরপ্রভাবজনিত সমস্যা ও উপসর্গ ক্রমশ বেড়ে চলছে বলে মানতে হয়। নেহরু কথিত তৎকালীন 'দুষ্ট আবেগের জয়' এখনো প্রশমিত হয় নি। বরং নানা খাতে এর উপসর্গাদির এমন বিস্তার ঘটে চলেছে যে এর নিরাময়যোগ্য ভেষজের সন্ধান মিলছে না। তাই নানাজনের নানা লেখার সার সংকেত এমনই হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে দেশবিভাগ আদপেই যুক্তিসঙ্গত ছিল না। কোনো যুক্তিসঙ্গত প্রকল্পের পরিণাম এত অশুভ, এত অমানবিক হয়ে ওঠে না।

AMARBOI.COM

চার

যুক্তিসঙ্গত নয়, তবু সে অযৌক্তিক ঘটনা কেন ঘটেছে, এ প্রশ্ন একালে সেকালে অনেকের। ঘটার অনেক কারণ একসঙ্গে এসে শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তাই অঘটন। তার আগে একটি প্রবাদ কথা– যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। সেই শেষ ভালো তথা উত্তর-প্রভাবের অশুভ, অমঙ্গল ও অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর বিবেচনাতেই এমন ধারণা যে দেশবিভাগ যুক্তিসঙ্গত ছিল না–নিয়তির মতো পরিস্থিতি তাকে সেদিকে টেনে নিয়ে গেছে। অবাঞ্ছিত বহুঘটনার জটিল পরিণতির নাম 'দেশবিভাগ' (পার্টিশন)। এমনই এর শুভ-অশুভ মাহাত্ম্য যে ইংরেজি 'পার্টিশন' শব্দটিও বাঙালির মুখে মুখে রপ্ত হয়ে গেছে।

মূল আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি কীভাবে বিশ শতকের শুরু থেকে (এমন কি তার আগেও) শাসকশ্রেণীর চেষ্টা দুই সম্প্রদায়কে দুই স্বতন্ত্রপথে চালনার। তবে তা বিশেষভাবে শুরু ১৯০৫-এ সূচিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জবাব দিতে– প্রথমত ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনে সহায়তা, ১৯০৯ সালে মর্লি মিন্টো সংস্কার প্রস্তাবে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন, তার সম্প্রসারিত প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯১৯-এ মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাবে এবং এ বিষয়ে সবচেয়ে মারাত্মক ১৯৩২-এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোঁয়েদাদ যা ১৯৩৫-এ ভারত শাসন আইনে পরিণত। ঐক্যের কফিনে বড়সড় পেরেক।

যাত্রা ভিন্ন, তবু ঐক্যের সম্ভাবনা মাঝে মধ্যে উঁকি দিয়ে গেছে, রোঁয়েদাদের আগে ও পরে। যেমন ১৯২৮-এ কলকাতা সম্মেলনে, ১৯৩৭-এর নির্বাচন-শেষে লীগ-কংগ্রেস যুক্তমন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনায়। কংগ্রেসের একগুঁয়েমিতে তা পণ্ড। প্রতিক্রিয়ায় এরপর (১৯৪০) থেকে জিন্নারও জেদি বিপরীত পথে হাঁটা, সাম্প্রদায়িক প্রচার, দ্বিজাতিতত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। বিশেষ করে ১৯৪৬-আগস্টে কুখ্যাত কলকাতা গণহত্যার ধারাবাহিকতায় নোয়াখালি, বিহার, দিল্লি, বোম্বাই– সে এক অবিশ্বাস্য অমানবিক হত্যাউৎসব। সেসবের সঞ্চিত পরিণামে ভারত-বিভাগ ও স্বতন্ত্র ভুবন পাকিস্তান আদায়। তাতে জিন্না-নেহরুদের রাজনৈতিক চিন্তা ও সিদ্ধান্ত কি ন্যায়বোধে দাঁড়াতে পেরেছিল? পরবর্তী প্রতিক্রিয়াতে তা মনে হয় না।

'মাত্র কয়েকজনের সিদ্ধান্তে বহুজনের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ'? বিষয়টা আসলে তাই। অনেক উদাহরণের মধ্যে দু চারটে ঘটনাই বিভাজনের অসঙ্গতি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট, থিসিস রচয়িতাগণ সেক্ষেত্রে যাই বলুন না কেন। ব্যাপক নররক্তস্রোত ও ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণার মতো বিষয়াদি দেখেই বোধহয় কমবেশি আত্মগ্লানিতে ভুগেছেন দেশবিভাগের কারিগরগণ– কারো মন্তব্য আগে, কারো বা পরে। আজাদ, নেহরু, গান্ধি, এমন কি সম্ভবত জিন্নাও। আজাদ বলেছিলেন, 'দেশভাগের জন্য উত্তরপুরুষ আমাদের ক্ষমা করবে না'। গাফফার খানদের প্রতিবাদ তো আগেই। ক্ষুব্ধ গান্ধির নীরবতাই যথেষ্ট, তবে স্বাধীনতার সূর্য যে রক্ত ও ঘৃণার অন্ধকারে কালো হয়ে গেল নিজের জীবন দিয়ে গান্ধি তা প্রমাণ করে গেলেন। আর নেহরু তার একাধিক মন্তব্যে 'দুষ্ট আবেগের জয়' ছাড়াও তাদের ভুলের কথা, অসহিষ্ণু ক্লান্তির কথা (লেনার্ড মোস্‌লে) বলেই ইতি টানেন নি। মাউন্টব্যাটেনকে দেশভাগ সম্বন্ধে বলেন 'তুমি এবং আমরা হয়তো ভুল করেছি' (স্ট্যান্‌লি উলপার্ট)। তিনি আরো বলেন, উত্তর প্রজন্মের ইতিহাসবিদগণ আমাদের ভুলভ্রান্তি নির্ধারণ করবে।

হ্যাঁ, আমরা করছি।

আর মোহাম্মদ আলী জিন্না? আশ্চর্য, পাকিস্তানের নিরন্তর প্রবক্তারও জানা ছিল না, পরিণতি বিচারে দেশবিভাগ সঠিক কি বেঠিক? অবশ্য তা সব কিছু ঘটে যাবার পরবর্তী ভাবনা। তার একান্ত সচিব কে. এইচ. খুরশিদের প্রশ্ন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'স্যার, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কি ঠিক কাজ ছিল'? দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে জিন্নার জবাব : 'জানি না। একমাত্র ভবিষ্যত প্রজন্মই সে বিচার করতে পারবে' (কুলদীপ, পৃ. ১৭)। মুল কারিগর সবাই তাদের কৃতকর্মের বিচার শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যত সময় ও প্রজন্মের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কুলদীপ নায়ার একাধিক শীর্ষ লীগ নেতার মনস্তাপের কথাও উল্লেখ করেছেন প্রসঙ্গত।

হ্যাঁ, দীর্ঘ ছয় শতক ধরে ভারতভাগের ঠিক-বেঠিক নিয়ে অনেক লেখক, ইতিহাসবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী নিজ নিজ মেধামাফিক বিচার ব্যাখ্যা করেছেন পক্ষে-বিপক্ষে। কিন্তু এর পরিণাম নিয়ে নিশ্চিত সদর্থক কথা উচ্চারণ কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি, যদিও এর দায় যে-যারমত প্রতিপক্ষের কাঁধে চাপিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু রক্তের সমুদ্রে ভাসমান মানুষের উত্তরপুরুষ, ছিন্নমূল যন্ত্রণাদীর্ণ মানুষ বা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অথবা মানবিক চেতনা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী কি মহাদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী মহাবিভাগের নায়কদের ক্ষমা করতে পেরেছেন (রবীন্দ্রপঙ্‌ক্তি স্মর্তব্য)। বিশেষ করে যারা বুঝে শুনে এই মহাবিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন?

পূর্বোক্ত কারো কারো লেখা বা বক্তব্য থেকে মনে হয় ক্ষমা তারা করতে পারেন নি। তারা রাজনৈতিক নেতাসহ ব্রিটিশরাজকেও এ অগ্রহণযোগ্য সর্বনাশের জন্য দায়ী করেছেন। জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার উপাচার্য ড. বশীরউদ্দিন আহমদ তো 'দেশভাগের জন্য প্রধানত স্বতন্ত্র নির্বাচন' ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন (যশবন্ত সিং পৃ. ৪৯৪)। যশবন্ত সিংহের মতে দেশভাগের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জিন্না-নেহরু-প্যাটেল কেউ সফল নন, পেছনে মূল কারিগর (তার ভাষায় 'ধাত্রী') ব্রিটিশরাজ। তার বিচারে জিন্না যেমন পাকিস্তানে 'রাষ্ট্র' ও 'জাতি' (নেশন) তৈরিতে ব্যর্থ, তেমনি তিনি এবং নেহরু-প্যাটেল-মাউন্টব্যাটেন ভারত ভেঙে জনসাধারণকে বিভক্তই করেছেন কিন্তু জাতির আবির্ভাব নিশ্চিত করতে পারেন নি (পৃ. ৫১৫)।

বিষয়টা আসলে জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন। কিন্তু বহুজাতি-বহুভাষী অধ্যুষিত উপমহাদেশে একক জাতিররাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। বহুজাতিক ফেডারেল ব্যবস্থার রাষ্ট্রগঠন বরং স্বাভাবিক ছিল যা উভয় পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে সম্ভব হয়নি, চেষ্টাও চলে নি। সে সম্ভাবনা ভারত-পাকিস্তানে এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। কিন্তু সেখানেও সমস্যা রয়েছে। দেশভাগ নিয়ে যেখানে নেতির ভার এত বেশি, সফলতার চেয়ে ব্যর্থতাই প্রধান সে দেশবিভাগ কি কোনো যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড়ায়? কী তাহলে দেশবিভাগের ইতিবাচক অর্জন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নের পাকিস্তান প্রাপ্তি নিয়ে? উপমহাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি (নৈরাজ্য) সে প্রশ্নের সঠিক জবাব।

এমন আলোচনা শেষে পাঠক কি ভাববেন যে দেশবিভাগের অর্জন বলতে কিছু নেই, এর সবই নেতিবাচক। না, অর্জন অবশ্যই আছে আর তাহল স্বদেশী রাজনীতিকদের হাতে শাসন ক্ষমতার হস্তান্তর যা দেশবিভাগের সূত্রে। এবং ভারতীয় মুসলমানদের একাংশের জন্য স্বতন্ত্র ভুবন যা নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। তবে নিয়মতান্ত্রিক পথে সমঝোতায় ক্ষমতা অর্জনের সীমাবদ্ধতা অনেক, সমস্যা অনেক বিশেষ করে যখন বিদেশী শাসকের মর্জিমাফিক একটি দেশ বিভক্ত করা হয়। এবং সব কিছুই পূর্বকাঠামো মাফিক থাকে।

তাই অবাক হবার কিছু নেই যে, বিভাজিত ভূখণ্ডে ঔপনিবেশিক কাঠামো, তার আমলাতন্ত্র, পুলিশতন্ত্র সবই পূর্বচরিত্র বিচারেও অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। আর সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশও ঘটে চলেছে ঠিক সেভাবে যা আকাঙ্ক্ষিত ছিল হিন্দুমুসলমান পার্সি ও অনুরূপ সব সম্প্রদায়ের মুৎসুদ্দিধনিকদের। বরং বলা যায় ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের বড় অস্বাভাবিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে– সঙ্গে দুর্নীতি মহাসহায়ক শক্তি। পর্দার আড়ালে এরাই প্রকৃত শাসক। আর পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এক মহাবাড়তি শক্তি সমরতন্ত্র।

তাই ১৯৪৭-আগস্টে যে বিশাল জনগোষ্ঠী মহানন্দে স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগান তুলেছিল তাদের অনেকে এখন নিরানন্দ স্লোগান তুলতে পারে এই বলে যে 'সবার উপরে পুঁজিবাদ সত্য, তাহার উপরে নাই'। তবে দেশভাগের সূত্রে যা সবচেয়ে বড়ো, স্থায়ী সত্য হয়ে থাকল তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক চেতনার ব্যাধি বা পাপ, যা প্রথম দুই ভূখণ্ডেই নয়, ত্রিধাবিভক্ত উপমহাদেশের জন্যই সামাজিক রাজনৈতিক সত্য। দেশবিভাগ তা দূর করতে পারেনি। অথচ নীতিগত প্রত্যাশা ছিল ঐ ব্যাধি থেকে মুক্তির।

মানুষ আশাবাদী। তাই তাদের প্রত্যাশা– মানবীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন সেকুলার. বৈষম্যহীন সমাজের জন্য। কিন্তু তেমন স্বদেশ তো আপ্সে আপ ধরা দেয় না বা গড়ে ওঠে না। সেজন্য দরকার শুদ্ধ আদর্শ ও শ্রম। ভাবছি মৃত্যুঞ্জয় মানুষ এ উপমহাদেশকে এর সর্বপ্রকার ব্যাধি ও পাপ থেকে একদিন মুক্ত করবে বাঞ্ছিত সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে। দেশভাগজনিত রক্তের ঋণ কি তাতে শোধ হবে? তখনকার ও পরবর্তী সময়ের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কি পূরণ হবে? দায়মুক্ত হতে পারবেন কি দেশভাগের কারিগরগণ? সর্বশেষ প্রশ্ন : ইতিহাস কি অপরাধীকে ক্ষমার অধিকার রাখে? এমনি প্রশ্নের মুখে দেশভাগের যুক্তি ও সঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে। কেউ কেউ হয়তো এমন সিদ্ধান্তেও আসবেন যে দেশবিভাগ সঠিক ছিল না, আবার কারো মতে সঠিক। দেশবিভাগে বাস্তুচ্যুত ও প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার ও অনুরূপ কেউ কেউ সখেদে বলতেই পারেন যে 'দেশভাগ ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ'।

বলছেন পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু বাঙাল যাদের 'দ্যাশের জন্য এখনো মন কান্দে' যেমন কাঁদে প্রবীণ কুলদীপ নায়ারের। ওই বাঙালদের অনেকে ভাবেন– 'দুই বাংলা আবার যদি এক হইতো'। কিন্তু বোঝেন স্বপ্নদেখা মানুষগুলো, সে স্বপ্ন সত্য হবার নয়। তবু সেখানকার আলাপে, গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে, এমনকি টিভি সিরিয়ালে ওই স্বপ্নের প্রকাশ ঘটাতে দেখি হয়তো ওই সব মানুষের জন্য যারা পিতা-পিতামহের 'দ্যাশটাকে' বুকের গভীরে ধরে রেখেছেন। ভাবছেন সাতচল্লিশের ভুলটাকে কি কেউ সংশোধন করতে পারবেন? ইতিহাসবিদ নন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হয়তো ভাবতে পারেন, ইতিহাসের ধারায় ওই ভুলের আংশিক সংশোধন কি সম্ভব 'উপমহাদেশের কনফেডারেশন' বা 'ঐক্যবদ্ধ দক্ষিণ এশিয়া জোট' গঠনে। যাকে বলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। রবীন্দ্রনাথ এক সময় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ঠেকাতে ঐক্যবদ্ধ এশিয়া গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন তার এক প্রবন্ধে (১৯৩৩)। এ সবই এখন নিছক তাত্ত্বিক 'ডিসকোর্স' বলা চলে। বাস্তবতা অনেক দূর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ঘণ্ট

অ/অ্যা

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৯২
অচ্যুত পট্টবর্ধন ১৪৬
অটলবিহারী বাজপেয়ি ৪৪৪
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০৯
অন্তর্বর্তী সরকার ৩২৩-২৯
অন্নদাশংকর রায় ৪৫৫
অমল হোম ২৩৫
অমলেশ ত্রিপাঠী ১৯৪
অমিয় বসু ৮০
অম্বালাল সারাভাই ২২৯
অরবিন্দ ঘোষ ৩৪, ১৯৩, ৩৮৮, ৪০০
অরুণা আসফ আলী ১৪৬, ১৫১
অশোক মিত্র (আই-সি-এস) ৩৩, ৩৯৮
(ড.) অশোক মিত্র (অর্থনীতিবিদ) ৪০৬
অসীম রায় ৪০৬
অ্যাটলি, ক্লেমেন্ট ১০৩, ১০৮, ১১২, ১১৫-১৭, ১১৯, ২৮৭, ৩৩২-৩৩, ৩৪৬, ৩৪৮-৪৯ ৩৫৯, ৩৯৪
অ্যান্ড্রুজ, সি. এফ. ২৩৩-৩৪, ২৩৬, ৩৬৫
অ্যামেরি, লিওপোল্ড ১২১, ১২৩, ২৭২, ২৮৭

আ

আইন অমান্য আন্দোলন ৬৯
(নবাব) আকবর খান বুগতি ১৩, ২৯, ১৬৪, ১৬৮, ৪২৮
আকরম খান ৮৫, ১৬৪, ১৬৭-৬৮, ১৯৩, ১৯৮, ২২২
আগা খান ৩৪
আজাদ হিন্দ ফৌজ ৫৬, ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৮১, ৮২, ১০০, ২৮৮, ২৯১-৯৮, ৩০৬, ৩২৫
(স্যার) আজিজুল হক ৫১
আটলান্টিক চার্টার ৭৯, ৮০, ৯৫, ৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দমঠ	১০, ৩৪, ১৭৬, ১৮৮, ১৯৬, ২০৩, ৩৮৭-৮৮, ৪০০
আনন্দমোহন বসু	১৮৯-৯০
(ডা.) আনসারি, এম.এ.	৩৩, ২০৮-০৯, ২৩২, ২৪৯, ২৬৫, ৩৮৫, ৪০০
আলী ভাইদ্বয়	২৭, ১৮১, ২০৮, ২৩৭
আবদুল গাফফার চৌধুরী	৪১০
আবদুর রসুল (ব্যারিস্টার)	১৮৩, ২১০, ২১৯, ২২১-২২, ২২৮, ৩৯০
আবদুল মজিদ সিন্ধি	৪৪৭
আবদুল হালিম গজনভি	৪৭, ১৩৭, ১৫৮, ১৮৩, ২১২, ২২৮, ২৯৯, ৩৯০
আবুল কালাম আজাদ	২২, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৫৮, ৬১, ৭৩-৭৬, ৯৮, ১০৪-৫, ১০৮, ১১১-১২, ১১৪, ১২২-২৪, ১৩৮, ১৪৪, ১৫২, ২০৯-১০, ২৪৭-৪৮, ২৫৫, ২৬০, ২৬২, ২৭৩, ২৮০-৮১, ২৮৪-৮৬, ২৮৯-৯০, ৩০১, ৩০৭, ৩০৯, ৩১১-১৪, ৩১৬, ৩২৪, ৩২৮, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪৬, ৩৫৩, ৩৭২, ৩৭৫-৭৮, ৩৮১-৮৫, ৩৯৫, ৪২৪, ৪২৬, ৪৫০, ৪৫৩, ৪৫৮
আবুল কালাম শামসুদ্দীন	১৭০-৭১, ১৭৩
আবুল মনসুর আহমদ	৪৫, ৮৭, ১৭০-৭৩, ১৯৪
আবুল হাশিম	১৯, ৮৮, ৯৩, ১৬৬-৬৭, ৩০২, ৩১৭, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৭১, ৪০৫, ৪০৯
আবুল হুসেন	১৮৩, ১৯৯, ৩৯০
(ড.) আম্বেদকর	২১, ৩০৮
আল্লাবক্স	৩৭, ৮৬, ৯৪, ১০৬, ১৩৭-৩৮-৪০, ১৫৯, ২৫৩, ২৫৭, ২৬৮, ২৮১, ৪২৭, ৪৪৩, ৪৪৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ৪৭, ২৯৯, ৩০১
আসফ আলী ১৪০
আহমদ শরীফ ২৩৩

ই
(কবি) ইকবাল ২২, ৬৬, ২৩২-৩৩, ২৪০, ২৫৩, ২৭০, ৪৪৩
(মিয়া) ইফতেখারউদ্দিন ১৪০
(হাসান) ইস্পাহানি ৪৩, ৪৫, ৬৫, ৮৬, ৮৭, ১৬১-৬৩, ১৬৮, ২২২, ৩৬৪, ৩৯৫, ৪০৪
ইস্কান্দার মীর্জা ৩৫৮, ৪৩০
(নবাব) ইসমাইল খান ৪২৪
ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৮৩, ৩৯০
ইসমে (লর্ড) ৩৪৪-৪৫

উ
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫, ১৯০

এ
এডুইনা মাউন্টব্যাটেন ৩৫১
এম. এন. রায় ৭৭
এমার্সন, রুপার্ট ২০

ও
ওবেইদুল্লাহ সিন্ধি ২০৯
(এস) ওয়াজেদ আলী ১৭১, ১৭৫, ২১৩, ৩৯৮
ওয়াভেল (ফিল্ডমার্শাল) ৩০, ১০৯, ১১৬, ১১৭, ১৪২, ২৭১-৭৩, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৩-৯৬, ২৯৯, ৩০৩, ৩০৫, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৮, ৩২০, ৩২২-২৬, ৩২৮-৩০, ৩৩২-৩৩, ৩৩৫-৩৭, ৩৪০-৪১, ৩৭৫-৭৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াভেল পরিকল্পনা	২৭৪, ২৮৪, ৩৯৪
ওয়ালি খান	২৯, ২৬৮, ২৭৯, ৩৫৬-৫৮, ৪৪৭
ওয়াহাবি আন্দোলন	২৮, ১৮৮, ৩৮৮
ওয়ারেন হেস্টিংস	২৭৮

ক

কডওয়েল, ক্রিস্টোফার	১২৭
কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড (সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ)	৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৬১, ৬৪, ২৪৪, ২৪৭-৫১, ২৫৩-৫৪, ২৬৪, ২৬৮, ২৭৯, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৮৯, ৪০৪, ৪৫৭
(জ্ঞানী) কর্তার সিং	৩০৮, ৩৫১
কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল	৭৯
কাজী আবদুল ওদুদ	১৭১, ১৭৫
কাজী মোতাহার হোসেন	১৭৫
কার্জন (লর্ড)	১৮৩, ১৯৮, ২০৫, ৩৯০
কামরুদ্দীন আহমদ	১৯, ২৪,২৭, ২৪৫, ৩৭১
কালিপ্রসন্ন সিংহ	১৯২, ২৯৬, ৩৩৫, ৩৫৪, ৪০৫
কিরণশংকর রায়	১৩৬, ১৫৭
কৃপালনি, আচার্য	১১১, ১৭৯
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৯
কৃষাণ চন্দর	৩৫২, ৪২৪
কেনেডি, জোসেফ	১০৯, ১১০
কেবিনেট মিশন (মন্ত্রীমিশন) প্রস্তাব	১৫, ৩৮, ৩০৬-৩১৫, ৩২০, ৩৩২, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৯৪, ৪০৪, ৪০৯, ৪১৪, ৪২৩
কৃষক বিদ্রোহ	২১৩-১৪
কেরামত আলী জৌনপুরি, মওলানা	১৮৮, ৩৯৭, ৪০৩
কে সি, (গভর্নর)	২৯৪, ২৯৬
কোসাম্বি, ডি. ডি.	১২৫
ক্যালকাটা ট্রায়ো	১৬৮
ক্রিপস, স্ট্যাফোর্ড	১০৩, ১০৭-১০, ১১২, ১১৬-১৭, ১২১-২২, ১৩১, ১৩৫-৩৮, ১৪০, ১৪২-৪৪, ২৮৭-৮৮, ২৯৯, ৩০৬, ৩০৯-১০, ৩১৫, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৪১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিপস প্রস্তাব ১০০, ১১৫-১৬, ১১৮, ১২৩, ১২৪, ১৩০, ১৩১, ১৪২-৪৩, ২৯১

খ
খাকসার ১৩৯, ২৭৫, ৪৩১
খাজা আহমদ আব্বাস ৩৫২, ৪২৪
(ডা.) খান সাহেব ১৩৭, ১৪০, ২৭৪, ২৮৮, ৩৫৪, ৩৫৭
(চৌধুরী) খালিকুজ্জামান ৫৯, ৬০, ১৬২, ২৪১, ২৫১, ২৬০, ২৬৬, ২৬৯-৭০, ২৮২, ৩৭৭-৭৮, ৪২৪, ৪২৯, ৪৪৭
খিজির হায়াত খান ১৪, ৩৫, ৭০, ৯১, ২৬৮, ২৮৩, ২৮৮, ৩০৪, ৩৩৫, ৩৪০, ৩৫০
খিলাফত আন্দোলন ১৮২, ২১০, ২১৩, ২১৮, ২৩৭, ২৪২, ৩৬৩, ৩৬৬

গ
গজনফর আলী খান ১৬২, ৩১৬, ৩১৭, ৩২৯, ৩৫১
গণভোট (সীমান্ত প্রদেশে) ৩৫৫-৩৫৮
গান্ধি এম. কে. ১৫, ২৪, ২৫, ২৭, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৫৫-৫৮, ৬১, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭২-৭৭, ৭৯, ৮১-৮৩, ৯৮, ১০২-০৩, ১০৬, ১১১-১২, ১২১-২৪, ১৩৪, ১৪২-৪৬, ১৪৮-৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ১৭৭-৮৩, ১৯৪-৯৫, ২১১, ২১৫-১৮, ২২৯-৩০, ২৩৪-৩৯, ২৪১-৪৬, ২৪৮-৪৯, ২৫৫, ২৬৯, ২৭১, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৮-৭৯, ২৮৮, ২৯০-৯১, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮, ২৯৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৬-০৭, ৩১১, ৩১৪, ৩২০, ৩২৮-৩০, ৩৪২-৪৬, ৩৬১-৭৩, ৩৭৫, ৩৭৯-৮৪, ৩৯৫, ৪০১, ৪০৩, ৪২৩, ৪৪২, ৪৫০-৫৪, ৪৫৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাফফার খান ২৯, ৩৭, ১৪০, ২৫৭, ৩০৪, ৩৪৬, ৩৫৪-৫৮, ৩৮২, ৪২৭, ৪৪৭
গোখ্‌লে গোপালকৃষ্ণ ৩৬, ১৮৫, ৩৭০
গোপাল হালদার ৯৭, ১৪৬, ১৫৪
গোবিন্দবল্লভ পন্থ ৩৭৮
গোলাম সারোয়ার ৩২২

চ

চার্চিল, উইনস্টন ১৫, ৯৫, ৯৬, ১০১, ১০৬, ১০৮-১০, ১১৩, ১১৫, ১১৭, ১১৯-২২, ১৩২, ১৫৩, ২৮৭, ৩৩৪, ৩৯৪
চিত্তরঞ্জন দাস ১৪, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৭২, ৯২, ১২৪, ১৬৫, ২১৩, ২২৯, ২৩৬-৩৮, ৩৯১, ৪০২, ৪১২
চিয়াংকাইশেক ১০২, ১০৩, ১০৪, ১৪৪
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (কৃষিতে) ১৮৬
চুন্দ্রীগড়, আই. আই ২৬৯, ৩২৯, ৪২৪
চৌরিচৌরা (অসহযোগ) ১৩৪, ১৭৮, ২৩৭, ৩৬৩

জ

জওহরলাল নেহরু ১২, ১৩, ১৫, ২৪, ৩০, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৫৩, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৭, ৭২, ৭৫, ৭৭, ৮১, ৮২, ১০২, ১০৩, ১১৮, ১২২-২৩, ১৭৭, ১৭৮-৮০, ২৪১, ২৪৫, ২৪৮, ২৫৫, ২৬২, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৯, ২৯১, ২৯৩, ২৯৫, ৩০৬, ৩১৩-১৬, ৩২০, ৩২২, ৩২৬, ৩২৯-৩০, ৩৩৪-৪৩, ৩৪৬-৪৮, ৩৫০, ৩৬১, ৩৬৮, ৩৭৫-৮৪, ৩৮৯, ৩৯৪-৯৫, ৪২৩, ৪৩২, ৪৪২, ৪৫০, ৪৫৪, ৪৫৬-৪৫৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনযুদ্ধ	৯৮-১০০, ১২৬-২৭, ১২৯-৩০, ১৩১-৩৪, ১৪২-৪৩, ২৫৪
জয়নুল আবেদীন (চিত্রশিল্পী)	১০৬
জয়প্রকাশ নারায়ন	১৪৬, ১৫১-৫২
জাগরী (উপন্যাস)	১৪৬, ১৪৭
জাফর আলী খান	২০৯, ২৩২, ২৬৮
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড	২১৫, ২২৮-২৯, ২৩৪-৩৬
জাফরউল্লাহ খান	২৬৮, ২৮২
জি. এম. সৈয়দ	১৪০, ২৪৯, ৪২৭, ৪৪৭
জিন্না, মোহাম্মদ আলী	১২-১৫, ১৭-৩০, ৩৩-৪৪, ৫০, ৫২-৬৭, ৬৯-৭৫, ৮৩-৯৪, ১১২, ১১৭-১৮, ১৩৩, ১৩৮-৩৯, ১৪২, ১৪৪-৪৫, ১৫৬, ১৬১-৬৩, ১৬৫-৬৬, ১৬৮, ১৮০, ১৯৩-৯৫, ২১০, ২১৭-১৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৯, ২৪১, ২৪৩-৪৮, ২৪৯-৮৯, ২৯১, ২৯৮-৩০০, ৩০২-৩০৬, ৩০৮-১৩, ৩১৫-১৬, ৩১৯-২০, ৩২৪-৩২, ৩৩৪, ৩৩৯-৪৮, ৩৫৪-৫৮, ৩৬১-৬৪, ৩৬৭-৭২, ৩৭৫-৭৬, ৩৭৮-৮২, ৩৮৭, ৩৮৯-৯০, ৩৯২-৯৫, ৪১৩-১৪, ৪২১-৩২, ৪৩৭, ৪৪২-৪৮, ৪৫০-৫৪, ৪৫৬-৫৯
জুলফিকার আলী ভুট্টো	৩৭৪
জেটল্যান্ড (লর্ড)	৬০, ২৫৪-৫৫, ২৬০-৬১, ২৭৭, ২৮০
জোশি, পি. সি.	৩৮০
জ্যোতি বসু	৪০৭
জেন্‌কিন্স, ইভান (গভর্নর)	৩৩৫, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৫০-৫৩

ড

ডাক ধর্মঘাট	৩২৫
ডান্ডি মার্চ	৩৬৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাফরিন (লর্ড) ১৮৬, ৩৮৯
ডায়ার (জেনারেল) ২১৫, ২২৮, ২৩৬, ৩৬৩
ডিভাইড অ্যান্ড রুল ৩১, ৬২, ১০৭, ১২১, ১৯৪, ৪১৩

ত

তমিজউদ্দিন খান ৫১
তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ১৪৮
(মাস্টার) তারা সিং ৩০৮, ৩৫১
তিলক, বালগঙ্গাধর ২১১, ২৩৬, ৪০১, ৪৫৩
তেজবাহাদুর সাপ্রু ৮৫, ৯৪, ১০৬, ১২০-২১, ১৪৩, ১৫৩, ২৭১, ২৯২, ৩০৮
তেভাগা আন্দোলন ২৯১, ২৯৮
তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ ২৯১, ২৯৮

দ

দাঙ্গা (কলকাতা) ১৯৭, ২১২, ২২০-২১, ২২৩-২৮, ২৩৮, ৩১৮-২১, ৩৯৫, ৪৩৩, ৪৫৭
দাঙ্গা (গড়মুক্তেশ্বর) ৩০৫
দাঙ্গা (নোয়াখালি) ৩২১-২২, ৩৯৫
দাঙ্গা (ঢাকা, ১৯৬৪) ৪৩৯
দাঙ্গা (বিহার) ২২০, ৩৯৫
দীপক পিপলাই ৪৩৫-৩৬, ৪৩৮, ৪৫৬
দীপংকর রায় ৪৩৫
দীনবন্ধু মিত্র ১৯২
দেশাই-লিয়াকত চুক্তি ২৭৩
দ্বিজাতিতত্ত্ব ১৩, ১৭, ১৯, ২০-২২, ২৮, ৫৬, ৬৫, ৬৭, ১৭৫, ১৯৩-৯৪, ২৪৪, ২৬০, ২৬১, ২৬৫-৬৭, ২৭৯, ২৮৯, ৩০৭, ৩০৯, ৩৪৪, ৩৫৬, ৩৬৯, ৩৮৩, ৩৮৭, ৩৯৩, ৪১৩, ৪১৫, ৪২০, ৪২২-২৪, ৪৪৩, ৪৪৮-৪৯, ৪৫৫-৫৬
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন

নওরোজী, দাদাভাই — ৩৬, ২৪৬

নওয়াব আলী চৌধুরী, সৈয়দ — ১৯৮-৯৯, ২১০, ২১৯-২৪, ৩৯৯

নওশের আলী, সৈয়দ — ৪৭, ১৩৭, ১৬৫-৬৮, ২২৭, ২৮৮, ২৯৯, ৩০১, ৩১৭, ৩২৭-২৮

নজরুল ইসলাম, কাজী — ২৬, ৭১, ১৭৪, ১৭৭, ৩৯৮

নবগোপাল মিত্র — ১৮৯, ৪০১

নবীনচন্দ্র সেন (কবি) — ১৮৭-৮৮

নরেন্দ্র মোদী (রাজনীতিক) — ৪৪৪

নলিনীরঞ্জন সরকার — ৪২-৪৩, ৫০

নাজিমুদ্দীন, খাজা — ৪০, ৪৮, ৪৯, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ১৫৫-৬০, ১৬২-৬৮, ২৮৮, ৩১৭, ৩২৭-২৮

নীতিশ সেনগুপ্ত — ১৪১

নিশতার, আবদুর রব — ৩২৯

নীতীশ বিশ্বাস — ৪০৭

নীহাররঞ্জন রায় — ১৯৪

নুরুদ্দিন, খাজা — ১৬৮, ৩১৭

নেহরু কমিটি (মতিলাল) — ৩৭

নেহরুর সমাজবাদ — ৩৭৯-৮০

নৌ-সেনা বিদ্রোহ — ২৯১-৯২, ২৯৭-৯৮, ৩০৬, ৩৬৩, ৩৮৪

ন্যাশনাল গার্ড — ২৭৫, ২৯৯, ৩০০

প

পাখতুন/পাখতুনিস্তান — ২৯, ২৫৭, ৩৫৫-৫৬, ৪২৭

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় — ৪০৯

পাবনা কৃষক বিদ্রোহ — ১৮৭

পাঞ্জাব সীমানা বাহিনী — ৩৫২-৫৩

পার্ল হারবার ঘাঁটি — ৯৬, ১০১, ১০৪, ১০৭

পীরপুর রিপোর্ট — ৫৪

পেথিক লরেন্স, লর্ড — ১১৭, ২৮৮, ৩০৬, ৩১০, ৩১৫, ৩২৬, ৩৩৪

প্রজাস্বত্ব আইন — ১, ১৮৯, ৪০২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যাটেল, বল্লভভাই ১২, ৫৫, ৬১, ৭৫, ৯৮, ১১১, ১২২, ১৭৮-৭৯, ২৪১, ২৪৯, ২৯৫, ২৯৮, ২৯৮, ৩১৩, ৩১৮, ৩২৩, ৩২৬, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৮, ৩৪২, ৩৪৬-৪৭, ৩৫১, ৩৫৬, ৩৭৫-৭৬, ৩৮২-৮৫, ৩৯৫, ৪০৩, ৪৩৩

পার্টিশন (বিভাজন) সাহিত্য ১০, ২৬৩

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ২৩, ১৩৩, ১৯৭, ২৭৪, ৩৯৫, ৩০৪, ৩১৫-১৮, ৩২২-২৩, ৩৭১, ৩৮৯

প্রফুল্ল রায় (লেখক) ৪৩৯

প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩৮

ফ

ফজল-ই-হোসেন ৫৫

ফজলুল হক, এ. কে. ২১, ৩৭, ৩৯-৪৪, ৪৫-৪৯, ৫০-৫৫, ৫৭-৫৮, ৬০, ৬২, ৬৫-৬৬, ৭০, ৭৭-৭৯, ৮২-৮৮, ৮৯-৯১, ৯৩-৯৪, ১৩৫-৩৭, ১৪০-৪১, ১৫৫-৬৮, ১৮০, ২০৪

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ৩৫২, ৪৫৫

ফিরোজ শাহ মেহতা ১৮৫

ফারায়েজি আন্দোলন ১৮৮, ৩৮৮

ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০, ৩৪, ১৮৮, ৪০০

বঙ্কিম মুখার্জি ১৭৫

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ১৮৩, ১৯৬, ১৯৯-২০০০২০৮, ২১২, ২৬৮, ৩৩৫, ৩৯০, ৩৯৮-৯৯, ৪০১, ৪৫৭

বঙ্গবিভাগ (২য়) ২৬৬, ৩৫৮, ৪০৫, ৪০৭-০৮, ৪১৬-১৭-১৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গীয় রেনেসাঁস	৩১, ১৮৭-৮৮, ৩৯৫-৯৮
বরকতুল্লাহ (বিপ্লবী)	২০৯
বাটলিওয়ালা, এস. এম.	৮০
'বাবু সম্প্রদায়'	৩৩, ৩৪
বারোজ, ফ্রেড্রিক (গভর্নর)	৩১৮, ৩২২, ৩৪৬, ৪০৮
বিড়লা, ঘনশ্যাম দাস	৪৩, ৪৪, ৪৫, ৬৫, ৬৭, ১৫২-৫৩, ১৮৩-৮৪, ২২৯-৩০, ২৭৬, ২৯৫, ৩৬৩-৬৪, ৪০৪
বিনয় ঘোষ	৩৯৯
বিপান চন্দ্র	১৯৪
বিপিনচন্দ্র পাল	১৯২-৯৩
বিবেকানন্দ, স্বামী	১০, ১৯০
বিভাজিত বাঙালি জাতিসত্তা	৪১৬-১৯
বিমলচন্দ্র ঘোষ (কবি)	৪০০
বিষ্ণু দে (কবি)	১০০, ২৯৬, ৪০০
বীরেন্দ্র শাসমল	২৩৭-৩৮, ৩৯১, ৪০২
বেঙ্গল প্যাক্ট	৪২, ৯২, ১৯৭, ২১৮, ২২৬, ২৩৮, ৩৭১, ৪০২

ভ

ভগৎ সিং	২৬, ৪০৭
'ভদ্রলোক' তত্ত্ব	৩৩, ৪৭, ৩৯৯
'ভদ্রলোক' শ্রেণী	১৭, ৪৭, ১৮৬, ২০০, ২১২, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০১, ৪০৩, ৪০৬
ভারত ছাড় আন্দোলন	৭৩, ১৩৩-৩৪, ১৪২-৫৫, ১৫৮-৬০, ১৭৮, ২৪৩, ২৯১, ৩৩৩
'ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িকতা' (জয়া চ্যাটার্জি)	৪০৫
ভবানীপূজা	৩৪, ১৮৮, ২০২, ৩৮৮, ৪০১
ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতি (১৯১৫)	২০৯
ভাষিক জাতীয়তার সেকুলার চেতনা	২১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম

(শহীদ) মঙ্গল পান্ডে ২৬
মতিলাল নেহরু ১৭৯, ২৩৮-৩৯, ৩৪২, ৩৯১-৯২
মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৪৩, ১৮৩, ১৯৯, ৩৯০
মধুসূদন, মাইকেল ১৮৭, ১৯২
মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭) ৩০, ৩১, ১৫০, ২৯২, ৩৯৭
মহামন্বন্তর ১৬০-৬২
মহেন্দ্র প্রতাব সিং (বিপ্লবী) ২০৯
মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাব ৩২, ৪৭, ২০৩, ২১৪-১৫, ২১৮, ২৩২, ৩৭১, ৩৮৯, ৩৯১, ৪০১, ৪৫৭
মর্লিমিন্টো প্রস্তাব ৩১, ২০৩, ২০৬, ৩৭১, ৩৮৯, ৩৯১, ৪০১, ৪৫৭
মাইনরিটি তত্ত্ব ১৫, ২৪৭, ৪৩০, ৪৪০, ৪৪৯, ৪৫৬
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৪, ৩২১, ৪৫৫
মাউন্টব্যাটেন, লর্ড ১৪, ৩০, ৬০, ৬৭, ১৯৫, ২৭২, ২৮৩, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৪০-৪৯, ৩৫৩-৬০, ৩৭৫-৭৭, ৩৮৩-৮৪, ৪০৮, ৪৪২, ৪৫৮
(শহীদ) মাতঙ্গিনী হাজরা ১৪৮
মালব্য, মদনমোহন ১৭৯, ২১৫, ২৩১, ২৩৮-৩৯, ২৪৯
মিন্টো, লর্ড ১৯৬, ১৯৮
মিন্টো লেডি ৩২
মুজফফর আহমদ ৩৪, ১৭৭, ২৩৭
মোপলা কৃষক বিদ্রোহ ১৮৬, ২১৩-১৪, ৪০৩
মুল্‌করাজ আনন্দ ৪২৪, ৪৫৫
মোহাম্মদ আলী, মওলানা ২০৮-১০, ২৩৯, ২৪৭, ২৪৯, ৪৫১, ৪৫০
মেয়ো, লর্ড ১৮৫, ১৮৮
ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যামজে ২৪৮, ২৫১, ৪০৪, ৪৫৭

য

যতীন্দ্রমোহন (জে. এম.) সেনগুপ্ত ১৭৯, ২৩৭, ৩৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তবঙ্গ ৪০৭, ৪০৯-১০, ৪৫৪
যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ৩২৪, ৩৬৪

র

রজনীপাম দত্ত ১২৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮, ২৯, ৬৮, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১১৩, ১২৯, ১৫৮, ১৭১-৭২, ১৭৪, ১৭৮, ১৮১-৮৬, ১৯০-৯১, ১৯৪, ২০০-০২, ২০৪, ২১২-১৩, ২১৫-১৬, ২২৪, ২২৬, ২২৯, ২৩৩-৩৫, ৩৬৫, ৩৮০, ৩৯০, ৩৯৮-৪০১
রঁল্যা, রোমা ৩৬৫
রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯০
রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯২-৯৪
রশীদ আলী দিবস ৮১, ২৯৬
রাজাগোপালাচারি ৭৪, ১১১, ১২২, ১৪৭, ১৫৩, ২৪১, ২৭১, ৩০৭
রাওলাট আইন ২১১-১২, ২২৭, ২২৯, ২৩২, ২৩৫
রহমত আলী চৌধুরী গ্রুপ ২২, ৬৬
রাগীব আহসান ১৬৩-৬৪, ১৬৬
রাজনারায়ণ বসু ১৮৯
রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৭৪, ৯৮, ১১১, ১৭৮-৭৯, ৩৮২
রামমনোহর লোহিয়া ৩৮২
রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৪৫
রিপন, লর্ড ১৮৫, ১৮৯
রিফিউজি শ্রেণী (তত্ত্ব) ৪৩৪-৩৮, ৪৪০-৪১
রিভিশনিস্ট (পুনর্বিবেচনাবাদী) ধারা ২৬২-৬৪, ২৬৯, ২৮২, ৪২০
রুজভেল্ট, ফ্রাংকলিন ৬৮, ৯৫, ১০১, ১০৩-০৬, ১১১, ১১৩, ১১৫-১৬, ১১৯, ১২২, ১৪৪, ১৫৩, ৩৩৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেনেসাঁ সোসাইটি (সম্মেলন) ১৬৯-৭৪
রোমিলা থাপার ১৯৪
র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ৩৪৯, ৩৫৮-৫৯, ৪৩৮

ল
লক্ষ্ণৌ চুক্তি ৩৬, ২১০, ২১৭, ২১৯-২২, ৩৭১, ৪২২
লাহোর প্রস্তাব ২০, ২১, ২৫, ৫৭, ৯২, ৯৩, ১৪২, ১৬৯, ১৭২, ২৬৯, ২৬৪-৬৮, ২৭৫, ২৭৯-৮২, ৩৭১, ৩৮৯, ৩৯৩, ৪৫৩
লালা লাজপত রায় ১৯২, ৪০১, ৪৫৩
লিনলিথগো, লর্ড ৩০, ৬০, ৭৫, ১০৮-১০, ১১২, ১১৬, ১১৯, ১২১-২৩, ১৩২, ১৩৪, ১৩৭, ১৪২, ১৪৮, ১৫০, ১৫৮-৫৯, ২৫১-৫২, ২৫৪-৫৬, ২৫৮-৫৯, ২৭১, ২৮২, ৩৬৯, ৩৯৩-৯৪
লিয়াকত আলী খান ১৫, ৬১, ৮৪, ৮৫, ১৬২, ২৪১, ২৫১, ২৬৬, ২৭৩, ৩৩৫, ৩২৯, ৩৪৩, ৩৫৯, ৩৭৩, ৪২৯

শ
শওকত আলী, মওলানা ২০৮, ৪৫০
শরৎ বসু ৫০, ৫৪, ৮৬, ৮৭, ১৫৬, ৩০২, ৩৩৫, ৩৫৪, ৪০৫
শামসুদ্দীন আহমদ ৫১, ১৩৬, ১৫৮, ৩০৩
শাহাবুদ্দীন, খাজা ১৬৮
শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৯, ২০২
শিবাজী উৎসব ৩৪, ১৮৮, ২০২, ৩৮৮, ৪০১
শেখ মুজিবুর রহমান ১৯, ৯১, ১৬৪
শচীন্দ্রনাথ সেন (নাট্যকার) ৭৮
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৮৬, ৮৭, ১৫৭, ১৬৪,৪০৫, ৪০৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স

সমর সেন	৩৩, ১০০, ৩৮১, ৪৩৪
সলিমুল্লাহ, নবাব	৩৪, ৬১, ১৯৩, ২০৩-০৫, ২১৯
সরোজিনী নাইডু	২৪, ২১৭, ৩৭০
সাইমন কমিশন	৩২, ৩৬, ২৩৯
সাদাত হাসান মান্টো	৩৫২, ৪২৪, ৪৫৫
সাভারকর, ভি. ডি.	১৫৬, ১৯৩, ৩৮৮, ৪৩৩, ৪৪৩
সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা	১৮৭-৮৮, ১৯০-৯৩
সিকান্দার হায়াত খান	১৪, ২৩, ৩০, ৩৭, ৩৮, ৫২-৫৫, ৬০, ৭০, ৮৩, ৮৯-৯৪, ১৩৯, ১৪৫, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৬-৫৭, ২৬৮, ২৭৯, ২৮১, ২৮৩-৮৪, ৩০৪, ৩৩৫, ৩৫১, ৩৬০, ৪৪৩, ৪৫৩
সিমলা বৈঠক	২৭৩-৭৪, ২৮৩-৮৭, ২৯১, ২৯৯, ৩০৯, ৩১২, ৩৯৪
সিরাজ-উদ-দৌলা	৪০৭
সিরাজ-উদ-দৌলা-দিবস	৬২
সিরাজ-উদ-দৌলা-নাটক	৬২, ৭৭
সুকান্ত ভট্টাচার্য্য	১০০, ১০৭
সুভাষ বসু	৪৩, ৪৪, ৪৫, ৬১, ৬৯, ৭২, ৭৬, ৭৮-৮৩, ৯৪, ৯৭-৯৮, ১০০, ১০৪, ১২৪, ১৫২, ১৫৫-৫৬, ১৬৫, ১৭৭, ২৩৭-৩৮, ২৪৩, ২৫৫, ২৯১-৯৩, ৩২৫, ৩৪৬, ৩৬৩, ৩৭৯-৮১, ৩৯১
সুশোভন সরকার	৩৩, ১৮৮-৯১, ২০০, ৩৯৮-৩৯৯
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০১
সুধী প্রধান	৪৩৫
সূর্য্য সেন (বিপ্লবী)	২৬, ৪০৭
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫, ১৮৯-৯০, ২১০, ২১৫, ৩৬৫, ৪০১
সৈয়দ আলী আহসান	১৭০, ১৭৪,
সৈয়দ এমদাদ আলী	১৭৪-৭৫
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	৪০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ বদরুদ্দোজা	১৩৬, ১৫৮, ১৬৮
সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন	১৭০, ১৭৩-৭৪
সোহ্‌রাওয়ার্দি, শহীদ	১৩,১৯, ৮৪, ৮৮, ১৪১, ১৫৫-৫৭, ১৬০-৬৮, ২০৫, ২২২, ২২৬-২৭, ২৯৬, ৩০৪, ৩১৭-১৯, ৩২২, ৩২৭-২৮, ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৭১, ৩৯৫, ৪০৩, ৪০৫, ৪০৮
'সোল স্পোকসম্যান' (জিন্না)	২৫০-৫৯, ২৬১-৬২, ২৬৮, ২৭৩-৭৪, ২৮৫, ৩০৩, ৩৬৮, ৪২৫-২৬
হবীবুল্লাহ বাহার	১৭০, ১৭৪
হসরত মোহানি	৬১, ১২৪, ১৭৭, ২০৮, ২১০, ২৩৬, ২৪৯, ৩৭৮, ৩৮১
হাবীবুল্লাহ, নবাব	৪৮, ১৩৬, ১৬৮
হাকিম আজমল খান	৩৩, ২০৪-০৫, ২০৮, ২৩২, ২৪৯, ২৬৫, ৪৪৯, ৪৫২
হান্টার, উইলিয়াম	১৮৫,-৮৬, ৩৮৮-৯০
হান্টার কমিশন রিপোর্ট	২২৮, ২৩৬
হার্বার্ট, স্যার জন	৪০, ৮৮, ১৫৭-৫৯, ১৬৬
হাশেম আলী খান	১৩৬, ১৬৮, ৩০৩
হিউম, অক্টাভিও	৩৪
হিটলার	৬৪, ৬৮, ৭৪, ৯৫, ১২৭, ১৫৩, ১৬২
হিন্দু রিভাইভালিজম	১৭৬, ১৮৭-৮৯, ১৯২
হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক	১৯৪
হুমায়ুন কবীর	৪২, ৪৭, ১৩৬, ১৭১, ১৭৫, ২৯৯
হেইগ, হ্যারি (গভর্নর)	২৬৬
হেমচন্দ্র কানুনগো (বিপ্লবী)	২০৩
হেমচন্দ্র নস্কর (মেয়র)	১৩৬
'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য'	১৯৫, ২০৯, ২১৭-১৮
হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি	২২৫, ২২৭-২৮, ২৩৫, ২৩৭
হীরেন মুখার্জি	৪৫৫
হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৪৫৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংশ্লিষ্ট গ্রন্থপঞ্জি

ক

Ambedkar, B.R., 'Pakistan or Partition of India', Bombay, 1945.

Ayesha Jalal, 'The sole Spokesman. Jinnah, The Muslim League and The Demand for Pakistan.', New Delhi, 1994.

Broomfield, J.H., 'Elite Conflict in a Plural Society. Twentieth Century Bengal, USA, 1968.

Broomfield, J.H., 'Mostly About Bengal', New Delhi, 1982.

Birla, G.D., In the Shadow of the Mahatma', Calcutta, 1955.

Birla, G.D., 'Bapu : A Unique Association, Correspondence, 1940-47' Bombay, 1953.

Bipan Chandra, 'Nationalism and Colonialism in India', New Delhi, 1979.

Coupland, R., 'The Indian Problem. 1833-1935', London, 1943.

Coupland, R., 'The Indian Politics : 1936-1942', London, 1944.

Farzana Shaikh, 'Community and Consensus in Islam : Muslim Representation in Colonial India 1860-1947' (Cambridge 1989).

Gordon, Leonard, A., 'Bengal : The Nationalist-Movement 1876-1940', Delhi, 1974.

Hardy, Peter, 'The Muslims of British India', London 1971.

Hodson, H.V., The Great Divide : Britain-India-Pakistan', Karachi, 1985.

Hiteshranjan Sanyal, 'The Quit India Movement in Medinipur District', 1942.

Humayun Kabir, 'Muslim Politics 1906-1942', Calcutta, 1942.

Jaswant Singh, 'Jinnah. India-Partition-Independence' New Delhi, 2009.

Jaya Chatterji, 'Bengal Divided'. New Delhi. 1996.

Jayanti Maitra. 'Muslim Politics in Bengal 1885-1906', Calcutta, 1984.

Kamruddin Ahmad, 'A Social History of Bengal', Dacca, 1970.

Khaliquzzaman, Choudhury, 'Pathway to Pakistan', Lahore, 1961.

Kuldip Nayar, 'Beyond the Lines', Dhaka, 2012.

Mansergh, Nicholas et al (Ed), 'Transfer of Power 1942-1947' (Eleven Volumes), 1970-1982, London.

Menon, V.P., 'The Transfer of Power in India, New Delhi, 1979.

Moon, Penderal, 'Divide and Quit', London, 1961

Moon, Penderal, (Ed), 'Wavel. The Viceroy's Journal', London, 1973.

Moor, R.J., 'Escape from the Empire', London, 1983.

Moor, R.J. 'Crisis of Indian Unity 1917-1940'. Oxford, 1974.

Moor, R.J, (Select Article) 'Jinnah and the Pakistan Demand' (India's Partion), 1994.
Monobina Gupta, 'Left politics in Bengal', New Delhi, 2010.
Mosley, Leonard, 'The Last Days of British Raj', London, 1971.
Mushirul Hasan (Ed), 'India's Partition : Process, Strategy and Mobilisation', Delhi, 1994.
Mushirul Hasan (Ed), 'Nationalism and Communal Politics in India 1906-1928', New Delhi, 1979.
Mushirul Hasan (Ed), 'Legacy of a Divided Nation : Indian Muslims since Independence', Delhi, 1997.
Nityapriya Ghosh and Ashokkumar Mukhopadhyaya, 'Partition of Bengal 1905-1911', Kolkata, 2008.
Nitish Sengupta, 'Land of Two Rivers', New Delhi, 2011.
Partha Chatteriee, 'Bengal 1920-1947 : The Land Question', Calcutta, 1984.
Ramesh Chandra Mojumder, 'Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century' 1960.
Rammonohar Lohia, 'Guiltymen of Indias Partition, Hyderabad, 1970.
Rafiuddin Ahmed, 'The Bengal Muslims 1870-1906 : A Quest for Identity', New Delhi, 1996.
Rajani Palme Dutt, 'India Today', Bombay, 1947.
Shila Sen, 'Muslim Politics in Bengal 1937-1947', New Delhi, 1976.
Spear, Percival, 'A History of India', New Delhi, 1990.
Suniti Kumar Ghosh, 'India and the Raj 1919-1947 : Glory, Shame and Bondage' (Two Volumes), Calcutta 1989, Bombay 1995.
Suranjan Das, 'Communal Riots in Bengal 1905-1947' Delhi, 1991.
Wali Khan, 'Facts are Facts : The Untold Story of India's Partition', Dhaka, 1987.
Wolpert, Stanley, Jinnah of Pakistan', London, 1984.

খ

অন্নদাশংকর রায়, 'বাংলার রেনেসাঁস', কলিকাতা, ১৩৮১
অমলেন্দু দে, 'স্বাধীন বঙ্গ ভূমি গঠনের পরিকল্পনা', কলিকাতা, ১৯৭৫
অমলেন্দু দে, 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক', কলিকাতা, ১৯৮৯
অসিত রায়, 'দেশভাগের ইতিহাস : একটি বিনির্মান প্রয়াস', কলকাতা, ১৯৯৮
অমলেশ ত্রিপাঠী, 'ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব', কলকাতা, ১৯৮৭
অরবিন্দ পোদ্দার, 'রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' কলিকাতা, ১৯৮২
আবদুল্লাহ রসুল, 'কৃষক সভার ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯৮০

আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', ঢাকা, ১৯৭০
আবুল কালাম আজাদ, 'ভারত স্বাধীন হলো', কলিকাতা, ১৯৫৯
আবুল হাশিম, 'আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি', কলকাতা, ১৯৮৮
আবুল হুসেন রচনাবলী, ঢাকা, ১৯৭৬
এস. ওয়াজেদ আলী, 'ভবিষ্যতের বাঙালী', কলিকাতা, ১৯৪৩
কামরুদ্দীন আহমদ 'বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ' (২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৩৮২
কালিপদ বিশ্বাস, 'যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়', কলকাতা, ২০১২
কেশব চৌধুরী, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপর্ষদ, ১৯৯০
জামালউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, 'রাজবিরোধী আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী', ঢাকা, ১৯৭৪
দীপক পিপলাই, 'আমার প্রশ্নভূমি : বাংলাদেশ' (পুস্তিকা), কলকাতা, ২০১৩
(ড.) নজরুল ইসলাম 'বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক', কলিকাতা, ১৪০১
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দেশবিভাগ নিয়ে', (প্রবন্ধ), ঈশান, ১৯৯৮
বিপানচন্দ্র, 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ', কলকাতা, ১৯৮৯
ভবানী সেন, 'বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান', কলিকাতা, মে-১৯৪৭
ভবানী সেন, 'ভাঙ্গনের মুখে বাংলা', কলিকাতা, মে-১৯৪৫
মুজফফর আহমদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', ঢাকা ১৯৭৭
রবীন্দ্র রচনাবলীর নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য
শৈলেশ কুমার মুখোপাধ্যায়, 'দাঙ্গার ইতিহাস' কলিকাতা, ১৩৯৯
শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জিন্না-পাকিস্তান, নতুন ভাবনা', কলিকাতা, ১৯৮৮
সুকুমার মিত্র, '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ' কলিকাতা, ১৯৬০
সমর সেনের কবিতা, কলিকাতা, ১৩৭৩
সমর সেন, 'বাবু, বৃত্তান্ত', কলিকাতা, ১৯৮৮
সুনীতি কুমার ঘোষ, 'বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি', ঢাকা, ২০০৫
সুমিত সরকার, 'আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭', কলকাতা, ১৯৯৩
সুরজিত দাশগুপ্ত, 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম', কলকাতা, ১৯৯১
সালাহউদ্দিন আহমদ, 'উনিশ শতকের মুসলিম সমাজচিন্তায় লোকায়ত ধারা' (প্রবন্ধ, বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি : ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সংকট' সংকলনধৃত) ঢাকা, ১৯৯৯
সুশোভন সরকার, 'বাংলার রেনেসাঁস' কলিকাতা, ১৩৯৭
সুধী প্রধান, 'বিভক্ত ভারতে পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা' (প্রবন্ধ), 'ঈশান' ১৯৯৮
হেমচন্দ্র কানুনগো, 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা,' কলিকাতা, ১৯২৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~